মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা

Ph.D.

আবুল আহসান চৌধুরী

পি-এইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সেপ্টেম্বর ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা

আবুল আহসান চৌধুরী

382275

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
উপ-উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
382275

পি-এইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর

টেলিফোন : ৮৬ ৫১ ৪৭ (অফিস)
৫০ ৭২ ৯০ ,,
৫০ ৯৫ ৭৭ (বাসা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সুপারিশ-পত্র

জনাব আবুল আহসান চৌধুরী আমার তত্ত্বাবধানে "মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য এটি রেজিস্ট্রীকৃত। অভিসন্দর্ভখানি জমা নেওয়ার ও ত্বরিৎ মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি সুপারিশ করছি।

ঢাকা, ১৫-৯-১৯৯৩

(প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ)
প্রো-উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন

মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ও জ্ঞান মূলত আবেগ-নির্ভর ও পূর্ব-ধারণা প্রসূত। অনেকাংশে সম্প্রদায়গত গৌরব-গর্বের প্রতীক হিসেবেই তিনি চিহ্নিত হয়ে থাকেন। বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, মশাররফচর্চাতে মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মশাররফ-সম্পর্কিত আমাদের বৃত্তাবদ্ধ ধারণা পরিবর্তন ও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও উৎসাহ নিয়েই মশাররফ সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করি সত্তর দশকের গোড়ার দিকে। পরে "মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা" শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধীনে পি-এইচ. ডি. গবেষণার কাজের সঙ্গে যুক্ত হই। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ। মূলত তাঁর আন্তরিক প্রেরণায় শেষপর্যন্ত এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন হলো। তাঁর প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার কাজকে সহজ, নির্বিঘ্ন ও সম্ভব করে তুলেছে। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণা-কাজটি যাতে নিছকই সহায়ক গ্রন্থ-নির্ভর না হয় সে-বিষয়ে আমি সবসময়ই সচেতন ছিলাম। তথ্য সংগ্রহে একদিকে যেমন ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানে নিয়োজিত থেকেছি, অপরপক্ষে অপ্রকাশিত তথ্য-দলিল ও পূর্বে অব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়কে তথ্যনিষ্ঠ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি।

382275

এই গবেষণার কাজে অনেক সুধীজনের কাছে আমি ঋণী। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ পরলোকে। আজ গভীর শ্রদ্ধা ও বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি প্রয়াত ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, অধ্যাপক আলী আহমদ ও প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামালের কথা। বাঙলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন ও অধ্যাপক আহমদ কবিরের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর কাজী আবদুল মান্নান এই কাজে আমাকে বিশেষ উৎসাহ যুগিয়েছেন। প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের নিকট থেকে বই-পুস্তক ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। অধ্যাপক এস. এম. আবদুল লতিফের সৌজন্যে পেয়েছি মশাররফ-সম্পর্কিত কিছু রচনার কপি ও জেরক্স। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী মশাররফের টাঙ্গাইল-পর্বের কিছু অজ্ঞাত সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। মশাররফ- সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রশ্নে প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা আমার ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেছে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এঁদের ঋণ স্বীকার করি।

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ হোসেন-সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সহায়তা করেছেন ডক্টর সনৎকুমার মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, অশোক উপাধ্যায়, ডক্টর স্বপন বসু, সুকুমার মিত্র, মোহিত রায়, ডক্টর ক্যারল সলোমন ও আরো অনেকে। মশাররফের রচনার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ডাইরী, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন মশাররফের পৌত্র প্রয়াত সৈয়দ সাদুল্লা ও মীর মোস্তফা হোসেন, মশাররফের দৌহিত্র-পুত্র প্রয়াত মীর আবদুল হাই, প্রয়াত অধ্যাপক আলী আহমদ, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র প্রয়াত এম. আশরাফ-উল হক ও নীলবিদ্রোহের নেতা সা [শাহ] গোলামের বংশধর শাহ আমিরুল লতীফ (মীরা)। করিমন্নেসা খানমের প্রপৌত্র এফ. কে. গজনবীর সৌজন্যে পেয়েছি দেলদুয়ার এস্টেটের কিছু তথ্য ও আলোকচিত্র। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের আলোকচিত্র পাঠিয়েছেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর)। এইসূত্রে অধ্যাপিকা শিরীনা হোসেন, আলমগীর রেজা চৌধুরী ও শুভ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতার কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম লাইব্রেরী, কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরী, হুগলী মহসীন কলেজ লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক সৌজন্য ও সহযোগিতার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। লণ্ডনের বৃটিশ লাইব্রেরী ও স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় জেরক্স সরবরাহ করে বাধিত করেছেন। এ-ছাড়া অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসীর (খোশবাসপুর, মুর্শিদাবাদ) ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার অবাধে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছি।

আর্থিক লাভ-ক্ষতি বিবেচনা না করেই অভিসন্দর্ভ মুদ্রণের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন কাশবন মুদ্রায়ণের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর আমিনুল ইসলাম। আমার পারিবারিক পরিমণ্ডলের সদস্যদের ত্যাগ ও শ্রমের কথা স্মরণ করতেই হয়। এ-ছাড়া সেইসব নেপথ্য শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা স্মরণ করি যাঁরা নিত্য স্নেহে-প্রেমে-তিরস্কারে-প্রেরণায় আমার এই গবেষণার কাজটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। এইসূত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ | আবুল আহসান চৌধুরী
২৯ ভাদ্র, ১৪০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় ।। দেশ-কালের পটভূমি

দ্বিতীয় অধ্যায় ।। মীর মশাররফ হোসেনের জীবন-কথা

তৃতীয় অধ্যায় ।। সাহিত্যকর্ম ঃ পরিচিতি ও শিল্পবিচার

চতুর্থ অধ্যায় ।। সমাজচিন্তার স্বরূপ

পঞ্চম অধ্যায় ।। উপসংহার

পরিশিষ্ট ।। মশাররফের গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী

।। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

।। চিত্রাবলী ও দলিল-প্রতিচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচী

১. ১৩০৫ সালের ১০ আষাঢ় গৃহীত মীর মশাররফ হোসেনের ফটো এবং তাঁর স্বাক্ষর
২. 'প্রদীপ' পত্রিকায় (পৌষ ১৩০৮) প্রকাশিত মশাররফের প্রতিকৃতি
৩. মশাররফ হোসেনের প্রতিকৃতি
৪. মশাররফ-পত্নী বিবি কুলসুমের প্রতিকৃতি
৫. কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল : মশাররফের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান
৬. কুষ্টিয়া হাইস্কুল : মশাররফের কৈশোরের বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান
৭. মশাররফের স্মৃতিবিজড়িত টাঙ্গাইলের 'শান্তিকুঞ্জ' কাছারি
৮. মশাররফ-কন্যা রওশন আরার পৌত্র মীর আবদুল হাইয়ের লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে রক্ষিত মশাররফের ব্যবহৃত টেবিল, কলমদান, কালির দোয়াত ও বাতিদান এবং পত্নী আজীজনন্নেসা ব্যবহৃত তামার বদনা
৯. পদমদী গ্রামে অবস্থিত মশাররফের কবর
১০. লাহিনীপাড়ায় মশাররফের প্রথমা পত্নী আজীজনন্নেসার কবর
১১. 'রত্নবতী'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা
১২. 'বসন্তকুমারী নাটক' গ্রন্থের আখ্যাপত্র
১৩. 'জমীদার দর্পণ' নাটকের আখ্যাপত্র
১৪. 'বিষাদ-সিন্ধু'র আখ্যাপত্র
১৫. 'সঙ্গীত লহরী'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা
১৬. 'গো-জীবন' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা।
১৭. 'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের আখ্যাপত্র
১৮. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র আখ্যাপত্র
১৯. 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র আখ্যাপত্র
২০. 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা
২১. 'বিবি খোদেজার বিবাহ' গ্রন্থের আখ্যাপত্র
২২ 'আমার জীবনী'র আখ্যাপত্র
২৩. 'ঈদের খোতবা'র আখ্যাপত্র
২৪. 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের আখ্যাপত্র
২৫. 'বিষাদ-সিন্ধু'র হিন্দী সংস্করণের আখ্যাপত্র
২৬. মশাররফ-সম্পাদিত 'হিতকরী' (পাক্ষিক) পত্রিকা
২৭. মশাররফ-সম্পাদিত 'আজীজনন্নেহার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন
২৮. 'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি
২৯. অপ্রকাশিত 'বাঁধা খাতা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি
৩০. অপ্রকাশিত 'প্রেম-পারিজাত' বা 'হজরত ইউসোফ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি
৩১. 'তহমিনা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি
৩২ 'আমার জীবনী'র পাণ্ডুলিপি
৩৩. মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে 'জমীদার দর্পণ' নাটকের বাস্তবতা-সম্পর্কিত সাক্ষ্য
৩৪. মশাররফের ১৩০৪ সালের অপ্রকাশিত দিনলিপি
৩৫. বিবি কুলসুমের ১২৯৮ সালের অপ্রকাশিত দিনলিপি
৩৬. নকল লেখা প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত মশাররফের কৈফিয়ৎ
৩৭. অসুস্থ মশাররফের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র
৩৮. 'গো-জীবন' গ্রন্থ প্রকাশকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদের প্রেক্ষাপটে মশাররফ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার দলিল
৩৯. নীলবিদ্রোহের নেতা সা গোলাম আজমের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালে নীলকর কেনীর দায়েরকৃত মামলার সাক্ষী মশাররফ-পিতা মোয়াজ্জম হোসেনের সওয়াল-জবাব
৪০. মশাররফের পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেন কর্তৃক ১৮৩৯ সালে প্রদত্ত খাজনার দাখিলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। মুসলিমসমাজের প্রতিনিধিত্বহীন, হিন্দু-প্রভাবিত বাঙলাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁর প্রতিভার গুণেই তিনি সমকালীন পাঠক ও সমালোচকের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। তাঁর জীবনবৃত্ত ও সাহিত্যকর্মের পঠন-পাঠন-আলোচনা-বিশ্লেষণ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে মুসলিম-প্রয়াসের সার্থক সূচনা তাঁকে দিয়েই। সব্যসাচী শিল্পী-ব্যক্তিত্ব মশাররফ ছিলেন নব্য-উত্থিত মুসলিম মধ্যশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মুখপাত্র। তাঁর জীবন ও সাহিত্য উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের জীবন-ভাবনা, মনন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংহতির সূত্রে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য, প্রকাশ-নৈপুণ্য, সমাজ-মনস্কতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অকপট স্বীকারোক্তি তাঁকে শিল্পী হিসেবে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনিই প্রথম সাহিত্যসেবী যাঁর প্রয়াসের মাধ্যমে বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার মূলধারার সঙ্গে মুসলিমসমাজের যোগসূত্র রচিত হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে মশাররফের আবির্ভাবে সমকালীন প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট তীব্রই হয়েছিল। অসামান্য স্বীকৃতি ও সমাদরপ্রাপ্তির পাশাপাশি নিন্দিত-সমালোচিতও হন তিনি। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে-পরিমাণ মনোযোগ, সম্মান ও প্রশংসা তিনি হিন্দুসমাজের নিকট থেকে লাভ করেন, অনেকটা সেই পরিমাণই অবহেলা, অনাদর ও উপেক্ষা অর্জন করেন স্ব-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-সহ হিন্দু-পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় মশাররফের শিল্পকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর আবির্ভাব অভিনন্দিত হয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' (১৮৭০) পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'র (১৮৬৯) পরিচিতি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একশো বছরেরও অধিককাল ধরে মশাররফ-সম্পর্কিত আলোচনার ধারা প্রবহমান। এই লঘু-গুরু মূল্যায়নের চুম্বক-ধারণা গ্রহণ মশাররফচর্চার গতি-প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ জরুরী ও প্রয়োজনীয়।

এ-যাবৎ মশাররফের জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তিনটি ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন' (কলিকাতা, ১৩৫৫), আবদুল লতিফ চৌধুরীর 'মীর মশাররফ হোসেন' (সিলেট, ১৯৫২) ও মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'মীর মশাররফ হোসেন' (ঢাকা, ১৯৭১)। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধের কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, যেমন ঃ আশরাফ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিকীর 'মীর মশাররফ হোসেন' ('বাঙলা একাডেমী পত্রিকা', পৌষ ১৩৬৩), এস. এম. আবদুল লতিফের 'মীর মশাররফ হোসেনের জীবন-কথা' ('সাহিত্যিকী', ১৫-১৬ বর্ষ ১৩৮৫-৮৬, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা), অপ্রকাশিত তথ্যোপকরণের সাহায্যে লিখিত শামসুজ্জামান খানের দুটি প্রবন্ধ 'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম—আজিজানাহার' ('সচিত্র সন্ধানী' ৫ ফাল্গুন ১৩৮৫) ও 'মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবনকথা—কিছু নতুন তথ্য' ('দৈনিক সংবাদ', ১০ পৌষ ১৩৯৯)। মশাররফের জীবনী-সংক্রান্ত রচনার মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথের পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তথ্য-সমৃদ্ধ ও সংহত এই জীবনীটি মশাররফ-সম্পর্কিত পরবর্তী সব রচনাকেই প্রভাবিত করেছে। বলা চলে, ব্রজেন্দ্রনাথের এই চরিত-পুস্তিকাই অন্যদের মশাররফ-সংক্রান্ত রচনার মূল উৎস। এই পুস্তিকাটি যেহেতু 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে রচিত, লেখকের জীবন ও সাহিত্য-সম্পৃক্ত তথ্য-পরিবেশনই মূল লক্ষ্য, তাই শিল্পীর মনন-মানস ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অবিশ্লেষিত থেকে গেছে। আবদুল লতিফ চৌধুরীর পুস্তিকায় মীরের দু-একটি গ্রন্থের পরিচিতি-প্রসঙ্গ ব্যতীত নতুন তথ্য বা বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। সেই তুলনায় আবদুল আউয়াল প্রণীত জীবনীটি সুলিখিত, সমাজ-পটভূমিকে বিবেচনায় এনে তিনি মশাররফ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপরি-বর্ণিত প্রথম দুটি প্রবন্ধ ব্রজেন্দ্রনাথের পুস্তিকা এবং মশাররফের 'আমার জীবনী', 'বিবি কুলসুম' প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের সাহায্যে রচিত। এইসব প্রবন্ধে নতুন তথ্য কখনো কেউ কেউ দিয়েছেন, যেমন আশরাফ সিদ্দিকী, কিন্তু সূত্রবিহীন হওয়ায় সেই তথ্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় থেকে গেছে।

মুনীর চৌধুরীর 'মীর-মানস' (ঢাকা, ১৯৬৫) মশাররফ হোসেন সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মশাররফের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত তাঁর চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে মীর-মানসের পূর্ণ পরিচয়-দানের লক্ষে এই গ্রন্থের প্রবর্তনা। আধুনিক শিল্প-দৃষ্টির প্রক্ষেপে এবং প্রয়োজনে তুলনামূলক রীতির অনুসরণে মশাররফ-সাহিত্যের বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টায় 'মীর-মানস' গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত। তবে মশাররফের এই সৃষ্টি-সমীক্ষাও সম্পূর্ণ নয়। মুনীর চৌধুরীর দৃষ্টি কেবল মশাররফের উল্লেখযোগ্য গদ্যশিল্পের উপরেই নিবদ্ধ ছিলো,—অপ্রধান, ধর্মাশ্রিত কিংবা পদ্যরচনা তাঁর যথার্থ অভিনিবেশ পায়নি।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল মশাররফ সম্পর্কে গবেষণা করে প্রথম পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। 'মীর মশাররফের গদ্যরচনা' (ঢাকা, ১৩৮২) গ্রন্থটি মূলত তাঁর পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ 'The Prose Works of Mir Massarraf Hosen' (Chittagong, 1975)-এর তর্জমা। এখানে তিনি মশাররফের গুরুত্বপূর্ণ গদ্যরচনার (১৮৬৯-১৮৯৯) শৈল্পিক গুণাগুণ বিচার করেছেন। প্রসঙ্গত যুগ-পরিবেশ, তাঁর মনন-মানসও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'মীর-মানসে'র মতো এই গ্রন্থেও লেখক মশাররফের গৌণ গদ্যরচনার প্রতি মনোযোগ দেননি। অবশ্য নির্ধারিত

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা-বিষয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে মশাররফের সমগ্র শিল্প-পরিচয় প্রদানের সুযোগও এখানে অনুপস্থিত। 'ভাষাশিল্পী মশাররফ' (ঢাকা, ১৯৬৯) গ্রন্থে তিনি মশাররফের ভাষাশৈলী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন।

বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে মশাররফ হোসেন যথাযথ গুরুত্ব-অনুসারে আলোচিত হয়েছেন এ-কথা বলা চলেনা। তবুও এর মধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৯৫৬) মশাররফ-প্রসঙ্গে আবদুল হাইয়ের আলোচনাংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'য় (২য় পর্যায়, চ-সং কলিকাতা, ১৩৮০) মশাররফের সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করেছেন। আজহার ইসলামের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ' (আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৩৭৬) গ্রন্থেও প্রচলিত তথ্যের সাহায্যে মশাররফের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে।

মুসলিম-মানসের পরিচয়-সূত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে কাজী আবদুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাঙ্‌লা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা' (রাজশাহী, ১৯৬১) ও আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য' (ঢাকা, ১৩৭১) গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তথ্যের দিক থেকে কাজী আবদুল মান্নান ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আনিসুজ্জামানের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। ওয়াকিল আহমদও তাঁর 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' (১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৩৯০) গ্রন্থে কিছু নতুন তথ্যসহ প্রসঙ্গত মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 'রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে' (ঢাকা, ১৩৯৮) গ্রন্থে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফের বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। তাঁর 'সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গে' (ঢাকা, ১৩৯৭) গ্রন্থে অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফ-সম্পর্কিত সংবাদ ও তর্ক-বিতর্ক সংকলন করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। আলী আহমদ তাঁর 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী'তে (ঢাকা, ১৩৯২) মশাররফের গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত প্রকাশনা-তথ্য উদ্ধার করে, অপ্রকাশিত রচনার হদিশ দিয়ে এবং মশাররফ-সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ করে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-গবেষককে উপকৃত করেছেন।

মোহাম্মদ ইদরিস আলী মশাররফের 'বাজীমাত' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫), 'হজরত বেলালের জীবনী' ('বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৬৭) 'মদীনার গৌরব' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮), 'হজরত আমীর হামজার ধর্ম্মজীবন লাভ' ('সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষা ১৩৬৯), 'মৌলুদ শরীফ' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯), 'মোসলেম বীরত্ব' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৭২) প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচিতিমূলক আলোচনার মাধ্যমে এইসব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। নানা প্রবন্ধ রচনা করে মশাররফের জীবন ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে আর যাঁরা আলোকপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, সুকুমার মিত্র, আহমদ রফিক, এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম আজহারউদ্দীন খান, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ।

মশাররফের স্মরণীয় শিল্পকর্ম 'বিষাদ-সিন্ধু'সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ ('শাশ্বত বঙ্গ', কলিকাতা, ১৩৫৮), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ('মুসলিম বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৩৭৫), আবু হেনা মোস্তফা কামাল ('কথা ও কবিতা', ঢাকা, ১৯৮১) ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', কার্তিক-চৈত্র- ১৩৯৩)। এরমধ্যে আবদুল ওদুদের আলোচনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'বিষাদ-সিন্ধু' অবলম্বনে মশাররফের শিল্পী-মানসের মৌল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি নির্দেশ করেছেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল শিল্পরূপকে তাঁদের আলোচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র গঠনরীতি ও ভাষাশৈলী বিবেচনা লাভ করেছে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনায়।

'বিষাদ-সিন্ধু' ব্যতীত দীর্ঘকাল মশাররফ হোসেনের অন্যান্য গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য ছিলো। পাকিস্তান-কালপর্বে আলোচনা-গবেষণা ও পাঠক-চাহিদার প্রয়োজনে মশাররফের কিছু কিছু গ্রন্থের সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদকীয় ভূমিকা এইসব বইয়ের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধারে সাহায্য করে। আশরাফ সিদ্দিকী এই উদ্যোগের পথিকৃৎ। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জমীদার দর্পণ' (১৯৫৫) ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৯৬০)। মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'রত্নবতী' (১৯৬৯), 'বসন্তকুমারী' (১৩৭৬) ও 'জমীদার দর্পণ' (১৯৮৯)। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদনা করেন 'গো-জীবন' (১৩৭৫)। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৩৭৭) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এ. কে. এম. শামসুল ইসলামের সম্পাদনায়। আনিসুজ্জামান সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন 'এর উপায় কি?' (১৩৮১)। আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সঙ্গীত লহরী' (১৯৭৬), 'টালা-অভিনয়' (১৯৭৯) ও 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' (১৯৮১)। 'আমার জীবনী' (১৩৮৪) প্রকাশিত হয় দেবীপদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়। সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৩৮৯)। কলিকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে 'বিষাদ-সিন্ধু' ও 'জমীদার দর্পণ' বই দুটি একত্রে 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৯৭৩) নামে প্রকাশিত হয় আবদুল আজিজ আল-আমানের সম্পাদনায়। কলিকাতার কমলা সাহিত্য ভবনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ' (১ম খণ্ড, ১৩৮৫)। এই রচনাসংগ্রহ সম্পাদনা করেন বিষ্ণু বসু ও ভূমিকা রচনা করেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজী আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করে 'মশাররফ রচনা-সম্ভার' (১৩৮৩, ১৩৮৬, ১৩৯১, ১৩৯১, ১৩৯২)। যদিও এই পাঁচ খণ্ডে মশাররফের সব প্রকাশিত গ্রন্থই অন্তর্ভুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি, তাঁর অপ্রকাশিত রচনা-ডাইরী-চিঠিপত্রও অসংযোজিত থেকে গেছে। তবু এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজ এবং তা মশাররফচর্চার ক্ষেত্রকে সহজ, আয়াসমুক্ত ও প্রসারিত করেছে।

মশাররফচর্চার এই খতিয়ান নিঃসন্দেহে একজন মহৎ ও ধ্রুপদী সাহিত্যশিল্পীর প্রতি সানুরাগ মনোযোগের স্বাক্ষর। কিন্তু এ-কথাও বলতে হয়, মশাররফ-সম্পর্কিত গবেষণাকাজ সংখ্যার বিচারে উল্লেখযোগ্য হলেও গুণগত বিচারে আশানুরূপ নয়। এর মূলে আছে কিছু বিশেষ মানস-প্রবণতা, তথ্যগত সীমাবদ্ধতা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমালোচনা-সামর্থ্যের অভাব। ব্রজেন্দ্রনাথের তথ্যের প্রতি অসহায় নির্ভরতা ও নির্বিচার ব্যবহার পুনর্বিবেচনার সুযোগকে সংকুচিত করেছে। ফলে পরবর্তীকালের মশাররফের জীবন ও সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি। পাকিস্তান-সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে ও পরে মশাররফচর্চায় একধরনের ধর্মীয় চেতনা ও জাতিগত গৌরববোধ ছায়া ফেলেছে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে, সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত, মশাররফ প্রত্যাশিত গুরুত্ব ও মনোযোগ লাভ করেননি।

উল্লিখিত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেই বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচিত। বস্তুত মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, অন্যান্য রচনার পাণ্ডুলিপি, দিনপঞ্জিকা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাগজপত্র, হিসাবপত্রের খাতা, বিবি কুলসুমের ডাইরী, 'হিতকরী' পত্রিকা, নীলবিদ্রোহ-সংক্রান্ত মোকদ্দমার নথি এবং পূর্বে অব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফের গ্রন্থ-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও নানা টুকরো খবর ইত্যাদি আকর তথ্য-দলিল ব্যবহারের সুযোগ এই অভিসন্দর্ভ-রচনাকালে পাওয়া গেছে। ফলে মীরের জীবনী-পুনর্গঠন এবং তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ধারণা ও সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রেই পুনর্বিবেচনার সুযোগ মিলেছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ, **'মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা'**, মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এ-ছাড়া প্রসঙ্গত যুক্ত হয়েছে 'প্রস্তাবনা' ও 'পরিশিষ্ট'।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম **'দেশ-কালের পটভূমি'**। এই অধ্যায়ে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষিত। বৃটিশ-শাসনের সূচনা-পর্ব থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বৃহত্তর বঙ্গদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক-শিক্ষা-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিবৃত হয়েছে। সাধারণভাবে সমগ্র দেশের এবং বিশেষভাবে বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা এই আলোচনা-পরিসরে বিশেষ বিবেচনায় এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম '**মীর মশাররফ হোসেনের জীবন-কথা**'। এই অধ্যায়ে মশাররফের জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিস্তৃত পরিচয় বিধৃত। প্রকাশিত তথ্য ও পূর্ব-বর্ণিত অপ্রকাশিত তথ্য-দলিলের সাহায্যে এই অধ্যায়টি রচিত। নতুন আকর উপকরণের সাহায্যে মশাররফ-জীবনী সম্পর্কে যেমন নতুন আলোক নিক্ষেপ সম্ভব হয়েছে, সেইসঙ্গে কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা সংশোধনের সুযোগও মিলেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম '**সাহিত্যকর্ম ঃ পরিচিতি ও শিল্পবিচার**'। এই অধ্যায়ে আছে রূপাঙ্গিকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসসহ মশাররফের সমগ্র রচনার সাধারণ পরিচয় ও শিল্প-বিচার। এই সূত্রে তাঁর সম্পাদিত-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার পরিচিতিও স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়েও অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য-দলিলের সাহায্যে মশাররফের শিল্প-মানসের পরিচয় গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং কোনো কোনো রচনার সৃষ্টি-উৎস সম্পর্কে নতুন ধারণা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম '**সমাজচিন্তার স্বরূপ**'। এই অধ্যায়ে মশাররফের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রচনাবলী এবং পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সাহায্যে তাঁর সমাজভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-চেতনার পরিচয় বিভিন্ন উপ-শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে। মশাররফের সমাজচিন্তায় যেমন প্রগতিশীলতার ছাপ আছে, তেমনি রক্ষণশীল মানসিকতাও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রসঙ্গত মীর-মানসের দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতা ও দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি '**উপসংহার**' হিসেবে চিহ্নিত। এই অধ্যায়ে আছে সমগ্র আলোচনার সার-সংক্ষেপ।

পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে মশাররফের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও রচনার একটি যথাসম্ভব বিস্তৃত ও প্রামাণ্য তালিকা। এই অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত সহায়ক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার স্বতন্ত্র পঞ্জিও শেষে প্রদত্ত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য ও প্রামাণ্য তথ্য-দলিলের প্রতিচিত্র, গ্রন্থ-পত্রিকার প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র, মশাররফ ও কুলসুমের প্রতিকৃতি এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের চিত্র পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন, উনিশ শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী-ব্যক্তিত্বের জীবন, শিল্পকর্ম ও চিন্তা-চেতনার সামগ্রিক পরিচয়-সূত্র উদ্‌ঘাটিত করাই বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দেশ-কালের পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দেশ-কালের পটভূমি

বৃটিশ শাসন-প্রতিষ্ঠার সূত্রে বাঙলা ও ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারত-সমাজে যুগান্তকারী এই সামাজিক বিপ্লব সংঘটনে "ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র"।[১] এর ফলে দেশীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়, রোপিত হয় পুঁজিবাদী শিল্পের বীজ, নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয় সমাজ-কাঠামো, ইংরেজী শিক্ষার সূত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত হয়, জন্ম নেয় নতুন শ্রেণী ও সমাজ। সমাজ-কাঠামোর এই উত্থান-পতন ও রূপান্তরে ভারতকে একদিকে চরম মূল্য দিতে হয়, অন্যদিকে ধ্বংস-স্তূপের অভ্যন্তরে জীবন-অংকুরোদ্‌গমের মতো ভারত এক সম্ভাবনাময় নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কার্ল মার্কস্ (১৮১৮—১৮৮৩) 'হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগে' বিশ্বাসী ছিলেননা, তবু তিনি বৃটিশ-শোষণের স্বরূপ লক্ষ্য করে এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ঃ

> .... বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র।[২]

প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ শোষণ ও লুণ্ঠন যে-কেবল সরকারী নীতি বা আইনের আওতাতেই হতো তা নয়, ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে এবং দুর্নীতি-উৎকোচের মাধ্যমেও হতো। পলাশী-যুদ্ধের পর কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ দেশের মোট রাজস্বের শতকরা ৬৬ ভাগ করায়ত্ত করেন।[৩] সংগৃহীত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক পরিমাণ অর্থ বৃটেনে চলে যায়।[৪] ১৮০৭ সালের হিসাব অনুসারে জানা যায়, পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরে ১০৮৫ কোটি টাকা বৃটেনে পাচার হয়।[৫] এর ফলে সঙ্গত কারণেই দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্মম অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯-৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাঙলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত এই মহাদুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ হারায়।[৬] কিন্তু কোম্পানীর জুলুম-অত্যাচার এই মর্মন্তুদ মানবিক বিপর্যয়ের পরও হ্রাস পায়নি, দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিক খাজনা আদায় হয়।[৭] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় শিল্প-বানিজ্য ও কৃষির মারাত্মক ক্ষতি হয়। এই মন্বন্তর মধ্য ও নিম্নবিত্তের মানুষকেই শুধু নিঃস্ব ও নিশ্চিহ্ন করেনি, সামন্ত ও উচ্চবিত্তের অভিজাত শ্রেণীকেও বিপর্যস্ত করেছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব সংগ্রহের আরো সুষ্ঠু ও নিশ্চিত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গদেশে প্রথমে 'পাঁচসালা', পরে 'দশসালা' এবং সবশেষে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলার আর্থ-সামাজিক জীবনে সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরফলে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার রূপ ও রীতির মৌল পরিবর্তন ঘটে। রাজস্ব আদায়ের চুক্তিতে জমিদার জমিতে লাভ করলো বংশানুক্রমিক দখলীস্বত্ব। বঙ্গদেশে জমিদারের পক্ষ থেকে সরকারকে দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষক-প্রজার নিকট থেকে এর প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায়ে সক্ষম হয়। রাজস্ব আদায়ের নামে জমিদারশ্রেণীর পীড়ন ও অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮] এর উপরে মধ্যস্বত্বভোগীর জুলুমের কারণে কৃষকসমাজকে নিঃস্ব ও ভূমিহীন হতে খুব বেশী সময় লাগেনি।[৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত রূপটি ছিলো এইরকম ঃ

> কর্নওয়ালিসের আইন কেবল কৃষকদের প্রাক্তন ভূমিস্বত্বই উৎখাত করেনি, কৃষকদের জমিচাষে উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তনও প্রহৃত করেছিল, কারণ জমির উন্নতিতে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পেত। এভাবে বাংলায় কৃষির মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং এখানকার কৃষকরা সারা ভারতের মধ্যে দরিদ্রতম অবস্থায় পৌছায়।[১০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলার আটজন প্রধান জমিদার, যাঁরা বাঙলার মোট রাজস্বের অর্ধেক প্রদান করতেন, তাঁরা দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ক্রমে জমিদারীর হাতবদল হয়।[১১] ছোটো-বড়ো বহু নব্য-জমিদারীর সৃষ্টি হয়। এই ভূ-সম্পত্তির মালিক হন ইংরেজের অনুগ্রহভাজন মুৎসুদ্দি-বেনিয়ান-দালাল-গোমস্তা-ফড়িয়ার দল, যাঁদের হাতে অগাধ অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল। বৃটিশ-শাসকদের চাহিদা ও প্রত্যাশা-অনুযায়ী এইভাবে শোষণ-সহায়ক এক অনুগত শ্রেণী জন্ম নিলো। এ-কথা সত্য যে ঃ

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের গোত্রান্তরিত করেছিল। পুর্বের ফিউডাল বদান্যতা এই হঠাৎ-জমিদারদের ছিলনা। তাঁরা স্বার্থপর অর্থপিশাচ হৃদয়হীন ঠিকাদারে পরিণত হয়েছিলেন—ইংরেজদের রাজস্বের ঠিকাদার।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এই নব্য সামন্তশ্রেণী কৃষক–শোষণের মাধ্যমে যে অর্থ–সংগ্রহ করতেন তা ব্যয় হতো ভোগ–বিলাস, দান–সেবা, পাল–পার্বণ–উৎসবের মতো ইন্দ্রিয়–সুখ, পুণ্য–সঞ্চয়, অভিজাত্য–প্রদর্শন ও খ্যাতি–অর্জনের অনুৎপাদনশীল খাতে। অথচ এই অর্থে বাঙলায় শিল্প–পুঁজির বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হতে পারতো, যেমন করে ভারত–লুণ্ঠনের অর্থে ইংল্যাণ্ডের শিল্প–বিপ্লব ত্বরান্বিত হতে পেরেছিল।[১৩]

১৮৩৩ সালে ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। এই সময় থেকে শোষণ–পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। শোষণের এই 'আধুনিক পর্বে' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারী শোষণ–প্রক্রিয়া চালু হয় এইভাবে ঃ

> ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের অর্থনৈতিক মর্মমূলে আরও গভীরভাবে প্রবেশের জন্যে রেলপথ প্রতিষ্ঠা, পথ–ঘাটের উন্নতি, কোম্পানীর আমলে যে সেচব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল তারও প্রতি মনোযোগ প্রদানের সূচনা, ইলেকট্রিক–টেলিগ্রাফ ও সর্বত্র একই ধরনের ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন, কেরানী ও অনুগত ভৃত্য যোগাড় করবার জন্যে ইংরেজী–শিক্ষার সীমাবদ্ধ প্রথম সূচনা, ইউরোপীয় ব্যাংক–ব্যবস্থার প্রচলন—ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[১৪]

এর পাশাপাশি বৃটেনের শিল্পপতিরা তাদের গভীরতর স্বার্থে পণ্যের প্রসারিত বাজারের প্রয়োজনে এদেশের আর্থিক জীবনে বিপর্যস্ত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৫] এই উদ্যোগের সঙ্গে মুখ্যত নীলচাষ এবং চা–কফি–রবারচাষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিলো। নীলচাষ বাঙলার অর্থনীতি ও সমাজজীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। অধিক মুনাফার লোভে নীলচাষের নামে কৃষকের উপর ইংরেজ নীলকরের অমানুষিক পীড়ন–অত্যাচার কৃষক–প্রজার জীবন দুর্বিসহ ও অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। বাঙলায় নীলবিদ্রোহ ছিলো এরই অনিবার্য পরিণতি।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয় এবং ১৮৫৮ সালে ভারত–শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বৃটিশ–রাজ। এই নতুন ব্যবস্থায় ভারত–শোষণ অনেকাংশে শাসনতান্ত্রিক ভদ্ররূপ লাভ করে। বৃটিশ শিল্প–পুঁজির সহায়তায় এইসময় থেকে বিভিন্ন শিল্প–কলকারখানা ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে থাকে। এর পাশাপাশি সীমিত ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজির বিকাশের সুযোগও উন্মোচিত হয়।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে ভারতে শিল্পায়ন কিংবা দেশীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে ইংরেজের সহায়তা ছিলো তার নিজেরই শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে। তবে এর আর্থ-রাজনীতিক ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। যতোই অসম ও দুর্বল হোক, তবুও এই প্রথম দীর্ঘ ইংরেজ শাসন-পর্বে ভারতীয়রা অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলো, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। দেশীয় শিল্প-পুঁজির বিকাশের ফলে নতুন সামাজিক শক্তি ও শ্রেণীর উদ্ভব হলো, উত্তরকালে যা জাতীয় চেতনা স্ফূরণের প্রধান সহায় হয়েছিল।

২.

ইংরেজ-আমলে বাঙলার বিপর্যস্ত অর্থনীতির ক্ষতির মাশুল সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কেও গুণতে হয়। তবে প্রকৃতিগতভাবে তা প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় থেকে অনেকাংশে ভিন্ন রকমের ছিলো। এতে মুসলমানসমাজকে জাতীয় জীবনের পথযাত্রায় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়।

বৃটিশ শাসন-পূর্বকালের মুসলমানসমাজকে সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে ঃ ক. অভিজাত শাসকগোষ্ঠী, খ. শাসন-সহায়ক শক্তি ঃ জমিদার-জোতদার, সরকারী আমলা-কর্মচারী ইত্যাদি, এবং গ. বৃত্তিজীবী গ্রামীণ মানুষ ঃ কৃষক-দিনমজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি।[১৭] ইংরেজ-শাসনের অভিঘাতে এই তিনটি শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইংরেজের নীতি ও পদক্ষেপের কারণে মুসলিম অভিজাতশ্রেণীর পতন ও বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেছেন ঃ

> একজন খান্দানী মুসলমানের সিন্দুকে অনবরত টাকা-পয়সা আমদানি হতো তিনটি অফুরন্ত উৎস থেকে—সেনাদলে নিয়োগ, খাযনা আদায় এবং বিচার অথবা শাসন বিভাগে চাকরি।[১৮]

পলাশী-যুদ্ধের পর থেকেই সেনাবাহিনীতে দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা কমতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ সামরিক পদে মুসলমানদের নিয়োগ একরকম প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। কোম্পানী কর্তৃক নবাবের বার্ষিক বৃত্তি ক্রমশ হ্রাস করায় আর্থিক কারণে নবাবের সেনাবাহিনীও ছাঁটাই করতে হয়।[১৯] হান্টারও বলেছেন, তাঁদের সময়ে কোনো অভিজাত মুসলমানের সেনাবাহিনীতে প্রবেশের সুযোগ ছিলোনা।[২০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলমান পদস্থ কর্মচারীদের স্থান দখল করে ইংরেজ কর্মচারীরা। বিশেষ করে জেলাভিত্তিক ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগের ফলে রাজস্ব বিভাগে মুসলিম-প্রাধান্য খর্ব হয়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ-শাসনের পূর্বে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকুরীতে বাঙলার মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিলো।[২২] নিজামত সরকারের কর্মচারীদের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৭৭৪ সালেও সেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো এবং হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা ছিলো শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ।[২৩] ফৌজদার পদেও মুসলমানেরা প্রায় একচেটিয়াভাবে নিয়োগলাভ করতেন।[২৪] মুসলিম আইনের প্রাধান্যের কারণে বিচার বিভাগে মুসলিম-নিয়োগ অবধারিত ছিলো। কাজীর পদটি বংশানুক্রমে পূরণ করা হতো।[২৫] কোম্পানীর শাসনামলের প্রথম অর্ধ-শতক সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদেরই নিরংকুশ প্রাধান্য ছিলো।[২৬] কিন্তু ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করলো। সরকারী নীতির ফলে এবং ফারসীর বদলে ইংরেজী সরকারীভাষা হিসাবে প্রবর্তিত হওয়ায় বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলিম প্রভাব ও প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে। পক্ষান্তরে এই স্থান পূরণ হতে থাকে ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণকারী হিন্দুদের দ্বারা। হান্টার জানিয়েছেন, ১৮৬৯ সালের চাকুরীর তথ্যে মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাত ছিলো ১ ঃ ২, কিন্তু দু'বছর পরে সেই অনুপাত দাঁড়ায় ১ ঃ ৩।[২৭] সরকারের কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্বই ছিলোনা। হান্টার ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসের সিভিল লিস্ট অনুসারে গেজেটেড পদের চাকুরীর যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বিভিন্ন বিভাগে কার্যরত মোট ২১১১ জনের মধ্যে ১৩৩৮ জন ইংরেজ, ৬৮১ জন হিন্দু ও সে-ক্ষেত্রে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৯২ জন।[২৮] হান্টার এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ১৮৭১ সাল নাগাদ একজন মুসলমানের পক্ষে কলিকাতা নগরীর কোনো অফিসে দারওয়ান, হরকরা বা দফ্‌তরীর চাইতে উচ্চ পদমর্যাদার কোনো চাকুরী পাওয়া একরকম প্রায় অসম্ভব ছিলো।[২৯] চাকুরী কিংবা চিকিৎসা ও আইনব্যবসায়ের মতো স্বাধীন পেশা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলমানদের অনুপস্থিতি বা অসম সংখ্যানুপাত এই সম্প্রদায়ের বিপর্যয়, অবক্ষয় ও পশ্চাদপদতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলার প্রাচীন ও বনেদী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারই ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হিন্দু সম্প্রদায় অনেকাংশে এই বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হন। এ-বিষয়ে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

> নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারী লাভ করতে পারলেন, যাঁদের হাতে নগদ অর্থ মজুত ছিল। এই শর্ত পালন করতে পারলেন কেবল নবাবী আমলের হিন্দু রাজস্ব-সংগ্রাহকেরা। তাই নতুন জমিদার-শ্রেণীতে হিন্দু-প্রাধান্যই দেখা যায়। এ কথা বলা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে বাংলার ধনবান হিন্দুরা পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানেরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।[৩০]

কলিকাতাবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কোম্পানীর দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি-দালাল-গোমস্তা, যাঁরা ইংরেজের অনুগ্রহ ও সহযোগিতায় প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁরাও নিলামে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারী ক্রয় করেন। কালক্রমে বাঙলার সিংহভাগ জমিদারীই এই নব্য ধনিক শ্রেণীর অধিকৃত হয়। সিটনকারের এক হিসাব অনুযায়ী ১৮৫৮ সালে 'সদর জমিদারী'র সংখ্যা ছিলো ৪৫৫০। এরমধ্যে হিন্দুদের ৩৮৫৫টি (৮৫%), মুসলমানদের ৬৪৩টি (১৪%) ও ইউরোপিয়ানদের ৫২টি (১%) ছিলো। কিন্তু এই স্বল্প-সংখ্যক মুসলমান-জমিদারীও উত্তরাধিকার আইনের ফলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। পরিণতিতে কালক্রমে মুসলমান জমিদারের উত্তরপুরুষ 'ভূমি-কৃষকে'র ভাগ্য-বরণ করতে বাধ্য হন।[৩১] অপরপক্ষে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি বড়ো ধরনের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার কারণ। এরফলে অনেক অভিজাত পরিবার নিঃস্ব কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, বাণিজ্য-নীতি ও শোষণ-বুদ্ধির ফলে বাঙলার উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানশ্রেণীরই যে বিপর্যয় ও পতন হয়েছে তা নয়, সেইসঙ্গে নির্যাতিত ও নিঃস্ব হয়েছে গ্রামের কৃষক-তাঁতী, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলো মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ বৃটিশ-নীতির ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে বরণ করেছে দারিদ্র, অপরপক্ষে নিম্নবিত্তের গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে।

রাজনৈতিক অবস্থা

পলাশী-যুদ্ধের পর ইংরেজ তাদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ নবাবকে নামেমাত্র ক্ষমতায় রেখে নেপথ্য-শাসকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-লাভের পর প্রত্যক্ষভাবে সুচনা হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের। এরপর প্রবর্তিত হয় ক্লাইভের (১৭২৫-১৭৭৪) 'দ্বৈত শাসন'। এই ব্যবস্থার কুফলের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে (১৭৩২-১৮১৮) বাঙলার গভর্ণর করে পাঠান। তাঁর সময়েই ১৭৭৩ সালে প্রবর্তিত রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে নতুন ব্যবস্থায় ভারত-শাসনের ব্যবস্থা হয়। এরপর ১৮৫৪ সাল থেকে গভর্ণর জেনারেলের (বড়লাট) অধীনে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরের (ছোটলাট) মাধ্যমে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের শাসনকার্য পরিচালিত হতে থাকে। এরফলে শাসনকার্যের অনেক জটিলতা দূর হয় এবং বাঙলার অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সূচনাও হয় এইসময় থেকেই।[৩২]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারত-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এতে "ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ভিত্তির আপেক্ষিক দুর্বলতা প্রকটিত" হয়ে উঠেছিল এবং "প্রশাসন যন্ত্রের মজবুতি এবং নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির চাহিদা পূরণের জন্য ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হয়েছিল"।[৩৩] এরফলে ১৮৫৮ সালে ভারত-শাসনের ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশরাজের উপর অর্পিত হয়। অবশ্য তাতে ভারতে বৃটিশ শাসন–কাঠামোর মৌলিক কোনো রূপান্তর ঘটেনি। বরং,

> পরবর্তী শত বৎসরে বৃটিশরাজের শাসনপদ্ধতি ছিল মূলত কোম্পানীর শাসন–কাঠামোরই পরিবর্তিত রূপ।[৩৪]

সূচনা–লগ্ন থেকেই বৃটিশ শাসন–শোষণের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের অসন্তোষ-ক্ষোভ বারবার রূপ নিয়েছে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামে। এদেশের কৃষকের সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি–আন্দোলনের সূচনা করেছিল। "১৭৬৭-১৮০০ খ্রীস্টাব্দের 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত কৃষক–বিদ্রোহই বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম বৈপ্লবিক স্বাধীনতা–সংগ্রাম।"[৩৫] এরপর অনেক ছোটো–বড়ো গণ–সংগ্রাম ও কৃষক–বিদ্রোহ সংঘটিত হয় বাঙলায়।[৩৬] এরমধ্যে ওহাবী আন্দোলন (১৮৭০–৩০), ফারায়জী আন্দোলন (১৮৩৮–৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫–৫৬), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭–৫৮) ও নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯–৬১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্রমশ জনমানসে বৃটিশ–বিরোধী চেতনা, স্বাদেশিকতাবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও সামন্ত–বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য–শিক্ষার সূত্রে যে জাতীয় জাগরণের ভাবধারা প্রকাশিত হয় তা মূলত ছিলো ধর্মাশ্রিত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। জাতিবৈরমূলক সাহিত্য রচনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস এই শতকের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বঙ্গদেশে রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধার জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতির একটা বিশেষ ভূমিকা ছিলো।[৩৭] 'জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), 'ইণ্ডিয়ান লীগ', 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৭৬), 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' (১৮৮৩)— এইসব প্রতিষ্ঠান সীমিত রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে।

অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান এ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউমের (১৮২৯–১৯১২) প্রচেষ্টা ও প্রযত্নে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। একজন রাজনীতি–বিশ্লেষক বলেছেন ঃ

> ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বৃটিশ–ভারতীয় সরকারের মূল লক্ষ্য ছিলো তিনটি। প্রথমত, নিজেদের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় এমন একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণী–স্বার্থের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিলো সেই দ্বন্দ্বগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে ভারতীয় জনগণের পক্ষে বৃটিশ–শাসনের বিরুদ্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত করা সম্ভব না হয়। তৃতীয়ত, নিম্নশ্রেণী নামে কথিত গ্রামাঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

বসবাসকারী, কৃষক, কারিগর এবং অন্যান্য পেশাজীবী জনগণ যাতে নিজস্ব কোনো শ্রেণীগত কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত ও বিদ্রোহী হতে না পারে।[৩৮]

বৃটিশ সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উপরিউক্ত ত্রিবিধ লক্ষ্য সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রথম যুগে কংগ্রেস ছিলো 'অত্যন্ত নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান'। মৃদুস্বরে সঙ্কোচের সঙ্গে সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনার মধ্যেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো সীমাবদ্ধ। কংগ্রেস ছিলো ধনী বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্র, দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জায়গা ছিলোনা এখানে, আর চাষী বা মজুরশ্রেণীর তো কোনো সম্পর্কই ছিলোনা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।[৩৯]

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বৃটিশ-বিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এইসময় থেকেই তার রাজনৈতিক ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও প্রকৃত গণ-ভিত্তি রচিত হয়। এইসময়ে, স্বদেশী আন্দোলনের কালে, কংগ্রেস-রাজনীতির পাশাপাশি বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি ধারাও গড়ে ওঠে।

২.

মুসলিমসমাজে সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী ও গভীর। সিপাহী বিদ্রোহের কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর রাজশক্তির যে পীড়ন, অবিচার ও বিরূপতা নেমে আসে, তারই সূত্রে মুসলিম-মানসে রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের রূপ ধীরে ধীরে পরিগ্রহ করতে শুরু করে। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও আনুগত্যের মূল্যে মুসলিমসমাজ জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ক্রমশ সুযোগ-সুবিধা লাভে সক্ষম হয় এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অসম প্রতিযোগী হিসেবে নিজেকে দাঁড় করায়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষ ও সঞ্চারের জন্য সভা-সমিতির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪০] স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), নবাব আবদুল লতীফ (১৮২৬-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ সমাজ-নেতা মূলত তাঁদের সংগঠনের মাধ্যমেই মুসলিম স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়াসী হন, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থাপন করেন সু-সম্পর্ক, স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষকে করে তোলেন অধিকার-সচেতন।

মুসলিম জাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের দায়-দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বর্তালে তিনি তা অপনোদনের চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশক্তির রোষ প্রশমিত করে তিনি তা অনুগ্রহে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। বিদ্রোহ বা বৈরিতা নয়, আনুগত্য ও সহযোগিতার মধ্যেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ও কল্যাণ নিহিত বলে ভেবেছিলেন। অচলা রাজভক্তির প্রেরণাতেই তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ

> ভারত আমাদেরই বিজিত দেশ। এখানে ইংরেজরা এসেছে বন্ধুরূপে, শত্রুরূপে নয়। আমাদের কামনা হলো—ভারতে ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী বরং চিরস্থায়ী হোক। আমাদের এই কামনা ইংরেজ জাতির জন্য নয় বরং স্বদেশের জন্য ; আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা ইংরেজদের মঙ্গল বা তাদের খোশামোদের জন্য নয় বরং আমাদের দেশেরই মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের জন্য।[৪১]

কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো 'অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক'।[৪২] কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর এই চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটে। মূলত অনগ্রসর মুসলমান সমাজের উন্নতির স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মৈত্রী-সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি মুসলমানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অনুমোদন করেননি।

স্যার সৈয়দ আহমদের কংগ্রেস-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গদেশকেও আন্দোলিত করে। অনুমান করা চলে, নবাব আবদুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলীর কংগ্রেস-বিরোধিতার মূলেও সৈয়দ আহমদের চিন্তার প্রভাব ছিলো। বাঙলার মুসলমান সম্পাদিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই সৈয়দ আহমদের কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন এবং তার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে।[৪৩]

বাঙলা ও বহির্বাঙলায় কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষেও মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ সক্রিয় ছিলো। কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বদরুদ্দীন তৈয়েবজী (১৮৪৪-১৯০৬)- সহ কয়েকজন মুসলিম নেতা অবশ্য জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত মওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) "কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতির পক্ষপাতী" ছিলেন। যদিও কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব (মাত্র ২ জন) আশানুরূপ ছিলোনা, কিন্তু পরবর্তীসময়ে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় (১৮৮৬), তৃতীয় (১৮৮৭) ও চতুর্থ (১৮৮৮) অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩, ৭৯ ও ২২২ জনে। বাঙলায় বহু বিশিষ্ট মুসলিম রাজনীতিবিদ ও নেতা কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। এঁদের মধ্যে কুমিল্লার ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭), বর্ধমানের আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬), টাঙ্গাইল-দেলদুয়ারের স্যার আবদুল হালিম গজনবী (১৮৭৯-১৯৫৬), পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সোলতান' (১৯০১) ও আরো একটি-দুটি পত্রিকা "কংগ্রেসের পক্ষে জনমত প্রচার করে"।[৪৬] 'হাফেজ' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭) কংগ্রেসের সমর্থনে প্রকাশিত শেখ

Dhaka University Institutional Repository

ওসমান আলি বি. এল.–এর 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি আলোচ্য প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা।[৪৭]

স্যার সৈয়দ আহমদের সমসময়ে বঙ্গদেশে নবাব আবদুল লতীফ মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ আহমদের মতো আবদুল লতীফও তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজের সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিরসনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের একটা বড়ো প্রভাব বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম অভিজাতশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর উপর লক্ষ্য করা যায়। মূলত 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' (১৮৬৩)–কে কেন্দ্র করেই আবদুল লতীফের চিন্তাভাবনা ও কর্মধারা পরিচালিত হয়।

রাজভক্তির প্রশ্নে নবাব আবদুল লতীফ ছিলেন অকপট ও আন্তরিক। তিনি লর্ড মেয়ো ও জাস্টিস্ নরম্যানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং লর্ড মেয়োর হত্যাকারীকে মুসলিম সমাজের 'কুলাঙ্গার' বলে অভিহিত করেন।[৪৮] ১৮৭০ সালে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির এক বিশেষ সভায় মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (১৮০০–১৮৭৩) বলেন যে, ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'। তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ধর্মীয় শাস্ত্রানুমোদিত নয়। সোসাইটির সদস্যবৃন্দ জৌনপুরীর এই সিদ্ধান্তের ভেতরে নিজেদের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পান এবং এই মত বৃহত্তর মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে প্রচারের উদ্দেশ্যে জৌনপুরীর বক্তব্যসহ এই বিশেষ সভার কার্যবিবরণীর পাঁচহাজার কপি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা হয়।[৪৯]

১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (পরে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে পরিচিত) সৈয়দ আহমদ বা আবদুল লতীফের সংগঠনের চাইতে অধিক রাজনীতি–সচেতন ছিলো। যদিও অন্যদের মতো সৈয়দ আমীর আলীও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সরকারের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য–প্রদর্শনে তৎপর ছিলেন, তবুও তাঁর কর্মকাণ্ডের ভেতরে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক–প্রয়াস যুগের দাবীর সঙ্গে ছিলো সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিপূর্ণ।

১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কাছে পেশকৃত এক দীর্ঘ স্মারকপত্রে সৈয়দ আমীর আলীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সম্প্রদায়–প্রীতি ও যুগ–সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপিতে তিনি "মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষায় পশ্চাদ–বর্তিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাসভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে" স্ব–সমাজের উন্নতির জন্য বৃটিশ–শাসকদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আলীর সংগঠন 'সমাজগতভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও উন্নতি কামনা করলেও রাজনীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষকেই প্রশ্রয় দিয়েছে'।[৫১] এই কারণেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনকেই রাজনীতিগতভাবে 'মুসলমানদের একটি প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।[৫২] আমীর আলীর এই সংগঠনের প্রভাব মুসলমানসমাজে বিশেষ কার্যকর হয়। এ-প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) বলেছেন ঃ

> এর ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানেরা "আঞ্জুমান" গঠিত করে চলে। এইসব আঞ্জুমানের বা সম্মেলনের বড়ো লক্ষ্য হয় মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা—ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সব ব্যাপারেই মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংহত ও সুস্পষ্ট হোক এই হল এর লক্ষ্য।[৫৩]

১৯০৫ সালের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অভিঘাত, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রম-বর্ধমান অবনতি ও মুসলিম-স্বার্থ সংরক্ষণের পটভূমিকায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা প্রায়-অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাতে শিক্ষা, চাকুরী, জন-প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দাবী সংযুক্ত হয়। সিমলা ডেপুটেশনের সূত্র ধরে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি, ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি-রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে 'মুসলিম লীগ' নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।[৫৪]

ইতোপূর্বে মুসলমানসমাজে যে সীমিত রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়, তা হয়েছিল প্রধানত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। অবশ্য রাজনীতিগত কর্মকাণ্ড এইসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিলোনা, মুসলিম সমাজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে তা পরিচালিত হয়েছে। সুসংগঠিত মুসলিম লীগই মুসলমানসমাজের জন্য পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধন ও সুবিধা-অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগ-রাজনীতির মাধ্যমে বাঙালীসমাজে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তা ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ-সংরক্ষণের ঝোঁক বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করে এবং সমাজ-রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব মুদ্রিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার অবস্থা

কোম্পানী-শাসনের সূচনা পর্বে শাসনকর্তারা ভারতবাসীকে শিক্ষাদানের কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি, ফলে এ-বিষয়ে কোনো উদ্যোগও গৃহীত হয়নি। ১৭৯২ সালে ভারতবর্ষে স্কুল-শিক্ষক প্রেরণের বিষয়ে উইলবারফোর্সের একটি প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ-প্রসঙ্গে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর স্পষ্টই মন্তব্য করেছিলেন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কারণেই আমেরিকা তাঁদের হাতছাড়া হয়, নতুন উপনিবেশ ভারতবর্ষ সম্পর্কে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটুক তা তাঁরা চাননা।[৫৫] মেজর জেনারেল লায়নেল স্মিথ ১৮৩১ সালে কমন্স সভার এক কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এই ভেবে যে, যে-পরিমাণ আধুনিক শিক্ষা ভারতবাসী লাভ করবে, সেই পরিমাণেই তারা স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করবে। এলফিন্স্টোন একবার কিছু পাঠ্য-পুস্তক তাঁর এক বন্ধুকে দেখিয়ে রসিকতার ছলে মন্তব্য করেছিলেন, এই বইগুলোই তাঁদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার টিকেট।[৫৬] রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ঔপনিবেশিক স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা 'নেটিভ'দের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও অবাধ শোষণের অধিকারবোধ থেকেই এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতিবাচক ধারণার জন্ম। এ-থেকে সহজেই বোঝা যায়, কোম্পানী আমলের প্রথম পর্যায়ে কেনো সরকার কোনো উদার শিক্ষানীতি গ্রহণ বা অনুসরণ করতে আগ্রহী হননি।

তবে এই পর্যায়ে সরকারের গরজ ও প্রয়োজনে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ঃ ১৭৮০ সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসা ও ১৭৯২ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ। 'হিন্দু ও মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী সৃষ্টি'ই ছিলো এই প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য।[৫৭] লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন না করে কোম্পানী সরকার সাবেকী আরবী-ফারসী-সংস্কৃত শিক্ষাকে সীমিত ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেন। এরপর ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

> এ কলেজ যদিও স্থাপিত হয় কোম্পানী-কর্মচারীদেরকে দেশী ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে, তবু এই কলেজকে কেন্দ্র করেই বাংলা ও উর্দু গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে এবং তার প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী।[৫৮]

১৮২৩ সালে সরকার শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য 'General Committee of Public Instruction' গঠন করেন। এরপর ১৮২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি অনুমোদন করেন। মেকলে-ও ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে (Minute) প্রাচীন পদ্ধতির প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা প্রদানের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করে ইংরেজী শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করেন। মেকলের সমর্থনের সূত্র ধরে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত সরকারী নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।[৫৯] পক্ষান্তরে উইলিয়ম অ্যাডামের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট সরকারের অনুমোদনলাভে ব্যর্থ হয়।

আপাত দৃষ্টিতে মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক বক্তব্য যতোই প্রগতিশীল বলে মনে হোক না কেনো, এর পেছনেও ছিলো সংকীর্ণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই সীমিত ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে একটি রাজভক্ত অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করা, যারা প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যের রক্ষক হবে—সেতুবন্ধ হবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে। মেকলে স্পষ্টই উল্লেখ করেন যে, এই নব-সৃষ্ট শ্রেণী হবে "রক্তে ও রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ"।[৬০]

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন না থাকলেও এদেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ অতি সীমিত থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক বাঙালীই ভালো ইংরেজী শিখেছিলেন।[৬১] বাঙালী হিন্দুর ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহের ফলেই ১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[৬২]

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজীশিক্ষা সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে। জানা যায়, ১৮৩৫ সালের পূর্বেই কলিকাতায় কমপক্ষে ২৫টি এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৩] ১৮৪৩ সালে 'Committee of Public Instruction'-এর বদলে 'Council of Education' গঠিত হয় এবং এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে কলিকাতাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে সরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতে কোম্পানী সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে ১৮৫৪ সালে বৃটেন থেকে এক নির্দেশনামা প্রেরিত হয়। শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারের মনোযোগের এক বিশেষ নিদর্শন এই নির্দেশনামা। এখানে উল্লেখ করা হয় ঃ ১. স্বতন্ত্রভাবে সরকারের শিক্ষা বিভাগ গঠন, ২. প্রাদেশিক রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ৩. সরকারী স্কুল ও কলেজের উন্নয়ন এবং সংখ্যা বর্ধন, ৪. মিডল্ স্কুল নামে বিদ্যালয় স্থাপন, ৫. বাঙলাশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপসহ বাঙলা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, এবং ৬. প্রজাসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য প্রদান।[৬৪]

ইংরেজ-শাসনের সূচনা-পর্ব থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ-দেশে শিক্ষা-বিস্তারে যে-উদ্যোগ গৃহীত হয় তার ফল একচেটিয়াভাবে হিন্দুসমাজই ভোগ করে। বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ প্রধানত হিন্দুসমাজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেরী, মার্শম্যান, হেয়ার, বেথুন প্রমুখ বিদেশী শিক্ষাব্রতী এবং রামমোহন, রাধাকান্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ স্বদেশী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের প্রয়াস ও অবদানে হিন্দুসমাজই লাভবান হয়। এইভাবে 'বিত্ত' ও 'বিদ্যা'র সমন্বয়ে এক নতুন শ্রেণী ও সমাজ গড়ে তুলতে হিন্দু সম্প্রদায় সক্ষম হয়।

২.

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইংরেজ সরকার এ-দেশে শিক্ষা-বিস্তারের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেননা। প্রথম পর্যায়ে সীমিত ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রসারের যে উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেন, তার মূলে ছিলো তাদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ১৭৮০ সালে প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী তৈরীর প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গড়ে ওঠে এই মাদ্রাসা।[৬৫] প্রতিষ্ঠার একদশকের মধ্যেও মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়। ১৮১২ এবং ১৮১৮ সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসার উন্নতি ও সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষে একজন ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু সরকারের আর্থিক দায়িত্বের কারণে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।[৬৬] সরকার একদিকে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কিন্তু অপরদিকে ক্যালকাটা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য ও অবহেলা প্রদর্শন করেছেন।

ক্যালকাটা মাদ্রাসায় ১৮২৬ সালে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ১৮২৬ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত ইংরেজী বিভাগ চালু থাকে এবং এই সময়কালে ইংরেজী বিভাগ থেকে মাত্র দু'জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়।[৬৭] ১৮৩৩ সালে মাদ্রাসায় ইংরেজী আবশ্যিক করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।[৬৮] ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অপারগতার কারণ ছিলো মূলত অর্থনৈতিক।

বাঙালী মুসলমানের মধ্যে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিলো তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবারের কাছে ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার আবেদন পেশ করে। কলিকাতার নিম্নবিত্তের মুসলমানদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিলো।[৬৯] প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুর্শিদাবাদ নিজামত কলেজ ও হুগলী কলেজেও ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছিলো।[৭০] তাই এ-কথা বলা চলে, ধর্মীয় গোঁড়ামী, অনীহা বা বিদ্বেষবশত নয় মূলত আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ও সুযোগের অভাবেই বাঙালী মুসলমান ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ আমলে মুসলমানসমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য, সংকট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তার আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পটভূমি সম্পর্কে অ্যাডাম, হান্টার প্রমুখ আলোচনা করেছেন। অ্যাডামের অনুসন্ধান-রিপোর্টে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য ও মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতার বিষয়টি স্পষ্টই ধরা পড়ে। যেমন ১৮০১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধর্মশাস্ত্র ও আইনশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য ছিলো যথাক্রমে ২০টি ও ১টি। একই সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ময়মনসিংহ জেলায় প্রত্যেক পরগণায় হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিলোনা। ১৮০৮ সালে দিনাজপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য একটিও মাদ্রাসা কিংবা উচ্চতর জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান ছিলো না। ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলাতেও মুসলমানদের ধর্ম বা আইনশিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো না। ১৮৩৪ সালে মুসলিম-প্রধান নাটোর মহকুমায় হিন্দুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো ৩৮টি, পক্ষান্তরে মুসলমানদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই ছিলোনা।[৭১]

অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বাঙলা পাঠশালায় হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৯৫৩১ ও ১০৮৩। আর ইংরেজী স্কুলগুলোয় ১৮৫ জন হিন্দু ছাত্রের বিপরীতে মুসলমান ছাত্র ছিলো মাত্র ৮জন। শুধু তাই নয়, ফারসী শিক্ষার মাদ্রাসাতেও মুসলমানের তুলনায় হিন্দু ছাত্রের প্রাধান্য ছিলো।[৭২] এই চিত্র বিচ্ছিন্ন স্থানিক নয়, সমগ্র দেশেরই সাধারণ চিত্র। ১৮৪১ সালে বঙ্গদেশের সরকারী স্কুল-কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৩১৮৮ ও ৭৫১, ১৮৪৬ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৩৮৪৬ ও ৬০৬। ১৮৫২ সালে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৩৮১৪ ও ৭৯৬, ১৮৫৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৩৩৮ ও ৭৩১।[৭৩] ১৮৪১ থেকে ১৮৫৬ সাল, এই ১৫ বছরে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩১৫০, পক্ষান্তরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ২০ জন হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের শিক্ষানীতি, হিন্দুসমাজের বৈরী মনোভাব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দারিদ্র—এইসবই ছিলো মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগলাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

হিন্দুসমাজের মতো মুসলমানসমাজেও, বিলম্বে হলেও, শিক্ষার প্রসারে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা মুসলমানসমাজের শিক্ষার সমস্যা ও সংকট এবং এর দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। এইসঙ্গে কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি মুসলমানসমাজের জন্য আবশ্যক ও উপযোগী সে-সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। শিক্ষা-বিষয়ে তাঁদের সুপারিশ-মতামত জ্ঞাপন করে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সরকারের নিকট থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা অর্জনেও সক্ষম হন। এই শিক্ষাব্রতী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে নবাব আবদুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব আবদুল লতীফের সামাজিক কর্মের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের প্রয়াসই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন ঃ

> দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—বিশেষ করে মুসলিমসমাজের শিক্ষা ব্যাপারে আমি আমার কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ নিয়োগ করেছি।[৭৪]

আবদুল লতীফের শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলমানসমাজের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি মিশ্র ধারণা পোষণ করতেন। সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেমন অনুভব করেছেন, আবার ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় কারণে আরবী-ফারসী শিক্ষাকেও অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন। ইংরেজী-পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি মাদ্রাসা-শিক্ষার সহাবস্থান ও সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

হাজী মুহম্মদ মহসীন-তহবিলের অর্থে পরিচালিত হুগলী কলেজে হিন্দু ছাত্রদের আধিক্য থাকায় মুসলমানসমাজে বিশেষ ক্ষোভ ছিলো। আবদুল লতীফ ১৮৬১ সালে বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহসীন-তহবিলের অর্থ যাতে মুসলমানসমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে খরচ হতে পারে সে-বিষয়ে সরকারের কাছে তিনি সুপারিশ করেন। প্রায় একযুগ পরে ১৮৭৩ সালে তাঁর এই আবেদন অবশেষে ফলপ্রসূ হয়। লর্ড নর্থব্রুক মহসীন-তহবিল থেকে মুসলিম-শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৫০ হাজার টাকার অতিরিক্ত মঞ্জুরী প্রদান করেন। এই অর্থে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে তিনটি নতুন মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই সঙ্গে বঙ্গদেশের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বেশকিছু বৃত্তি প্রদত্ত হয় এবং ইংরেজী কলেজে শিক্ষারত মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ এই তহবিল থেকেই প্রদানের ব্যবস্থা হয়।[৭৫]

১৮৮২ সালে বড়লাট রিপন ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। আবদুল লতীফ এই কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে বলেন, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙলা এবং উর্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানের ভাষা। তাঁর মতে, নৃতাত্ত্বিক বিচারে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই তাদের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বাঙলা। তবে সংস্কৃতবহুল বাঙলাভাষার সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দ যুক্ত করে তাকে মুসলমানীরূপ দিতে হবে। পক্ষান্তরে আরব-ইরান-মধ্য এশিয়া থেকে আগত উচ্চশ্রেণীর অভিজাত মুসলমানের শিক্ষার ভাষা হবে উর্দু।[৭৬]

শিক্ষাক্ষেত্রে আবদুল লতীফের অবদানের গুরুত্ব স্বীকার করেও এ-কথা বলতে হয়, তিনি আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ও শাস্ত্রীয় আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যাপারে দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য যথার্থ বলে বিবেচনা করা যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমানদের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা। শিক্ষিত হিন্দুদের মত পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক শিক্ষা অর্জনে তাঁর কোনই আগ্রহ ছিলনা। বস্তুতঃ তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকেই শক্তিশালী করতে মনোযোগী হন। তার ফলে মুসলিম মনন একদিকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও অন্যদিকে রক্ষণশীল সেকেলে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে বিচরণ করায় তাঁদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য দীর্ঘকাল বিরাজ করে।[৭৭]

বাঙলার মুসলমানসমাজে শিক্ষার প্রসারে সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন'ও (১৮৭৮) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে নবাব আবদুল লতীফ ও তাঁর 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র চাইতে আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন অধিক প্রগতিশীল ও আধুনিক ছিলো। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা কমিশনের কাছে পেশকৃত এক স্মারকলিপিতে সরকারকে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মাদ্রাসা বিলোপ করে সেই অর্থে কলিকাতায় কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য একটি ইংরেজী-কলেজ স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়। অবশ্য নবাব আবদুল লতীফ এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করেন।[৭৮] প্রকৃতপক্ষে আমীর আলীর এ্যাসোসিয়েশন শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার ও প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্যশিক্ষার পক্ষে তার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে।

সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা ও স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। এর ফলাফল উনিশ শতকের সাতের দশকের পর মুসলমানসমাজে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল।[৭৯] 'সমাজনেতাদের আন্দোলন', 'নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার উন্নতি' এবং 'সরকারী শিক্ষানীতির উদারতা'র পরিপ্রেক্ষিতে এক-দশকের মধ্যেই মুসলিম-শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮৭১ সালে যেখানে বাঙলার মুসলমান অধিবাসীর শতকরা ১৪.৭ ভাগ স্কুল-কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করতো, সেখানে ১৮৮১-৮২ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৩.৮ ভাগে।[৮০] এর ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানসমাজে একটি শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণী গড়ে ওঠে। আত্মপ্রতিষ্ঠার গরজে একদিকে তারা যেমন হয়ে উঠলো ইংরেজের অনুগত অনুগ্রহভাজন, অপরদিকে জাতীয় ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে তারা আত্মপ্রকাশ করলো হিন্দুসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে।

ধর্মীয় অবস্থা

বৃটিশ শাসনকালে বঙ্গ-ভারতে ধর্মের যে বিকৃতি ও অবক্ষয় দেখা দেয় তার প্রভাব সমাজজীবনে গভীর হয়েছিল। Murray T. Titus-এর 'Indian Islam' (Oxford, 1930) গ্রন্থে ইসলামধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

অবক্ষয়ের চিত্র পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরের মিশনারী W. Ward রচিত 'A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus' (Serampore, 1818) গ্রন্থে অধঃপতিত হিন্দুর ধর্ম ও সমাজের বিবরণ আছে।[৮১]

হিন্দুধর্মের অবক্ষয় ও বিকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায় ঃ

> উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনেকটা আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠায় তার মধ্যে নানারকম বিকৃতির প্রবেশ ঘটে। চড়কের বীভৎসতা ও কদর্য সঙ, দুর্গাপূজার সময় বাঈজী এনে মদ-মাংস খেয়ে ফূর্তি করা...., রাসযাত্রার সময় আমোদ-প্রমোদ, মাহেশে স্নানযাত্রার সময় মেয়ে-মানুষ নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত হৈ হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী পর্যন্ত বাঁধা রেখে জুয়া খেলা, অমানবিক সতীপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করে দলে দলে তামাসা দেখতে আসা, শাক্তদের বীভৎস বামাচার, ব্রাহ্মণদের অনাচার এবং অত্যাচার, তারকেশ্বরের মোহন্তের 'স্বীয় ধর্ম-কর্ম সংস্থাপনার্থ' বেশ্যা রাখা, কবির দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউড়—সবই ধর্মের নাম নিয়ে চলত, এবং কলকাতা বা বাংলার হঠাৎ-নবাবরা ছিলেন এসবের প্রধান উৎসাহদাতা। বাইরের ঠাট বজায় থাকলেও সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শতাব্দীর সূচনা থেকেই অন্তত কলকাতা অঞ্চলে নিষ্ঠা ও ভক্তির অভাব ফুটে উঠেছিল।[৮২]

আচারজীর্ণ-সংস্কারাচ্ছন্ন-রক্ষণশীল হিন্দুধর্মে জীবন-জিজ্ঞাসা ও প্রগতি-পন্থার অভাব-অন্তরায় অনুভব করে ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য-উত্থিত হিন্দুসমাজের একাংশের মধ্যে খৃস্টধর্মের প্রতি অনুরাগ-আসক্তি জন্মায়। খৃস্টান মিশনারীরা এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করেনি। কোম্পানীর শাসনের প্রথম যুগে মিশনারীরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতালাভে সক্ষম হয়নি। ১৮১৩ সালে এই বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হলে মিশনারীরা নানাভাবে এ-দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমেও স্থানীয় অধিবাসীদের খৃস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতো। অবশ্য এদেশের মানুষকে প্রায় ক্ষেত্রে পারলৌকিক পরিত্রাণ অপেক্ষা জাগতিক স্বার্থই খৃস্টধর্ম গ্রহণে অধিক প্রলুব্ধ করেছে। জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম-প্রথায় পীড়িত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত বর্ণহিন্দুরাও খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোপীনাথ নন্দী, লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখের খৃস্টধর্ম গ্রহণ হিন্দুসমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও-র (১৮০৯-১৮৩১) যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার প্রভাবপুষ্ট, 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা দেখা দেয় এবং এর পাশাপাশি আবার খৃস্টধর্মে অনুরক্তি ও নাস্তিক্যবাদের প্রবণতাও প্রকট হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুধর্মকে আধুনিক জীবনোপযোগী করে তোলা, কুসংস্কার–অনাচার–বিকৃতি থেকে রক্ষা, হিন্দু সম্প্রদায়কে সনাতন হিন্দুধর্মে আগ্রহী–আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল রাখা এবং খৃস্টান মিশনারীদের সমালোচনা ও ধর্মান্তর–রোধের জন্য হিন্দুসমাজে ধর্ম–সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। রামমোহন রায় (১৭৭২–১৮৩৩)– দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭–১৯০৫)– কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮–১৮৮৪) উদ্যোগ–প্রচেষ্টায় একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মোপসনার যুক্তিবাদী ভাব–আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ভাবুক, পুরোধা ও পথিকৃৎ রামমোহন খৃস্টধর্মের প্রসার–প্রতিরোধের উদ্যোগও গ্রহণ করেন এর ভেতর দিয়ে। রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩–১৮৬৭) ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭–১৮৪৮) 'ধর্মসভা'র মাধ্যমে হিন্দুধর্ম–সংস্কারের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮১৫–১৯২৮) হিন্দুধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা ও আন্দোলন হিন্দুসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও প্রাণ–প্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬–১৮৮৬) অবদান ও ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্ম–সংস্কার আন্দোলনের আরেকটি বড়ো উদ্যোগ গৃহীত হয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪–১৮৮৩) 'আর্যসমাজে'র মাধ্যমে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭–১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭–১৯০৯) প্রমুখ ইংরেজী–শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক–ব্যক্তিত্বের ভিন্নদৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা শিক্ষিতসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এইভাবে এক 'নব্য হিন্দুবাদে'র জন্ম হয়।

২.

ভারতবর্ষে প্রধানত সুফী–দরবেশের মাধ্যমেই ইসলামধর্ম প্রচারিত হয়। এইসব প্রচারক ধর্মের আনুষ্ঠানিক–আচরিক দিক সম্পর্কে অনেকখানি উদার ও উদাসীন ছিলেন। তাই ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ধর্ম–বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দেয়। ধর্মান্তরিত হলেও পুর্বের আচার–বিশ্বাস–সংস্কার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহিরাগত মুসলমানরাও হিন্দুদের সাহচর্য–সান্নিধ্যে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। বংশ–পরম্পরায় এই প্রভাব মুসলমানসমাজে কার্যকর থাকে এবং ধীরে ধীরে তা সমাজ–সত্তার গভীরে দৃঢ়মূল হয়।

Murray T. Titus তাঁর 'Indian Islam' গ্রন্থে ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতির উপর হিন্দু–প্রভাবের যে–কারণ নির্দেশ করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ ১. হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, ২ মুসলমান [illegible] হিন্দু মুরীদ ও অপরদিকে হিন্দু সাধকের মুসলমান শিষ্য, ৩. মুসলিম–মানসে হিন্দু চিন্তা–দর্শন ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব, এবং ৪. ধর্মীয় শিক্ষার পটভূমি ব্যতীত অসম্পূর্ণ ধর্মান্তর।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

এদেশে ইসলামধর্মের অবক্ষয় ও বিকৃতি নানাকারণে দেখা দিয়েছিল। মুসলমান শাসনকর্তাদের ধর্ম সম্বন্ধে অতি উদারতা, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলমানদের আগ্রহ ও অনুরাগ, হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতি-আচার-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্যে মুসলমানদের আচার-আনুষ্ঠান-উৎসব-পার্বণ গড়ে তোলা, মুসলমান বাদশা-নবাব-সুলতানের হিন্দুবিবাহে আগ্রহ[৮৪]—এইসব নানা কারণে মুসলমানদের ধর্মাচরণে একটি দেশজ লৌকিক রূপ যুক্ত হয়ে পড়ে, যা বিশুদ্ধ ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলোনা। এই বিকৃতি ও অবক্ষয় কোন্ পর্যায়ে পৌছেছিল তার কিছু নমুনা এখানে পেশ করা হলো।

জানা যায়, মুগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর সুর্য ও অগ্নিপূজক ছিলেন, জাহাঙ্গীর দেওয়ালীর পূজানুষ্ঠান করতেন এবং তাঁর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিলেন। বাঙলার নবাব-পরিবারে হোলী-উৎসব যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলো। শাহমত জঙ্গ, সউলত জঙ্গ, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর সকলেই হিন্দুদের হোলী-উৎসব সাড়ম্বরে পালন করতেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুশয্যায় মীরজাফর আরোগ্যের আশায় দেবী কীর্তিশ্বরীর পাদোদক পর্যন্ত পান করেছিলেন। মীরকাসিম এক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে তাঁর পুত্রের কোষ্ঠী তৈরী করিয়েছিলেন।[৮৫] মুসলিম বিধবার সহমরণ, হিন্দু-মুসলিম বিবাহ-সম্পর্ক, বিভিন্ন লৌকিক দেবতার পূজার্চনা, পীর-পূজা, হিন্দুদের মতো কুসংস্কারে বিশ্বাস, যৌতুক-প্রথার প্রচলন, বিধবা বিবাহে বিরোধিতা[৮৬] প্রভৃতি হিন্দু-প্রভাবজাত আচার-আচরণের ভেতর দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় ইসলামধর্মের মুলনীতি ও বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ ঢাকা জেলার সাধারণ গ্রামীণ মুসলমানের ধর্মীয় আচার-শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঃ

> ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে কয়েকটি গ্রামের মুসলমানেরা বকর-ঈদ পালন করবার জন্য লখীয়া নদীর ধারে সমবেত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে নামাজ পরিচালনা করতে পারে এমন কেউ ছিলনা। তখন কুড়ি বছরের একজন ঢাকার যুবক নৌকাতে করে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সেখানে নামে এবং নামাজ পরিচালনা করে তাদের সাহায্য করে।[৮৭]

এই চিত্র অনেকাংশে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাকেও প্রতিফলিত করে।

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রভাবে মুসলমানসমাজে যে ধর্ম-বিকৃতি, পৌত্তলিক ভাবধারা ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড প্রশ্রয় পায়, তারফলে ইসলামের মূল নীতি-বিশ্বাসে চিড় ধরে। ইসলামের এই বিকৃত রূপকে কেউ কেউ 'লৌকিক ইসলাম' বলে অভিহিত করেছেন।[৮৮] পীর-পূজা, কদম-রসুল, বেরা-ভাসান প্রভৃতি মুসলিম বিশ্বাস ও আচার হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রথযাত্রা ও দুর্গাপূজার সাদৃশ্যে মহররম-উৎসব, শবেবরাত অনুষ্ঠানে কালীপূজার আচরিক প্রভাব, ফাতেহা-ই-

Dhaka University Institutional Repository

দোয়াজদাহাম অনুষ্ঠানে জন্মাষ্টমীর প্রভাব মুসলিমসমাজের ধর্মীয় অবক্ষয়ের রূপকে স্পষ্ট করে তোলে। মুসলমান কর্তৃক 'মক্কেশ্বর শিবে'র পূজা, মুসলমান বন্ধ্যা-রমণীর সন্তানলাভের আশায় 'চৈতন মৈথুন মেলা'য় যোগদান ও শিবের ভোগ প্রদান, এবং মুসলমানের লক্ষ্মীপূজা-মনসাপূজা-শীতলাপূজা-ওলাদেবীর পূজা ও ভূত-প্রেত-অপদেবতায় বিশ্বাস মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলঘট স্থাপন, হলুদ কুটান, ফুরুল ডুবান, সাধ-ভক্ষণ, সহলা গাওয়া, সিঁদুর পরা, কাজল পরা ইত্যাদি সব হিন্দু আচার-উৎসব-বিশ্বাসই মুসলমানসমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৯]

শুধু ধর্মীয় আচার-আচরণ ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপেই নয় সাহিত্য-শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, পুরাণ, আচার-বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম ও পুরাণ হয়েছে শেখ ফয়জুল্লাহ-সৈয়দ সুলতান-আলাওল প্রমুখ মুসলিম কবির শিল্প-প্রেরণার উৎস। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও তাঁদের রচিত পদ-সংখ্যাও স্বল্প নয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম কবির ভাবমণ্ডল ছিলো হিন্দু-ধর্মাশ্রিত ও ঐতিহ্য-অনুপ্রাণিত।

বাঙলায় ইসলামধর্মের বিকৃতির পরিচয় বাউল-ফকির ও অন্যান্য লোকায়ত মরমী সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-দর্শন-তত্ত্ব-ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেও পাওয়া যায়। হুজরতী, গোবরাই, পাগলানাথী, খুশি-বিশ্বাসী, সাহেবধনী, জিকির, ফকির ও বাউল-সম্প্রদায়- এরা স্পষ্টই শাস্ত্রীয় ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেই তাদের মতবাদের প্রবর্তনা করে।[৯০] এই প্রসঙ্গে লালনপন্থী বাউলদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইভাবেই ক্রমশ ধর্ম ও সমাজজীবনে 'লৌকিক ইসলাম' (শিরক্ ও বিদায়াৎ) 'শাস্ত্রীয় ইসলামে'র (শরীয়তী ইসলাম) স্থান দখল করে নেয়।[৯১]

বাঙলাদেশে ইসলাম যখন তার বিশুদ্ধ রূপ হারিয়ে 'লৌকিক ইসলামে' পরিণত হয়েছিল, তখন তার শাস্ত্রীয় রূপ পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চলে ও ধর্ম-সংস্কারের নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়। শাস্ত্রীয় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে সংস্কার-আন্দোলন গড়ে ওঠে 'ওহাবী আন্দোলন' তার মূল প্রেরণা হলেও তা ফারায়জী, তরিকা-ই-মুহম্মদী, আহল্-ই-হাদীস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এইসমস্ত আন্দোলন বৃহত্তর অর্থে ওহাবী আন্দোলনেরই নামান্তর—গভীরভাবেই ওহাবী-প্রভাবিত।[৯২] হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, তীতুমীর, কেরামত আলী জৌনপুরী, এনায়েত আলী প্রমুখ এই সংস্কার-আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। সকল প্রকারের অনাচার-কুসংস্কার-পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের 'আদি' ও 'অকৃত্রিম'-রূপে প্রত্যাবর্তনই ছিলো এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

খৃস্টান মিশনারীদের তৎপরতায় বাঙলার মুসলমানসমাজে ধর্মান্তরের একটি প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তবে এই ধর্মান্তর হিন্দুসমাজের মতো ব্যাপক ছিলোনা বা স্বধর্মে

Dhaka University Institutional Repository

আস্থাহীনতার কারণেও হয়নি। মূলত পল্লীবাসী দরিদ্র ও অজ্ঞ মুসলমান প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত হয়েই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে।

ইসলামধর্ম, মোহাম্মদ (সঃ) প্রভৃতি সম্পর্কে খৃস্টান মিশনারীদের রচিত নিন্দা-সমালোচনামূলক গ্রন্থের প্রতিক্রিয়া মুসলমানসমাজে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। মুসলমানসমাজে এর প্রতিবাদ হয় এবং মওলানা-মৌলবীরা বাহাসে অবতীর্ণ হন ও পাল্টা পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হতে থাকে।[৯৩] বস্তুত মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ও মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের (১৮৭৯-১৯৩৭) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মিশনারীরা ব্যাপক ধর্মান্তর ও ইসলাম-দ্বেষী প্রচার-প্রচারণা প্রায় একতরফাভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

মুসলমানসমাজ একদিকে হিন্দুধর্মের রীতি-নীতি-আচার-সংস্কার দ্বারা যখন প্রভাবিত এবং অপরদিকে খৃস্টধর্ম গ্রহণের কারণে বিব্রত, তখন তার অভ্যন্তরীণ ধর্ম-কলহ তাকে আরো বিভক্ত ও দুর্বল করে তোলে। শিয়া-সুন্নী, ওহাবী-ফারায়জী, হানাফী-মোহাম্মদী প্রভৃতি বিতর্ক মুসলমান-সমাজকে আত্মঘাতী বিরোধে যুক্ত করে। এই ধরনের সামাজিক-ধর্মীয় অনৈক্য উচ্ছেদে সংস্কার আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের ভেতর দিয়েই বাঙালী মুসলমান স্বধর্মের স্বরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আবার এই ধর্মীয় চেতনার সূত্র ধরেই মুসলমানসমাজে আর্থ-রাজনীতিক সচেতনতা আসে—জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের বোধ তীব্র হয়।

সামাজিক অবস্থা

> ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে।[৯৪]

কার্ল মার্কসের উপরিউক্ত মন্তব্য ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তনের ঐতিহ্যের প্রতিই নির্দেশ করে। এই সমাজ-কাঠামো ধ্বংস করে ইংরেজ পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরী করে দেয় 'ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র' হিসেবে। মার্কসের বিবেচনায় এ-ছিলো 'এশিয়ায় প্রথম-শ্রুত মহত্তম সমাজ-বিপ্লব'।[৯৫]

প্রথা আর সংস্কারে আবদ্ধ, শাস্ত্র আর আচারে জীর্ণ বাঙালীসমাজের স্বরচিত বিবরে প্রবেশ করলো আধুনিকতার আলো। পুরাতন সমাজ-কাঠামোর ভাঙনের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠলো নতুন শ্রেণী ও সমাজ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামীণ বাঙলায় জমিদার ও রায়ত শ্রেণীর পাশাপাশি জন্ম নেয় জোতদার, মহাজন, ক্ষেতমজুর ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। অপরদিকে শহরাঞ্চলে আবির্ভূত হয় শিল্পপতি,

Dhaka University Institutional Repository

বণিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণী।[৯৬] নতুন শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে সমাজ–কাঠামোর এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বাঙালীর সমাজজীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজ আমলে সমাজ–কাঠামোর যে মৌল পরিবর্তন সাধিত হয় তার স্বরূপ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো যখন একদল সুযোগ–সন্ধানী ভাগ্যান্বেষী ইংরেজের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠ–পোষকতায় প্রচুর বিত্ত–সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করে। এইসময় থেকে বংশ–মর্যাদা ও জাতি–কৌলীন্য বিত্তের কাছে পরাজিত হতে থাকে। এই নব্য ধনী সম্প্রদায়ের ভোগ–বিলাস, রুচি–বিকার, অমিতাচার, নৈতিক অধঃপতন সামাজিক জীবনকে কলুষিত করে তোলে। একধরনের মধ্যযুগীয় চেতনা ও মূল্যবোধকে আশ্রয় করে তাঁদের জীবন প্রবাহিত হয়েছে। অপরপক্ষে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমাজ–প্রগতির সপক্ষে তাঁদের ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হন।

ইংরেজ–শাসনের পূর্ব থেকেই বাঙালী হিন্দুসমাজ নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলো। বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কৌলীন্য–প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সহমরণ প্রভৃতি সামাজিক বিভেদ–অনাচারে হিন্দুসমাজ ছিলো জর্জরিত। স্বভাবতই সমাজের এই কুসংস্কার ও অনাচার দূরীকরণে নব্যশিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায় আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এইভাবে রামমোহন–বিদ্যাসাগর আর তাঁদের সহযাত্রীদের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজ–সংস্কারে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সনাতনপন্থী রক্ষণশীলদের মতবিরোধ ও বাদ–প্রতিবাদ অনড়–স্থবির সমাজ–সত্তার মূলে নাড়া দেয়। ঐতিহাসিক নিয়মেই এই দ্বন্দ্বে পরিবর্তনবিমুখ রক্ষণশীল পক্ষ পরাজিত হয়, সময় ও সমাজ চলে এগিয়ে।

উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীসমাজ একদিকে যখন আধুনিক শিক্ষা ও প্রগতি–চিন্তায় অগ্রসরমান, পাশাপাশি বিত্তবান সমাজ তখন লাম্পট্য–মদ্যপান, নেশা–জুয়া, বারবণিতা–গমন, বাঈজী–মুজরোর প্রমোদ–স্ফূর্তিতে নিমজ্জিত। এইসমস্ত নৈতিকতা–বিরোধী কার্যকলাপ বাঙালীসমাজে একধরনের সামাজিক স্বীকৃতিলাভ করেছিল এবং তা অনেকাংশে আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদার নিদর্শন বলে বিবেচিত হতো। 'ইয়ং বেঙ্গল' ও নব্য 'এজু'রা ছাড়াও রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মরাও সুরাসক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর পিতা একত্রে মদ্যপান করতেন। রামমোহন–দ্বারকানাথের উদ্যোগে বাঈজী–নাচের খবরও পাওয়া যায়। রামমোহন যে উপপত্নী–পোষণ করতেন তা–ও অবিদিত নয়। দুর্গাপূজার দিন প্রতিমার বদলে বেশ্যা–দর্শন করে বেড়ানো কিংবা রক্ষিতার স্বাচ্ছন্দ্য–বিধানের জন্য অকাতরে অর্থব্যয়,—এইসব চিত্র উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের সমাজজীবনের অতি–পরিচিত ছবি। ধনগর্বী স্থূল–রুচির 'বাবু', জ্ঞানমার্গী–যুক্তিবাদী

Dhaka University Institutional Repository

'এজু', উদার সমাজ-সংস্কারক সকলেই কমবেশী এই সামাজিক অনাচারের অংশভাগী। বিত্তের প্রভাব--প্রতাপ, আধুনিকতার ভ্রান্ত ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধের শৈথিল্য, পাশ্চাত্য জীবনাচরণের নির্বিচার অনুকরণ, বিকাশমান নাগরিক-জীবনের ক্লেদ-গ্লানি ইত্যাদি কারণেই সমাজজীবনে উপরিউক্ত অনাচার-ভ্রষ্টাচার প্রশ্রয় পায়।

সমাজ-প্রগতির একটি প্রধান শর্ত মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব ও বিকাশ। এ-দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ-বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্য ঃ

> বাংলাদেশে নতুন শ্রেণীরূপায়নের ফলে সমাজে যে-শ্রেণীর বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[৯৭]

তবে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশের ইতিহাস অভিন্ন নয়। ঐতিহাসিক কারণেই মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে। সঞ্চিত অর্থের অভাবে মুসলিমসমাজ নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিমসমাজের অনগ্রসরতা ও মুসলিম মধ্যশ্রেণীর বিলম্বিত আত্মপ্রকাশের মূল কারণ এখানেই নিহিত।[৯৮]

২.

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখে বলা যায়, যখন হিন্দু মধ্যশ্রেণীর প্রয়াসে হিন্দুসমাজ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অগ্রসর, মুসলিম মধ্যবিত্তের তখন কেবল উন্মেষকাল। বিনয় ঘোষ বলেছেন ঃ

> হিন্দুসমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকরীজীবী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন একটি বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারমধ্যে মুসলমানসমাজে নতুন মধ্যশ্রেণীর বিকাশ তো একেবারেই হয়নি, পুরাতন অভিজাতসমাজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র ও নিঃস্বশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে। নতুন কোনো বিদ্বৎসমাজেরও বিকাশ হয়নি।[৯৯]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলিমসমাজে যোগ্য সামাজিক নেতৃত্বের অভাব সমগ্র সমাজকে উত্থানরহিত ও হতাশাগ্রস্ত করে রাখে। দারিদ্র ও অশিক্ষা ছিলো মুসলমানসমাজের নিত্য সঙ্গী। ইতোপূর্বে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, রেভারেণ্ড জেমস্ লং প্রমুখ মুসলিমসমাজের যে পতনোন্মুখ করুণ চিত্র অংকন করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত তার কোনো মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিতত্ত্বের আলোচনা উচ্চ অভিজাত মুসলমানসমাজকে যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় করে তোলে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই মূলত ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে—বাঙালী মুসলমানের জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে গ্রিয়ারসন, ডাল্টন, রিজলে, ওয়াইজ প্রমুখ পণ্ডিত এই অভিমত পোষণ করেন।[১০০] আভিজাত্যগর্বী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৯-১৯১৭) তাঁর 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) নামক গ্রন্থে এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করে বাঙলার অধিকাংশ মুসলমান যে বহিরাগত অভিজাত শ্রেণীর বংশধর, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ফজলে রাব্বির এই মত অনেকাংশে ভ্রান্ত হলেও জন্ম ও বংশকৌলীন্যে গর্বিত মুসলিমসমাজের একাংশের অনুভূতি ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম জাতিতত্ত্ব নিয়ে এই বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ বাঙলার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানদের তাদের 'স্বতন্ত্র অস্তিত্ব' ও 'বংশকৌলীন্য' সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।[১০১]

বাঙলার মুসলমানের সমাজকাঠামোর বিন্যাসে হিন্দুপ্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ইসলাম সাম্যের ধর্ম হলেও এবং এই ধর্মে জাতিভেদপ্রথার অনুমোদন না থাকলেও বঙ্গদেশে হিন্দু জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম-প্রথার প্রভাব ও সাদৃশ্যে মুসলমানসমাজে জাতিভেদ প্রথা গড়ে ওঠে।[১০২] জে. ডি. কানিংহাম মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় মুসলমান হিন্দুদের চারবর্ণের সাদৃশ্যে সৈয়দ, শেখ, মুগল ও পাঠান এই চারশ্রেণীতে বিভক্ত।[১০৩] আর. লেভী সামাজিক-বিন্যাসের ক্ষেত্রে বাঙলার মুসলমানকে আশরাফ, আজলাফ বা আতরাফ ও আরজাল এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বিদেশাগত আরব, পারসিক, আফগানের বংশধর এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুর উত্তরপুরুষ। আজলাফ বা আতরাফ দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশজ মুসলমান। বাঙলার স্থানীয় অধিবাসী যাঁরা ধর্মান্তর-সূত্রে মুসলমান হন, মূলত তারাই এই শ্রেণীভুক্ত। কৃষক, তন্তুবায়, কলু, দর্জি প্রভৃতি পেশাজীবীরা আজলাফ বা আতরাফ শ্রেণীর মুসলমান। আরজাল বা সর্বনিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের অস্তিত্বও সমাজে ছিলো। হালালখোর, লালবেগি, আবদাল, বেদিয়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের পেশাজীবী মুসলমানের সঙ্গে অন্য উচ্চতর দুই শ্রেণীর মুসলমানের যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলোনা শুধু তাই নয়, তাদের মসজিদে প্রবেশ কিংবা সাধারণ কবরখানা ব্যবহারেরও কোনো অধিকার ছিলোনা।[১০৪] উনিশ শতকের প্রথম পর্বে শ্রেণী-বৈষম্য ও বংশমর্যাদাবোধ মুসলমানসমাজে বিস্তৃত হয়। আশরাফ ও আতরাফ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হতোনা, আহার-বিহারও অপ্রচলিত ছিলো। এইভাবে বাঙলার মুসলমানসমাজ শ্রেণীগত ঐক্যের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত সামাজিক বিন্যাসের সর্বোচ্চে অবস্থিত উচ্চ অভিজাত শ্রেণীই, মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত উনিশ শতকে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, মুসলিমসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বংশ-কৌলীন্যের আভিজাত্য, ভূমিস্বত্বের অধিকার-ভোগ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা—সব মিলিয়ে এই শ্রেণীকে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় এই অভিজাত উচ্চশ্রেণী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বৃটিশ-পূর্বকালে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা দারিদ্র বরণ করতে বাধ্য হন। জাতিত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, যুগোপযোগী আধুনিক জীবনচর্চার সঙ্গে যোগসূত্রহীনতা, ইংরেজীশিক্ষার সুযোগলাভে ব্যর্থতা ও আর্থিক অসচ্ছলতা এই আশরাফ শ্রেণীকে সমাজে বংশমর্যাদাগর্বী, অতীতাশ্রয়ী এক প্রভাবহীন শ্রেণীতে পরিণত করে। বঙ্গদেশ ও বাঙালীসমাজের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন এই শ্রেণী বাঙলাভাষা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারেননি। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে এই অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানসিক ব্যবধান ছিলো দুস্তর। বাঙালী মুসলিম মধ্যশ্রেণীর উদ্ভবের ফলে বাঙলার সর্বশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

বিত্ত ও বিদ্যার সমন্বয় বাঙালী মুসলমানের সামাজিক কাঠামোতেও পরিবর্তন আনে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যেখানে বংশ-কৌলীন্যের নিরংকুশ প্রাধান্য ছিলো, সেখানে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজে বিত্ত ও বিদ্যা সেই জন্মসূত্রের আভিজাত্যকে স্থানচ্যুত করে। বিত্ত যে বংশমর্যাদা অর্জনেও যথেষ্ট সহায়ক ছিলো তা মুসলিমসমাজে প্রচলিত এই প্রবচন থেকে বেশ বোঝা যায় ঃ

> গত বছর আমি 'জোলা' ছিলাম, এই বছরে আমি 'শেখ' এবং আগামী বছরে, ফসলের দাম বাড়লে, আমি 'সৈয়দ' হবো।[১০৬]

আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনভিজাত মুসলমানের পদবীও ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে ঃ

> আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দিন,
> তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।[১০৭]

প্রকৃতপক্ষে অভিজাত ও অনভিজাত এই সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, বৃত্তি ও পেশার দ্বারা সামাজিক ও কৌলিক মর্যাদা নির্ধারণ একদিকে যেমন মুসলমানসমাজকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করেছিল, অপরদিকে তেমনি নানা কুসংস্কার ও অনাচার সমাজসত্তাকে রেখেছিল দুর্বল ও নির্জীব করে। এইভাবে শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত অনগ্রসর মুসলমানসমাজ কালক্রমে উত্থানরহিত স্থবির সমাজে পরিণত হয়েছিল।

বাঙালী মুসলমানসমাজে যে অবক্ষয় ও দুর্গতি দেখা দিয়েছিল তাতে স্বাভাবিকভাবেই নারীর অবস্থা যে শোচনীয় ছিলো তা বলাই বাহুল্য। অবরোধবাসিনী নারীসমাজ পর্দা-প্রথার অন্তরালে জগতবিচ্ছিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাপনে বাধ্য হতো। মুসলিমসমাজে তাই নারীশিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ উনিশ শতকে গৃহীত হয়েছিল এমন খবর পাওয়া যায়না। সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক-যৌতুক-বাঁদীপ্রথা, বিধবাবিবাহে প্রতিবন্ধকতা মুসলিম নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিসহ। এইসব প্রথা ও সংস্কার সমাজকে স্থবির ও দুর্বল করে রেখেছিল। এই তথ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে যে, ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গদেশে ৪ থেকে ২৯ বছর বয়সী মুসলিম বিধবার সংখ্যা ছিলো ১৭২১৩৯০ জন।[১০৮] ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, চরিত্রদোষ উপরিউক্ত প্রথাসমূহের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে সমাজে প্রকাশিত হয় এবং তা নৈতিকতার সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। এ-সব সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সমাজের সচেতন অংশের পক্ষ থেকে ক্রমশ প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে।

বাঙলার মুসলমান জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর ভোগবিলাস, আলস্য-উদ্যোগহীনতা, অশিক্ষা-অপব্যয় সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত ও দৃঢ়মূল করেছিল। সেখ আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দুমোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থে উনিশ শতকের বিত্তবান মুসলিমসমাজের জীবনযাত্রার চালচিত্র তুলে ধরেছেন এইভাবে,–
–"বাঈজী, খেমটাঅলি, তয়ফাদার, যাঁহার বিলাসিতার অঙ্গ, এসব আমোদে যিনি অহোঃরাত্রি মগ্ন! কবুতর উড়ান, মোরগবাজি, ঘুড্ডি খেলা, সৎরঞ্চ খেলা, যাহার প্রিয়কার্য্য,—পারসির এক দস্তখত পর্য্যন্ত যাঁহার দৌড়, যিনি সমুদয় দিন, কি অন্ততঃ দিনের ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত গড়িয়ে নিদ্রা যান, সেই 'চৈতন্য জড়পদার্থ" —ই[১০৯] বাঙলার মুসলমান জমিদার।

আশরাফ-আতরাফ, শিয়া-সুন্নী, মজহাবী-লামজহাবী, শরীয়তপন্থী-মারেফতপন্থী প্রভৃতি সামাজিক-ধর্মীয় অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে মুসলমানসমাজ মুখর ছিলো। অপরপক্ষে হিন্দু-মুসলিম বিবাদ-বিরোধের বহির্দ্বন্দ্বে উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব-বিরোধের সমস্যা বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সংঘাতের সন্নিহিত দুটি ধারা মধ্যযুগ থেকেই মিশ্ররূপ নিয়ে প্রবহমান ছিলো। ইংরেজ শাসকের কূটচালের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উনিশ শতকে বিশেষ জটিল ও তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সমাজে প্রতিফলিত হয়।

বাঙলার মুসলিম মধ্যশ্রেণী ও বিদ্বৎগোষ্ঠীর প্রকৃত উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে।[১১০] মুসলিম মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ শাসকদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো। মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা বা চাকুরীর ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা, আগ্রহ বা আনুকূল্য থাকার কোনোই কারণ ছিলোনা, শুধু বিকশিত হিন্দু মধ্যশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সামাজিক-রাজনৈতিক দাবী ও প্রত্যাশার ফলে তাদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কৌশলে তা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ মুসলমানসমাজের প্রতি দৃষ্টিদান করেন। হিন্দু মধ্যশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

'সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি'র ভিত্তিতে অব্যাহতভাবে শাসনকার্য পরিচালনাই ছিলো বৃটিশের মূল উদ্দেশ্য।[১১১] বিকাশমান মুসলিম মধ্যশ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করেনি। এর সামাজিক ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এরফলে মুসলিম মধ্যশ্রেণী রাজশক্তির অনুগত একটি শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠে। ইংরেজ–প্রীতি, ইংরেজ–শাসনের প্রতি অবিচল আস্থা–ভক্তি এই শ্রেণীর সকল সামাজিক–রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষা–প্রসার, চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ–সংরক্ষণ এবং অধিকতর সুবিধা সংগ্রহ, রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার, জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব–প্রতিষ্ঠায় এই নবসৃষ্ট মধ্যশ্রেণী তাদের শক্তি, শ্রম, মনোযোগ ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। হিন্দু মধ্যশ্রেণীর প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলিম মধ্যশ্রেণী গড়ে ওঠায় জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্বেষের মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে এবং সামাজিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে হিন্দু–মুসলমানের সৌহার্দ্য–সহাবস্থানের সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হয়।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁদের অনুসারীরা মুসলমানসমাজের মধ্যে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং স্ব–সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অভাব–অভিযোগ–সমস্যা মোচনে সফলতা অর্জন করেন। মুসলমানসমাজের প্রয়োজন ও দাবী সম্পর্কে সরকারও ক্রমশ অবহিত ও সচেতন হয়ে ওঠে। এই কলিকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত শহুরে 'এলিট'–শ্রেণীর কর্মকাণ্ড বা চিন্তা–চেতনা মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হতে পারেনি। বৃহত্তর পল্লীবাঙলার সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছিন্নতার ক্ষতিপূরণ আরো কয়েক দশক পরে 'মুসলিম লীগে'র (১৯০৬) সূত্রে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) ঘটনাপ্রবাহ ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা বাঙলার মুসলমানের সমাজজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছিল,—সমাজের নেতৃত্ব তখন আরো সচেতন, অগ্রসর ও পরিণত মধ্যশ্রেণীর হাতে। জীবিকা, সংবাদপত্র ও সভা–সমিতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্ব মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

নবাবী আমলের শেষপর্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট, ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধের শৈথিল্য এবং সামাজিক অবক্ষয় বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। নবাবী আমলের অবসান হলেও পরবর্তী কোম্পানী আমলের বঙ্গদেশ এই সাংস্কৃতিক–উত্তরাধিকারকে অস্বীকার তো করেইনি বরঞ্চ গভীর আগ্রহে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।[১১২] কেনো এই বিকৃত ও স্থূল রুচির সংস্কৃতিচর্চা সমাজে অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলো তার জবাব ও ব্যাখ্যা ইংরেজ–আমলে 'বিত্তে'র প্রভাবে নতুন সমাজ–কাঠামো নির্মাণের ইতিবৃত্তের ভেতরেই নিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

আঠারো-উনিশ শতকে যাঁরা ইংরেজ-ফরাসী বণিকদের আমলা-মুৎসুদ্দী-গোমস্তা-দেওয়ান-খাজাঞ্চী-ঠিকাদার-বেনিয়ান হিসেবে কাজ করে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন, তাঁদের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা-পরিচিতি, বংশ-মর্যাদা বা আভিজাত্য ছিলোনা। বাঙালীসমাজে "তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিলনা।"[১১৩] বিত্ত-কৌলীন্যে উত্তরকালে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত এইসব অজ্ঞাতকুলশীল 'হঠাৎ নবাব' এতোই সাধারণ ও নগণ্য ছিলেন যে পূর্বজীবনে কেউ মুদী-দোকানী, কেউ পরান্নে প্রতিপালিত, কেউবা শিশি-বোতলের কারবারী, আবার কেউ পাঁচটাকা বেতনে সরকারের কাজ করতেন। তাই সঙ্গতকারণেই উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক রুচি যে এদের অধিগত হতে পারেনা তা সহজেই অনুমেয়। সমকালীন 'নক্শা'য় এই ভুঁইফোঁড় নব্য-ধনীদের পরিচয় অঙ্কিত হয়েছে এইভাবে ঃ

> নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্‌শী, ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হল। সেপাই পাহারা, আসা সোঁটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রাবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। শহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠল।[১১৪]

অসুস্থ সমাজে সুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতিচর্চার আবহ, উপায় ও উপকরণ থাকেনা। উনিশ শতকের বাঙলায় নিম্নস্তর থেকে উত্থিত কিছু ব্যক্তির হাতে আকস্মিক অপরিমিত ধনাগম জন্ম দিয়েছিল বিলাস-মত্ততার। আমোদ-প্রমোদ-বিনোদনের উপকরণ ছিলো বাঈজীর নাচ-গান, গণিকাচর্চা, আখড়াই-হাফ্ আখড়াই-কবিগান-পাঁচালি, যাত্রা-তর্জা-টপ্পা-খেউড়-বুলবুলির লড়াই—এইসব। এই জীবন ও সংস্কৃতিচর্চা 'নব্যবাবু'দের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিলোনা। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে বণিক-শাসিত যে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, 'তাহাতে রুচির শুচিতা ছিলনা, প্রাণের আরাম ছিলনা, আর ছিলনা মননের আত্মবীক্ষা'।[১১৫]

বাঙলার সূচনাপর্বের মুদ্রণ-ইতিহাসও কুরুচি ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৮১৯-২০) বাঙলা মুদ্রণের উন্মেষ-যুগের প্রথম ১৫ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

তালিকায় দেখা যায়, মুদ্রিত ১৯টি গ্রন্থের মধ্যে ৮টিই ছিলো বিকৃত রুচির আদিরসাত্মক যৌন-উদ্দীপক গ্রন্থ।[১১৬] উনিশ শতকে ভোগলিপ্সু স্বল্পশিক্ষিত 'বাবু'-দের কাছে এই ধরনের বইয়ের বিশেষ সমাদর ছিলো।[১১৭]

অবশ্য এরই মাঝে সমাজে পরিবর্তনও আস্‌ছিল ধীরে ধীরে। শিক্ষার প্রসার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয়, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, সংবাদপত্রের প্রকাশনা,—সামন্ত ও বণিকতান্ত্রিক স্থূল ও বিকৃত সাংস্কৃতিক রুচি পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল। উনিশ শতকে সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে। এরপর ক্রমশ কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালীসমাজের জীবনাগ্রহ, জীবন-জিজ্ঞাসা ও শিল্পবোধের নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.

মধ্যযুগে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলিম নৃপতিদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চর্চায় বাঙলাসাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। আলাওল, দৌলত কাজী বা দৌলত উজীর বাহরাম খান মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অথচ অন্ত্য-মধ্যযুগ বা আধুনিক বাঙলাসাহিত্যের সূচনা-পর্বে মুসলিম অবদান অনুল্লেখযোগ্য। বাঙালী মুসলমানের আর্থ-সামাজিক জীবন ও ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যন্তরেই এই পশ্চাদপদতার কারণ নিহিত। মূলত এ-ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রশ্নটিই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ-কথা সত্য যে ঃ

> উত্তর ভারতে ফার্সীর উত্তরাধিকারী উর্দূভাষী সমাজে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্যগত যোগ বিদ্যমান তা' বাঙলায় রক্ষিত হয়নি। এখানে অভিজাতশ্রেণী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা পেয়েছে ফার্সী ও উর্দূর ভিতর দিয়ে সিরাজ-ইস্পাহান-দিল্লী-লক্ষ্মৌ থেকে, আর নিম্নশ্রেণীর মানসলোক আবর্তিত হয়েছে বাঙলারই গ্রাম ও তার মুসলমান-অমুসলমান প্রতিবেশীকে অবলম্বন করে। অভিজাতরা যেমন অ-বাঙালী সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে আশ্রয় নিয়েছে, নিম্নশ্রেণী তেমনই সান্ত্বনা খুঁজেছে তার অমুসলমান প্রতিবেশীর লোক-ধর্মের কাব্যে ও সঙ্গীতে। এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূর করার জন্যই হয়ত আরবী-ফার্সী জর্জরিত, রসবিবর্জিত মুসলমানী পুঁথিসাহিত্যের জন্ম।[১১৮]

বাঙালী মুসলমানের এই সাংস্কৃতিক দৈন্য ও বন্ধ্যাত্ব তার মানসলোককে অনেককাল বিশুষ্ক করে রেখেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালী হিন্দুর সাহিত্যসাধনা যখন নতুন পথ ও পাথেয় সন্ধানে নিয়োজিত, তখনও মুসলমানসমাজ দোভাষী পুঁথির অবাস্তব, জীবনবিমুখ, উদ্ভট কল্পনার জগতে নিমগ্ন। 'কবিওয়ালা'দের মতো 'শায়ের'-রাও ছিলেন ক্রান্তিকালের কবি এবং তাঁদের শিল্পকর্ম ছিলো

Dhaka University Institutional Repository

'ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিধারার নিদর্শন'।[১১৯] এই 'মানস-আকালের সাহিত্য', প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্যোগ-দুর্দিনের ঐতিহাসিক দলিল'।[১২০]

প্রাক্-আধুনিককালে মুসলিম-মানসের সাংস্কৃতিক পরিচয় সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির ভেতর দিয়ে। গাথা-গীতি-গীতিকায় গ্রামীণ জন-মানসের শিল্পবোধের পরিচয় রয়েছে উৎকীর্ণ। বাউল-মুর্শিদী-মারফতী-সারি-জারি-ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া গানের ভেতর দিয়েই এই লোকসমাজ নিজেদের স্বরূপ, মন-মানস, আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছে। পুঁথিসাহিত্যের বিকৃত বাঙলা আর উচ্চকোটির বাঙালী মুসলমানের উর্দূ-ফারসীর মোহের পাশাপাশি সাধারণ নিম্নকোটির মানুষের রচিত এই লোকসাহিত্যই একমাত্র বিশুদ্ধ বাঙলাভাষায় সাহিত্যচর্চার নিদর্শন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, মাতৃভাষার প্রশ্নে দ্বিধা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-জাতীয়তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও মধ্যশ্রেণীর অনস্তিত্ব, আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে মুসলিম-প্রয়াসকে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করেছে। এই অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যখন বাঙলাসাহিত্যের আধুনিক-পর্বে মুসলিমপ্রয়াস সূচিত হলো, তখন আর্থ-সামাজিক জীবনের মতো শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিবেশী হিন্দুর তুলনায় সে পিছিয়ে রইলো।

কালক্রমের বিচারে খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীই প্রথম মুসলিম গদ্যলেখক। গদ্যে-পদ্যে রচিত তাঁর 'উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পারমার্থিক ভাব' (১৮৬০) মুসলিম গদ্যরচনার প্রথম নিদর্শন। নক্‌শাকার ও প্রহসন-রচয়িতা হিসেবে মুন্সী আজিমদ্দীন ('কি মজার কলের গাড়ী' ঃ ১৮৬৩), মুন্সী নামদার ('কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের একি দম্ভ' ঃ ১৮৬৩), গোলাম হোসেন ('হাড়জ্বালানী' ঃ ১৮৬৪), সেখ আজিমুদ্দী ('কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' ঃ ১৮৬৮), আয়েন আলী শিকদার ('বিধবা বিলাস' ঃ ১৮৬৮), মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী গদ্যলেখক।[১২১] কিন্তু শিল্প-সাফল্য কিংবা উৎকর্ষের কারণে নয়, কেবল সাহিত্যের ইতিহাসের কালক্রম উল্লেখের জন্যই এঁদের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, রূপ ও রীতি, বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যে মীর মশাররফ হোসেনই উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্যলেখক ও সাহিত্যশিল্পী।

প্রকৃতপক্ষে মশাররফের আবির্ভাবের সময় থেকেই বাঙলাসাহিত্যে মুসলিম-প্রয়াসে আধুনিক-পর্বের সূচনা। সাহিত্যক্ষেত্রে মশাররফের আবির্ভাব বাঙালী মুসলমানের বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। উনিশ শতকের উত্তর-পর্বে মুসলিম মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয়ের পর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ও স্বরূপ-অন্বেষার প্রয়াসে মানস-পালাবদলের সূত্রপাত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, *প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯*, (মস্কো, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই), পৃঃ ২১ (মার্কসের উক্তি)।

২. ঐ, পৃঃ ১৫

৩. Brijen K. Gupta, *Sirajuddaullah and the East India Company 1756—1757*, (Leiden, 1966), P. 131

৪. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য*, (ঢাকা, ১৯৬৪), পৃঃ ৭-৮

৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত*, (কলিকাতা, ১৩৭৯), পৃঃ ৪

৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বাঙ্গলার ইতিহাস*, (কলিকাতা, ১৩৮৩, দ্বি-স), পৃঃ ১৭০

৭. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, (ঢাকা, ১৯৬৯, দ্বি-স), পৃঃ ৪

৮. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৬৬), পৃঃ ১৬

৯. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, (কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃঃ ২৫

১০. কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি কতোভ্‌স্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, (মস্কো, ১৯৮২), পৃঃ ৪১৫-১৬

১১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা*, (ঢাকা ১৯৮১, দ্বি-স), পৃঃ ১৯৪-৯৮

১২. *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পৃঃ ২৪

১৩. *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, পৃঃ ১৬-১৭

১৪. নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা*, (কলিকাতা, ১৯৫৭), পৃঃ ৬০

১৫. ঐ, পৃঃ ৬৪

১৬. ঐ, পৃঃ ১৩৩-৩৪

১৭. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৮৩), পৃঃ ৩৬

১৮. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান*, (ঢাকা, ১৯৭৪, তৃ-স), আবদুল মওদুদ অনূদিত, পৃঃ ১৫৩

১৯. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃঃ ২১

২০. *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান*, পৃঃ ১৫৪

২১. ঐ, পৃঃ ১৫৬-৫৭

২২. ঐ, পৃঃ ১৬১

২৩. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society*, (Delhi, 1980), P. 67

২৪. *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, পৃঃ ৩১

২৫. ঐ, পৃঃ ৩৬

২৬. *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান*, পৃঃ ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

২৭. ঐ, পৃঃ ১৬২–৬৩
২৮. ঐ, পৃঃ ১৬৪
২৯. ঐ, পৃঃ ১৬৫
৩০. *মুসলিম–মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ১০
৩১. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮–৩৯
৩২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ৩য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৮১, দ্বি–স), পৃঃ ৮৬
৩৩. *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* পৃঃ ৪৫২
৩৪. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক কাঠামো,* (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃঃ ৮৮
৩৫. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৭০), পৃঃ ১০৪
৩৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুপ্রকাশ রায়ের *ভারতে কৃষক–বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (১ম খণ্ড)।
৩৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত,* (কলিকাতা ১৩৭৯), পৃঃ ৬৬–৮৩
৩৮. বদরুদ্দীন উমর, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,* (কলিকাতা, ১৯৮৪), পৃঃ ৪৭
৩৯. জওহরলাল নেহরু, *বিশ্ব–ইতিহাস প্রসঙ্গ,* (বঙ্গানুবাদ ; কলিকাতা, ১৯৬৫, তৃ–স), পৃঃ ৩৮২
৪০. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪
৪১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা,* (ঢাকা, ১৯৮২), পৃঃ ৩৫৯
৪২. *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,* পৃঃ ৩৫
৪৩. ওয়কিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ২য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৮৩), পৃঃ ১৬২
৪৪. *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,* পৃঃ ৩৬
৪৫. ঐ, পৃঃ ৫৫
৪৬. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩
৪৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,* (ঢাকা, ১৩৮৩), পৃঃ ২০৬
৪৮. নওয়াব আবদুল লতীফ, *মুসলিম বাঙ্গলা ঃ আমার যুগে,* (ঢাকা, ১৯৬৮), আবু জাফর শামসুদ্দীন অনূদিত, পৃঃ আঠারো (অনুবাদকের ভূমিকা)
৪৯. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal,* (Dacca, 1974), P. 172
৫০. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮–৫৯
৫১. ঐ, পৃঃ ১৬৪
৫২. *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,* পৃঃ ৪৪
৫৩. কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ,* (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃঃ ১২৮
৫৪. *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,* পৃঃ ৭০
৫৫. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান,* (ঢাকা, ১৯৮২), দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত, পৃঃ ১৮৬
৫৬. *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসহিত্য*, পৃঃ ১২
৫৮. ঐ, পৃঃ ১৩
৫৯. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৯-৩০
৬০. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃঃ ২৪
৬১. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭-১৮
৬২. ঐ, পৃঃ ১২০
৬৩. ঐ, পৃঃ ১২৩
৬৪. সুশীলকুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, (কলিকাতা, ১৩৮৩, দ্বি-স), পৃঃ ১৭৯
৬৫. *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, পৃঃ ১৮৮-৮৯
৬৬. ঐ, পৃঃ ১৯৫-৯৬
৬৭. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, (ঢাকা, ১৯৬৯), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, পৃঃ ১২
৬৮. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য*, পৃঃ ৩১
৬৯. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃঃ ৬৪-৬৫
৭০. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য*, পৃঃ ৩১
৭১. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃঃ ৪৫-৪৬
৭২. ঐ, পৃঃ ৪৭
৭৩. *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, পৃঃ ৩০৩-০৯
৭৪. *মুসলিম বাঙ্গলা ঃ আমার যুগে*, পৃঃ ১০-১১
৭৫. ঐ, পৃঃ ১৬
৭৬. ঐ, পৃঃ ১০৫
৭৭. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, (কলিকাতা, ১৯৭৪), পৃঃ ১৫৬
৭৮. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃঃ ৭৬
৭৯. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য*, পৃঃ ৮৯
৮০. ঐ, পৃঃ ৮৯-৯০
৮১. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪
৮২. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, (কলিকাতা, ১৯৮৫, দ্বি- স), পৃঃ ৪৫
৮৩. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য*, পৃঃ ১৬
৮৪. *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, পৃঃ১-৩
৮৫. ঐ, পৃঃ ৩-৪, ২৫
৮৬. ঐ, পৃঃ ৬, ২৩, ২৬-২৮
৮৭. *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পৃঃ ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব,* (কলিকাতা, ১৯৩৫), পৃঃ ১৮৪

৮৯. মুহম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইসলাম,* (ঢাকা, ১৯৪৮, পুনর্মুদ্রণ), পৃঃ ১৩৭-৪২

৯০. *বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব,* পৃঃ ১৮৬

৯১. ঐ, পৃঃ ১৪৪

৯৩. Muhammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities,* (Chittagong, 1965), PP, 3-4

৯৪. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, *উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে,* (মস্কো, ১৯৭১), পৃঃ ৩৯

৯৫. ঐ, পৃঃ ৪২

৯৬. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ৬৩

৯৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* (কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃঃ ৬৪

৯৮. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ তিন-চার

৯৯. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* (কলিকাতা, ১৩৮৪, দ্বি-স), পৃঃ ২৪

১০০. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়,* (কলিকাতা, ১৯৭৯, দ্বি-স), পৃঃ ৫৭

১০১. *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* পৃঃ ১৬৮-৬৯

১০২. এ-বিষয়ে মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী প্রণীত *মুসলমানের জাতিভেদ* (হুগলী, ১৩৩৪) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১০৩. *The Dynamics of Bangladesh Society,* P. 127

১০৪. Ibid, P. 128

১০৫. *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান,* পৃঃ ২৪

১০৬. *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* পৃঃ ১৭১

১০৭. ঐ, পৃঃ ১৭১

১০৮. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩

১০৯. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ১৯১

১১০. *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* পৃঃ ২৭

১১১. ঐ, পৃঃ ২৭

১১২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর,* (ঢাকা ১৯৭৫), পৃঃ ১০

১১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* (কলিকাতা, ১৯৫৭, দ্বি-নিউ এজ সংস্করণ), পৃঃ ৫৫

১১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নক্শা,* (ঢাকা, তারিখবিহীন, ঝিনুক পুস্তিকা), পৃঃ ৩৯-৪০

১১৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলাসাহিত্য,* (কলিকাতা, ১৯৫৯), পৃঃ ২৫

১১৬. মুরারি ঘোষ, *প্রাক-আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতি,* (কলিকাতা, ১৯৮৩), পৃঃ ৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পৃঃ ২২৬

১১৮. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস,* (ঢাকা, ১৯৭৪), পৃঃ ১৫৬

১১৯. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ১৬৩

১২০. আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা,* (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃঃ ২০০

১২১. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীর মশাররফ হোসেনের জীবন-কথা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীর মশাররফ হোসেনের জীবন-কথা

মীর মশাররফ হোসেনই সমাজ-প্রগতির মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙালী মুসলমানের ভাষাগত সংস্কার, দোভাষী পুঁথির রুচি, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসা প্রথম সার্থক সাহিত্যশিল্পী। মুক্ত মন, উদার শিল্পদৃষ্টি, সমাজ-মনস্কতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা তাঁর জীবন ও শিল্প-সাহিত্যচর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। মশাররফ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠ লেখক নন, বাঙলাসাহিত্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই তিনি একজন স্মরণীয় শিল্পস্রষ্টা। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল ও বর্ণাঢ্য। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বে যুগপৎ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ ও উন্মেষযুগের মধ্যশ্রেণীর আচরণ-রুচি-প্রবণতা-বিশ্বাস প্রতিফলিত।

পরিবেশ-পটভূমি

মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম এমন এক অঞ্চলে, যার স্থানিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুবিদিত। মশাররফের জন্মভূমি লাহিনীপাড়া কুমারখালী ও কুষ্টিয়ার মধ্যবর্তী একটি গ্রাম । মশাররফের বর্ণনায় তাঁর জন্মগ্রাম-প্রসঙ্গে জানা যায় ঃ

> লাহিনীপাড়ার উত্তরাংশ হইয়া পূর্ব্বদেশগামী রেললাইন গৌরীনদী পার হইয়া গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কুষ্টিয়া স্টেশন হইতে কালিগঙ্গা জংশন তাহার কিছুদূর পূর্ব্বেই ১১২ মাইল পোষ্টের দক্ষিণ যে গ্রাম ঐ গ্রামেই লাহিনীপাড়া। ১

লাহিনীপাড়াকে কেন্দ্রবিন্দু কল্পনা করে একটি বৃত্ত রচনা করলে দেখা যাবে, সন্নিহিত কুমারখালীতে জন্ম নিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্য-সাধক, নির্ভীক সাংবাদিক ও প্রজারদরদী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)। হরিনাথকে কেন্দ্র করে কুমারখালীতে গড়ে ওঠে এক 'কাঙাল-মণ্ডলী'। সাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩), ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) ছিলেন সেই 'কাঙাল-মণ্ডলী'র কীর্তিমান সদস্য। মরমিয়া সাধনার ক্ষেত্রভূমি কুমারখালী থানার অন্তর্গত ভাঁড়ারা ও লাহিনীপাড়া-সংলগ্ন ছেঁউড়িয়া গ্রাম বাউলশ্রেষ্ঠ লালন সাঁইয়ের (১৭৭৪-১৮৯০) যথাক্রমে জন্মস্থান ও সাধনক্ষেত্র। কুমারখালী-সংলগ্ন খোক্সার জানিপুরে জন্মেছিলেন সেকালের বিখ্যাত কীর্তনিয়া রবীন্দ্র-নন্দিত শিবনাথ সাহা (শিবু সাহা)। এর অদূরে

Dhaka University Institutional Repository

হিজলাবট গ্রামে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃপুরুষ শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের (১৮৫৭-১৯৩৮) জন্ম। শিলাইদহে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাউলকবি গগন হরকরা (১৮৪০?-১৯১০), গোঁসাই রামলাল (১৮৪৬-১৮৯৪) ও গোঁসাই গোপালের (১৮৬৯-১৯১২) মতো মরমী-ব্যক্তিত্ব। শিলাইদহে জমিদারী-সূত্রে এ-অঞ্চলের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রচিত হয়। মূলত দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও প্রযত্নে কুমারখালী-কুষ্টিয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসূত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) প্রমুখ ব্রাহ্মনেতার সঙ্গে এই অঞ্চলের একটি যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

ইংরেজ-পরিচালিত রেশমকুঠি ও ৫১টি নীলকুঠির হেড অফিস কুমারখালী এবং সংলগ্ন এলাকা ছিলো নীলচাষের একটি প্রধান অঞ্চল। মীরের স্মৃতি-শ্রুতিতে নীলচাষ-নীলকুঠিয়াল-নীলবিদ্রোহের কথা ও কাহিনী ছিলো উজ্জ্বল। লাহিনীপাড়া-সংলগ্ন গড়াই নদীর ওপরে রেলসেতু-নির্মাণের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে অস্থায়ী ফিরিঙ্গি-বসতি। এইভাবে ফিরিঙ্গি-সংস্কৃতির সঙ্গেও এই অঞ্চলের মানুষের একটি ক্ষীণ-পরিচয় সাধিত হয়। বর্ণিত কুষ্টিয়া-কুমারখালীর ঐতিহ্যগত সারস্বত-সাধনার এই কেন্দ্রীয় ভূমিতেই মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম অবিভক্ত নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী লাহিনীপাড়া গ্রামে।[২] তাঁর জন্মের সঠিক সাল-তারিখ নিয়ে সংশয় ও বিতর্ক আছে। মশাররফ নিজেই নানাসময়ে নিজের ভিন্ন ভিন্ন জন্ম-তারিখ উল্লেখ করে বিষয়টিকে রহস্যাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। 'আমার জীবনী'তে তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমার জন্ম সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্মপত্রিকায় লেখা আছে।"[৩] কিন্তু তিনি 'আমার জীবনী' বা অন্যত্র সেই জন্মপত্রিকার বিবরণ প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ 'আমার জীবনী'র বিভিন্ন স্থানে তাঁর বয়সের কথা যেভাবে উল্লেখ আছে তাতে তাঁর জন্মসাল কখনো হয় ১৮৪৩, আবার কখনো বা ১৮৪৫ । কিন্তু এই একই গ্রন্থে মাতা দৌলতন্নেসার বিবাহের তারিখ দিয়েছেন পৌষ ১২৫২ (১৮৪৫ খৃঃ]। এই তারিখ সঠিক হলে কোনক্রমেই তাঁর জন্ম ১৮৪৩ কিংবা ১৮৪৫ সালে হতে পারেনা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় (২৯ আশ্বিন ১৩১০) প্রকাশিত 'মশার্‌রফের পিতার জীবনী' থেকে মশাররফ হোসেনের জন্ম-তারিখ পেয়েছেন ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ (২৮ কার্তিক ১২৫৪)।[৪] মুহম্মদ আবদুল হাই[৫], কাজী আবদুল মান্নান [৬], মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল[৭], আলী আহমদ[৮]-সহ অধিকাংশ গবেষকই নির্বিচারে ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত তারিখ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে আবদুল আউয়াল মন্তব্য করেছেন যে, "সঠিক তারিখ সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই"।[৯] অপরপক্ষে আশরাফ সিদ্দিকী[১০], সৈয়দ মুর্তাজা আলী[১১] ও আনিসুজ্জমান[১২] কোনো সূত্র উল্লেখ ছাড়াই মশাররফের জন্মসাল ১৮৪৮ বলে বিবেচনা করেছেন। মশাররফ-জীবনীকার আবদুল লতিফ চৌধুরী প্রথমে মীরের জন্মসাল ১৮৪৮ বলে উল্লেখ করলেও[১৩] পরে ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত তারিখই গ্রহণ করেছেন।[১৪]

সম্প্রতি মশাররফের স্বলিখিত জীবনবৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর জন্মের সাল ও তারিখ উদ্ধার হয়েছে ঃ ১০ কার্তিক ১২৫৪ (২৬ অক্টোবর ১৮৪৭) রবিবার। কিন্তু এই তথ্য-সংগ্রাহক ও নিবন্ধকার পুরাতন পঞ্জিকা মিলিয়ে দেখেছেন ১০ কার্তিক রবিবার নয় মঙ্গলবার এবং এই সূত্রে মন্তব্য করেছেন, "মীর তারিখ বা বারের নামের একটায় ভুল করেছেন।"[১৫] ফলে এ-ক্ষেত্রে মশাররফের জন্মসাল ১৮৪৭ নির্ধারিত হলেও শেষপর্যন্ত তারিখ ও বার সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। উপরি-বর্ণিত মশাররফের জন্মের অভিন্ন সাল-তারিখ তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর নোটেও পাওয়া যায় ঃ "জন্মের তারিখ — ১২৫৪ সালের ১০ই কার্ত্তিক রবিবার অতি প্রত্যুষে।"[১৬]

পাশাপাশি মীরের ভিন্ন একটি জন্ম-তারিখ পাওয়া যায় তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর অপর এক খস্ড়ায়। এই পাণ্ডুলিপির একস্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন, "... অদ্য ১৩০৪ সালের ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার। ইংরেজী ১৮৯৮ ১লা মার্চ। ১২৫৪ সাল ১৭ই কার্ত্তিক আমার জন্ম—তাহা হইলে আজ আমার বয়স ৫০ বৎসর ৪ মাস ১ দিন।"[১৭] মশাররফের এই বাঙলা জন্ম-তারিখ মোতাবেক খৃস্টিয় তারিখ নির্ণীত হয় ২ নভেম্বর ১৮৪৭।

মশাররফ হোসেনের জনক-জননীর নাম মীর মোয়াজ্জম হোসেন ও দৌলতন্নেসা। এঁদের চার পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে মশাররফ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

মশাররফের আত্মজীবনী থেকে তাঁর বংশ-পরিচয় জানতে পারা যায়। বিত্ত, বিদ্যা ও কৌলীন্যের দুর্লভ সমন্বয়ে গৌরবমণ্ডিত এই পরিবার। 'সৈয়দ' এঁদের কৌলিক পদবী, আর রাজপ্রদত্ত উপাধি 'মীর'। মশাররফের এক পূর্বপুরুষ সৈয়দ সাদুল্লা ছিলেন 'মহা মাননীয় তাপসপ্রবর'। মীর জানাচ্ছেন, তিনি প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে সুদূর বাগদাদ নগরী থেকে ভারতবর্ষে আসেন এবং তারপর ফরিদপুর জেলার সেকাড়া গ্রামে চন্দনানদীর তীরে গুরু-পুত্র শাহ্ পাহলওয়ানের গৃহে বাস করতে শুরু করেন। পরে তাঁরই একমাত্র কন্যার সঙ্গে সাদুল্লার বিবাহ হয়। সাদুল্লা ছিলেন সিদ্ধ সাধক। সেকাড়া গ্রামেই তাঁর মৃত্যু হয়। সাদুল্লার চার পুত্র, কিন্তু তাঁদের নাম জানা যায়না।তবে মীর কুতবুল্লা নামে তাঁর এক পৌত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কুতবুল্লার দুই পুত্রের নাম মীর ওমর দারাজ ও মীর আলী আকবর। মীর মশাররফ হোসেন এই মীর ওমর দারাজেরই অধঃস্তন পুরুষ এবং পদনদীর নবাব মীর মহম্মদ আলীর পূর্বপুরুষ মীর আলী আকবর।

Dhaka University Institutional Repository

মীর মশাররফ হোসেনের বংশতালিকা ১৮

- সৈয়দ সাদুল্লা
  - চার পুত্র (নাম অজ্ঞাত)
    - মীর কুতবুল্লা
      - মীর ওমর দারাজ
        - মীর এবরাহিম হোসেন
          - জোলফেকার আলী
          - হাফিজা খাতুন
          - নাসিমা খাতুন
          - মোয়াজ্জম হোসেন
            - আজগার আলী
            - মশাররফ হোসেন
              - মফাজ্জল হোসেন [১মা পত্নীর গর্ভজাত]
              - মহামদ হোসেন [১মা পত্নীর গর্ভজাত]
              - কন্যা [১মা পত্নীর গর্ভজাত]
              - রওশন আরা
              - কন্যা [অকালমৃত]
              - এবরাহিম হোসেন
              - আমিনা খাতুন
              - সালেহা খাতুন
              - সালেমা খাতুন
              - আশরাফ হোসেন
              - ওমর দারাজ
              - মাহবুব হোসেন
              - রাহেলা খাতুন
              - মোস্তাক হোসেন
            - শামসুন্নেসা
            - মোহতেশাম হোসেন
            - কন্যা [স্বল্পায়ু]
            - মোকাররহম হোসেন
            - বজলাল হোসেন
          - মহেব আলী [২য়া পত্নীর গর্ভজাত]
          - কন্যা [২য়া পত্নীর গর্ভজাত]
      - মীর আলী আকবর [পদনদীর নবাব মীর মহম্মদ আলীর প্রপিতামহ]

Dhaka University Institutional Repository

মীর ওমর দারাজের পুত্র মীর এবরাহিম হোসেন মশাররফের পিতামহ। তাঁর জীবন নাটকীয় ও ঘটনাবহুল। মশাররফ এইসব ঘটনা গুরুত্বসহকারে বিবৃত করেছেন। বলেছেন তিনি ঃ

> ..... আমার জীবনীর গৌরব ও মানমর্যাদার মূল কারণই মীর এবরাহিম হোসেনের আশ্চর্য্য ঘটনা।[১৯]

এবরাহিম হোসেন বলিষ্ঠ চেহারার সুপুরুষ ছিলেন। যৌবনে ইয়ার-বক্সি নিয়ে খোশ্-মেজাজে সময় কাটানো ও শিকার করে বেড়ানোই ছিলো তাঁর প্রধান নেশা। বিদ্যাচর্চার প্রতি কোনো মনোযোগ তাঁর ছিলোনা। এবরাহিমের এই আচরণ বংশ-মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় পিতা ওমর দারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে লজ্জিত ও অভিমানী এবরাহিম গৃহত্যাগ করেন। মশাররফের বর্ণনায় জানা যায়, "সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশ কেবল নূতন শাসনে আনিয়াছেন।"[২০] এবরাহিম বিদ্যাশিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ যাওয়া স্থির করেন। পথিমধ্যে সাঁওতা গ্রামে মহিলা জমিদার আনার খাতুনের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং গৃহকর্ত্রীর আগ্রহে জমিদারবাড়ীতেই গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রায় আট বছরকাল এখানে তিনি অবস্থান করে সেবা-সততা দিয়ে আনার খাতুনের প্রিয়ভাজনরূপে গণ্য হন। মৃত্যুকালে আনার খাতুন তাঁর সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবরাহিম হোসেনকে দান করে যান। জমিদার-কর্ত্রীর জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে এই সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়, পরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তা উদ্ধার হয়। এরপর এবরাহিম দীর্ঘকালের ব্যবধানে পদমদীতে ফিরে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হন।

পিতামাতার উদ্যোগে এবরাহিম হোসেনের বিবাহ হয়। এই পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় পুত্র মোয়াজ্জম হোসেনই মশাররফ হোসেনের পিতা। এবরাহিম হোসেন সাঁওতা গ্রামে নতুন বাড়ীঘর নির্মাণ করে সেখানে স্থায়িবাসের ব্যবস্থা করেন। তবে পৈতৃক নিবাস পদমদীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিলো। বয়সকালে জমিদারী ও সাংসারিক দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র জোলফেকার আলীর হাতে দিয়ে তিনি ধর্মচিন্তায় নিমগ্ন হন। কিছুকাল পরে এবরাহিম হোসেনের পত্নীবিয়োগ হয়। এরপর বৃদ্ধ বয়সে তিনি পদমদীর নিকটবর্তী দক্ষিণবাড়ী গ্রামের ২০/২১ বছরের এক সুন্দরী বিধবা যুবতীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু অনুদার-স্বার্থপর এই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'র আচার-আচরণে সংসারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এবরাহিম হোসেন তখন দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী-পুত্র-কন্যাদের লাহিনীপাড়ায় স্বতন্ত্র বাসভবন তৈরী করে তাঁদের পৃথক করে দেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি সহায়-সম্পত্তি পুত্র-কন্যাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করেন। শৈশবে মাতৃহীন কনিষ্ঠ পুত্র মোয়াজ্জম হোসেনের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাত থাকায় সম্পদ-বন্টনে তাঁকে অধিক আনুকূল্য করেন। ফলে পদমদীর 'তালুক জমাজমি বাগান পুষ্করিণী

Dhaka University Institutional Repository

সমুদয়' এবং তরফ সাঁওতার সম্পত্তির অর্ধাংশ মোয়াজ্জম হোসেন প্রাপ্ত হন। এবরাহিম হোসেন পরিণত বয়সে ১২৩৩ সালের চৈত্রমাসে পবিত্র রমজানের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মীর জোলফেকার আলী দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিলোনা, দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা শুকরণনেসাকে রেখে জোলফেকার আলী পরলোকগমন করেন। এই নাবালিকা কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব বর্তায় পিতৃব্য মোয়াজ্জম হোসেনের উপর। তিনি ফরিদপুর জেলার গট্টি গ্রামের সাহ্ গোলামাজমের সঙ্গে শুকরণনেসার বিবাহ দিয়ে তাঁকে ঘরজামাই রাখেন। কিন্তু এর ফলাফল শুভ হয়নি। জানা যায় ঃ

> জামাতা সাহ গোলামাজমের কৌশলে নিমকহারামীর আচরণে চোরের চরিত্রে বদমাইস ডাকাতের ব্যবহারে, চক্ষুলজ্জাহীন দয়া-মমতাহীন পাথরের কলিজার ঘৃণিত টঙ্কারে, মীর মোয়াজ্জম হোসেন পৈতৃক বাটী হইতে, বিষয়সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ হইলেন।[২১]

এ-বিষয়ে মশাররফের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মীর মোয়াজ্জম হোসেনের প্রথম বিবাহ হয় হামিদন্নেসার সঙ্গে। একমাত্র সন্তান পুত্র আজগর আলীকে ছোটো রেখেই হামিদন্নেসা পরলোকগমন করেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে আজগর আলীরও মৃত্যু হয়। এরপর মোয়াজ্জম হোসেন লাহিনীপাড়ার মুন্শী জেনাতুল্লার একমাত্র কন্যা দৌলতন্নেসাকে ১২৫২ সালের পৌষ মাসে বিবাহ করেন এবং শ্বশুরালয়েই বসবাস করতে থাকেন। জেনাতুল্লা ছিলেন রংপুর জেলার 'হর্তা-কর্তা বাহাদুরে'র (ম্যাজিস্ট্রেট) 'মীর-মুনশী'। এই চাকুরী-সূত্রে তিনি 'বিস্তর উপার্জন' করতেন।

মশাররফের সূত্রে তাঁর জনক-জননী মোয়াজ্জম-দৌলতন্নেসার অন্তরঙ্গ পরিচয় জানতে পারা যায়। পিতাকে "মোসলমান সমাজের সমুজ্জ্বল রত্ন" হিসেবে উল্লেখ করে মশাররফ তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

> মীর সাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী।[২২]

তিনি ছিলেন ইংরেজভক্ত, নীলকরের বন্ধু। মজলিশি মেজাজের মানুষ মোয়াজ্জমের গীত-বাদ্যের প্রতি অনুরাগ ও অধিকার ছিলো। তবে তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিলো শিথিল।

দৌলতন্নেসা শান্ত স্বভাবের সহনশীল রমণী। মশাররফের বর্ণনায় ঃ

> মাননীয়া দৌলতন্নেসা, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট নিখুঁত।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

এবং,

... দৌলতন্নেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী।[২৪]

অবশ্য দৌলতন্নেসার দাম্পত্যজীবন পূর্বাপর সুখের ছিলোনা। স্বামীর পরনারীতে আসক্তির জন্য তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন এবং অন্তিমকালেও অনুতপ্ত স্বামীকে মার্জনা করেননি। দৌলতন্নেসার মৃত্যুকালে মশাররফের বয়স ছিলো ১৪ বছর কয়েক মাস। মাতার মৃত্যুর পর মাতামহী ফাখেরা খাতুনের স্নেহ-যত্নে মশাররফ-ভ্রাতারা প্রতিপালিত হন। কনিষ্ঠ বজলাল হোসেনকে লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফুফু। [আত্মজীবনীর অপ্রকাশিত খস্ড়া ঃ ১নং খাতা]। মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর খস্ড়ার নোট থেকে জানা যায়, পত্নীবিয়োগের পর মোয়াজ্জম হোসেন প্রায় ছয় বছর জীবিত ছিলেন। ১২৭৩ সালের ৯ চৈত্র শুক্রবার বেলা দুটোর সময় পদমদীর বাড়ীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মোয়াজ্জম-দৌলতন্নেসা-দম্পত্তির ছয় সন্তান, যথাক্রমে ঃ মশাররফ, শামসুন্নেসা, মোহতেশাম, স্বল্পায়ু এক কন্যা, মোকাররম ও বজলাল হোসেন।

পিতৃ ও মাতৃকুলে মশাররফই প্রথম পুত্রসন্তান। তাই তাঁর জন্মে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন। জানাচ্ছেন তিনি ঃ

মাতামহ জেনাতুল্লা আমাকে দেখেন নাই। আমার জন্মসময়ে তিনি চাকুরীস্থলে রঙ্গপুরে ছিলেন। আমার জন্মসংবাদ লইয়া যে নরসুন্দর ও সংবাদবাহক তাঁহার নিকট গিয়াছিল, তাহাদিগকে থালা ঘটিবাটি কলসী কাপড় বনাত নগদ টাকা বিস্তর দিয়াছিলেন। অন্য অন্য আমলা মুহুরী দারগা জমাদার প্রভৃতির নিকটেও তাহারা অনেক টাকা পাইয়াছিল।[২৫]

মশাররফের জবানীতে জানা যায়, "মাতামহী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন", "পিতাও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন" এবং জননী "এতই ভালবাসিতেন এতই স্নেহ করিতেন যে তাহা মুখে প্রকাশ অসাধ্য"।[২৬] তাই মশাররফ অত্যন্ত আদরযত্নে লালিত-পালিত হন। ছেলেবেলায় তিনি খুবই দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। নিজেই স্মরণ করেছেন ঃ

বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার বদ্‌মেজাজী, হটকারিতা এবং দুষ্টুমি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোদে রোদে দৌড়াদৌড়ি সারাটি দিন খেলা করা ইহাই আমার ভাল লাগিত।[২৭]

মশাররফের ছয় ভাইবোনের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অকালমৃত্যু হয়। ১৮৫০ সালে ভগ্নি শামসুন্নেসার জন্ম। ১৮৫৩ সালে মোহতেশাম ও এক ভগ্নি যমজ জন্মগ্রহণ করে। ভগ্নিটি জন্মের পর মাত্র কয়েক ঘন্টা জীবিত ছিলো। এর কয়েকবছর পর মোকাররম হোসেনের জন্ম। বজলাল হোসেন সর্বকনিষ্ঠ।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র নয় বছর বয়সে ভগ্নি শামসুন্নেসার মৃত্যু হয়। মশাররফের আত্মজীবনীর অপ্রকাশিত নোট থেকে জানা যায়, কনিষ্ঠ সহোদর বজলাল হোসেন ওরফে বিশু মিয়া প্লীহা জ্বরে ১১ বছর বয়সে ১২৭৮ সালের ২৮ পৌষ বৃহস্পতিবার রাত বারোটার সময় ইহলোক ত্যাগ করে। মোকাররম হোসেন অপেক্ষকৃত দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন।

মশাররফ হোসেনের সহোদরদের মধ্যে মোহতেশাম হোসেন ছিলেন বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি যথেষ্ট আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। মোহতেশাম বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পাশ করেন এবং ব্যবহারাজীবী হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমকালীন সভা-সমিতির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিলো। তাঁর কিছু রচনা মশাররফ-পরিচালিত 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি পদমদী নবাব এস্টেটের অন্যতম মোতওয়াল্লী ছিলেন। তিনি টিপু সুলতানের বংশে বিবাহ করেন। মশাররফ হোসেনের সূত্রে জানা যায়, ১২৮৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্রবার রাতে প্রিন্স বসীরদ্দীন সাহেবের দৌহিত্রী ও প্রিন্স ছাবদার সেকো সাহেবের কন্যার সঙ্গে চুঁচুড়ার বাড়ীতে মোহতেশাম হোসেনের বিবাহ হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে পদমদীর নবাব মীর মহম্মদ আলী, সৈয়দ ওলিউল্লাহ, হাইকোর্টের প্লীডার মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, মশাররফ হোসেন ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মফাজ্জল হোসেনসহ অনেক গণ্যমান্য সুধী উপস্থিত ছিলেন।[২৮] এরপর ১৩০৪ সালের ৫ অগ্রহায়ণ শুক্রবার কলিকাতার টালিগঞ্জের শাহ নূরুদ্দীন সাহেবের কন্যার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এই বিবাহসভাতেও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সঙ্গে মশাররফ হোসেনও উপস্থিত ছিলেন।[২৯] মোহতেশামের সঙ্গে মশাররফের আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক আমৃত্যু অক্ষুণ্ন ছিলো। মশাররফকে লিখিত মোহতেশামের পত্রে শ্রদ্ধা-ভক্তি-নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়। মশাররফও তাঁর এই স্নেহভাজন অনুজের জন্য বিশেষ গৌরববোধ করতেন।

শিক্ষাজীবন

মশাররফ হোসেনের অসমাপ্ত শিক্ষাজীবনে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় সাফল্য বা কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যানিষ্ঠ অভিভাবকত্বের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের প্রতি অনীহা, বিলাস-ব্যসন-আমোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্তি, নৈতিক চরিত্রের স্খলন ও মহৎ জীবনাদর্শের অনুপস্থিতি তাঁর বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায় হয়েছিল।

সেকালের নিয়ামানুসারে শৈশবেই অর্থাৎ চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে মশাররফের বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হয়। তাঁর পিতার উপস্থিতিতে লাহিনীপাড়ার পার্শ্ববর্তী পাহাড়পুর গ্রামনিবাসী মুন্‌শী জমিরুদ্দীন 'তাক্তি' বা হাতেখড়ি দেন। মুন্‌শী জমিরুদ্দীন ছিলেন জবরদস্ত মৌলবী। মশাররফের পিতার

Dhaka University Institutional Repository

হাতেখড়িও তিনিই দিয়েছিলেন। 'তাক্তি'র পর মশাররফের বাল্যশিক্ষা কিভাবে অগ্রসর হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

> আমার শিক্ষার জন্য মুন্সী হেরাছতুল্লা নামে একজন মুন্সী মাসিক দুইটাকা বেতনে আলিফ বে পড়াইতে নিযুক্ত হইলেন। গ্রামের দুর্গাচরণ রায়ের হাতের অক্ষর খুব ভাল ছিল। তাঁহারই অক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা অক্ষর ভাল করিয়া লেখা আরম্ভ করিলাম। বেশীদিন মাটি আঁচড়াইতে হয় নাই। লাহিনীপাড়ার উত্তরেই জয়নাবাদ গ্রাম। ঐ গ্রামে জগমোহন নন্দীর এক পাঠশালা ছিল । ... পিতার অনুরোধে নন্দী মহাশয় আমাদের বাটীতে ঐ পাঠশালা উঠাইয়া আনিলেন। আমি নন্দী মহাশয়ের বাঙ্গালা অক্ষর লেখা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আরবির বর্ণমালা শিক্ষার অগ্রে বাঙ্গালার বর্ণমালা মুখস্থ হইল। তালপাতে অক্ষরও লিখিতে লাগিলাম।[৩০]

মক্তব-পাঠশালা ও গৃহশিক্ষকের কাছে মশাররফ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাঙলা ও ফারসীশিক্ষাও রপ্ত করেন। অল্পদিনেই বাঙলা চিঠিপত্র রচনায় তিনি বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন। বিদ্যাচর্চায় সাফল্যের জন্য সরস্বতী-বন্দনা, অর্থ না বুঝে কোরআন শরীফ-পন্দেনামা বা গোলেস্তাঁর পাঠ মুখস্থ করা, মৌলবী-মুন্শীর বাঙলা-শিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব —মশাররফের আত্মকথায় তাঁর বিদ্যাচর্চার অন্তরঙ্গ বর্ণনার পাশাপাশি সেকালের গ্রামীণ শিক্ষা-ব্যবস্থার এইসব নিপুণ চিত্রও ফুটে উঠেছে।

মশাররফের কৈশোরে বিলাতে উচ্চশিক্ষার একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরী হয় পিতৃবন্ধু নীলকর টি. আই. কেনীর প্রস্তাবে। কিন্তু স্নেহান্ধ মাতামহী অনুমোদন না করায় মশাররফ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। মশাররফ উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারলে তাঁর জীবনেতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো।

পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ে মোয়াজ্জম হোসেন পূর্বাপর সমান মনোযোগী থাকতে পারেননি। পত্নী-বিয়োগে মোয়াজ্জম হোসেনের মধ্যে একধরনের সংসার-বৈরাগ্য দেখা দেয়। ফলে উদাসীন-উদ্‌ভ্রান্ত মোয়াজ্জমের কর্তব্যচেতনাও অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। মশাররফ মন্তব্য করেছেন ঃ

> আমার মাতৃবিয়োগের পর আমার বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে পিতৃদেবের যেন তত আগ্রহ ছিলনা।[৩১]

গ্রামে বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর যৌবনের প্রারম্ভে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু তাতে সমস্যাও কম ছিলোনা। সবিস্তারে মশাররফ জানিয়েছেন ঃ

> বিদ্যাশিক্ষা এইখানেই যেন ইতি বোধ হইতেছে। কারণ দূর দেশে না গেলে আর দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই। ..... বিদেশে পাঠাইতে তাঁহার [পিতা] কোন আপত্তি নাই । রাজসাহী ঢাকা নিতান্তপক্ষে পাবনায় রাখিয়া ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষা দেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

Dhaka University Institutional Repository

> কাহারো বাসায় রাখিয়া অন্যের গলগ্রহ করিয়া দিতেও পারেননা। রীতিমত বাসা করিয়া চাকর সঙ্গে দিয়া রাখিতেও সাহসে কুলায়না। একা একা বাসায় রাখিতেও ইচ্ছা করেননা। একজন অভিভাবক সঙ্গে রাখাই তাঁহার ইচ্ছা। এই সকল চিন্তাতেই প্রায় বৎসরকাল কাটিয়া গেল।[৩২]

১৮৬৩ সালে কুষ্টিয়া মহকুমা গঠিত হয়। তার কিছু আগেই ১৮৬১ সালে কুষ্টিয়ায় একটি ইংরেজী হাইস্কুল স্থাপিত হয়। মশাররফের পিতা তাঁকে ও অনুজ মোহতেশাম হোসেনকে কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি করতে মনস্থির করেন। মশাররফ-পিতার ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যে অনীহা ও বিদ্বেষ ছিলো তা ইংরেজীনবিশ আত্মীয়স্বজনের সংস্পর্শে এসে অনেকাংশে দূর হয় এবং পুত্রদের ইংরেজীশিক্ষার জন্য 'মনে মনে বড়ই ব্যস্ত', হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁদের কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই পর্যায়ের লেখাপড়া সম্পর্কে মীর বলেছেন ঃ

> আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, ইংরেজী আর বাঙ্গলা পড়িতে হয়। ..... আমি ইংরেজী এ বি সি পড়ি—বাঙ্গলা ছোট একখানি কেতাব প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা। বাঙ্গলা শিশুশিক্ষা চটি বহি, — দুইতিন দিন পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, আমি এ পুস্তকের সকলি পড়িয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় পরীক্ষা করিলেন। পড়ায় আটকিল না। বানান করায় ভুল হইল।[৩৩]

এরপর পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শে 'বোধোদয়' ধরেন। কিন্তু নানা কারণে কুষ্টিয়া স্কুলে পড়াশুনার খুব একটা অগ্রগতি হলোনা। তবে কিছু নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে-পরিচিত হন। প্রহার-শাসনের ভয়াবহতা, শিক্ষাদান-প্রণালীর ক্রটি, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপস্থিতি মীরের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এরই মাঝে চঞ্চল প্রকৃতির কৌতূহলী মশাররফ স্কুল-পালিয়ে সরাসরি কলিকাতায় চলে যান। এই সফরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তিনি।

এইসময়ে পদমদীতে নবাব সাহেবের উদ্যোগে একটি ইংরেজী-বাঙলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতার নির্দেশে কুষ্টিয়া স্কুল ত্যাগ করে এই স্কুলে ভর্তি হতে হয় মশাররফকে। কুষ্টিয়া স্কুল-ত্যাগের বিষয়টি মশাররফকে খুবই হতাশ ও ক্ষুণ্ন করে। আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন ঃ

> আমার মাথা খাওয়া হইল। শিক্ষার শেষ ইতি এইখানেই হইল। বোধোদয়ের শেষপর্য্যন্তই বোধহয়, শিক্ষায় বোধ জন্মিয়া বিদ্যার ইতি হইল। কুষ্টিয়ায় নূতন মহকুমা বসিয়াছে, দিন দিন উন্নতি হইতেছে। ..... দিন দিন স্কুলের উন্নতি, স্থানের উন্নতি হইবে, এই স্থান ছাড়িয়া জঙ্গলময় গণ্ডগ্রামে যাইতে হইল।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ পদ্মদীর নবাব স্কুলে 'প্রথম শ্রেণী'তে ভর্তি হন। তাঁর ভাষায়,, "দুই বৎসর ... পদমদীর স্কুলে ছাত্র সাজিয়াছিলাম"।[৩৫] এখানে বিদ্যাচর্চার পরিবর্তে স্খলিত চরিত্র স্কুল-শিক্ষক আর প্রমোদ-মত্ত অভিভাবক নবাব সাহেবের আচার-আচরণ-প্রশ্রয়ে চরিত্রদোষের হাতেখড়ি হয়। আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে সঙ্গত কারণেই লেখাপড়া শিকেয় ওঠে। মশাররফ অকপটে স্বীকার করেছেন ঃ

> অভ্যাসদোষে, সঙ্গদোষে এরূপ হইল যে, আর পড়িতে ইচ্ছা হয়না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাসিরহস্য -তাস খেলিতেই ইচ্ছা করে। একটি বৎসর এইভাবে খেলা আমোদ-প্রমোদে ভালবাসায় কাটিয়া গেল। ..... শেষে মত্ততায় বেশী বাড়াবাড়ি হইলেই হাটে হাড়ি ভাঙে।বাধ্য হইয়া পদমদী পরিত্যাগ করিতে হইল।[৩৬]

এরপর মশাররফ পিতার নির্দেশে কৃষ্ণনগরে গিয়ে কলেজিয়েট স্কুলে 'পঞ্চম শ্রেণী'তে ভর্তি হন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল সেকালের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৩৭] কলেজিয়েট স্কুলে বাঙলা অপেক্ষা ইংরেজীশিক্ষার গুরুত্বই ছিলো বেশী।

এই কৃষ্ণনগরে পাঠকালে মশাররফের জীবনে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তি মশাররফের মৃত্যুসংবাদ রটনা করে। এ-প্রসঙ্গে ঘটনার বিবরণ দিয়ে 'শ্রী ন. ম. হ.' নামে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্র 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় এক পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র থেকে জানা যায় ঃ

> কুষ্টিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত মির মোসারফ হোসেন, শ্রীযুক্ত মুনসি মহাম্মদ আওসাফ (কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের নাজির) সাহেবের স্বীয়াবাসে অবস্থিতি করিয়া, কৃষ্ণনগর কালেজে, বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। ... মহাশয়! শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কোন এক ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক পাষাণহৃদয়, নাজির সাহেবের স্বনাম স্বাক্ষরিত একখানি কৃত্রিম পত্র উপরুক্ত মির সাহেবের বাটীতে ডাকযোগে লিখে যে "মির মোসারফ হোসেনের গত বুধবারে ভেদ বমি হইয়া বৃহস্পতিবারে বেলা দেঢ় প্রহরের সময় বাহোসের সাত মৃত্যু হইয়াছে ....। ... মির সাহেবের বাটীতে ঐ কৃত্রিম পত্র তাঁহার পরিবারগণ প্রাপ্তান্তে জ্ঞাত হইয়া হাহাকার ধ্বনি করত মূর্চ্ছিত হইয়া, মৃত্তিকোপরি পতিত হইলেন। ..... অনন্তর মৃত মির সাহেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (কাফনদাফন) কিভাবে কোথায় হইয়াছে এতদ্বিবরণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নিমিত্ত তাঁহার খুড়া উক্ত কৃত্রিম পত্রসহ .... কৃষ্ণনগরে উল্লেখিত নাজির সাহেবের বাসস্থলীতে হাহাকার রবে রোদনকরত, বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে করিতে উপস্থিত, মহাশয়! মৃত ব্যক্তি পরম কারুণিক

Dhaka University Institutional Repository

> পরমেশ্বরেচ্ছায় শারীরিক সুস্থ থাকিয়া পরম সুখে পাঠাভ্যাস করিতেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার খুড়ার এতাদৃশাবস্থা দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ... যে ব্যক্তি এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছে আমরা তাহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করিতেছি যে মির সাহেবের প্রতি কাহার কিরূপ স্নেহ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল...।[৩৮]

কৃষ্ণনগর মশাররফের বিদ্যাশিক্ষার জন্য না হলেও অন্য কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। কৃষ্ণনগরের ভাষা ও কৃষ্ণনাগরিকদের বেশ-ভূষা-আচার-আচরণ মশাররফকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। ফলে এখানেও তাঁর লেখাপড়া ব্যাহত হয় ফ্যাশন-দুরস্ত হওয়ায় আর রমণী-সংসর্গজাত পূর্ব-স্মৃতির তাড়নায়। 'নীরস শিক্ষা' তাঁকে নিষ্ঠ বিদ্যার্থী করতে পারেনি, তিনি স্বীকার করেছেন ঃ

> মন আমোদ চায়, মন মধুমাখা কথা চায়, প্রেমের নিমন্ত্রণ চায়, খোসগল্পের মজলিস চায়, খেলা-ধূলার আড্ডা চায়। আর চায়—মন মজান মনের মত ভালবাসা , আর রূপসী ললনার চাঁদমুখখানি সদা দেখিতে।[৩৯]

উক্ত মনোবাসনা নিয়ে মশাররফ একবার কৃষ্ণনগর থেকে কলিকাতায় যান। এই কলিকাতা-সফর তাঁর জীবনপর্বের পালাবদল ঘটিয়েছিল।

কলিকাতায় আকস্মিকভাবে তাঁর পিতৃবন্ধু পাবনা ফৌজদারী আদালতের প্রাক্তন নাজির মুন্শী নাদের হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তিনি মশাররফকে কলিকাতায় তাঁর বাসায় থেকে কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করার প্রস্তাব দেন। অবশেষে নাদের হোসেনের উৎসাহে ও পিতা মোয়াজ্জম হোসেনের সম্মতিক্রমে কৃষ্ণনগরের পাঠ চুকিয়ে কিছুদিন পর মশাররফ পুনরায় কলিকাতায় যান। কিন্তু শেষপর্যন্ত নাদের হোসেন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। তাঁর অভিসন্ধি ছিলো মশাররফের সঙ্গে কন্যার বিবাহ-দান। মহানগরী কলিকাতায় মশাররফের বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা এইভাবে অসফল হয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ প্রয়াসের এখানেই সমাপ্তি।

আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা, পারিবারিক উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও মশাররফের শিক্ষাজীবন ফলপ্রসূ হতে পারেনি। মশাররফ এই অসাফল্যের দায় অস্বীকার করেননি। উত্তরকালে ছাত্রজীবনের অবিমৃষ্যকারিতার কথা স্মরণ করে অনুশোচনাদগ্ধ মীর আফসোস্ করে বলেছেন ঃ

> আজ চক্ষে জল আসিতেছে, আজ মহা-দুঃখে অন্তর ফাটিতেছে, সময়ের মূল্য বুঝি নাই। অনর্থক কাজে দিন গত করিয়াছি, রাত্রি কাবার করিয়াছি। এখন আক্ষেপ করিলে হইবে কি ?[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ ও সংসারজীবন

মশাররফ হোসেনের বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ। তাঁর দাম্পত্যজীবন বরাবর একতালে চলেনি। অচরিতার্থ প্রণয়, বিবাহ-বিভ্রাট, বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন ও পরিশেষে মধুময় সংসারজীবনের সন্ধান — এই হলো তাঁর বিবাহ ও সংসারপর্বের ক্রমিক ছক।

নাজির নাদের হোসেনের গোপন উদ্দেশ্যের ফাঁদে পা দিয়ে মশাররফের শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। নাদের হোসেন গোপনে তাঁর কন্যার সঙ্গে মশাররফের বিবাহের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। নাদের হোসেনের তিনকন্যার মধ্যে প্রথমা লতিফন্নেসা ও দ্বিতীয়া আজীজন্নেসা ছিলেন বিবাহযোগ্যা। লতিফন্ ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা। মশাররফের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। কলিকাতায় কেউ বিবাহ-সম্বন্ধ ভেঙে দিতে পারে এই আশঙ্কায় মশাররফকে নাদের হোসেনের গ্রামের বাড়ী যশোরের মক্তারপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে লতিফনের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে নিয়মিত প্রণয়গাঢ় পত্র-বিনিময়ও হতে থাকে। এক পত্রে লতিফন লেখেন ঃ

> ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি — আমি তোমার, তুমি আমার। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী ....। .... জীবনেও তুমিই আমার স্বামী, জীবন অন্তেও তুমিই আমার স্বামী।[৪১]

১৮৬৫ সালের ১৯ মে (৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২) শুক্রবার একইদিনে লতিফন ও আজীজনের বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। মশাররফের সঙ্গে লতিফনের এবং পার্শ্ববর্তী পানিসারা গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার মীর হোসেন আলীর সঙ্গে আজীজনের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহ-বাসরে প্রতারণাপূর্বক কন্যা-বদল করে বুদ্ধিহীনা, কুরূপা, ঈর্ষাকাতর, অশিক্ষিতা, সাংসারিক কর্মে অপটু, 'বেআক্কেল পশুর সমান' আজীজনের সঙ্গে মশাররফের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই অপ্রত্যাশিত প্রবঞ্চনামূলক ঘটনার আকস্মিকতায় মশাররফ বিবাহবাসরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শুরু হয় মশাররফের দাম্পত্য-জীবনের এক বিড়ম্বিত অধ্যায়।

লতিফন-মশাররফের গভীর প্রণয় এই 'কনে-বদলে'র বিবাহে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ঘটনা মশাররফকে সর্বস্বহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। অপরদিকে বিফল বাসনা বুকে নিয়ে লতিফন অকস্মাৎ পীড়িত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। লতিফন এই বিবাহ স্বীকার করেননি, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও মশাররফকেই 'স্বামী' বলে সম্বোধন ও কবুল করে যান। মশাররফের মনেও লতিফনের স্মৃতি চির-জাগরূক ছিলো। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী কুলসুমের সঙ্গে লতিফনের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিলো। জানা যায়, "তিনি প্রায়ই কুলসুমকে লতিফুন বলিয়া ডাকিতেন।"[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

আজীজননেসার সঙ্গে মশাররফের বিবাহ ছিলো একটি পরিকল্পিত দুর্ঘটনা। পত্নীদর্শনের প্রথম মুহূর্তে মশাররফের মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তাতে তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

> আমি নজর করিতেই আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আরসীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিলামনা। চক্ষু নিচে করিয়া মাথা হেঁট করিলাম। আমার কলিজার কাঁপনী তখনও যায় নাই। চক্ষে পড়িল, চক্ষে ছায়া পড়িল গৌরবর্ণ কিন্তু মুখের গঠন ওষ্ঠ অধর চিবুক নিতান্তই কদাকার। নাসিকা একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। ভ্রূর রেখা আছে মাত্র একনজরে দেখিয়া আর দেখিতে ইচ্ছা হইলনা। ... কেবল ঈশ্বরের নিকট হৃদয় হইতে কান্দিয়া কহিলাম, দয়াময়! আমার কপালে ইহাই ছিল।[৪৩]

পত্নীর প্রতি তাঁর বিকর্ষণ ও বিরূপতা কখনো লুপ্ত হয়নি। বলাবাহুল্য, তাঁদের দাম্পত্যজীবন আদৌ সুখের হয়নি। তবে আজীজননেসার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়।[৪৪] এই দুই পুত্র শরৎ (মীর মফাজ্জল হোসেন) ও শিশিরের (মীর মহামদ হোসেন) জন্ম যথাক্রমে ২ কার্তিক ১২৭৯ এবং পৌষ ১২৮১। এরা দু'জনই হুগলী কলেজে পড়াশুনা করতো। মশাররফ তাঁর এই দুই পুত্রকে খুবই ভালবাসতেন। শরতের মৃত্যু হয় ৩০ চৈত্র ১২৮৮ এবং শিশিরের মৃত্যুতারিখ ১৩ কার্তিক ১২৯৪।[৪৫] কন্যাটিও অকালমৃতা।

বিবি কুলসুমকে বিবাহের পর সাংসারিক অশান্তি আরো প্রবল হয়ে ওঠে। আজীজন্নেসা নানাভাবে কুলসুমের ক্ষতির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। একসময় আজীজনের অত্যাচার ও অবাধ্যতা চরমে ওঠে। শেষপর্যন্ত মশাররফ ১৩০৪ সালের ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর ১৮৯৭) শনিবার আজীজন্নেসাকে তালাক দেন। এইভাবে তাঁদের বত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে। তালাকপ্রাপ্তা আজীজন্ পার্শ্ববর্তী সাঁওতা গ্রামের নূরুদ্দীন মিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪৬] ১৩০৪ সালের ১৯ ফাল্গুন দিনপঞ্জিতে মশাররফ লিখছেন, "প্রথম স্ত্রী আজীজান বিবি গত কার্ত্তিক মাসে আমার পক্ষে মৃত্যু হইয়াছে—তালাক দেওয়া হইয়াছে।"[৪৭] এরপর আজীজন্নেসার প্রসঙ্গে মশাররফ সম্পূর্ণ নীরব। যতদূর জানা যায়, তাঁর শেষজীবন কাটে সাঁওতা গ্রামেই। কিন্তু তাঁর কবর আছে মশাররফের ভদ্রাসন-সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে। মশাররফের ইচ্ছাতেই আজীজন্নেসাকে লাহিনীপাড়ায় দাফন করা হয় কিনা সে-তথ্য অজ্ঞাত।

মশাররফ প্রথমা পত্নীর প্রতি তাঁর অপ্রসন্নতার কথা কখনো প্রচ্ছন্ন বা অনুক্ত রাখেননি। আজীজন্নেসার আচার-আচরণে মশাররফ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তবুও এই 'হাড়জ্বালানী' পত্নীর নামেই মশাররফ কেনো যে পত্রিকা ('আজীজন নেহার') প্রকাশ করেছিলেন সে-বিষয়টি আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিবাহের বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মশাররফের দ্বিতীয় বিবাহ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ-সূত্রে জানা যায়, ১২৮১ সালের পৌষ মাসে কুষ্টিয়ার বারখাদা গ্রামের দরিদ্র কৃষক শেখ সদরুদ্দীন ও লালন বিবির কন্যা বিবি কুলসুমের (১৮৬১-১৯১০) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।[৪৮] কুলসুমের পূর্বনাম 'কালী'। বিনোদিয়ার পীরসাহেব নতুন নামকরণ করেন। মশাররফের দ্বিতীয় বিবাহ আত্মীয়স্বজন ও প্রথমা পত্নী অনুমোদন করতে পারেননি। ফলে মশাররফ নিন্দা-সমালোচনা-দুর্ব্যবহার-বিদ্বেষ-বিদ্রূপের সম্মুখীন হন।এ-সব কারণে সাময়িকভাবে তাঁকে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান করতে হয় কিছুদিন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সপত্নী-বিবাদ এতোই প্রবল হয়ে ওঠে যে আজীজননেসা কুলসুমকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিবাহ মশাররফের জীবনকে শান্তি, সুখ ও সাফল্যে পরিপূর্ণ করেছিল। মশাররফ বলেছেন ঃ

> কুলসুমকে নেকাহ করার পূর্ব্বে আমি মানব-সমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত ছিলামনা। ..... ছ'মাসে ন'মাসে ১২ মাস তাঁহার [আজীজন্নেসা] সহিত আমার দেখা হইত কিনা সন্দেহ। সংসারে টান ছিলনা। সংসার থাক্ বা অধঃপাতে যাক্ — সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা। পাঁচ এয়ার লইয়া পঞ্চ মকারের সেবা করিতে পারিলেই হইল। পঞ্চ মকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পাঁচ্ এয়ারের মন যোগাইতে পারিলেই জীবন জুড়াইল।[৪৯]

কুলসুমকে তাঁর 'উন্নতির দৈব কারণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন মশাররফ। বিবি কুলসুমকে তিনি তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের স্মারক বিবেচনা করতেন।

বিবি কুলসুম মশাররফের প্রযত্নে ও আপন চেষ্টায় নিজেকে স্বামীর যোগ্য করে তুলেছিলেন। নিরক্ষর কুলসুম স্বামীর প্রেরণায় লেখাপড়া শিখেছিলেন, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কে অনুরাগ জন্মেছিল। রাজনীতি সম্পর্কেও মতামত-দানের মতো ধারণা ছিলো তাঁর। মশাররফের অনেক লেখার প্রেরণাও তিনি। অনেকক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন মশাররফ-রচনার প্রথম পাঠিকা বা শ্রোত্রী। নিয়মিত ডাইরী লিখতেন। তাঁর দিনপঞ্জিতে গার্হস্থ্য-জীবনের ঘরোয়া কথার পাশাপাশি সামাজিক বা সাহিত্যবিষয়ক টুকরো-প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। এখানে তাঁর ১২৯৮ সালের ২৯ আশ্বিন বৃহস্পতিবার তারিখের দিনপঞ্জিটি অবিকল উদ্ধৃত হলো ঃ

> প্রাতে সয্যা হইতে উঠিয়া নিয়মিত কার্য্য সমাধান করিয়া ঘরে আসিলাম [।] সাহেব বলিলেন অদ্য গারিসি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে। এই কথা বলিয়া জল উঠাইতে বলিলেন। হাছু জল আনিল। সাহেব হাসের বাচ্যা কতক্ষণ লইয়া খেলা করিলেন। পরে স্নান করিলেন। আমরা সকলেই একসঙ্গে খাইলাম ডাল ইলিস মৎস্য ভাযি দিয়া। সাহেব শুইলেন আমিও শুইলাম। কিন্তু আমার ঘুম হইলনা। সাহেবও তখনি উঠিয়া কিছু খেতে চাহিলেন [।] দুধমুড়ি

Dhaka University Institutional Repository

> খাইলেন। এবং সাহেব ক্ষণিক বাগানে কৃসকের কার্য করিলেন। সন্ধা হইল সাহেব তখনি শুইলেন। আমি লিখিতে বসিলাম [।] আবার উঠিলেন ভাত আনিতে বলিলেন [।] ভাত খাওয়া হইল। সাহেব লিখিতে বসিলেন। আমি শুইলাম।[৫০]

পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য-জীবনে কুলসুম ছয় কন্যা ও পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। ১২৮৬ সালের ২৪ ফাল্গুন প্রথম সন্তান কন্যা 'রাওসান আরা' (সতী)-র জন্ম হয় লাহিনীপাড়ায়। মশাররফ লিখেছেন ঃ

> কন্যা জন্মিল ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিলাম। প্রসূতীর মঙ্গল কামনা করিলাম। যাতক্রিয়া ইত্যাদি শাস্ত্র-সঙ্গত মত করিলাম। সেইদিন হইতে অর্থাৎ কন্যা জন্মিবার পরক্ষণ হইতেই যেন বাড়ীতে শান্তির বাতাস বহিল। আত্মীয়স্বজন মন হইতে পূর্ব্ব হিংসা পূর্ব্ব দ্বেষ সমুদায় যেন ধুইয়া গেল।[৫১]

রওশন আরা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। লাহিনীপাড়া গ্রামেই ১২৯৭ সালের ২৪ মাঘ মীর আবদুল ওহাবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এরপর ১২৮৮ সালের ২৬ ফাল্গুন সাবিত্রী নামে এক স্বল্পায়ু কন্যার জন্ম হয়। প্রথম পুত্র এবরাহিম হোসেন (সত্যবান)-এর জন্মও লাহিনীপাড়ায় ৪ আশ্বিন ১২৯০ সালে। এবরাহিম মশাররফের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। উত্তরকালে পিতার গ্রন্থ- প্রকাশনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। তৃতীয়া কন্যা আমিনা খাতুন (কুকি) টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে জন্মগ্রহণ করেন ৯ আশ্বিন ১২৯২। লাহিনীপাড়ায় সালেহা খাতুন (সুনীতি) ও সালেমা খাতুন (সুমতি) নামে যমজ কন্যার জন্ম হয় ১ আশ্বিন ১২৯৪। দ্বিতীয় পুত্র আশরাফ হোসেন (রণজিৎ)-এর জন্ম ১৩ মাঘ ১২৯৫ টাঙ্গাইলে। এখানেই জন্ম হয় তৃতীয় পুত্র ওমর দারাজ (সুধন্বা)-এর ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৭। চতুর্থ পুত্র মাহবুব হোসেন (ধর্মরাজ)-এর জন্মও টাঙ্গাইলে, তাঁর জন্মতারিখ ১৩ আষাঢ় ১২৯৯। ষষ্ঠ কন্যা রাহিলা খাতুন ও পঞ্চম পুত্র তথা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মোস্তাক হোসেন (যুবরাজ)—উভয়ের জন্মই লাহিনীপাড়ায়। রাহিলার জন্ম ৫ বৈশাখ ১৩০৪ এবং মৃত্যু ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। মোস্তাকের জন্ম ৯ মাঘ ১৩০৫। বহু সন্তানবতী হলেও কুলসুম পুত্র-কন্যাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। মশাররফ-কুলসুম দুর্লভ দাম্পত্য-সুখের সন্ধান পেয়েছিলেন। কুলসুম যথার্থ অর্থেই মশাররফের প্রিয় সহচরী ও ছায়া-সঙ্গিনী ছিলেন।

মশাররফ তাঁর জীবনের একটি 'গুপ্ত কথা' কুলসুম-জীবনীতে প্রকাশ করেছেন। ১২৯২ সালের এক রাতে অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে দুই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বারাঙ্গনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মশাররফ জানাচ্ছেন ঃ

> তাহার পর ঘটনাক্রমে এরূপ হইল—যে—শ্যামবর্ণা যাহার কালা আদমির উপর বেশী ঘৃণা—বৎসরকাল মধ্যে তাহার গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

বারাঙ্গনার গর্ভজাত এই পুত্রটি লেখাপড়া শিখে অফিসে চাকুরী করতো। মশাররফের পুত্র-পরিচয়ে তার বিবাহও হয়। মাত্র ২২/২৩ বছর বয়সে সামান্য জ্বরে তার অকালমৃত্যু হয়। সন্তান-জন্মের কয়েক বছর পর মশাররফের উপপত্নীর কলিকাতার গ্রাণ্ড হোটেলের বড় খানসামার সঙ্গে বিবাহ হয়। পুত্রের মৃত্যুর পর মশাররফের সঙ্গে তার একবার পত্রে যোগাযোগ হয়। বিবি কুলসুম মশাররফের উপপত্নী ও এই অবৈধ সন্তানের কথা জানতেন। এদের প্রতি কুলসুমের আগ্রহ ও সেইসঙ্গে সহানুভূতিও ছিলো।

স্বল্প রোগভোগের পর ১৩১৬ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ পদমদীতে বিবি কুলসুমের মৃত্যু হয়। পদমদীতেই শ্বশুর মোয়াজ্জম হোসেনের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবর-গাত্রে মশাররফ হোসেন রচিত এই চতুর্দশপদী স্মরণলিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়ঃ

জীবনের নিয়োজিত কার্য্য শেষ করি।
দয়াময়া ভালবাসা স্নেহ পরিহরি।
বসনভূষণ ধন আত্মীয়স্বজন।
লালসা বাসনা ভোগ করি বিসর্জ্জন,
স্বামী সোহাগিনী বিবি কুলসুম হেথায়,
সমাধিশয্যায় রয় অনন্ত নিদ্রায়।
পঞ্চ পুত্র এক কন্যা রাখি প্রাণপতি,
জগত ছাড়িয়া স্বর্গে করিতে বসতি
তেরশত ষোল সাল ছাব্বিশে অঘ্রাণ,
রবিবার প্রাতে প্রাণ করিল প্রয়াণ।
পতিগতপ্রাণা ধনী পতিসহ আসি,
পদমদীর মৃত্তিকায় রহিলেন মিশি।
ভাইভগ্নি যেই হও ক্ষণেক দাঁড়াও,
আত্মার কল্যাণে তাঁর আশিষিয়ে যাও।

পত্নীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত মশাররফ একটি গ্রন্থ ('বিবি কুলসুম') রচনা করেন। এই স্মরণ-পুস্তকের প্রতিটি ছত্রে কুলসুমের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও প্রীতির পরিচয় বিধৃত — কুলসুমের গুণবত্তার নানা পরিচয় এখানে উন্মোচিত। শোকবিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত মশাররফ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে এখানে উচ্চারণ করেছেন ঃ

> আমার দুইটী উপযুক্ত সন্তান... এবং.. ছয়টি কন্যার বিয়োগে এত উতলা, এত জ্ঞানহারা এত পাগল হই নাই হৃদয়ে এত আঘাত লাগে নাই। .. একি হইল। হায়! হায়! আমার এ দশা

Dhaka University Institutional Repository

> কেন হইল? সময় সময় মনে হয়, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, সংসার গিয়াছে, ঘরকন্না গিয়াছে, একের অভাবে সমুদায় ধ্বংস হইয়াছে। আমার আর কিছু নাই।[৫৩]

এই আবেগাশ্রিত গদ্যকাব্যের শোকগাথা মীরের গভীর পত্নীপ্রেমকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কর্মজীবন

জীবিকার প্রয়োজনে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-পরিবারের সন্তান মশাররফ হোসেনকে নানাস্থানে একাধিক কর্ম গ্রহণ করতে হয়। পেশাগত জীবনে তিনি পদমদী এস্টেট ও দেলদুয়ার এস্টেটে চাকুরী করেছেন। একসময় কলিকাতায় বইয়ের দোকান দিয়েছিলেন। পৈতৃক জোত-জমা ও স্বরচিত বই-পুস্তক থেকেও আয়-উপার্জন হতো।

প্রথম বিবাহের (মে ১৮৬৫) পরপরই মশাররফ শ্বশুরালয় মক্তারপুর থেকে লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। তার পূর্বেই প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় ছেদ পড়েছে। তাই এইসময়ে গ্রামে অবস্থান করে পারিবারিক জোত-জমা তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। মশাররফ জানাচ্ছেন ঃ

> আমাদের স্থাবর সম্পত্তি সালঘর মধুয়ায়—কুটীর মালিক কুষ্টীয়া অঞ্চলের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা মিঃ টেম্‌স কেনী সাহেব মধ্যে ইজারা ছিল। পূজনীয়া জননীর মৃত্যু হইলে আমি অনেকসময় সালঘর মধুয়ায় সাহেবের নিকট যাইতাম। প্রায়ই অশ্বারোহণে যাইতাম।[৫৪]

১৮৭১ সাল থেকে মশাররফ কিছুকালের জন্য হুগলীর চুঁচুড়া শহরে বাস করেছিলেন। এইসময় অনুজ মোহতেশাম হোসেন হুগলী কলেজে পড়াশুনা করতেন। চুঁচুড়ায় মশাররফ কি করতেন তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে তিনি স্থানীয় 'আরবী-বঙ্গ বিদ্যালয়' পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 'এডুকেশন গেজেট' (২৮ এপ্রিল ১৮৭১) পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে এ-খবর পাওয়া যায়। এই চুঁচুড়া থেকেই হুগলী কলেজের মুসলমান ছাত্রদের সহায়তায় 'আজীজন্‌নেহার' নামে একটি পত্রিকা (বৈশাখ ১২৮১/এপ্রিল ১৮৭৪) প্রকাশ করেন।

'আজীজন্‌নেহার' পত্রিকা দুই বছর অর্থাৎ ১৮৭৬ (১২৮৩) পর্যন্ত চলেছিল। সম্ভবত এই সালেই মশাররফ চুঁচুড়া থেকে লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। ১২৮৩ থেকে ১২৮৬ সাল পর্যন্ত, যতদূর জানা যায়, মশাররফ মোটামুটি লাহিনীপাড়াতেই ছিলেন। এই সালের শেষের দিকে, পদমদী এস্টেটের ছোট তরফের তত্ত্বাবধায়কের কাজে যোগ দেন। তাঁর জীবনকথার অপ্রকাশিত খস্‌ড়া নোট থেকে জানা যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> ১২৮৬ সাল চৈত্র মাসে পদমদী মির আবদাচ্ছামাদ ওরফে মির আলী আহাম্মদ ছাহেবের বাটীতে জমিদারী কার্য্যের ভার গ্রহণ করি মাসিক বেতন ২০ টাকা ... ।[৫৫]

মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এ -বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে ঃ

> সময় ২ টাকার অনাটনহেতু বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হওয়া আরম্ভ হইল। কার্য্যবশত পদমদী যাইতে হইল। নবাবের [মীর মহম্মদ আলী] ভ্রাতা সৈয়দ আবদাচ্ছামাদ সাহেব বলিলেন ভাই—তুমি ত এখন বাটীতে বসিয়াই আছ। একটা কথা বলি তাহা যদি স্বীকার কর ... আমি আমার আমলাদের সহিৎ পারিয়া উঠিনা। হিসাবনিকাশও বেশী বুঝিনা। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া ঠকিতে হয়। তুমি আমার একটু সাহায্য করিলে অনেক সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারে। আমি সম্মত হইলাম।[৫৬]

কিন্তু পদমদী এস্টেটে যোগদানের পরবর্তী মাসেই মীর আবদাচ্ছামাদের মৃত্যু হয়। মশাররফ তখন পদমদীর নবাব সরকারে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর উপরিউক্ত খস্‌ড়া নোটে এ- বিষয়ে লিখেছেন ঃ

> ১২৮৭ সালের বৈশাখ মাসে উক্ত মির সাহেবের মৃত্যু হইলে নবাব সরকারে (মির মাহামদ আলী) কার্য্যস্বীকার করি—বেতন অনিশ্চিৎ।[৫৭]

এখানে কতোদিন দায়িত্ব পালন করেন তা অজ্ঞাত। ১২৯০ সাল মীরের আর্থিক দুরবস্থার বছর এবং ১২৯১ সালে দেলদুয়ার এস্টেটের চাকুরীতে যোগ দেন। তাই মনে হয়, অজ্ঞাত কারণে মশাররফ ১২৯০ সালের পুর্বেই কোনো এক সময়ে পদমদী থেকে বিদায় নেন। তিনি স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করেন, না তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় তা জানা না গেলেও এরপর থেকে নবাব সাহেবের প্রতি তাঁর অপ্রসন্নতা লক্ষ করা যায়। মশাররফ তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে নবাব মহম্মদ আলী সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য করেছেন। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীর অপ্রকাশিত খস্‌ড়া নোটে নবাবের মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেছেন এই ভাষায় ঃ

> নবাব মির মাহামদ আলী ১৩০১ সালের ২১ একুশে আশ্বীন তাহার কলিকাতাস্থ রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মরিয়াছেন।[৫৮]

এখানে সচেতনভাবে ব্যবহৃত 'মরিয়াছেন' শব্দটি অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা-অসহিষ্ণুতা-অসৌজন্যের স্বাক্ষর। অথচ একসময় নবাব সাহেবের সঙ্গে মশাররফের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো। নিজেকে 'আজ্ঞাবহ কিঙ্কর' হিসেবে অভিহিত করে ১২৭৯ সালে তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি নবাব মহম্মদ আলীকে উৎসর্গ করেন। ১২৮৪ সালে 'নবাব' খেলাত-প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রশস্তি-গীতি রচনা করে তাঁকে উপহার দেন।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফের কর্মজীবনের পদমদী-পর্বের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাই হয়তো এই সম্পর্ক-অবনতির কারণ।

স্থায়ী উপার্জনের কোনো নির্দিষ্ট উৎস না থাকায় মশাররফকে মাঝে-মধ্যেই অর্থ-সংকটে পড়তে হয়েছে। ১২৯০ সালের ৪ আশ্বিন পুত্র এবরাহিম হোসেনের জন্ম। এইসময় মশাররফের চরম অর্থকষ্ট ছিলো। জানা যায় ঃ

> এই ৯০ সাল আমার আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। অতি কষ্টে দিনাতিপাত হইত। এব্রাহিমের জন্মের পর প্রসূতীর সুশ্রূষা ভালরূপ হইতে পারে নাই। —৯০ সালে কুলসুম বিবি বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছেন। ভাতেকাপড়ে কষ্ট পাইয়াছেন।[৬০]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, মশাররফ বলেছেন, "১২৯১ সালে আমি দেলদুয়ার শ্রীমতী করিমননেসা সাহেবের স্টেটে ম্যানেজারী স্বীকার করিয়া দেলদুয়ার চলিলাম।"[৬১] ১ আষাঢ় তিনি দেলদুয়ারে পৌছান। এখানে তাঁর অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব আছে। তবে তাঁর অপ্রকাশিত দিনপঞ্জি থেকে ১২৯৯ সালের অন্তত আষাঢ় মাস পর্যন্ত তাঁর টাঙ্গাইলে অবস্থান সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।[৬২] মশাররফের দেলদুয়ার-জীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল। আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-তিক্ততার স্মৃতিতে পূর্ণ দেলদুয়ারের দিনগুলো।

টাঙ্গাইল-দেলদুয়ারে মশাররফ-কুলসুমের একাধিক পুত্র-কন্যার জন্ম। 'বিষাদ-সিন্ধু'সহ তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গেও টাঙ্গাইলের স্মৃতি জড়িত। এখানে অবস্থানকালে তিনি দেলদুয়ার এস্টেটের শরিকি-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে কারাভোগও করতে হয়। জনশ্রুতি আছে, মশাররফের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য তাঁর অনুজ ব্যারিস্টার মীর মোহতেশাম হোসেন টাঙ্গাইলে আসেন। টাঙ্গাইল-দেলদুয়ারপর্বের ঘটনাবলি তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী ও 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমদিকে করিমন্নেসা খানম মশাররফ ও কুলসুমকে যথেষ্ট স্নেহানুকূল্য করতেন। দেলদুয়ারে তাঁর নিজ কক্ষে কুলসুমের থাকার ব্যবস্থা হয়। মশাররফও তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থটি জননী-সম্বোধনে করিমন্নেসাকে উৎসর্গ করেন। মশাররফের টাঙ্গাইল-শহরে বাসের জন্য তিনি 'শান্তিকুঞ্জ' নামের একটি বাসগৃহেরও ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এই সম্পর্ক শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকেনি। দেলদুয়ার এস্টেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরেও মশাররফ বেশ কিছুকাল সপরিবারে টাঙ্গাইলে ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিলো টাঙ্গাইল শহরের থানাপাড়ার 'শান্তিকুটিরে'। এইসময় তিনি টাঙ্গাইলে 'হিতকরী' পত্রিকা ও 'হিতকরী প্রেস' পরিচালনা করতেন।১২৯৯ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৮ আষাঢ় পর্যন্ত ঘটনার সারাংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে মশাররফ তাঁর অপ্রকাশিত দিনপঞ্জিতে লিখেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> চাকুরি নাই কেবল প্রেস লইয়া—হিতকরী কাগজ লইয়া আছি। ইহার মধ্যে প্রধান ঘটনা—করিমননেসা সাহেবা, কালী ঘোষ দ্বারা তাহারই স্টেটের পাওনা জন্য আমার নামের ডিক্রি। ... করিমননেসা সাহেবার নামে ৪নং নালিষ করিয়াছি। .... ঈশ্বর তোমার কৃপা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। বড়ই কষ্ট ....। এতগুলি সন্তান-সন্ততী।[৬৩]

মশাররফের দেলদুয়ার-বিবাদের কিছু তথ্য 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকায় (৭ ফাল্গুন ১৩০০/১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪) পাওয়া যায়।

দেলদুয়ার এস্টেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর মশাররফ বেশ কয়েক বছর ভীষণ অর্থকষ্টে পড়েন। তাঁর অপ্রকাশিত দিনপঞ্জিকায় ঘন ঘন এই দুর্ভাগ্য-দুরবস্থার উল্লেখ মেলে। ৩ আষাঢ় ১৩০০ তারিখে দিনপঞ্জিতে উল্লেখ করেছেন, "অদ্য একটী টাকা হাতে নাই। নিতান্তই কষ্ট।"[৬৪] একই সালের ২১ আশ্বিন বলেছেন, "টাকাকড়ীর অনাটন, নানারূপ .. কষ্ট, পুত্রকন্যার পীড়া—পারিবারিক কষ্ট, ... এই আশ্বীন মাস আমার পক্ষে নিতান্তই দুঃখজনক।"[৬৫]

টাঙ্গাইল থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুকাল লাহিনীপাড়ায় ছিলেন। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়, 'গাজী মিয়া' "অন্নজলের আকর্ষণে" ১৩০৩ (১৮৯৬) সালে বগুড়ায় গিয়ে প্রায় তিনমাস অবস্থান করেন। বগুড়ায় তিনি স্বল্পকাল চাকুরীও করেন বলে কারো কারো অনুমান।[৬৬] জীবিকা কিংবা ভিন্ন প্রয়োজনে তাঁকে অনেক স্থানেই সপরিবারে অবস্থান করতে হয়। বিবি কুলসুমের প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ঃ

> সুখদুঃখে লাহিনীপাড়া, পাবনা, বগুড়া, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কলিকাতা ছায়ার ন্যায় মীর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্বামীসেবা করিয়াছেন।[৬৭]

পাবনা, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহে মশাররফ কোন্ সময়ে এবং কেনো অবস্থান করেছেন তা অবশ্য কোনো সূত্র থেকে স্পষ্ট জানা যায়না।

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে, মশাররফ ১৩১০ (১৯০৩) সালের শ্রাবণ মাসে সপরিবারে কলিকাতায় আসেন এবং ১৩১৬ (১৯০৯) সালের ১ ভাদ্র পদমদী যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, এখানেই ছিলেন। মশাররফ কলিকাতায় গিয়ে প্রথমে অনুজ ব্যারিস্টার মোহতেশাম হোসেনের পত্নীর 'বড়মহলে' দু'বছর বাস করেন। এরপর টালিগঞ্জ থানার নিকটে ৪৮নং সার্কুলার রোডের একটি ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ী ভাড়া নেন। দু'বছর পর ১৩১৬ সালের ৩১ শ্রাবণ জাননগর রোডের ১২/২নং বাড়ীতে এসে ওঠেন। কিন্তু এই

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীতে বাসের মেয়াদ ছিলো মাত্র কয়েক ঘন্টা, পরদিনই অর্থাৎ ১ ভাদ্র সপরিবারে পদমদী যাত্রা করেন।[৬৮]

কলিকাতায় মশাররফ একটি পুস্তক বিপণী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইসময় পুস্তক বিক্রির আয় ছিলো তাঁর জীবিকার অন্যতম উৎস। এই পর্বে প্রায় শিল্পগুণহীন ধর্মাশ্রিত পুস্তক রচনার প্রেরণার মূলেও ছিলো মুখ্যত অর্থচিন্তা। মশাররফের বইয়ের ভালো কাট্‌তি ছিলো। পদমদীতেও "পুস্তক বিক্রয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪ টাকা আয়" হতো।[৬৯]

'The Statesman and Friend of India', (Calcutta, 31 May 1885) পত্রিকা-সূত্রে জানা যায়, মশাররফ অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন।[৭০] 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র এক কার্যবিবরণীতে (৯ জুন ১৯০০) মশাররফের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে,— 'late Honorary Magistrate, Kustia and Tangail.'[৭১]

জীবনের শেষপর্বে মশাররফ দ্বিতীয়বারের মতো পদমদী নবাব এস্টেটের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। তবে ঠিক কোন্ সালে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায়না। তাঁর আত্মজীবনীতে পদমদী এস্টেটের একটি মামলার উল্লেখ মেলে। ১৯০৬ সালে ফরিদপুর সাব্-জজ আদালতে এস্টেটের উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় বাদী ছিলেন মশাররফ-ভ্রাতা ব্যারিস্টার মোহ্‌তেশাম হোসেন।[৭২]

পদমদীর সঙ্গে জীবনের শেষ কয়েক বছর মশাররফের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই ক্ষয়িষ্ণু এস্টেটের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে মশাররফ এ-সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> পদমদী আসিয়া পূজার পর কাছারী বন্ধ দিয়াছি, বেশী কাযকর্ম্ম নাই। কিন্তু আমার কার্য্য ফুরায়না। তাহাতেই সময় ২ কুলসুম বিবি বলিতেন, যে ইহা অপেক্ষা বড় বড় স্টেটে তোমাকে কাযকর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি। এত খাটিতে ত দেখি নাই। ঐ এক জমিদারী কাযকর্ম্মেই দেখি, তুমি দিনরাত ঐ লিখাপড়া নিয়াই আছ?..... আমি বলিলাম তুমি তোমার বাল্যকাল হইতে আমার স্বভাব জান, যাহা মন্দ—আমি তাহা ভাল করিতে চেষ্টা করি। ... এই ওক্‌ফ স্টেটে চারহাজার টাকা সংগ্রহ হইবেনা সকলেই বলে। আর নবাব স্টেট থাকিবেনা বিক্রয় হইয়া যাইবে। এই দুইটী মন্দ আমি ভাল করিতে চেষ্টা করিতেছি।[৭৩]

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পদমদীতে অবস্থান করে মশাররফ পদমদী নবাব এস্টেটের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যজীবন

মশাররফ হোসেনের জন্ম, লালন ও বর্ধন পল্লী-পরিবেশে। তাই সেকালের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় ও প্রভাব তাঁর মনন-মানসে স্পষ্টভাবেই মুদ্রিত। তাঁর আকিকা অনুষ্ঠানে প্রচলিত লৌকিক নিয়মানুসারে গাজীর গান পরিবেশিত হয়েছিল। দুরন্ত শিশু মশাররফকে বশে এনে দুধ খাওয়ানোর জন্য দাসী-বাঁদীকে নাচ-গান করতে হতো। 'খেউরি'র দিন তাঁকে 'শান্ত ধীর স্থির' রাখার একমাত্র উপায় ছিলো 'গান বাজনা আর নাচ'। তাঁর নিজের ভাষায়, "কেহ ঢোল বাজাইত, নাচিত গান করিত,আমি স্থির হইয়া বসিতাম"।[৭৪] বাল্যকালে পাঠশালার সংস্কৃতমণ্ডিত বাঙলা পদ্যশিক্ষা কিংবা মুন্‌শীজীর ফারসীকাব্য-পাঠ, কোনোটাই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। পাশাপাশি পিতার পত্রলিখনের মুসাবিদা করার ভেতর দিয়ে বাঙলা গদ্যরচনায় তাঁর নৈপুণ্য জন্মে।

কৈশোরে মশাররফ পত্রলিখন আর বাঙলা হেঁয়ালী রচনায় বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন।

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা।
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা।   (কাঁঠাল)

— এইধরনের অনেক হেঁয়ালী রচনা করেন তিনি। আবার এ-ছাড়া মুন্‌শীজীর নেতৃত্বে ফারসী কবিতার লড়াইয়ে যোগ দিতে যেতেন বিভিন্ন স্থানে। সেইসময়ে বাঙলা কবিতার এইধরনের লড়াইয়ের সম্ভাব্যতা বিষয়ে তাঁর মনে আগ্রহ জাগে। গ্রামে 'বয়েত -বাহাসে'র পাশাপাশি বাঙলা পুঁথি-পাঠেরও খুব রেওয়াজ ছিলো। সুকণ্ঠ মশাররফ মাতামহীর নির্দেশে কেয়ামতনামা, হাজার মস্‌লার পুঁথি পড়ে শোনাতেন। জৈগুনের পুঁথি, সোনাভান, সামর্থভান, আমির হামজার পুঁথি প্রভৃতি পুঁথি-পাঠের আসর শ্রোতায় পূর্ণ হয়ে যেতো এবং গ্রামের বয়স্কা রমণীরা তাঁকে সাগ্রহে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুঁথি শুনতেন। মশাররফ এই পুঁথির জগতেই প্রথম গল্পরসের সন্ধান পান। তবে এইসময় পর্যন্ত তাঁর যে সাহিত্যবোধ গড়ে ওঠে তা একান্তই গ্রাম্য পুঁথির রুচি-শাসিত।

পিতার সঙ্গে ঢাকা-সফর মশাররফের সাহিত্যিকজীবনের প্রস্তুতি-পর্বের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঢাকায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় এক হিন্দু শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি মশাররফকে দুখানা বই দেন ঃ 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে একটি বাঙলা অভিধান ও উপাখ্যান 'কাদম্বরী'। মশাররফ জানিয়েছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> সেইদিন হইতেই আমি কাদম্বরী পুস্তক চুপি চুপি পড়িতে লাগিলাম। আর পুস্তক গুরুজীর সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার নিকট কাদম্বরী বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইল। সুর করিয়া পড়া যায়না। পদে পদে মিল নাই। অক্ষরে অক্ষরে শেষে মিল নাই। প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিবোধ হইত। তিন পাতা পড়িলেই কিছু কিছু ভাল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ষোল আনা বোধ হইলনা। যাহা পড়ি, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিনা। এক একটু ভাব মনে বসিতে লাগিল। ...... যাহা হউক আমি বিরক্ত হইয়াও কাদম্বরী আর অভিধান ছাড়িলামনা। ঐ দুইখানি পুস্তক আমার সঙ্গের সাথী হইল।[৭৫]

'কাদম্বরী'র মাধ্যমেই তিনি প্রথম যথার্থ সাহিত্যের স্বাদ লাভ করেন এবং পুঁথির রুচি থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ পান।

তবে সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-সম্পাদক কুমারখালীর কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩–১৮৯৬) ও কলিকাতার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪২–১৯১৬) নিকট থেকে। বলা চলে, এঁদের দু'জনের প্রেরণাতেই মশাররফের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি।[৭৬]

তাঁর সাহিত্যচর্চার উন্মেষপর্বে সংবাদ-নিবন্ধের পাশাপাশি কিছু প্রবন্ধ ও কবিতাও 'প্রভাকর' বা 'গ্রামবার্ত্তা'য় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৬৫ সালের মে মাসে 'সংবাদ প্রভাকরে' 'মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর কিছু পরে (১২৭২) 'প্রভাকরে' তাঁর 'গোলাপ' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটি পাঠকমহলে অত্যন্ত সমাদৃত হওয়ার কারণে পত্রিকার উক্ত সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়।[৭৭] প্রথম যুগের একটি লেখা নিয়ে মশাররফকে বেশ বিপত্তিতে পড়তে হয়েছিল। পূর্ব-প্রকাশিত ভিন্নজনের রচিত একটি কবিতা মশাররফের নামে 'গ্রামবার্ত্তা'য় (পৌষ ২য় পক্ষ, ১২৭১) প্রকাশিত হয়। পরে বরিশালের জনৈক পাঠক কবিতাটি যে নকল সেই অভিযোগ এনে পত্রিকায় পত্র দেন। অবশেষে পত্রিকায় ('গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', আগস্ট ১৮৬৫)) মশাররফের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবসান ঘটে।[৭৮] মশাররফের প্রথম যুগের রচনাও যে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিলো সে সাক্ষ্য দিয়েছেন জলধর সেন ঃ

> মীর মশাররফ কাঙ্গালের প্রকাশিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারিনা। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না, লিখিতেন "গৌরীতটবাসী মশা"। এই 'মশার' লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানবিশী–পর্বের পর মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। প্রায় ৪৫ বছর পরিসরের সাহিত্যজীবনে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫। এ–ছাড়া অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও কম নয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। তাঁর জীবন নানা স্মরণীয় ঘটনায় পূর্ণ। তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী এক বিরল শিল্পী–ব্যক্তিত্ব। তাঁর অন্তর্গত বোধ–বিশ্বাস–উপলব্ধি তাঁর জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। সামাজিক ভূমিকা, সাংস্কৃতিক চেতনা, পারিবারিক আচরণ ও ব্যক্তিক অনুভূতি —সব মিলিয়ে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব তা একদিকে যেমন তাঁর কালকে প্রতিফলিত করে, অপরদিকে তাঁর স্বভাবেরও প্রতিনিধিত্ব করে।

মশাররফের মধ্যে বংশ–গৌরব ও জাত্যভিমান পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিলো। ভারতবর্ষে আগত তাঁর পূর্বপুরুষকে 'মহামাননীয় তাপসপ্রবর' বলে অভিহিত করেছেন। কৌলিক পদবী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ

> কার্যের পারদর্শিতা অনুসারে রাজদত্তা উপাধি মীর এবং বংশমর্যাদা ও বংশপরিচয়ের উপাধি সৈয়দ। মীর হইলেই সৈয়দ হইতে পারেনা। ... সাহ সৈয়দ সাদুল্লা মীর উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার বংশধরগণ মীর উপাধিতে পরিচিত। সৈয়দ তাঁহাদের বংশের উপাধি।[৮০]

পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> মীর সাহেব মোসল্মান সমাজের সমুজ্জল রত্ন। তাঁহার বংশমর্য্যাদা ভারতবিখ্যাত। যদিও তিনি ভারত রাজ্যের প্রান্ত সীমা বঙ্গে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, পবিত্র ধাম বোগদাদ শরিফের মহা মাননীয় এবং গণনীয়, সৈয়দ বংশসম্ভূত — প্রভু সৈয়দ সাদুল্যার বংশধর।[৮১]

মাতা দৌলতন্নেসার 'পবিত্র রূপের বর্ণনা করা .... অসাধ্য', এক কথায় তুলনাহীনা তিনি — 'দৌলতন্নেসার রূপই যেন জগতের আরাধ্যা'। মশাররফের বর্ণনায়,—'দৌলতন্নেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চির সতী"।[৮২]

মশাররফের পত্নীপ্রেম ছিলো প্রগাঢ়। তাঁর জীবনে দ্বিতীয়া পত্নী কুলসুমের অবদান অপরিসীম। কুলসুমই মশাররফের বিভ্রান্ত–উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সৌম্য–শৃঙ্খলার ছন্দে বেঁধে দিয়েছিলেন। এই পত্নীই

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর উত্তরজীবনের সুখ, সৌভাগ্য ও সাফল্যের মূল উৎস, এ-কথা মশাররফ কখনো বিস্মৃত হননি। কুলসুমের মৃত্যুতে মশাররফের শোকার্ত হাহাকার তাঁদের মধুময় দাম্পত্যজীবনের স্মৃতিকে উদ্ভাসিত করে দেয়। পত্নীর প্রতি মশাররফের অনুরাগ ও দুর্বলতা ছিলো প্রবল। তবে অনেকক্ষেত্রেই প্রেম ও স্ত্রৈণতার ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। পত্নীকে অতিরিক্ত সমীহ করার প্রবণতা সবসময়ই তাঁর মধ্যে ছিলো। কুলসুমও আধিপত্য বিস্তার করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেননা। যেমন, একবার পদমদীতে যাওয়ার পথে নৌকা এবং আহারের বন্দোবস্ত না হওয়ায় কুলসুমের ক্রোধ কল্পনা করে ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত মশাররফ পত্নীর কাছে গিয়ে "অতি বিনম্র অতি মোলায়েমভাবে" এই অব্যবস্থার কৈফিয়ৎ প্রদান করেন। এই ব্যাখ্যা কুলসুমের অনুমোদন পায়। এরপর শঙ্কামুক্ত মশাররফ মন্তব্য করেছেন, "বাঁচিলাম। এই জন্য মহা রাগের কারণ হইত।"[৮৩] পত্নীর পরামর্শ ও মতামত ছিলো তাঁর পাথেয় ; তা কেবল সাংসারিক বা বৈষয়িক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়েও ছিলো প্রসারিত। রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কুলসুমের মতামত অনুকূল ছিলোনা। এই ধারণা মশাররফের সিদ্ধান্তকেও কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা তাঁর বক্তব্য থেকেই জানা যায় ঃ

> সেই হইতে আমি কোন সভাসমিতিতে যাই নাই। কারণ কুলসুম বিবির কথাটা আমার মনে লাগিয়াছিল।[৮৪]

ঘরোয়া-মশাররফের চিত্র-চরিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী ও দিনপঞ্জি এবং বিবি কুলসুমের ডাইরী থেকে। বাগান করা ছিলো তাঁর একটি বিশেষ শখ। তাই সময় পেলেই নিজ হাতে বাগান-পরিচর্যার কাজ করতেন। সপরিবারের প্রায়ই বেড়াতে বেরোতেন। বিবি কুলসুমের অপ্রকাশিত ডাইরীর (মঙ্গলবার ২৭ আশ্বিন ১২৯৮) একটি বিবরণ ঃ

> প্রাতে সয্যা হইতে উঠিয়া নিয়মিত কার্য্য সমাধা করিয়া ঘরে আসিলাম। সাহেব বলিলেন চল আমরা সকলেই বেড়াইতে যাই তাই ঠিক হইল। নৌকাও ভাড়া হইল দুইখানা [।] ... ছেলেমেয়ে সকলেই চলিলাম। পালকিতে উঠিলাম রাত্র প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত বেড়ান হইল।[৮৫]

বিবি কুলসুমকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় থিয়েটার-সার্কাস-জাদুঘর-এশিয়াটিক মিউজিয়ম-হুগলীব্রীজ-ঘোড়দৌড়-এক্সজিবিশন-গড়েরমাঠে গোরাপল্টনের কুচকাওয়াজ দেখিয়েছেন।[৮৬] পুত্রকন্যাদের প্রতি মশাররফ অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। বহু সন্তানের জনক হলেও এঁদের সঙ্গে সময় কাটানো কিংবা স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শনে তাঁর ক্লান্তি ছিলোনা। আত্মজ-আত্মজাদের শৈশব-বাল্যের নানা মজাদার মুখের কথা আগ্রহ ভরে খাতায় টুকে রাখতেন। এখানে তাঁর অপ্রকাশিত খাতা (১৩০৪) থেকে কিছুটা নমুনা উদ্ধৃত হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কুকীর কথা—ছোটকালের কথা — ৫ বৎসর বয়সকাল —
কথা — মপিউদ্দী আমি বোয়ে কাচাই গে আম্। .....
রণজীতের কথা —
গিত কয় কেডা মা। গিত কয় কেডা। ঐ শুন ফুফুর ভাতারে গীত কয়।
....
সুমতী-সুনীতি বলিত —
আঁ চাঁদল, আঁ চাঁদল ।...
সুধন্যার কথা —
ভাগো । ভাগো — অর্থাত বাপ গো —
কোন জিনিস ভাঙ্গিতে হইলে বলিত ভাঙ্গি ভাঙ্গি — ভাগি। ... [৮৭]

মশাররফের নৈতিক চরিত্র কলুষমুক্ত ছিলোনা। যুগ-পরিবেশ ও পারিবারিক-সূত্রে সময়ে সময়ে এ-পদস্খলন ঘটে। তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেনও নৈতিকতার সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি কখনো। বাঈজী বা রক্ষিতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কখনো নিঃশেষিত হয়নি। মশাররফের মাতার অকালমৃত্যুর কারণও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। উত্তরাধিকার-সূত্রে মশাররফ পিতার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন। পিতার বা তাঁর নিজের এই চারিত্রিক ত্রুটি প্রকাশে মশাররফ কোনোই আবরণ রাখেননি। তাঁর এই অকপট স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে যুগ-দুর্লভ।

মশাররফ মজলিসি-মেজাজের মানুষ ছিলেন। গান-বাজনা ও আনন্দ-স্ফূর্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগ আবাল্যের। চরিত্র-দোষের সূচনাও এই সূত্রেই। মশাররফ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও অসংকোচে তাঁর চরিত্রদোষের হাতেখড়ি কিভাবে হয় সে-সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> দাসী-বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্ক-রেখায় কলঙ্কিত হয়।[৮৮]

এরপর জ্ঞাতিভ্রাতা পদমদীর নবাব মীর মহম্মদ আলীর সহযাত্রী হিসেবে নৌকাযোগে বরিশালের বামনা-গমনের পথে তাঁর রক্ষিতার সাহচর্য মশাররফকে রমণী-সংসর্গে আগ্রহী করে তোলে। পদমদী নবাব স্কুলে পড়াশুনার কালে চরিত্র-হননের সব উপকরণের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। এখানেও নবাবের রক্ষিতার সংস্পর্শে তাঁর চরিত্রদোষ ঘটে। এ-বিষয়ে মশাররফের জবানীতেই জানা যায় ঃ

> ঘরের মধ্য হইয়া আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই একপ্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই অতি মোলায়েম সৌগন্ধিযুক্ত গণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপি চুপি বলিলেন — এবং আমার হাতে কয়েকটা পানের খিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিওনা — মার খাইবে।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যার্থী মশাররফের এই 'অবিদ্যা'-চর্চার পরিণাম যে শুভ হয়নি তা জানাতেও দ্বিধা করেননি তিনি।

বিবি কুলসুমের সঙ্গে বিবাহের পরেও মশাররফের দাসী বা বারবণিতা-গমন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুলসুম তাঁকে এ-বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ করতেন। একদিন এইধরনের সন্দেহের বশবর্তী "কুলসুম মহা ক্রোধান্বিতা হইয়া বাড়ীর একটি দাসীকে মারিতে একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে তাড়া" করেন। বিব্রত মশাররফের কৈফিয়ৎ ঃ

> আমি বলিলাম আমি মিথ্যাবাদী নহি বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহার সহিত কোন কথা কহি নাই ; কাহারও গায়ে হাত দেই নাই।[৯০]

মশাররফ ইঙ্গ-বঙ্গ-বারাঙ্গনার গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মের দায়িত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। নিজের চরিত্রদোষ সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি ও পিতার নৈতিক স্খলন সম্পর্কে সত্যভাষণ তাঁর ব্যক্তিত্বে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

মশাররফ ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, কর্মদক্ষ ও পরিশ্রমী। ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। নিয়মানুবর্তিতা তাঁর চরিত্রের আরেক গুণ। কাজকর্মে ছিলেন নিপুণ-পরিপাটি, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। বিষয়বুদ্ধিতে প্রাজ্ঞ মশাররফের অক্লান্ত চেষ্টায় ক্ষয়িষ্ণু পদমদী নবাব এস্টেটের উন্নতি সাধিত হয়। নিয়মিত ডাইরী লিখতেন। ব্যক্তি, সমাজ ও সমকাল তাঁর চোখে নিপুণভাবে ধরা পড়েছে। চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগরক্ষায় আগ্রহের অভাব কিংবা আলস্য ছিলোনা। প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও পারিবারিক খুঁটিনাটি তথ্য এবং সাংসারিক ও অন্যান্য হিসাবপত্র খাতায় লিখে রাখতেন। দেনা-পাওনার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁকে অত্যন্ত বাস্তববাদী করে তুলেছিল। রুটিনমাফিক কাজ করা তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত ছিলো।

মশাররফের জ্ঞানস্পৃহা ও পাঠ-প্রবণতা ছিলো উল্লেখ করার মতো। খবরের কাগজ ও বইপড়া ছিলো তাঁর দৈনন্দিন আবশ্যিক কাজের অন্তর্গত। মাঝে-মধ্যে পুত্রকন্যা ও পত্নীকেও বই পড়ে শোনাতেন। বিবি কুলসুম তাঁর বুধবার ২১ আশ্বিন ১২৯৮ তারিখের দিনপঞ্জিতে উল্লেখ করেছেন, "... শুইয়া ২ উদাসিন পথিকের মনের কথা পড়িয়া সকলকে শুনাইলেন।"[৯১] মশাররফের নানা-বিষয়ক খাতায় (অপ্রকাশিত ১নং খাতা) তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহের অসমাপ্ত তালিকা পাওয়া যায়। উপন্যাস, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস, আইন, ধর্ম— এইসব নানা বিষয়ের বই মশাররফের পাঠ্যতালিকায় ছিলো। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে ছিলো কোরআন শরীফ, শাহনামা, চাহার দরবেশ, কাসাসুল আম্বিয়া, রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী, গিরিশ গ্রন্থাবলী, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য, কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম

Dhaka University Institutional Repository

প্যাঁচার নক্‌শা, কাঙাল হরিনাথের ব্রহ্মাণ্ডভেদ, ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী ও হরিনাথ গ্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শেখ আবদুর রহিমের হজরত মহম্মদের জীবনচরিত, ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের তাপসমালা, বড়পীর সাহেবের জীবনী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের সেরাজদ্দৌলা, রেয়াজুস সালাতীন, সাহিত্য-দর্পণ, মোজাম্মেল হকের মহর্ষি মনসুর, শব্দার্থ প্রকাশিকা, ইংরেজী অভিধান, উর্দু-ইংরেজী অভিধান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটক, এসলামতত্ত্ব, ব্রহ্মসঙ্গীত, রেয়াজউদ্দীন আল-মাশহাদীর অগ্নিকুক্কুট এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কড়ি ও কোমল ।

লেখার কাজও প্রায় প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু করতেন। কোনো কোনো দিন লেখাপড়ার কাজ করতে করতে রাত গভীর হয়ে যেতো। নিবিষ্ট মনে লিখে যেতেন। বিবি কুলসুম এমন একটি রাতের কথা বলেছেন তাঁর দিনপঞ্জিতে (বুধবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৮) ঃ

> আমি ত শুইলাম তিনি অনেক রাত্র পর্য্যন্ত লিখাপড়া করিলেন [।] যতবার চক্ষু খুলিয়াছে ততবার দেখিয়াছি তিনি বসিয়া আছেন দুইটি বাতি জ্বলিতেছে — আরও ডবল করিয়া বাতি ধরাইয়াছেন আরও খুব আল আলা হইয়াছে।[৯২]

মশাররফ ছিলেন মর্যাদা-সচেতন, স্পর্শকাতর ও অভিমানী মানুষ। নিজের সম্মান বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে কোনো কাজ করেননি। প্রথম পুত্রের বিবাহ-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধের পরিচয় মেলে। অনাদর বা অবহেলা তাঁর মনে সবসময়ই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বৈষয়িক স্বার্থের কারণে আপনজনেরা অনেকসময় তাঁর সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেছেন। তাঁদের ব্যবহার তাঁর মানসিক কষ্টের কারণ হয়েছে। স্নেহভাজন অনুজ ব্যারিস্টার মোহতেশাম হোসেনের অমনোযোগিতা ও নিস্পৃহ মনোভাবের জন্য ব্যথিত মশাররফ দিনপঞ্জিকায় (১৯ ফাল্গুন ১৩০৪) লিখেছেন ঃ

> ভাই মীর মহতেশাম হোসেন বিলাত হইতে আসিয়া আমাদের বিষয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি মনে ২ কখনই কপটতা ভাব জানি নাই। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই কপটতা ভাব ছিল। বিশেষ বিলাত হইতে আসিয়া কপটতা ভাব আরও বেশী হইয়াছে। মুখের উপর আলাপ করেন বটে অন্তরে আড়ালে চক্ষের অগোচর কিছুই নাই। আমরা যেন একেবারে পর। পর হইলেও সময় অসময় দুট কথা জিজ্ঞাসা করা— ভাইসাহেব কখনই তাহা মনেও করেননা। বড় লোক বড় ভাব উচ্চ আশা— আমরা নীচ ব্যক্তি হীন আশা কি করা।[৯৩]

আর্থিক দৈন্য পরিবারেও যে পুরুষের সমাদর হ্রাস করে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন মশাররফ। বেশ কিছুকাল যখন তাঁকে অব্যাহত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, তখন সেই দুর-বস্থার সময়ে তিনি প্রিয়তমা পত্নীর নির্লিপ্ত ও শীতল ব্যবহার সহ্য করেছেন, শিকার হয়েছেন অবহেলা ও অমনোযোগের। এই

Dhaka University Institutional Repository

অপাংক্তেয় জীবনের গ্লানি সংবেদনশীল মশাররফকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। দিনপঞ্জিতে (সোমবার ৩০ পৌষ ১৩০২) বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে বিষয়টি লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন ঃ

> বুধবার কুষ্টীয়া যাই আর বৃহস্পতী শুক্র শনীবার পাঁচদিন পর বাটীতে আসি। স্ত্রী জাতী এরূপ স্বার্থপর যে, যখন আমার চাকুরি ছিল — .. কোন স্থান হইতে আসিয়া স্ত্রীর জন্য কিছু আনিব আনিবই। যদি কোন জিনিস না আনিয়া থাকি নগদ টাকা অবশ্যই কিছু দিব। সেই আপন তখন আমার — কত আদর কত ভালবাসা দেখান। কত নখরা চখরা , ... কত রকমের যে মন ভুলান কথা, আঁখির ঠার, ... গলা ধরিয়া কত ভালবাসা দেখান প্রকাশ ...। আজ পাঁচদিন পর বাটী আসিলাম। একটীবার জিজ্ঞাসা নাই যে তুমি কোথায় ছিলে, ... কাছে বসা নাই। গা ঘেসীয়া নিকটে বসা নাই। সেই এক ভাব ঘৃণার ভাব। আমার সঙ্গে কথা কহা নাই। ... খাওয়াটা একসঙ্গেই হইল বটে কিন্তু সোয়াটা আর একসঙ্গে হইতে চাহেনা। বিবি সাহেব আর এক বিছানায় সুইতে ইচ্ছা করেননা। তখন গা গন্ধ করে, মুখে গন্ধ করে, বিছানাখানা ঝাড়া নাই। বিছানা অথচ তাহারই ঘরে। ... ধন্য সংসার ধন্য স্ত্রীলোকের মন। .... [৯৪]

স্বার্থ-শাসিত সংসার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মশাররফের অভিমানী মনের পরিচয় এখানে প্রতিফলিত।

মশাররফ-চরিত্রে প্রতিশোধস্পৃহ মনোভঙ্গির একটি পরিচয় বরাবর পাওয়া যায়। নিজের অবমাননা বা অবমূল্যায়ন কখনো বরদাস্ত করতেননা। তাঁর স্বার্থ-সংরক্ষণে অপারগ বা অনিচ্ছুক কোনো ব্যক্তিকেই তিনি মার্জনা করেননি। তাঁর মতের বা পথের বিরোধী যাঁরা তাঁদের প্রতিও কখনো প্রসন্ন থাকেননি। এ-সব বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিলো তীব্র ও নির্মম। তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ও চরিত্রহনন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। তাঁর ব্যক্তিগত অপছন্দের জীবিত মানুষজনকেই কেবল নয় পূর্বপুরুষের মৃত প্রতিপক্ষকেও সমান বৈরী জ্ঞান করেছেন।

পদমদীর নবাব মীর মহম্মদ আলী ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা, সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও মনিব। তাঁর অনুগ্রহ-আনুকূল্য দু'হাতে গ্রহণ করেছেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একসময় তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি নবাবের নামে উৎসর্গও করেন। কিন্তু স্বার্থের সংঘাতের কারণে উত্তরকালে মহম্মদ আলীর প্রতি যে মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, যে ভাষায় তাঁর ব্যক্তিক ও পারিবারিক অগৌরবের গোপন ঘটনাবলি উন্মোচিত করেছেন তা সৌজন্য ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। নবাবকে চরিত্রহীন, সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর, অমানুষ হিসেবে চিত্রিত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, চরম অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর প্রয়াণ-সংবাদ উল্লেখ করতে গিয়ে 'মরিয়াছেন' বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় দেলদুয়ার এস্টেটের করিমন্নেসা খানম প্রসঙ্গেও। মশাররফের এককালের অন্নদাত্রী করিমন্নেসাকে 'জননী' বলে সম্বোধন করে উৎসর্গ করেন তাঁর ধ্রুপদী-গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫)। কিন্তু এখানেও যখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে মশাররফ উৎসর্গ-পত্র প্রত্যাহার করে নেন। 'শত্রুর শত্রু পরম মিত্র'—এই দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে করিমন্নেসার বিপক্ষদলীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে হাত মেলান। এরপর চরম প্রতিশোধ নেন 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে। এখানে করিমন্নেসার চরিত্রকে কলুষিত-কলঙ্কিত করতে তাঁর উৎসাহের অভাব হয়নি।

প্রথম পত্নী আজীজন্নেসার আচার-আচরণ, চেহারা-চরিত্র সবই তাঁর কাছে ছিল মন্দ ও অসহনীয়। মশাররফ তাঁর সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন আজীজনের চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরতে। উল্লেখ করেছেন আজীজনের আটষট্টিটি কুস্বভাবের।[৯৫] একান্ত গোপন ঘরোয়া কথাও কেবল আজীজনের মন্দ দিক তুলে ধরার প্রয়োজনে তিনি সাগ্রহে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

সাহ গোলামাজম ছিলেন মশাররফের পিতার প্রতিপক্ষ। সহায়-সম্পত্তিগত বিরোধের কারণে এই ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাইকে মশাররফ-পিতা কখনো ক্ষমা করতে পারেননি। তাই গোলামাজম সম্পর্কে নিন্দাবাদ প্রচার মশাররফ পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। অথচ নীলবিদ্রোহে প্রজাদরদী এই নির্ভীক সৈনিকের অবস্থান ছিলো রাজভক্ত ও নীলকর-সহযোগী মশাররফ-পিতার সম্পূর্ণ বিপরীতে। পূর্বের বিতৃষ্ণার জের হিসেবে মশাররফ 'আমার জীবনী'তে গোলামাজমের পুত্র নুরুদ্দীনকে আজীজন্নেসা কর্তৃক বিবি কুলসুমকে হত্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ডাকাত' বলে অভিহিত করেছেন। মশাররফ এইভাবে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে চরিত্রহনন করে জীবৎকালীন কিংবা মরণোত্তর শাস্তি প্রদান করেছেন। এই প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা যে সর্বত্রই সংগত ও সমীচীন এ-কথা বলা যায়না। উপরিউক্ত বিষয়গুলো পূর্বাপর পর্যালোচনা করে বলা চলে, মশাররফ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বার্থ-সচেতন ছিলেন, অন্যের ত্রুটি-বিচারে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ছিলেন না এবং তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধের ধারণা হয়তো কিছুটা শিথিল ছিলো।

মশাররফ-চরিত্রে পরোপকারী-হিতব্রতীচেতনার পরিচয়ও আছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রায়ত-প্রজার পক্ষে তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন সবসময়ই ছিলো। 'জমীদার দর্পণ' এ-বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় নীলচাষীদের প্রতি তাঁর মমত্বপূর্ণ মনোযোগ প্রচ্ছন্ন আছে। জোতদার-জমিদারের প্রজা-পীড়ন তাঁকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। প্রতিকারের যথাসাধ্য করেছেন। মশাররফের এমন একটি প্রয়াসের সন্ধান পাওয়া গেছে পুরাতন পত্রিকার পৃষ্ঠায়। 'প্রতিবাসী শ্রী মশা'-স্বাক্ষরিত তাঁর একটি পত্র 'কি ভয়ানক অত্যাচার' নামে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে স্থানীয় জমিদারের পীড়ন-অত্যাচারের বিবরণ আছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> কুষ্টিয়ার অতি নৈকট্য সাঁওতা গ্রামের আড়াই আনীর জমীদার শ্রী খোন্দকার আবদুল হাক—নিবাস সাহজাতপুর—মাঝে মাঝে তাঁহার জমীদারিতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার গমনাগমনের ব্যয় বাজে জমার দ্বারাই আদায় হয়। এইবারে জনৈক প্রজার একশত টাকা জরিমানা করিয়া আদায়ের হুকুম দেন। প্রজা টাকা দিতে অপারগ হইলে, ঐ প্রজার শত টাকা মূল্যের অলঙ্কার লইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইংরাজরাজ্যে এখনও এরূপ অত্যাচার! বিশেষ বিচারপতি অতি নিকট। কি আশ্চর্য্য! অত্যাচারিত প্রজা আদালতাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, জমীদারের সংগে মকদ্দমা প্রমাণ হওয়াই কঠিন ; ইহার পরেই ঐ গ্রামের আংশিক জমীদার মীর মহছেন আলী, আবদুল হাকের পক্ষ হইয়া গরিব প্রজার সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছে। না হবে কেন? একে জাতভাই। বিশেষ একক্ষুরে উভয়ের মাথা মুড়নো। ... আমাদের গরিবের বন্ধু মহামান্য কেম্বেল বাহাদুর একবার মপস্বঃলের প্রতি দৃষ্টি করুন। নিষ্ঠুর ক্ষুদ্র তালুকদারগণ টাকার লোভে গরিবের প্রতি সময়ে সময়ে যেরূপ অত্যাচার করে, তাহা মনে করিলে কার না অশ্রুপাত হয়? ঐ সকল দুর্জ্জনদিগকে দমন করিতে কি কেউ নাই?[৯৬]

সাময়িকপত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে মশাররফ সাহসী-নির্ভীক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'আজিজন নেহার' ও 'হিতকরী' পত্রিকায় অনেকসময়ই জমিদার-মহাজন-আমলার অত্যাচার-অবিচার-অন্যায়-দুর্নীতির খবর ছাপা হয়েছে। ফলে কখনো কখনো মশাররফকে এঁদের রোষে পড়তে হয়েছে। কিন্তু এ-সব ঝুঁকি ও বিপদ স্বীকার করে নিয়েই কল্যাণব্রতী নির্ভীক সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতেন। এ-বিষয়ে তাঁর প্রেরণা ও আদর্শ ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-সম্পাদক প্রজাদরদী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার।

মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চেতনায় লালিত ছিলেন। মুক্তবুদ্ধির প্রেরণা তাঁর লেখকসত্তাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে। ধর্মনিষ্ঠ ও স্বজাতিবৎসল হয়েও তিনি ভিন্ন ধর্ম বা জাতির প্রতি বিরূপ-বিদ্বিষ্ট-অনুদার মনোভাব পোষণ করেননি। সম্প্রদায়-সম্প্রীতির জন্য তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিলো আন্তরিক। 'গো-জীবন' (১৮৮৯) এ-বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ধারণায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ তিনি কখনো স্বীকার করেননি। ভাষা-ব্যবহারে তিনি যে উদার ও মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন তা যথার্থই যুগ-দুর্লভ। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে আরবী-ফারসী শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করে সংস্কৃতজ বাঙলা শব্দ ব্যবহার করার ফলে নিন্দিত-সমালোচিত হন। তিনি জানিয়েছেন, "পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন" করার কারণে "স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন"। মশাররফ ব্যথিত চিত্তে আক্ষেপ করে বলেছেন, "শাস্ত্রের খাতিরে ", "সমাজের কঠিন বন্ধন" ও "দৃঢ়

Dhaka University Institutional Repository

শাসনে" নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে "কল্পনাকুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলামনা"[বিষাদ-সিন্ধু]।

মশাররফ প্রথমা পত্নীর গর্ভের দুই পুত্রের ডাকনাম রেখেছিলেন শরৎ ও শিশির। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভের পুত্র-কন্যাদের নাম রাখেন, যথাক্রমে—সতী, সাবিত্রী, সত্যবান, কুকী, সুনীতি, সুমতি, রণজিৎ, সুধন্বা, ধর্মরাজ ও যুবরাজ। এই নামকরণ সম্পর্কে সেকালে তাঁর গ্রামে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়। তাঁর সম্পর্কে কটুক্তি-নিন্দা প্রচারিত হয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত মশাররফ সব অসঙ্গত অভিযোগ অগ্রাহ্য করে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। প্রথম পুত্রের নামকরণ-সম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে মশাররফ তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

> ... আকিকা হইল — নাম রাখিবার সময় উপস্থিৎ। নাম রাখা হইল মফাজ্জাল হোসেন। ..... পারস্যভাষায় নাম রাখা হইল। আমি সদা সর্ব্বদা ডাকার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় নাম রাখিব। ... দুইএকজন বলিলেন বাঙ্গলা নাম রাখিবেন রাখুন, তাই বলিয়া রাম, কৃষ্ণ, শিবদুর্গা, কালী নাম রাখা ভাল নয়। আমি বলিলাম—তাহাতে দোষ কি? ... আপনারা এক চক্ষে দেখিবেন। কাযেই বাঙ্গলা ভাষাটা আপনাদের চক্ষেই ধরেনা। অথচ বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার শস্য, বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার সকলই আপনার বলিতেছেন, ভাষাটার প্রতি এত ঘৃণার কারণ কি? .... বাঙ্গলার মাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম ডাক "মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। কথা ফুটীয়ে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেছেন, অথচ বাঙ্গলা হিন্দুর ভাষা কাফেরের ভাষা শিখিলে পড়িলেই মহাপাপ। তাহা যাহাই হউক আমার পুত্রের নাম আমি "শরৎ" রাখিলাম। ... অনেকে চটীয়া ফাটীয়া লাল হইয়া উঠিয়া গেলেন। মোসল্মান হইয়া ছেলের নাম "শরৎ" রাখিল। কথাটা বাতাসের আগে ধাইয়া চলিল....। সেই কথা লইয়া হাসিতামসা খোসগল্প আহলাদে আটখানা আমি হিন্দু হইয়া গিয়াছি। তাই ত ছেলের নাম রাখিলাম শরৎ।
>
> অরে গণ্ড মূর্খ জাহেলের দল .... চন্নু মন্নু ঘটু নটু অর্থশূন্য অতি কদর্য্য নামের স্থানে শরৎ নাম রাখিলাম ইহাতে কি দোষ হইল। .... হায়রে সমাজ। হায়রে জগত। ভাল অংশ চক্ষে দেখিতে নারাজ মন্দ অংশই চক্ষের দর্শনীয়। তাহা লইয়াই আলোচনা। ..... শরৎ নামেই আন্দোলন—মহা আন্দোলন—হউক আন্দোলন, আমি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলামনা। দমিলামনা।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

নিজের আন্তরিক বোধ ও বিশ্বাসের কাছে মশাররফ সবসময়ই বিশ্বস্ত ছিলেন। জাতিসত্তার আলোকেই তাঁর আত্মপরিচয় স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর কালের বাঙালী মুসলমানের মতো তিনি স্বদেশ ও মাতৃভাষা সম্পর্কে নির্লিপ্ত কিংবা দ্বিধান্বিত ছিলেননা।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, সম্মাননা ও স্বীকৃতি

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ৬৫ বছরের জীবনকালে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান-স্বীকৃতি অর্জন না করলেও পাঠকসমাজে অসামান্য জনপ্রিয়তা ও সমালোচকমহলে অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছিলেন। তাঁর এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রসারিত ছিলো। তাঁর পূর্বে কোনো মুসলিম সাহিত্যসেবী এতো ব্যাপক পরিচিতি, প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা পাননি।

মূলত 'বিষাদ-সিন্ধু'ই বাঙলাসাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট করে দেয়। গ্রন্থ-বিক্রয় ও পাঠক-প্রিয়তার দিক দিয়ে 'বিষাদ-সিন্ধু' বাঙলাসাহিত্যের বিরল গ্রন্থসমূহের অন্যতম। প্রায় অর্ধশত-সংস্করণে 'বিষাদ-সিন্ধু'র লক্ষাধিক কপি বিক্রয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচকবৃন্দ মশাররফ-সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মশাররফের মতো বাঙলা বাঙালী হিন্দুও লিখতে পারেননা কিংবা তাঁর মতো বাঙলা কোনো হিন্দু লিখতে পারলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করতে পারেন— এমন প্রশংসাবাণী ঘন ঘন উচ্চারিত হয়েছে। একজন বাণীসাধকের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে ঈর্ষনীয়। সত্যের অনুরোধে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, মশাররফ তাঁর নিজের সম্প্রদায় অপেক্ষা গুণগ্রাহী হিন্দুসমাজের নিকট থেকেই অধিক সম্মান-স্বীকৃতি-আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

মশাররফ কিছু কিছু সভা-সমিতির সাম্মানিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-সব সংগঠনের পরিচালনা বা নীতি নির্ধারণীতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। টাঙ্গাইলে অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কুষ্টিয়ার 'স্টুডেন্টস্ মাজকারাতুল ইসলাম-ই কুষ্টিয়া'-র সঙ্গেও তাঁর যে যোগ ছিলো তা এই সংগঠনের এক অনুষ্ঠানপত্র (১১ মে ১৯০২) ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে জানা যায়। কুষ্টিয়ার অন্তর্গত খোক্সার সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী (১৮৬৭-১৯২৩) প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলাম' (১৩১১)-এর তিনি ছিলেন উপদেষ্টা এবং এই সংগঠনের সাহায্যার্থে কয়েকবার তাঁর বেশকিছু গ্রন্থও দান করেন। ধর্মীয় সভা-সমিতিতে তাঁর যোগদানের আরো কিছু খবর পাওয়া যায়। ১৩০৭ সালের ২৬ বৈশাখ বাউলসাধক লালন সাঁইয়ের আস্তানার নিকটে ছেঁউড়িয়া গ্রামের এক ধর্মসভায় যোগ দিয়ে বাঙলা মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন। সেই সভায় যশোরের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ ও গাঁড়াডোবের মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

পাংশার রওশন আলী চৌধুরীর (১৮৭৪-১৯৩৩) 'কোহিনূর' (১৩০৫) পত্রিকার পরিচালক-সমিতির অন্যতম সদস্য এবং 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক হিসেবে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়। মশাররফ 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাঁর 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) নাটকটি উৎসর্গ করেন উক্ত সোসাইটির কর্ণধার নবাব আবদুল লতীফকে। মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী-সূত্রে জানা যায়, পদমদীতে নবাব সাহেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এবং তিনি মশাররফকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র ১৯০০ সালের ৯ জুন এক জরুরী সভায় সৈয়দ আমীর আলীর মাদ্রাসা-শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানানো হয়। সোসাইটির কার্যবিবরণীতে মাদ্রাসাশিক্ষার সপক্ষে মশাররফ হোসেনের লিখিত বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে মুদ্রিত হয়।[৯৯] তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সদস্যও ছিলেন দীর্ঘকাল।[১০০] তবে যে-সব সভা-সমিতিতে বৃটিশ-রাজের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণ করা হতো তার সঙ্গে তিনি কোনো যোগ রাখতেননা। শেষজীবনে তাই তিনি কোনো সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেননা। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁকে উপদেষ্টা মনোনীত, সদস্যপদ প্রদান, সভাপতি কিংবা আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করেন। বৃটিশ সরকারও তাঁকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে তাঁর যোগ্যতা ও কর্মের স্বীকৃতি দেন।

তবে এ-কথা সত্য যে, যতোখানি মনোযোগ ও সম্মান-স্বীকৃতি মশাররফের প্রাপ্য ছিলো, তা তিনি পাননি। উত্তরকালে একজন আলোচক মশাররফের প্রতি অবহেলা ও নির্লিপ্তিকে 'এক অমার্জনীয় অপরাধ' বলে অভিহিত করে ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

> যদি আমাদের মীর সাহেব আমাদের এই কর্ত্তব্য-বিমুখ, সাহিত্য-সম্মান-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হতভাগ্য সমাজে না জন্মিয়া অন্য কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার সম্মানের জন্য কি যে তুমুল আয়োজন হইত, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। তাঁহাকে যদি আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ পাইত, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার সম্মান ও স্মৃতি-রক্ষার কোন অনুষ্ঠানই বাকি রাখিতনা। তাহারা তাঁহার জন্য শুধু প্রবন্ধ লিখিয়া অথবা জীবনী প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতনা ; অধিকন্তু তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে যতকিছু প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তাহারা তাহার কোনটী প্রতিপালনেই ত্রুটি করিতনা। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, বাংলার মুসলমান-সমাজ গুণের আদর ও গুণীর সম্মান করিতে আদৌ শিক্ষালাভ করে নাই।[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৯১– ১৯৫২) অনুযোগ করে বলেছেন ঃ

> দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের এই প্রতিভাবান সাহিত্যিককে আজ আমরা নামে মাত্র চিনি, তাঁহার জীবনীর এবং জীবনের সকল কীর্ত্তির পরিচয় তাঁহার স্ব–সমাজের লোকও রাখেননা।[১০২]

শেষজীবন ও মৃত্যু

মশাররফ হোসেনের শেষজীবন রোগ-শোক-দুঃখ-ব্যর্থতা-অভাব-অনটনের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যুর বেশ কয়েকবছর পূর্ব থেকেই মশাররফ নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

১৩১২ সালের ২৯ চৈত্র দিনলিপিতে মশাররফের রোগ-ব্যাধির দীর্ঘ বিবরণ আছে ঃ

> .... ভয়ানক পীড়া ডাবল নিউমেনিয়া বিগত ১৫ই মাঘ পীড়ায় অজ্ঞান ১০ই হইতে পীড়ার সূচনা—এ বৎসর পীড়ায় ২ আমার শরীর জরজর হইল। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে মুখে এত ব্রণ হইল যে ১৫০ দুইশত ব্রণের কষসহ পাকীয়া পুঁজ বাহির হইয়া মুখ বিকৃত করিয়া ফেলিল। দেড় মাস সেই পীড়ায় ভুগীলাম তাহার পর আশ্বীন মাসে লীভারের পীড়ায় ভুগীয়া বড়ই কষ্ট পাইলাম। .... অগ্রহায়ণ মাসের ৭ই তারিখে কুষ্টিয়া গিয়াছিলাম। .... সন্ধ্যার সময় নৌকায় আসিয়া ভয়ানক বমি সমস্ত রাত্র বমি.......... । রাত্র ১টার সময় ডাক্তার আনাইয়া দেখান হইল—ছোডা অটার এক বোতল ।৹ আনা মূল্যে খরিদ করিতে হইল। .... প্রাতকাল পর্যন্ত বমি—আমি প্রায় অজ্ঞান। ১২টার ট্রেনে কুষ্টীয়া হইতে কলিকাতা আসিলাম। সেই পীড়ায় ভয়ানক কষ্ট পাইলাম [।] পেটে বেদনা হইত—আর বমি হইত [।] .... অনেক চিকিৎসার পর পৌষ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল....... । ১০ই মাঘ তারিখে আবার নিউমিনিয়াতে ধরিল .... [।] ১২দিন অজ্ঞান অবস্থা—শেষে ডাক্তার দাউদার রহমান যিনি পূর্বেই সন ১২৯০ .... ব্যারিস্টার সাহেবের বাটীতে থাকা সময় চিকিৎসা করিয়াছিলেন [।]....... তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করান হইল ঈশ্বর রক্ষা করিলেন।[১০৩]

২৬ ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখের একটি ব্যবস্থাপত্র থেকে জানা যায় মশাররফ হোসেন প্রস্রাবের কোনো জটিলতায় ভুগ্‌ছিলেন।[১০৪] মঙ্গলবার ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ তারিখের দিনলিপিতে মশাররফ প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন, “এদিকে নিজের শরীর অসুস্থ—সর্ব্বদা রোগে ভূগীতেছি।”[১০৫] তাঁর দিনপঞ্জিতে মাঝে-মধ্যেই এমন অসুস্থতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জীবনসঙ্গিনী বিবি কুলসুমের মৃত্যুতে মশাররফ শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রিয়তমা পত্নী কুলসুমের মৃত্যুর পর মশাররফ মাত্র দুই বছর জীবিত ছিলেন। স্মৃতিভারাক্রান্ত নিঃসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি পদমদীতেই অতিবাহিত করেন। এইসময় তাঁর জীবনীশক্তি ও সৃজনক্ষমতাও ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। পত্নীবিয়োগ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল পত্নীর স্মৃতিচর্চা-পুস্তক ('বিবি কুলসুম') ব্যতীত আর কিছু রচনা করেননি। অবশ্য 'আমার জীবনী'র ১১-১২শ খণ্ড একত্রে ২ মার্চ ১৯১০ তারিখে প্রকাশিত হলেও তা পূর্বে রচিত। জীবনের এই শেষ দু'টি বছর তাঁর অজ্ঞাতবাসের কাল। পদমদীতেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর।[১০৬] পদমদী নবাববাড়ীর একপ্রান্তে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তাঁর অচিহ্নিত কবরটি বর্তমানে বিধ্বস্ত-প্রায়।

সবচেয়ে বেদনা ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাঙলাসাহিত্যের এই স্মরণীয় সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের মৃত্যু-সংবাদ সমকালীন কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা এখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত। কোনো স্মরণসভা হয়েছিল এমন খবরও মীর-গবেষকগণ দিতে পারেননি।

তাঁর সঠিক মৃত্যু-তারিখ নিয়ে সংশয় আছে। তবে মৃত্যুসাল যে ১৩১৮ তা দু'একটি সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। ১৫ আশ্বিন ১৩২০ (২০ অক্টোবর ১৯১৩) প্রকাশিত কাঙাল-জীবনীতে জলধর সেন প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন ঃ

> তিনিও [মশাররফ] আমদিগকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে এমন একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের নাম কেহই করেন নাই।[১০৭]

মশাররফের মৃত্যু সম্পর্কে আর-একটি উল্লেখ মেলে ১৩১৮ সালের ১৯ ফাল্গুন চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) অভিভাষণে ('বসুধা', ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮) ঃ

> বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ কিছুই নাই... মায়ের যেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি যেমন মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য বিলাপ করিতেছি, মীর মোসারেফ্ হোসেনের জন্য সেইরূপ গভীর দুঃখে আত্মহারা হইয়াছি। আমার বড় বাসনা হইয়াছিল, মনোমোহন বা গিরিশচন্দ্রের অন্যতর একজনকে এই সম্মিলনের সভাপতি করা হয় ; —আমি এমন কি, এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমার বিরোধী ছিল। মীর মোসারেফ্ হোসেনকে আমি কখনও দেখি নাই ; তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম, এই সম্মিলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিব। শেষসময়ে শুনিলাম, তিনি এখন বিহেস্তবিহারী।[১০৮]

Dhaka University Institutional Repository

'কোহিনুর' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১৮) প্রকাশিত মশাররফ-স্মরণে সৈয়দ এমদাদ আলীর (১৮৭৫-১৯৫৬) একটি চতুর্দশপদী কবিতা ব্যতীত মশাররফের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুরাগ-গাঢ় আর কোনো শোকগাঁথার সন্ধান আমাদের জানা নেই ঃ

যাও যাও দুঃখ কষ্ট পিছনে ফেলিয়া
সাহিত্যের কীর্ত্তি তোমা করিবে অমর
সেই এক সান্ত্বনার অমৃত লভিয়া
স্বর্গপথে দ্রুতগতি হও অগ্রসর।
কারবালার শোকদৃশ্য দেখাতে জগতে
যে 'বিষাদ-সিন্ধু' তুমি করিলে রচনা
পড়েনি কি তার রেখা জীবনের স্রোতে?
লভ নাই শান্তি স্থানে অশান্তি বেদনা?
যখন ফুটিলে তুমি জাতীয় জীবনে
একা শতরূপে হলে বঙ্গে প্রভাবিত।
তোমার পদাঙ্ক ধরি সাহিত্যকাননে
চলেছে স্বজাতি তব আজি শত শত।
কীর্ত্তিসৌধ হতে পারে পলকে বিলয়
তোমার যে কীর্ত্তি তাহা অক্ষয় অব্যয়।

চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলিনে'র পঞ্চম অধিবেশনের তৃতীয় দিনে (২১ ফাল্গুন ১৩১৮/ ৪ মার্চ ১৯১২ সোমবার, বেলা সাড়ে এগারোটা) মশাররফের মৃত্যুতে 'নতুন প্রস্তাব' শিরোনামে নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ঃ

> বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান লেখকগণের অগ্রণী 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রণেতা মীর মশারফ হোসেন সাহেবের মৃত্যুতে এই সম্মিলন শোক-প্রকাশ করিয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ভার দেওয়া হইল।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন 'শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রওশান আলী চৌধুরী (ফরীদপুর)' এবং সমর্থন করেন 'চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (চব্বিশ পরগণা)'।[১০৯]

'উপাসনা' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১৮, পৃঃ ৩৩৫-৩৬) 'শোকগাথা' শিরোনামে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়াত মশাররফকে স্মরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফের মৃত্যুর আট বছর পর ১৩২৭ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ 'তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কার্যালয়ে তাঁর একটি চিত্র-প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়।[১১০] 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার'-এর অর্থানুকূল্যে স্থাপিত মশাররফের এই চিত্রটির শিল্পী ছিলেন অজিতকুমার সেন।[১১১]

মশাররফ হোসেনের মৃত্যুর 'প্রায় পনর বৎসর' পর 'ইসলাম-দর্শন' (পৌষ ১৩৩২) পত্রিকায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক' নামে প্রকাশিত এক ধারাবাহিক রচনায় আবু-নূর মশাররফের মৃত্যুতে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'স্মৃতি-সভা' আহ্বানের অনীহা ও কটু-মন্তব্য প্রকাশের অভিযোগ উত্থাপন করেন।[১১২]

আফাজুদ্দিন আহমদও ('সওগাত', ভাদ্র ১৩২৬) এক আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

> বাঙ্গালা সাহিত্যের কহিনূর 'বিষাদ-সিন্ধু'র অমর রচয়িতা মরহুম মশাররফ হোসেন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থে অপদার্থ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এ পর্য্যন্ত কিছুই করে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা তাঁহার অভিনন্দন করি নাই কিংবা কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করি নাই ; আজ তাঁহার পরলোকগমনের এই সুদীর্ঘকাল পরেও অধম আমরা, অক্ষম আমরা তাঁহার স্মৃতিচর্চ্চার কোন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিলামনা। মুসলমান সাহিত্যিকগণের পক্ষে ইহার চেয়ে লজ্জার, ইহার চেয়ে অকৃতজ্ঞতার, ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই মীর মশাররফ হোসেন যদি অন্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে দেশময় কি যে একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া যাইত তাহা প্রণিধানযোগ্য। পক্ষান্তরে বঙ্গসাহিত্যের এই অন্যতম রত্নটির জন্য আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সাহিত্যিকগণ অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও কিছু করিতে অগ্রসর হয়েন নাই।[১১৩]

মশাররফ হোসেনের মৃত্যুর পর এ্যাকাডেমিক-আলোচনার বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তাঁর মূল্যায়নের কিছুটা চেষ্টা হয়। এইসব আলোচনায় কখনো কখনো আবেগোচ্ছ্বাস, গৌরব-বোধ ও খণ্ডিত বিচার-প্রবণতা মিশ্রিত থাকলেও তা মশাররফকে নতুন আলোকে উন্মোচিত করার প্রয়াসের কারণে উল্লেখের দাবী রাখে। এমন একটি আলোচনায় আবু-নূর বলেছেন ঃ

> আমাদের সাহিত্যের যুগ-পরিবর্ত্তক কে এবং কোন্ মহাত্মার যত্ন-প্রচেষ্টায় আমাদের সাহিত্য পয়ার ত্রিপদীর প্রচলিত নাগপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে—এই প্রশ্নের উত্তরে মরহুম মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের নাম স্বতঃই আমাদের মনের দ্বারে উঁকি দিয়া থাকে।... আমরা

Dhaka University Institutional Repository

> মীর সাহেবকেই আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রবর্ত্তক— বাঙ্গলার মোসলেম সাহিত্য-গুরু বলিয়া মনে করি। তিনিই যে চির প্রচলিত অশুদ্ধ দোভাষী গদ্যকে কোন্‌ঠাসা করিয়া সুকুমার বিশুদ্ধ গদ্য-পদ্যকে বঙ্গ-ভারতীয় কনক আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এ কথা কে যেন অলক্ষ্য হইতে আমাদের বলিয়া দেয়। বাণী-বালাখানা গঠনের সেই প্রাথমিক যুগে আমরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার যে পরিচয় পাই, তাহাতে তাঁহাকে মোসলেম সাহিত্যের যুগ-পরিবর্ত্তক মহাচার্য্য আখ্যায় বিভূষিত না করিলে তাঁহার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইবে বলিয়া মনে করি।[১১৪]

প্রবন্ধকার মশাররফ গ্রন্থাবলীকে বাঙালী মুসলমানের 'স্বতন্ত্র সাহিত্যের বীজ-মন্ত্র' এবং মশাররফকে 'সাহিত্য-সুলতান' হিসেবে অভিহিত করে দৃঢ়-মন্তব্য করেছেন ঃ

> বর্ত্তমান মোস্‌লেম-সাহিত্যে লেখক তথা লেখিকারও বেশী অভাব নাই ; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন একটীও সাহিত্যিক খুঁজিয়া পাওয়া যায়না—যাঁহাকে আমরা মীর সাহেবের শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া আনন্দলাভ করিতে পারি।[১১৫]

সমকালীন বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবক ও সাময়িকপত্র-পরিচালক শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) মশাররফকে 'বাঙ্গালার সাহিত্যগগনে' মুসলমানসমাজের 'ধ্রুবতারা' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর স্থান-নির্দেশ করেন।[১১৬]

তথ্য-নির্দেশ

১. মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী,* (কলিকাতা, ১৩৮৪), দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৫৭

২. মশাররফের জন্মকালে কুমারখালী পাবনা জেলার অন্তর্গত ছিলো, পরে ১৮৭১ সালে নদীয়া জেলাভুক্ত হয়।

৩. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭০

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ঃ ২৮ - ২৯ সংখ্যক পুস্তিকা (কলিকাতা, ১৩৬১, প-স), পৃঃ ৩১

৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, (ঢাকা, ১৯৫৬), পৃঃ ৬৯

৬. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ৫ম খণ্ড, (ঢাকা, ১৩৯২), কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, পৃঃ ঊনষাট

Dhaka University Institutional Repository

৭. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *বাঙলাসাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন,* (ঢাকা, ১৩৮৬), পৃঃ ১

৮. আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* (ঢাকা, ১৩৯২), পৃঃ ৫৯৬

৯. *বাঙলাসাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ১ (পাদটিকা)

১০. আশরাফ সিদ্দিকী, 'মীর মশাররফ হোসেন', *বাঙলা একাডেমী-পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ১৮

১১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* (ঢাকা, ১৩৭৪), পৃঃ ৩৪৬

১২. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২২১

১৩. আবদুল লতিফ চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* (সিলেট, ১৯৫২), পৃঃ ১

১৪. আবদুল লতিফ চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* (ঢাকা, ১৯৮০), পৃঃ ১

১৫. শামসুজ্জামান খান, 'মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবনকথা – কিছু নতুন তথ্য', *দৈনিক সংবাদ,* ১০ পৌষ ১৩৯৯

১৬. *মীর মশাররফ হোসেনের নানা-বিষয়ক রাফ্ খাতা।* নিজস্ব সংগ্রহ (অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে), ২নং *খাতা।*

১৭. *মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীর খসড়া পাণ্ডুলিপি।* কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে সংগৃহীত, ৩নং *খাতা।*

১৮. মশাররফের *আমার জীবনী* গ্রন্থ এবং মশাররফ-পৌত্র সৈয়দ সাদুল্লা ও মশাররফ-কন্যা বিবি রওশন আরার পৌত্র মীর আবদুল হাইয়ের সহায়তায় এই বংশলতিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ ১০

২০. ঐ, পৃঃ ১৩

২১. ঐ, পৃঃ ৫৭

২২. মীর মশাররফ হোসেন, *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* (ঢাকা, ১৩৭৭), এ. কে. এম. শামসুল ইসলাম সম্পাদিত, পৃঃ ৯

২৩. ঐ, পৃঃ ১৩৮

২৪. ঐ, পৃঃ ১৪১

২৫. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৪

২৬. ঐ, পৃঃ ৭৪, ৭৬

২৭. ঐ, পৃঃ ৭৫

২৮. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জিকা।* নিজস্ব সংগ্রহ, ১নং *খাতা।*

২৯. ঐ

৩০. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৯–৮০

৩১. ঐ, পৃঃ ১০২

৩২. ঐ, পৃঃ ১২১–২২

৩৩. ঐ, পৃঃ ১৭৮

৩৪. ঐ, পৃঃ ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. ঐ, পৃঃ ১৯১

৩৬. ঐ, পৃঃ ১৯৭

৩৭. মশাররফের কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকদের বিষয়ে নদীয়ার জন-ইতিহাসের গবেষক মোহিত রায় অতিরিক্ত কিছু তথ্য পেশ এবং সেইসঙ্গে মীরের স্মৃতিবিভ্রম-মোচনের চেষ্টা করেছেন। দ্র. মোহিত রায়, *নদীয়া উনিশ শতক,* (কলিকাতা, ১৩৯৫), পৃঃ ৬৭-৭৫।

৩৮. *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* (পাক্ষিক), ২ ভাগ ১৮ সংখ্যা, ফাল্গুন ১ম পক্ষ ১২৭১, ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫, পৃঃ ২৩৫

৩৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২০২

৪০. ঐ, পৃঃ ২০২

৪১. ঐ, পৃঃ ২৪১-৪২

৪২. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, 'ঐতিহাসিক ক'নে বদল', *মাহেনও,* আগস্ট ১৯৫২, পৃঃ ৩০

৪৩. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২৭১

৪৪. মীর মশাররফ হোসেন, *বিবি কুলসুম,* (কলিকাতা, ১৩১৭), পৃঃ ৫

৪৫. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৪৬. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৪৭. ঐ

৪৮. কিন্তু কুলসুমের দেনমোহরের অংশ পরিশোধের জন্য মশাররফ ১৯০৩ সালের ২১ জানুয়ারী (৭ মাঘ ১৩০৯) পত্নী-বরাবর যে 'জমি বাটী বাগান' বিক্রয় খোষ কবালা (দলিল নং ঃ ২৬৯/১৯০৩ সাল ; কুমারখালী সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস) করে দেন, সেখানে মশাররফ-কুলসুমের বিবাহের তারিখ উল্লেখ করা হয় ১৭ মাঘ ১২৮০ এবং দেনমোহর ৫ হাজার টাকা।

৪৯. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৫৫

৫০. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৫১. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৬৬

৫২. ঐ, পৃঃ ১১৪

৫৩. ঐ, পৃঃ ৫-৬

৫৪. ঐ, পৃঃ ৪৫

৫৫. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৫৬. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি।* নিজস্ব সংগ্রহ (অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে), *৪নং খাতা।*

৫৭. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৫৮. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৫৯. মীর মশাররফ হোসেন, *সঙ্গীত লহরী,* (কুষ্টিয়া, ১৯৭৬), আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, পৃঃ ২১-২৩

৬০. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৬১. ঐ, পৃঃ ৬৭

৬২. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৬৩. ঐ

৬৪. ঐ

৬৫. ঐ

৬৬. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৩৮৬), কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, পৃঃ তেতাল্লিশ (গ্রন্থ-প্রসঙ্গ)

৬৭. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৮

৬৮. ঐ, পৃঃ ৯

৬৯. ঐ, পৃঃ ৪৩

৭০. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* (ঢাকা, ১৩৮২), পৃঃ ২৩

৭১. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩ (পাদটীকা)

৭২. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৫

৭৩. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ১১৬–১৭

৭৪. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৫

৭৫. ঐ, পৃঃ ১৪৮–৪৯

৭৬. ঐ, পৃঃ ২৩৬–৩৭

৭৭. *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ৯৩

৭৮. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ২০

৭৯. জলধর সেন, *কাঙ্গাল হরিনাথ,* ১ম খণ্ড , (কলিকাতা, ১৩২০), পৃঃ ৩৯

৮০. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৯

৮১. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* পৃঃ ৮

৮২. ঐ. পৃঃ ১৩৮, ১৪১

৮৩. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ১১৬–১৭

৮৪. ঐ, পৃঃ ১২৩

৮৫. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৮৬. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৩৬–৩৭

৮৭. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৮৮. *আমার জীবনী,* পৃঃ ১২৭

৮৯. ঐ, পৃঃ ১৯৫

৯০. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ১২৬

৯১. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯২. ঐ

৯৩. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

৯৪. ঐ

৯৫. শামসুজ্জামান খান, 'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম—আজিজাননাহার', *সচিত্র সন্ধানী,* ৫ ফাল্গুন ১৩৮৫, পৃঃ ১৩

৯৬. *মধ্যস্থ*, ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃঃ ১৯৫–৯৬

৯৭. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী* (খণ্ডিত অংশ)। নিজস্ব সংগ্রহ (অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে), *৫নং পাণ্ডুলিপি,* পৃঃ ১৮৭–৮৯।

৯৮. শেখ জমিরুদ্দীন, *আসল বাঙ্গালা গজল,* (নদীয়া, ১৩৩৭, চতুর্দশ–স), পৃঃ 'বিজ্ঞাপন'–৩

৯৯. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

১০০. *সাহিত্য–পরিষৎ–পঞ্জিকা,* ত্রয়োদশ বর্ষ, (কলিকাতা, ১৩১৩), পৃঃ ৮০

১০১. আবু–নুর, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক', *ইসলাম–দর্শন,* পৌষ ১৩৩২, পৃঃ ৯২

১০২. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৫

১০৩. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

১০৪. কুষ্টিয়ার প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ এম. এ. কাসেমের সৌজন্যে ব্যবস্থাপত্রের মর্মোদ্ধার করা গেছে।

১০৫. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা,* পূর্বোক্ত।

১০৬. আশরাফ সিদ্দিকী কোনো সূত্র উল্লেখ না করে মশাররফের মৃত্যুর এই তারিখ উল্লেখ করেছেন (*বাঙলা–একাডেমী পত্রিকা,* ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, ১৯৫৮)। পরবর্তীকালে প্রায় সকলেই নির্বিচারে এই তারিখটিই গ্রহণ করেছেন। সুস্পষ্ট মৃত্যু–তারিখ পাওয়া না গেলেও ইতোপূর্বে ১৩১৭ সালে প্রকাশিত *নদীয়া কাহিনী* গ্রন্থে কুমুদনাথ মল্লিক উল্লেখ করেছেন, "সম্প্রতি ইঁহার [মশাররফ] মৃত্যু হইয়াছে"। (মোহিত রায় সম্পাদিত, তৃ– স ঃ কলিকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ১৭২)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,, "১৩১৮ সালের শেষভাগে মীর মশাররফ হোসেন পরলোকগমন করেন"। (*স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৩)। আবদুল লতিফ চৌধুরী তাঁর *মীর মশাররফ হোসেন* গ্রন্থে (সিলেট, ১৯৫২) মশাররফের মৃত্যুসাল উল্লেখ করেছেন ১৯১২। কাজী আবদুল মান্নান মশাররফের মৃত্যুর তারিখ দিয়েছেন নভেম্বর ১৯১১/কার্তিক ১৩১৮ (*মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ ঊনষাট)। প্রফেসর মান্নানের এই তথ্যও সূত্রহীন। পক্ষান্তরে একই গ্রন্থের অন্যত্র (পৃঃ একশ দুই) মৃত্যুকাল উল্লেখ করেছেন ১৯১২। আজহার ইসলাম তাঁর *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ* (আধুনিক যুগ) গ্রন্থে (ঢাকা, ১৩৭৬ ; পৃঃ ৭১১) মশাররফের মৃত্যুসাল নির্দেশ করেছেন ১৯১২। শামসুজ্জামান খান মৃত্যুসাল ১৯১১ উল্লেখ করলেও তারিখ বা সূত্র–নির্দেশ করেননি (*নানা প্রসঙ্গ,* ঢাকা, ১৩৯০, পৃঃ ২)।

১০৭. *কাঙ্গাল হরিনাথ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯

১০৮. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৪

১০৯. *বঙ্গীয়–সাহিত্য–সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনের কার্য্য–বিবরণ,* (আখ্যাপত্র ছিন্ন), পৃঃ ৩৫, ৪১

১১০. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৪

১১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পরিষৎ–পরিচয়,* (কলিকাতা, ১৩৫৬ ?), পৃঃ ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১১২ *ইসলাম-দর্শন,* পৌষ ১৩৩২, পৃঃ ৯২

১১৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে,* (ঢাকা, ১৩৯৮), পৃঃ ৩১৭

১১৪. *ইসলাম-দর্শন,* পৌষ ১৩৩২, পৃঃ ৯১

১১৫. ঐ, পৃঃ ৯২

১১৬. *শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী,* ২য় খণ্ড , (ঢাকা, ১৩৭৪), 'বঙ্গভাষা ও মুসলমানসমাজ', পৃঃ ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যকর্ম ঃ পরিচিতি ও শিল্পবিচার

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যকর্ম ঃ পরিচিতি ও শিল্পবিচার

মশাররফ হোসেনই বাঙালী মুসলমানসমাজে প্রথম সার্থক সাহিত্যশিল্পী। মোটামুটি ১৮৬৫ থেকে ১৯১০ সাল, প্রায় ৪৫ বছর মশাররফের শিল্পসৃষ্টির সময়কাল। এই দীর্ঘসময়ে তাঁর সাহিত্যসাধনার ফসল স্বল্প নয়। এ-পর্যন্ত তাঁর পঁচিশখানা প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ-ছাড়া আছে বেশকিছু অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত রচনা।

মশাররফ ছিলেন বিচিত্রধর্মী লেখক। বিষয়-বৈচিত্র্যে তাঁর রচনা বিশিষ্টতার দাবী রাখে। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস-উপাখ্যান-নকশা, নাটক-প্রহসন, কবিতা-সঙ্গীত-পদ্য, প্রবন্ধ, জীবনী, আত্মজীবনী, ছাত্রপাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি সব মাধ্যমেই তিনি লেখনী চালনা করেছেন। কেবল মুসলমানসমাজেই নয় উনিশ শতকের সমগ্র বাঙলাসাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই তাঁর মতো সব্যসাচী লেখকের দৃষ্টান্ত বিরল।

মশাররফের শিল্পী-মানস পূর্বাপর সরলরৈখিক ছিলোনা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি ও সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে তা কখনো কখনো বিচলিত ও দ্বিধান্বিত হয়েছে। শিল্পী-জীবনের সূচনাকাল থেকে 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) রচনার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর শিল্প ও সমাজসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত ছিলো। এইসময় পর্যন্ত একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মকে প্রাণিত করেছে। কিন্তু এরপর তাঁর পূর্ব-বিশ্বাস ও ধারণায় চিড় ধরে। উত্তরকালের সাহিত্যে শিল্পপ্রেরণার পরিবর্তে ধর্মীয় বোধের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সহজেই লক্ষণীয়।[১] তাই এই নিরিখে মীরের সাহিত্যকর্মকে শিল্পপ্রেরণাজাত ও ধর্মাশ্রিত, প্রবণতার দিক দিয়ে, এই দুইভাগে বিভক্ত করা চলে।

রূপাঙ্গিকের ভিত্তিতে মশাররফ-সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পরিচয়-চিত্র তুলে ধরে।[২] এই ধরনের শ্রেণীকরণে লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাঁর শিল্পচর্চার বিশেষ আগ্রহ ও প্রবণতা কেমন ছিলো সেই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এখানে মশাররফের প্রকাশিত গ্রন্থ ও উল্লেখযোগ্য অগ্রন্থিত রচনার আঙ্গিকগত বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস এবং সেইসঙ্গে তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার নাম নির্দেশিত হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. উপন্যাস-উপাখ্যান-নক্‌শা ঃ রত্নবতী, বিষাদ-সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়ার বস্তানী, হজরত ইউসোফ (প্রেম-পারিজাত), রাজিয়া খাতুন, তহ্‌মিনা, নিয়তি কি অবনতি।

২. নাটক-প্রহসন ঃ বসন্তকুমারী নাটক, জমীদার দর্পণ, এর উপায় কি?, বেহুলা গীতাভিনয়, টালা-অভিনয়।

৩. কবিতা-সঙ্গীত-পদ্য ঃ গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু, সঙ্গীত লহরী, মৌলুদ শরীফ, বিবি খোদেজার বিবাহ, হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ, হজরত বেলালের জীবনী, হজরত আমীর হামজার ধর্ম্মজীবন লাভ, মদীনার গৌরব, মোস্লেম-বীরত্ব, বাজীমাৎ।

৪. প্রবন্ধ-ইতিহাস ঃ গো-জীবন, এসলামের জয়।

৫. জীবনী-আত্মজীবনী ঃ আমার জীবনী, বিবি কুলসুম।

৬. বিবিধ ঃ মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা, ঈদের খোতবা, উপদেশ।

৭. সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ঃ ক. আজীজন নেহার, খ. হিতকরী।

মশাররফের সাহিত্যধারণার হাতেখড়ি লৌকিক কাহিনী ও দোভাষী পুঁথির মাধ্যমে। এই গ্রাম্যরুচির সাহিত্যবোধ পরিশীলিত হয় মূলত 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) উপাখ্যানের সঙ্গে পরিচয়ের ভেতর দিয়ে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের বিভিন্ন রচনা, বিশেষ করে 'বিজয়-বসন্তে'র (১৮৫৯) কথা উল্লেখযোগ্য। মশাররফের উপাখ্যান রচনার প্রাথমিক প্রেরণা এই তিন সূত্র থেকেই আহৃত বলে অনুমিত হয়। মশাররফের 'রত্নবতী'র (১৮৬৯) পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, অন্তত প্রথম উপাখ্যান 'রত্নবতী'তে মশাররফ এ-সব রচনার দ্বারা প্রভাবিত হননি।

মশাররফ মূলত গদ্যশিল্পী। তাঁর গদ্যনির্ভর শিল্পকর্মের মধ্যে উপন্যাস-উপাখ্যান-নক্‌শাজতীয় রচনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ধারার রচনার মধ্যে একটি ক্রমোত্তরণের আভাস অত্যন্ত স্পষ্ট। এই শিল্প-বিবর্তন কেবল ভাষার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, তা বিষয়োপকরণ ও আঙ্গিক সম্পর্কেও সমান সত্য। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'র সঙ্গে উত্তরকালের অগ্রন্থিত রচনা 'নিয়তি কি অবনতি'র তুলনা করলে এই সিদ্ধান্ত আরো পোক্ত হয়। 'রত্নবতী'তে যেখানে কেবল রূপকথাশ্রিত কাহিনী-পরিবেশনের মাধ্যমে গল্পরস ও নীতি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিহিত, সে-ক্ষেত্রে 'নিয়তি কি অবনতি'র কাহিনী বাস্তব-সমস্যার সামাজিক ভূমি থেকে উত্থিত। চিরায়ত প্রণয়-কাহিনী পরিবেশনের জন্য তিনি পুরাণের সাহায্য গ্রহণে যে কুণ্ঠিত নন, তার প্রমাণ মেলে 'হজরত ইউসোফ' ('প্রেম-পারিজাত') কিংবা 'তহ্‌মিনা'য়। পবিত্র কোরআন শরীফ ও প্রচলিত লোকপুরাণ থেকে চয়ন করেন ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়-কহিনী। পারস্য-

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণ 'তহমিনা'র কাহিনীর উৎস। এক ভিন্ন আঙ্গিকে শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর নীল-চাষ ও বিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত হয় 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় (১৮৯০)। সমকালীন ইতিহাসের এক শিল্পগাঢ় রূপ এই গ্রন্থ। এর বহিরঙ্গে অত্যাচারী নীলকরের কথা ও কাহিনী, আর অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে রিপু-শাসিত মানব-মানবীর স্খলন-পতনের দুঃখময় পরিণতি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত মীরের অভিনব নক্‌শা 'গাজী মিয়ার বস্তানী'। তীব্র ব্যঙ্গ-কৌতুক-শ্লেষের মধ্য দিয়ে মানবপ্রকৃতির রহস্যঘন স্বরূপ এখানে উন্মোচিত। ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ মানবিক ট্রাজেডিকে তিনি রূপ দিয়েছেন 'বিষাদ-সিন্ধু'তে (১৮৮৫-৯১)। সেইসঙ্গে গভীর শৈল্পিক মমতায় উদ্‌ঘাটিত করেছেন অচরিতার্থ প্রণয়ের বেদনায় জর্জরিত এক অসহায় ও নিয়তি-লাঞ্ছিত মানবের হৃদয়গত উপলব্ধিকে। মূলত ইতিহাসে তিরস্কৃত ও ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে ঘৃণিত এক চরিত্রের বিফল কামনা-বাসনার প্রকৃতি ও পরিণাম চিত্রণই এই উপাখ্যানের মুখ্য লক্ষ্য।

বাঙলা নাটক-প্রহসনের ধারাতেও মশাররফের অবদান বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। বিষয়-বৈচিত্র্যের বিশেষত্ব এখানেও প্রতিফলিত। মশাররফ যে-কেবল নাটক রচনাই করেছেন তা নয় স্ব-উদ্যোগে সাফল্যের সঙ্গে সেই নাটকের অভিনয়ও করিয়েছেন লাহিনীপাড়া গ্রামে। বাঙলা পেশাদারী রঙ্গালয়ের সেই শৈশবলগ্নে মশাররফের উদ্যোগ ও প্রযত্নে প্রত্যন্ত পল্লীতেও নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা হয়। এবিষয়ে তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা কৌতূহলোদ্দীপক ঃ

> যে সময় আমি নাটক অভিনয় করিয়াছি, গ্রাম দূরে থাকুক সে সময় মহানগরী কলিকাতায় ব্যবসাদার নাট্যকারগণ রঙ্গমঞ্চে কেহই দেখা দেন নাই। কয়েক বৎসর পর নেসানাল থিয়েটার নামে এক নাট্যমন্দীর স্থাপিত হয়। তাহার পরেই বেঙ্গল থিয়েটার আসরে অবতীর্ণ হন।[৩]

মশাররফের প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) ব্যতীত আর-সব নাটকের কাহিনীই সমাজ-সংলগ্ন। যদিও তিনি সংস্কৃত রূপ ও রীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেননি, তবু তাঁর নাটকে সমাজ-বাস্তবতা ও সমকালীন ঘটনা প্রধান অনুষঙ্গ হয়েছে। 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) 'এর উপায় কি?' (১৮৭৫) ও 'টালা-অভিনয়' (১৮৯৭) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উৎপীড়ন, শোষণ ও অবিচারে জর্জরিত রায়ত-প্রজার প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ, মমতা ও সহানুভূতি 'জমীদার দর্পণ' নাটকে প্রতিফলিত। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিম্নকোটির শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর অনুরাগ-পক্ষপাত প্রকাশিত 'টালা-অভিনয়' প্রহসনে। উনিশ শতকের শহুরে বাঙালী 'বাবু'দের অনাচার ও নৈতিক অধঃপতন যে কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তার স্বাক্ষর আছে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের পাতায়। সেই অনাচারের প্রধান অধ্যায় ছিলো সুরাপান ও গণিকাগমন। মশাররফের প্রহসন 'এর উপায় কি?' চরিত্রদোষের এই বিষয় অবলম্বন করেই রচিত। আবহমান বাঙলার মানুষের স্মৃতিতে মনসা-পুরাণের কাহিনী চির-উজ্জ্বল।

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ বেহুলা-লখিন্দরের এই জনপ্রিয় লোকপুরাণ নিয়ে রচনা করেন 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯)। 'আমার জীবনী'-সূত্রে জানা যায়, মশাররফ শৈশব থেকেই লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। 'বেহুলা গীতিভিনয়ে'র মতো লৌকিক কাহিনীর নাট্য-রূপায়ণের মূলে রয়েছে লোকসংস্কৃতির প্রেরণা ও প্রভাব।

কবিতার সঙ্গে মশাররফের যোগ আবাল্যের। ছেলেবেলায় বয়েতবাজির অভিজ্ঞতা, পুঁথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, হেঁয়ালি রচনা—এইসব স্মৃতি কবিতার প্রতি তাঁকে অনুরাগী করে তোলে এবং তাঁর কাব্যচর্চার সহায়ক হয়। তাঁর যৌবনোন্মেষকালের রচনাও যে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ আছে 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮ চৈত্র ১২৭২) প্রকাশিত তাঁর 'গোলাপ' শীর্ষক কবিতার জন্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ঘটনায়। তাঁর পদ্য ও গীত রচনা সমানতালে চলেছিল। মূলত তাঁর বিভিন্ন নাটক-প্রহসনের জন্য গীত রচনার প্রয়োজন হয়। অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ বাউলাঙ্গের পদ রচনার পশ্চাতে ছিলো তাঁর সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও প্রভাব।[৪]

জীবনের শেষপর্বে রচিত মশাররফের কাব্য-কবিতার প্রায় সর্বাংশই ধর্মাশ্রিত রচনা। ধর্মীয় কথা, কাহিনী, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্ব এইসব পদ্যরচনার মূল উপজীব্য। এ-বিষয়ে বিরল ব্যতিক্রম তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রথম-পর্বের রচনা 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরীসেতু'। সমকালীন ঘটনা এই অকিঞ্চিৎকর পদ্য-পুস্তিকার প্রেরণা ছিলো। 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬) ও 'মোস্লেম-বীরত্ব' (১৯০৭) অনেকটা কাহিনী-কাব্যের ঢঙে রচিত। ধর্মীয় উদ্দেশ্যসাধনে রচিত 'মৌলুদ শরীফ' (১৮৯৪) গ্রন্থেও পদ্য তার প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে।

শেষজীবনে মশাররফ ধর্মাশ্রিত কাব্য-কথা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫) থেকে 'বাজীমাত', (১৯০৮) পর্যন্ত সাতটি গ্রন্থ এই পর্যায়ভুক্ত। এই পর্বে তাঁর শিল্প-প্রয়াস কেনো ধর্মীয় চেতনার খাতে প্রবাহিত হয় তার আভাস পাওয়া যায় 'বিবি খোদেজার বিবাহ' কাব্যপুস্তকের ভূমিকায়। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, বাঙালী মুসলমানসমাজে তিন শ্রেণীর পাঠকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণীর পাঠক 'মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক পাঠ করেন'। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকও 'মুসলমানি বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী' এবং সেইসঙ্গে ধর্মীয় পুস্তকের 'মুসলমানি বাঙ্গলা ভাষায় বঙ্গানুবাদ' ও 'এসলামি ভাষায় লিখিত,— কি সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রিকা যাহাতে মাত্র খবর থাকে তাহা পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন না'। উপরিউক্ত দুই শ্রেণী মুসলমান পাঠকসমাজের 'চৌদ্দ আনা দল' এবং তাঁদের ধারণা, 'পদ্যে লিখিত না হইলে—কেতাব কি প্রকারে হয়?' অপরদিকে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক যাঁরা, তাঁদের 'রুচি পরিমার্জ্জিত, সাধু ভাষার দিকেই অধিক টান'। মুসলমানসমাজের প্রসিদ্ধ লেখকবর্গ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং 'ইহারা আবর্জ্জনা ছাড়াইয়া

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানসমাজে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রচলনে বিশেষ যত্নবান'। এই দলেরই প্রধান লেখক মশাররফ হোসেন তাঁর পূর্ব কৃতি বিস্মৃত হয়ে এঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, এঁরা 'সমাজের চৌদ্দআনা লোককে ফেলিয়া দুই আনা লোক লইয়া সাহিত্য সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন'। কিন্তু মশাররফ তাঁর এককালের সাহিত্যসতীর্থদের সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হয়ে 'চৌদ্দ আনা দলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া' ধর্মীয় উপকরণনির্ভর পদ্য-কাব্য রচনায় ব্রতী হন, কেননা স্বল্পশিক্ষিত বৃহত্তর 'মুসলমান-সমাজে পদ্যের বড়ই আদর'।[৫] তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূলত জাতিগত-স্বাতন্ত্র্যচিন্তার পাশাপাশি গ্রন্থ-কাটতির ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যও নিহিত ছিলো। একজন সার্থক গদ্যশিল্পী পরিণত বয়সে কিভাবে ব্যর্থ পদ্যকারে রূপান্তরিত হন, তার দৃষ্টান্ত আছে মশাররফের উত্তরকালের কাব্যচর্চায়।

মশাররফ হোসেন বেশকিছু প্রবন্ধও রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সমাজ-সমস্যামূলক। 'সংবাদ প্রভাকরে' (মে ১৮৬৫) প্রকাশিত 'মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি'ই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। 'কোহিনুর' (ভাদ্র ১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত 'সৎ-প্রসঙ্গ' সাম্প্রদায়িক-সমস্যা নিয়ে রচিত। 'হিতকরী' (১, ১৫ পৌষ ১২৯৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধটি। গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মুসলিমসাজের শিক্ষার বিষয়ে এখানে আলোচনা করেছেন। প্রবল সম্প্রদায়-সম্প্রীতির পরিচায়ক 'গো-জীবনে'র (১৮৮৯) প্রবন্ধগুলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর অস্বাক্ষরিত অনেক রচনা। তাঁর প্রবন্ধ মৌলিক চিন্তার পরিচয় বহন করে। মুক্তবুদ্ধি, স্বচ্ছ চিন্তা ও যুক্তিবাদিতা তাঁর প্রবন্ধের প্রধান গুণ।

ইতিহাসের উপাদান-উপকরণ তাঁর অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্টিধর্মী কোনো কোনো রচনার উৎসও ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাস তাঁকে বিশেষ প্রাণিত করেছিল। এরই ফসল 'এসলামের জয়' (১৯০৮) গ্রন্থ। তবে এখানে তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় আবেগ।

মশাররফের সৃষ্টিধর্মী শিল্প-প্রয়াসের মধ্যে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' স্পষ্টতই আত্মজৈবনিক রচনা। তবে তাঁর জীবনস্মৃতির প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট পরিচয় প্রতিফলিত 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১০) ও 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) গ্রন্থে। এ-কেবল নিছক ব্যক্তির জীবনেতিহাস নয়, সেইসূত্রে প্রসঙ্গত সমাজ ও সমকালের চিত্রও বিশেষ উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রকাশিত।

উপরিউক্ত রচনা ও গ্রন্থের বাইরে বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর কয়েকটি পুস্তকের সন্ধানও পাওয়া যায়। জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের চিন্তা তাঁকে 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' (১৯০৩) নামে শিশু-শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রচনাতে উদ্বুদ্ধ করে। স্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে অনুবাদ করেন 'ঈদের খোতবা' (১৯০৯)। সুনীতি ও সদ্গুণাবলীর অনুশীলন-মানসে অনূদিত হয় মহাজ্ঞানী হজরত লোকমানের 'উপদেশ' (১৩১২)।

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফের সৃষ্টিসত্তার বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে লিখেছেন। তাঁর প্রায় সব রচনারই উৎস ইতিহাস, পুরাণ কিংবা বাস্তব ঘটনা। জীবনবাদী ও সমাজসচেতন লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে গভীরভাবে ছায়া ফেলেছে। তাঁর মন ও মননে সমাজ-সংলগ্নতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তি, সমাজদৃষ্টি, মানবচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান, স্বচ্ছ-উদার মনোভঙ্গি ও শিল্প-সামর্থ্যের সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম নির্মিত। লেখক হিসেবে তাঁর অর্জন, সাফল্য ও সিদ্ধি তাঁকে ধ্রুপদী শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে। সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধিতা ও বিচলিত শিল্পচিন্তা সত্ত্বেও মশাররফের সাহিত্যকর্ম ভাব-ভাষা-ভাবনায় সমগ্র বাঙলাসাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবীদার।

মশাররফের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তাঁর সাংবাদিকতা-কর্ম ও সাময়িকপত্র-সম্পাদনার গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। বাঙালী মুসলমানের সাময়িকপত্র-প্রকাশনার আদিপর্বে মশাররফের গৃহীত উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি 'আজীজন নেহার' (১৮৭৪) ও 'হিতকরী' (১৮৯০) নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং 'সংবাদ প্রভাকর', 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। এইসব পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাদ্বয়ে তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। এইসব রচনা কিছু স্বনামে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকার নিয়মানুসারে অধিকাংশ রচনাই ছিলো অস্বাক্ষরিত। তাঁর চিন্তা-চেতনার বিশেষ পরিচয় এখানে প্রতিফলিত। মশাররফের ভাষাচর্চা ও সমাজচেতনাবোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দুই পত্রিকার অবদান স্বল্প নয়।

382275

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপন্যাস-উপাখ্যান-নক্শা

রত্নবতী

'রত্নবতী' মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ। 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' নামে চিহ্নিত এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে (১২৭৬ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থের বিষয় ও প্রকরণ সম্পর্কে আভাস দিয়ে ভূমিকায় লেখক বলেছেন ঃ

> একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি, ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পরিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক 'রত্নবতী'র কাহিনীর মৌলিকত্ব দাবী করলেও তিনি যে প্রচলিত লোককাহিনীর কাছে ঋণী, সে-আভাস তাঁর ভূমিকা থেকেই পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত ক্ষেত্র গুপ্তও মন্তব্য করেছেন ঃ

> গল্পটি কিন্তু মশাররফ হোসেনের মৌলিক কল্পনার ফল নয়। রূপকথা-কথাসরিৎসাগর-আরব্যরজনীর নানা উপাদানের মিশ্রণ—হুবহু কোন বিশেষ গল্পের অনুসরণ না-ই হতে পারে।[৬]

লেখক-কথিত 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' মন্তব্যে সরল আস্থা স্থাপন এবং মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,[৭] সুকুমার সেন,[৮] মুহম্মদ আবদুল হাই,[৯] আশরাফ সিদ্দিকী[১০] প্রমুখ গবেষক 'রত্নবতী'কে 'উপন্যাস' হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তবে কাজী আবদুল মান্নান,[১১] আনিসুজ্জামান,[১২] মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল[১৩] একে রূপকাহিনী বলেই অভিহিত করেছেন। মুনীর চৌধুরীও স্পষ্টই বলেছেন ঃ

> 'রত্নবতী' প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা। তার ধর্ম উপন্যাসের চেয়ে রূপকথার অনেক কাছাকাছি।[১৪]

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় 'রত্নবতী'র শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আরব্য-রজনীর গল্পমালা যেমন 'আরব্য-উপন্যাস' নামে অভিহিত তেমনি শিথিল-অর্থেই এখানে 'উপন্যাস' অভিধাটি আরোপিত হয়েছে।[১৫] প্রকৃতপক্ষে জীবনধর্মী উপন্যাস-রচনার চিন্তা বা প্রেরণা মশাররফ তখনো অর্জন করেননি এবং সেইসময়ে তা তাঁর উদ্দেশ্যের অন্তর্গতও ছিলো না। মূলত বৃহত্তর পাঠকসমাজের গল্পরসের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই রূপকথা-আশ্রিত এই কাহিনীর অবতারণা।

রূপকথার আঙ্গিকে ছকে-বাঁধা কাহিনী-পরিবেশনের মাধ্যমে একটি বহুলচর্চিত নীতিবাক্যের সার প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠাই 'রত্নবতী'র কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। গুজরাট নগরের রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীতনয় সুমন্ত পরস্পর গভীর সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। 'ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ' — এই নিয়ে একদিন উভয়ের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। রাজকুমারের পক্ষপাত 'ধনে'র প্রতি, অপরদিকে সুমন্ত 'বিদ্যা'র সমর্থক। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই জটিল বিতর্কের সমাধান লাভের আশায় দুই বন্ধু বিপরীতমুখী ভিন্ন পথে দেশ-ভ্রমণে বের হয়। ভ্রমণের এক পর্যায়ে রাজকুমার এক তপস্বী কপিবরের সৌজন্যে ইচ্ছাপূরণের এক আশ্চর্য দৈব অঙ্গুরীয় লাভ করে। অতঃপর সে রত্নপুর রাজ্যের রাজনন্দিনীর পাণিপ্রার্থী হয়। কিন্তু শর্তপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়। অপরদিকে মন্ত্রীপুত্র সুমন্ত নানাস্থান ভ্রমণশেষে পূর্বোক্ত কপিবরের নিকট থেকে ইচ্ছামাফিক দৈহিক রূপ-পরিবর্তনের বরলাভ করে। তারপর সুমন্ত রত্নপুর রাজ্যে এসে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিপদ সম্পর্কে অবগত হয়। তখন সে আপন বুদ্ধিবলে বন্ধুকে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধারের উদ্যোগ নেয়। সুমন্তের কৌশলে অলৌকিক জলের প্রভাবে রাজমহিষী, রাজকুমারী ও তার কিঙ্করী বানরীতে রূপান্তরিত হয়। অনুতপ্ত রাজার অনুরোধে সন্ন্যাসীরূপী রাজপুত্র সুকুমারের সঙ্গে রাজকন্যা রত্নবতীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়। এদিকে সুমন্তও রত্নপুর রাজ্যের মন্ত্রীকন্যার পাণিগ্রহণ করে। এইভাবে লেখক এক সরলরৈখিক কাহিনীর মাধ্যমে 'ধনে'র উপরে 'বিদ্যা'র জয় দেখিয়েছেন।

'রত্নবতী'তে আধুনিক আখ্যানের পরিচয় অনুপস্থিত। আধুনিক উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসা, মানবীয় আচরণ বা মনোদ্বন্দ্ব কোনোকিছুই এখানে পরিচর্যা লাভ করেনি। এই কাহিনীতে একধরনের রূপকথার কিশোর-কৌতূহল নিবৃত্তির উপাদান আছে। উদার-উদ্দাম কল্পনা-জগতে লেখকের বিচরণ এতোটাই স্বচ্ছন্দ যে সেখানে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকত্বের আবির্ভাব ঘটে স্বাভাবিকভাবেই। জলের স্পর্শে মানবের কপিতে রূপান্তর কিংবা কপির মানবরূপ লাভ, ইচ্ছাপূরণ অঙ্গুরীয়ের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সহজপ্রাপ্তি, ইচ্ছামাফিক মানবদেহের ভিন্ন আকৃতি ধারণ—এইসব ঘটনা অলৌকিকত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, "মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের মতো অতিপ্রাকৃতিক উপাদান এখানেও প্রাধান্য বিস্তার করেছে।"[১৬]

'রত্নবতী'তে চরিত্র আছে, কিন্তু তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ নেই। রাজনন্দন সুকুমার, মন্ত্রীপুত্র সুমন্ত, তপস্বী কপিবর, রাজা রত্নধ্বজ, রাজমহিষী, রাজকন্যা রত্নবতী, কিঙ্করীবৃন্দ 'রত্নবতী'র পাত্র-পাত্রী। সব চরিত্রই নির্দ্বন্দ্ব, সরলরৈখিক ও পরিণতিহীন।

সুকুমারকে যদি এই উপাখ্যানের নায়ক বিবেচনা করা যায় তাহলে বলতে হয় তার বুদ্ধিই যে স্বল্প তা নয়, তার ব্যক্তিত্বেরও যথেষ্ট অভাব আছে। তার নির্বুদ্ধিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই সে বিপদাপন্ন হয়। রাজকুমারী রত্নবতী তার পাণিপ্রার্থী সুকুমারের কাছে যখন 'মাণিক্যাঙ্গুরী' দাবী করে তখন, —

> ভবিষ্যৎ জ্ঞানশূন্য নির্বোধ রাজকুমার অঙ্গুরীয়কের নিকট মাণিক্যাঙ্গুরী যাচঞা না করিয়া আপন অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীটি তৎক্ষণাৎ সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন।
>
> [প্রথম পরিচ্ছেদ]

এইভাবে নিজের ভুল সিদ্ধান্ত ও নিবুর্দ্ধিতার যোগ্য মাশুল তাকে দিতে হয়। বিপদগ্রস্ত রাজকুমারের অনুতাপ ও অনুশোচনা তার বুদ্ধিশূন্যতা ও উদ্যমহীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার এই স্বরচিত লাঞ্ছনায় পাঠকের সহানুভূতির তুলনায় বিরক্তিই অধিক উৎপাদন করে। প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞা, মেধা, অভিজ্ঞতা ও মহৎ জীবনাদর্শের অভাবই তাকে 'বিদ্যা' অপেক্ষা 'ধনে'র প্রতি পক্ষপাতী করে তোলে। 'ধন' না 'বিদ্যা' — শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের এই বিতর্কে সুমন্তের কাছে তার পরাভব তার ভাবমূর্তি ও নায়ক-ভূমিকাকে ক্ষুণ্ন করে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুত্র সুকুমারের এই নিষ্প্রভ চরিত্রের পাশে সুমন্ত পূর্বাপর অনেক বেশী উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। লেখকের বর্ণনায়, 'সুমন্ত অতি বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য' এবং 'বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন' (প্রথম পরিচ্ছেদ)। জীবনের শ্রেয়োবোধে তার আস্থা, তাই 'ধন' নয় 'বিদ্যা'কেই সে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাদানে উদ্যোগী। সে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, কুশলী, বন্ধুবৎসল ও পরহিতব্রতী। রাজকুমারী রত্নবতীর কূটজালে কারারুদ্ধ সুহৃদ সুকুমার ও সম-ভাগ্যবরণকারী ভিন্‌দেশী রাজকুমারদের মুক্তির জন্য তার চিন্তা ও প্রয়াস মহৎ জীবনভাবনারই অন্তর্গত ঃ

> বন্ধু তবে এই রমণীর মোহিনীপাশে আবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আরও অনেক রাজপুত্র সেই কূটযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত যদি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ।
>
> [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

সুমন্তের মধ্যে রক্ত-মাংসের মানুষের অনুভূতিও কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল। যেমন, তার ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় রাজকুমারী রত্নবতীর 'রূপমাধুরী দর্শন' করে। এই উপাখ্যানে সুকুমার 'ধন' ও সুমন্ত 'বিদ্যা'র প্রতীক হিসেবে প্রকাশিত।

রত্নবতী এই উপাখ্যানের নাম-চরিত্র। এখানে তার ভূমিকা নির্ধারিত, পাণিপ্রার্থী রাজকুমারদের কিভাবে জব্দ করা যাবে সে—ই তার একমাত্র চিন্তা। অবশ্য এ-কাজে কিঙ্করীর সহায়তা ও পরামর্শই তার পাথেয়। তার চরিত্রে অমানবিক আচরণ, নির্মমতা ও দাম্পত্যজীবনে পরবশ্যতা-স্বীকারে অনীহা ফুটে উঠেছে। পাণিপ্রার্থী রাজকুমার যখন তার মনোবাঞ্ছা পূরণে ক্রমাগত সফল হয় তখন বিচলিত রত্নবতী সখীকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

> সহচরি ! আর তিন দিবস প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিলেই আমার গর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে খর্ব হইবে, সুতরাং বিবাহ করিয়া রাজনন্দন যে, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে সর্ব্বাগ্রে সযত্ন হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহাতে মান রক্ষা হয়, এরূপ উপায় কর।
>
> [প্রথম পরিচ্ছেদ]

স্বামীর 'ইচ্ছানুবর্ত্তিনী কিঙ্করীর ন্যায়' জীবনযাপনে একান্ত অনীহা তার। সুকুমারের মতোই সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন তার চরিত্রে নেই। নায়িকা-সুলভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে অনুপস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা রত্নধ্বজ নির্ভেজাল ভালোমানুষ। সহজ, সরল, ও মানুষের দুর্দশায় কাতর। তার আচার-আচরণে রাজন্যসুলভ গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতার পরিবর্তে এক নিরীহ দুর্বলচিত্ত গৃহস্থের পরিচয়ই অধিক ফুটে উঠেছে। আত্মজার পতি-নির্বাচনের অসঙ্গত ও অমানবিক পদ্ধতির কাছে তার অসহায় আত্মসমর্পণ রাজন্য-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্ত করে দেয়।

এই উপন্যাসের নামকরণের তেমন কোনো যথার্থতা বা সার্থকতা নিরূপিত হয়নি। রত্নপুর রাজ্যের রাজদুহিতা রত্নবতীর নামানুসারেই এই উপাখ্যানের নামকরণ। কিন্তু রত্নবতী এই কাহিনীর গতিধারা নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি কিংবা তাকে অবলম্বন করেও কাহিনী পল্লবিত হয়ে ওঠেনি। মূল ঘটনা রত্নবতী-লাভের জন্যও পরিচালিত হয়নি। তাই উপাখ্যানের 'রত্নবতী' নাম খুব যে যুক্তিসঙ্গত তা বলা যায়না। এ-ছাড়া এই কাহিনীতে নীতিবাক্যের সার প্রতিপন্নে একটি সূক্ষ্ম ত্রুটি আছে। আসলে এখানে 'বিদ্যা' নয়, 'বুদ্ধি'র জয় ঘোষিত হয়েছে এবং 'ধন' যে 'বিদ্যা'র তুলনায় অকার্যকর তা সম্পূর্ণত প্রমাণিত হয়নি। লেখক এই উপাখ্যানে 'বিদ্যা' ও 'বুদ্ধি'কে সমার্থক বিবেচনা করেছেন।

এই স্বল্প-পরিসরের 'অকিঞ্চিৎকর' গ্রন্থটির যদি কোনো বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তবে তা তার ভাষায়। মশাররফ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'র মাধ্যমেই পাঠকসমাজের দৃষ্টি-আকর্ষণে সক্ষম হন। এই সমাদর ও স্বীকৃতির মূলে ছিলো ভাষা। তৎসম শব্দবহুল 'রত্নবতী'র ভাষা সাধুরীতির এবং এতে মিশ্র প্রভাব আছে। 'রত্নবতী'র ভাষায় তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০-১৮৮৫) অনূদিত বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র প্রভাব অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য যে, কৈশোরে মশাররফ তাঁর সাহিত্য-ধারণার প্রথম পাঠ লাভ করেন এই পুস্তকের মাধ্যমেই। প্রভাব-প্রসঙ্গে 'কাদম্বরী'র সঙ্গে যোগ করতে হয় কাঙাল হরিনাথের 'বিজয়-বসন্তে'র (১৮৫৯) নাম। ভাষাগত প্রভাবের বিষয়ে একজন সমালোচক ধারণা করেছেন 'রত্নবতী'র ভাষার জন্য মশাররফ বঙ্কিমচন্দ্র নন বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী।[১৭]

'কাদম্বরী' ও 'বিজয়-বসন্তে'র ভাষার সঙ্গে 'রত্নবতী'র ভাষার সাদৃশ্য-নির্দেশের জন্য উভয় পুস্তক থেকেই কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেলো ঃ

> ১. একদা প্রদোষসময়ে শুকনাস ও রাজা রাজভবনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে কুলবর্দ্ধনানাম্নী প্রধানা পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার কর্ণে মহিষীর গর্ভসঞ্চারের সংবাদ কহিল। নরপতি শুভসংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদে কলেবর রোমাঞ্চিত ও কপোলমূল বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন হর্ষোৎফুল্ল লোচনে শুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে তিনি রাজার ও কুলবর্দ্ধনার আকৃতি দেখিয়াই অনুমান করিলেন রাজার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে।
>
> ['কাদম্বরী', কথারম্ভ][১৮]

Dhaka University Institutional Repository

> ২. একদা পরীক্ষিৎ রাজেন্দ্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারিগণ ভয়াকুল হইয়া ইতস্ততঃ নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজানুচরেরা অনেকক্ষণ মৃগের অনুসন্ধানে ও অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া, বিস্তৃত তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। রাজা অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক হরিণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। মৃগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া নক্ষত্র বেগে ধাবিত হইল। রাজাও তাহার অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ঘোটক বন-পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া মৃগতুল্য-বেগে ধাবিত হইতে পারিলনা।
>
> ['বিজয়-বসন্ত', উপক্রমণিকা][১৯]

পাশাপাশি 'রত্নবতী'র নীচের অংশটুকুর পরিচয় গ্রহণ করলে তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও কাঙাল হরিনাথের কাছে মশাররফের ঋণের আভাস পাওয়া যায় ঃ

> একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নগরের সুচারু শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজানন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে! বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ?
>
> [প্রথম পরিচ্ছেদ]

'রত্নবতী'র গদ্য নিরঙ্কুশ সাধুরীতিশাসিত ও তৎসম শব্দনির্ভর। সমকালীন গদ্যনির্ভর আখ্যানের ভাষার সাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য 'রত্নবতী'তে স্পষ্টই প্রতিফলিত। একজন সমালোচক 'রত্নবতী'র 'পঞ্চাশৎ' পৃষ্ঠার হিসেব নিয়ে দেখিয়েছেন, এ-পৃষ্ঠার ১০৯ টি শব্দের মধ্যে ১১টি সমাসবদ্ধ পদ ও ৫টি যুক্ত ক্রিয়াপদ এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা ৫১।[২০] অন্যান্য পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান নিলেও মোটামুটি এই অনুপাত রক্ষিত হবে। লক্ষণীয় যে, এই গ্রন্থে আবহ ও বিষয়ের অনুকূল নয় বলে লেখক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেননি।

মীরের উপমা-রূপক-চিত্রকল্পময় ধ্বনিমুখর গদ্যের সূচনা 'রত্নবতী'তে। এই উপাখ্যানে অলঙ্কার-প্রয়োগে অভিনবত্ব হয়তো নেই, তবে ভাষার ধ্বনি-ব্যঞ্জনা ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য এখানে যে দুর্লক্ষ্য নয়, তার দৃষ্টান্ত মিলবে উদ্ধৃত পংক্তিমালায় ঃ

> পরমেশ্বর এই সুবর্ণলতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আভরণ করিবার অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন? ... এই সৌন্দর্য্যসরোবরের পদ্মফুলটি আজ তাঁহার হৃদয়-সরোবরে শোভা সম্পাদন করিবে।
>
> [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা,

> উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতের বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের দুঃখজলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল।
>
> [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

মশাররফের রূপকল্পময় গীতধর্মী গদ্যের সূচনা 'রত্নবতী' উপাখ্যানে। উত্তরকালে এই ভাষা আরো সংহত ও পরিশীলিত হলেও 'রত্নবতী'র ভাষা-বৈশিষ্ট্য নানাকারণে উল্লেখ্য। প্রকৃতি বর্ণনায় 'রত্নবতী'র ভাষা যে গীতলস্পর্শজাত ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম, তার নমুনা যথেষ্টই পাওয়া যায়। যেমন, ক্রমশ স্ফুটমান প্রভাত-প্রকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী চিত্র ঃ

> রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী কান্তবিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।
>
> [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

চিত্রকল্প ও উপমার সমন্বিত নির্মাণে ভাষা যে-কেমন অন্তরস্পর্শী ও শোভন-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার নমুনা ঃ

> শশিসীমন্তিনী যামিনী রাজপুত্রের ভাবী দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গমন সময়ে বিহগকুলের কলরবই ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ।
>
> [প্রথম পরিচ্ছেদ]

'রত্নবতী'র ভূমিকায়, 'ভাষা-সঙ্গতি'র সামঞ্জস্য রক্ষার ত্রুটি করেননি বলে মশাররফ যে-মন্তব্য করেছেন তা একেবারে অযথার্থ হয়নি। 'রত্নবতী'র সাফল্য তার ভাষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বক্তব্য কিংবা বিষয়-গৌরবে নয়, মূলত ভাষার সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রশ্নেই স্বীকৃতি ও প্রশংসা মিলেছে। আধুনিককালে মুসলিম-রচিত সাহিত্যধারায় মার্জিত, পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ বাঙলা গদ্যভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের কৃতিত্ব তাঁরই। এ-বিষয়ে 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১৮৭০, পর্ব ৫/৫৪ খণ্ড) পত্রিকায় 'রত্নবতী'র আলোচনা প্রসঙ্গে এর ভাষাভঙ্গির যে মূল্যায়ন করা হয় তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। সমালোচক মন্তব্য করেছেন, পুঁথির মিশ্র ভাষারীতির পদ্যচর্চা ব্যতীত "মুসলমানেরা বাঙ্গালা লিখিতে পারেনা" বলে যে ধারণা প্রচলিত, "শ্রীযুক্ত মীর সাহেব সেই বোধের একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন"। 'রত্নবতী'র ভাষা-সাফল্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ প্রশংসা করে বলা হয়েছে, মীরের এই রচনা "কোন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয়না"। সমালোচক আরো উল্লেখ করেছেন, " কি বর্ণশুদ্ধি, কি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকরণ, কি রচনাকুশলতা, সকল বিষয়েই গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে" এবং "বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে গ্রন্থে বর্ণবিন্যাসে সুসাধু সংস্কৃত শব্দের কুত্রাপি ভ্রম হয় নাই"। সর্বোপরি সমালোচকের বক্তব্য, "নামপত্রে যাবনিক নামটি না থাকিলে আমরা অনায়াসে গ্রন্থখানি সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু দ্বারা বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতাম"।[২১] 'Calcutta Review (Vol. L-99, 1870) পত্রিকা তো সরাসরি 'রত্নবতী'কে মুসলমানের ছদ্মনামে অপর কোনো লেখকের রচনা বলে সন্দেহ করেছে ('We take it that the author has concealed his name the nom de plume of a Musalman'.)।[২২]

'রত্নবতী'তে মশাররফের ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম ছায়া পড়েছে এমন ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেন। এ - বিষয়ে কাজী আবদুল মান্নান মন্তব্য করেছেন, এই উপাখ্যানে লেখকের 'জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটেছে' এবং এখানে তিনি 'তাঁর আত্মজিজ্ঞাসারই জবাব খুঁজেছেন'।[২৩] আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এই ধারণা কষ্টকল্পনা মাত্র।

'রত্নবতী' রচনা হিসেবে 'অকিঞ্চিৎকর' হলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর তাৎপর্য অপরিসীম। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই বাঙলা গদ্যে মুসলিম-প্রয়াসের সার্থক ধারা যুক্ত হয়, মুসলিম রচিত সাহিত্য বাঙালীসমাজে স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করে এবং প্রথম সার্থক মুসলিম গদ্যশিল্পী হিসেবে মশাররফের আবির্ভাব সম্ভব হয়। 'রত্নবতী'ই মীরের বাঙলাসাহিত্যে প্রবেশের ছাড়পত্র।

বিষাদ-সিন্ধু

'বিষাদ-সিন্ধু' বাঙলাসাহিত্যের একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ। শিল্পবোধ, জীবনানুভূতি ও ভাষাসৌকর্যে 'বিষাদ-সিন্ধু' মশাররফ হোসেনের এক স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। মীরের অসামান্য লোকপ্রিয়তা ও ব্যাপক পরিচিতির মূলেও আছে এই গ্রন্থ। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপাখ্যানের কাহিনী। 'মহরম পর্ব্ব', 'উদ্ধার পর্ব্ব', 'এজিদবধ পর্ব্ব'— ' 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই তিনটি পর্ব স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে। ১৮৯১ সালে এর একত্রিত অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মশাররফ 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণ 'মাত' সম্বোধনে উৎসর্গ করেন দেলদুয়ার এস্টেটের জমিদার করিমন্নেসা খানমকে। অবশ্য মশাররফের সঙ্গে তাঁর 'অন্নদাত্রী' করিমন্নেসার সম্পর্কের অবনতির কারণে পরবর্তী সংস্করণে এই উৎসর্গপত্রটি প্রত্যাহৃত হয়। 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনায় মশাররফ 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সহায়তালাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। ভুবনচন্দ্র 'বিষাদ-সিন্ধু'কে "উত্তমরূপে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সজ্জিত করেন"।[২৪] অবশ্য এই তথ্যের যথার্থতা নির্ণয় এখন আর সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙলাসাহিত্যের মধ্যযুগ থেকেই কাব্য-কবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কারবালা-কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে মর্সিয়া সাহিত্যের বিশাল এক ভাণ্ডার।[২৫] আধুনিককালেও এ-ধারা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি।[২৬] কারবালার ট্রাজেডি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)-কেও স্পর্শ করেছিল। মোহররমের কাহিনী নিয়ে একটি মহৎ মহাকাব্য রচিত হতে পারে বলে তিনি মত পোষণ করেছিলেন।[২৭]

'মহরমপর্ব্বে' লেখকের 'মুখবন্ধে' মশাররফ 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী-উৎস সম্পর্কে জানিয়েছেন ঃ

> পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। ... তবে মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয় প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৮]

তবে সমালোচকবৃন্দ মশাররফের এই বক্তব্য অনুমোদনে দ্বিধান্বিত। মুনীর চৌধুরী মশাররফের দাবী সম্পর্কে যৌক্তিক সংশয় পোষণ করেছেন। তিনি দোভাষী পুঁথির সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র আন্তরিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন মশাররফের অবলম্বন ছিলো কারবালা-বিষয়ক জনপ্রিয় বাঙলা পুঁথিই।[২৯] গোলাম সাকলায়েনের অভিমত অভিন্ন।[৩০] আনিসুজ্জামান[৩১] ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামও[৩২] মনে করেন দোভাষী পুঁথিই মশাররফের কাহিনীর প্রধান প্রেরণা ও মূল উৎস। কাজী আবদুল মান্নান অনুমান করেছেন, "গ্রন্থটির প্রতি ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ সৃষ্টির" জন্যই মশাররফ কাহিনী-উৎসের প্রশ্নে আরবী-ফারসী গ্রন্থের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন।[৩৩]

তিনপর্ব্বে বিভক্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'মহরম পর্ব্বে'র পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছাব্বিশ, 'উদ্ধারপর্ব্বে'র ত্রিশ ও 'এজিদবধ পর্ব্বে' পাঁচ। অবশ্য 'মহরমপর্ব্বে'র 'উপক্রমণিকা' ও 'উদ্ধারপর্ব্বে'র 'উপসংহার'কে ধরলে আরো দুটি অধ্যায় বৃদ্ধি পাবে। এখানে পরিচ্ছেদ চিহ্নিত হয়েছে 'প্রবাহ' নামে।

'মহরম পর্ব্বে' বর্ণিত হয়েছে দামেস্ক-অধিপতি মাবিয়া-পুত্র এজিদের প্রণয়াসক্তি, ব্যর্থতা এবং তার পরিণাম। হাসানপত্নী জয়নাবের প্রতি এজিদের প্রণয়-দৌর্বল্য থাকলেও জয়নাবকে সে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। এই ব্যর্থতার সূত্রে হাসানের প্রতি সে বৈরিতা পোষণ করে এবং তার ষড়যন্ত্রকৌশলে হাসানকে জীবন দিতে হয়। এরপর এজিদ হাসান-অনুজ হোসেনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয় এবং অবশেষে কারবালা প্রান্তরের এক অসম যুদ্ধে হোসেন নিহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

'উদ্ধার পর্ব্বে'র কাহিনী-অংশে আছে বিপন্ন হোসেন-পরিবারের অস্তিত্বরক্ষা এবং ক্রোধান্ধ দুর্জয় বীর মোহাম্মদ হানিফার প্রতিশোধ-গ্রহণের বিবরণ।

'বিষাদ-সিন্ধু'র শেষখণ্ড 'এজিদবধ পর্ব্বে' হানিফার এজিদ-হত্যার প্রচেষ্টা, এজিদের ভূ-গর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষে পলায়ন ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নারকীয় কষ্টভোগ, দৈবনির্দেশে বহু প্রাণক্ষয়কারী হানিফার প্রাকৃতিক বন্দীত্ব এবং হোসেন-বংশধর জয়নাল আবেদীনের রাজ্যলাভের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। উপসংহারে লেখক সত্যের জয় ও পাপের পরিণামফল ভোগের অবশ্যম্ভাবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাস-সূত্রে জানা যায়, এজিদের সঙ্গে হাসান-হোসেনের বিবাদ-বিরোধ রাজনৈতিক, রাষ্ট্রক্ষমতার দখলই এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ। কিন্তু 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এই বৈরিতার মূল কারণ হিসেবে এজিদের জয়নাব-লাভের কামনাকেই রূপায়িত করা হয়েছে। জয়নাবই যে এই মহা-ট্রাজেডির উপলক্ষ তা তার নিজের স্বগতোক্তিতেই প্রতিপন্ন হয় ঃ

> হায়! ... আমার নিজ জীবনের আদি অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতভাগিনীই বিষাদ-সিন্ধুর মূল। জয়নাব এই মহাপ্রলয়কাণ্ডের মূল কারণ।
>
> [এজিদবধ পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ]

এ-দিক দিয়ে 'বিষাদ-সিন্ধু'র সঙ্গে হোমারের 'ইলিয়াডে'র কাহিনীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেখানেও এক রমণী, হেলেনের কারণেই ঘটে যায় গ্রীক ও ট্রোজানদের মধ্যে বিনাশী সমর, রচিত হয় মানবিক বিপর্যয়ের এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি।

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রকরণ-প্রকৃতি বিচারে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আবদুল লতিফ চৌধুরীর মতে এটি একটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'।[৩৪] এই একই অভিমত মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালেরও।[৩৫] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম একে 'উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩৬] ক্ষেত্র গুপ্ত এ-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> বাংলায় মহাকাব্যিক উপন্যাস কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু খাঁটি মহাকাব্যের কাছাকাছি উপন্যাস বিষাদসিন্ধু। বিষাদসিন্ধু গদ্যে-লেখা মহাকাব্য এবং বিষাদসিন্ধু একটি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স।[৩৭]

মুহম্মদ আবদুল হাই 'বিষাদ-সিন্ধু'র আঙ্গিক-বিষয়ে যে-সিদ্ধান্ত করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> বিষাদ-সিন্ধু খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, জীবনচরিতও নয়, তেমনি আটঘাট বাঁধা বিধিবদ্ধ 'organic plot'-এর উপন্যাসও নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্তিক আবেগমাখানো এক সংকর সৃষ্টি।[৩৮]

'বিষাদ-সিন্ধু' রচনার পশ্চাতে ইতিহাসচেতনা বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য নয়, মানবিক উপলব্ধি ও শিল্পপ্রেরণার প্রভাবই সক্রিয় ছিলো বলে সমালোচকদের অনুমান।[৩৯] তাই এই উপাখ্যানে লেখকের ইতিহাসনিষ্ঠা বারবার বিচ্যুত হয়েছে, রূপায়িত হয়নি ধর্মীয় উদ্দেশ্যও ।

মহাকাব্যিক ক্যানভাসে অঙ্কিত, 'বিষাদ-সিন্ধু'তে গৌণ-মুখ্য চরিত্রের এক মহা-মিছিলের সমাবেশ ঘটেছে। তবে সব চরিত্রই কাহিনীর প্রয়োজনে অপরিহার্য নয় কিংবা তারা সমানভাবে প্রস্ফুটিত ও বিকশিতও হয়নি। অধিকাংশ চরিত্রই বৃত্তাবদ্ধ, তাদের আচরণ বা কর্মের মাধ্যমে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বা ইতিহাসে যে-সব চরিত্র শ্রদ্ধেয়, মহিমান্বিত, গুণসমৃদ্ধ তাঁরা এই উপন্যাসে নিতান্তই নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয়।

> মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবনবিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়পরবশ মানব-মানবীর হর্ষশোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এইজন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ, কিস্‌সা-কাহিনীর ক্রোড়োদ্‌ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকাসংলগ্ন, প্রিয়-পরিজন বেষ্টিত, শত্রু-মিত্র পরিবৃত সঞ্জীব নরনারী।[৪০]

— সমালোচকের উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'র চরিত্রসমূহের মৌল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

এজিদই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্র। তার কামনা-বাসনাকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের সূচনা এবং তার শোচনীয় বিপর্যয়েই এই কাহিনীর সমাপ্তি। তার কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করেই 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী পল্লবিত হয়ে উঠেছে। লেখক এজিদ চরিত্র-চিত্রণে যতোটা আন্তরিক ও মনোযোগী, অন্য চরিত্র অঙ্কনে ততোখানি নিবিষ্ট হতে পারেননি। রিপুশাসিত রক্ত-মাংসের একজন মানুষের প্রকৃতি, প্রবণতা ও বাস্তবতা নিয়ে এজিদ চরিত্রটি উপস্থাপিত। এ-প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর বিশ্লেষণ স্মরণীয় ঃ

> গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত চরিত্র এজিদের। তার চিন্তায়-আচরণে, আবেগে-অভিব্যক্তিতে এমন একটা দৃঢ় গাঢ় ঔজ্জ্বল্য আছে যে অন্যান্য চরিত্র তার পাশে নিতান্ত মর্যাদাহীন বলে মনে হয়। নীতিবিদের দৃষ্টিতে এজিদের ক্রিয়াকর্ম যত গর্হিত ও অভিশপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

> বিবেচিত হোক না কেন, চরিত্র বিচারের সাহিত্যিক মানদণ্ডে এজিদের মতো প্রাণময় পূর্ণাবয়ব পুরুষ সমগ্র উপন্যাসে দ্বিতীয়টি নেই। এজিদ পাপী, ধর্মদ্রোহী এবং ইন্দ্রিয়পরবশ। কিন্তু এজিদের পাপের প্রকৃতি অসামান্য, তার বিকাশ প্রলয়ঙ্করী, তার পরিণাম যেমন ভয়াবহ, তেমনি শোকাবহ। [৪১]

এজিদের রূপজমোহই তার ট্রাজিক পরিণতির জন্য দায়ী। রূপজমোহের তীব্র আগুনে এজিদ অসহায় প্রেম-পতঙ্গের মতোই দগ্ধ হয়েছে সারাজীবন। ইতিহাসে এজিদের যে রাজনৈতিক অভিপ্রায় বিবৃত, তা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। এখানে মহানবী (সঃ)-এর দৌহিত্র হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে এক রমণীর প্রতি তার তীব্র প্রণয়-কামনাই নির্দেশিত হয়েছে। রাজ্য নয় রমণীই তার লক্ষ্য। উপাখ্যানে স্পষ্টই বিবৃত হয়েছে ঃ

> এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত ও রাজমুকুটের প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষী নহেন। তিনি যে রত্নের প্রয়াসী, তিনি যে মহামূল্য ধনের প্রত্যাশী তাহা তাঁহার পিতার মনের অগোচর, বুদ্ধির অগোচর।
>
> [মহরম পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ]

উপন্যাসের সূচনাতেই এজিদ তার মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রকাশ করেছে ঃ

> পিতঃ আমার দুঃখ অনন্ত, এ দুঃখের সীমা নাই, উপশমের উপায় নাই। আমি নিরূপায় হইয়াই জগতের আশা হইতে একেবারে বহুদুরে দাঁড়াইয়াছি। আমার বিষয় বিভব, ধনজন ক্ষমতা সমস্তই অতুল, তাহা আমি জানি। .... কিন্তু আমার অন্তর যে মোহিনী মূর্ত্তির সুতীক্ষ্ম নয়নবানে বিদ্ধ হইতেছে, সে বেদনার উপশম নাই। পিত। সে বেদনার প্রতিকারের প্রতিকার নাই। যদি থাকিত তবে বলিতাম।.... আর বলিবার সাধ্য নাই। হয় দেখিবেন না হয় শুনিবেন, — এজিদ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশ নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোন নিৰ্জ্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্রধামে চলিয়া গিয়াছে। ...
>
> [মহরম পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ]

জয়নাবের প্রতি এজিদের প্রেমাসক্তির তীব্রতা সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ

> এজিদের শিরায় শিরায়, শোণিত বিন্দুর প্রতি পরমাণু-অংশে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপ্নে জয়নাব-লাভের চিন্তা অন্তরে অবিরতভাবে রহিয়াছে।
>
> [মহরম পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলেছেন ঃ

> এজিদ ত পূর্ব্ব হইতেই জয়নাবরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। যেদিন জয়নাবকে দেখিয়াছে, জয়নাবের অজ্ঞাতে সেদিন এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমলসুধা পান করিয়াছে, সেইদিন এজিদ জয়নাবকেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাব রূপসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, জয়নাবকেই জপমালা করিয়া দিবানিশি জয়নাব-নাম জপ করিতেছে। জয়নাব ধ্যান, জয়নাব জ্ঞান ।
>
> [মহরম পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ]

জয়নাব-প্রেমে উন্মাদ-প্রায় এজিদ তার জন্য 'রাজ্যসুখ তুচ্ছ' ও 'প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ' করতে উদ্যত। হাসান-হোসেনের 'বধসাধনের জন্য' মদীনায় সৈন্যদল প্রেরণে তার কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিলোনা। এজিদের মনোগত আকাঙ্ক্ষা উন্মোচিত হয় যখন মন্ত্রী মারওয়ানকে সেনাদলের অধিনায়ক নির্বাচন করে আবেগী ভাষায় সে বলে ঃ

> ভাই মারওয়ান । ..... যদি এজিদের মানরক্ষা করিতে চাও, যদি এজিদের অন্তরাগ্নি নির্বাণ করিতে চাও, যদি এজিদের মনের দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি এজিদের জয়নাবলাভের আশা-তরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও আর পশ্চাতে ফিরিওনা।
>
> [মহরম পর্ব্ব, দশম প্রবাহ]

এজিদ একনিষ্ঠ প্রেমিক। তার প্রেমে খাদ নেই, কপটতা নেই। বন্দিনী জয়নাবকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত বক্তব্যে এজিদের প্রণয়কাতর অন্তরের মর্মকথাই প্রকাশিত হয়েছে ঃ

> এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিতপ্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ? কি কারণে এজিদ আপনার চক্ষের বিষ? কি কারণে দামেস্কের পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা?
>
> [উদ্ধারপর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ]

এজিদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও— আত্মবিনাশের পদধ্বনি শুনেও জাগ্রত থাকতে জানে। মোহাম্মদ হানিফার আক্রমণে সন্ত্রস্ত এজিদ আত্মরক্ষার জন্য যখন পলায়নোদ্যত তখনও তার মনের গভীরে লালিত জয়নাবের স্মৃতি তাকে আলোড়িত করে ঃ

> বন্দীগৃহ চক্ষে পড়িল। এজিদের চক্ষে দামেস্কের বন্দীগৃহ পড়িতেই তাঁহার মন যেন কেমন করিয়া চমকিয়া উঠিল। এমন সঙ্কট সময়েও এজিদের মন যেন কেমন করিয়া উঠিল। যে রূপ হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল, সরিয়া আসিল।
>
> [এজিদবধ পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ]

Dhaka University Institutional Repository

এজিদের জীবন বেদনা, অচরিতার্থতা আর অসাফল্যে পূর্ণ। যে-জয়নাবের জন্য এজিদ মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার সকল সীমা অতিক্রম করে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জয়নাব-লাভের আশা ফলবতী হয়নি, বরঞ্চ বলি হয়েছে বহুসংখ্যক মানুষের জীবন। কৃতকর্মের জন্য তার মনে অনুশোচনা জেগেছে, আত্মদ্বন্দ্ব আর বিবেক-দংশনে জর্জরিত হয়েছে সে ঃ

> কেন হেরিলাম? সে জ্বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাহিলাম? হায়। হায়। সেই এক দিন, আর আজ এক দিন ! কি প্রমাদ। প্রেমের দায়ে কি না ঘটিল? কত প্রাণ—ছি। ছি। কত প্রাণের বিনাশ হইল !
>
> [উদ্ধার পর্ব্ব, উনবিংশ প্রবাহ]

তীব্র শোচনাজাত আত্মগ্লানি আর অন্তরের প্রচ্ছন্ন হাহাকারে দীর্ণ এজিদের এই স্বগতোক্তি তার চরিত্রের একটি ভিন্ন দিকের পরিচয় তুলে ধরে।

এজিদ-চরিত্রে নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা, দানবীয় পৈশাচিকতা, অমানবিক আচরণ— সবকিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার প্রণয়-তৃষ্ণার সূত্রে। প্রণয়ে ব্যর্থতা ও দয়িতার প্রত্যাখ্যানের মর্মপীড়া তার অন্তরে যে প্রতিহিংসার ক্রোধবহ্নি জ্বেলেছে তাতেই ভস্মীভূত হয়েছে সকল মানবিক গুণাবলী, নীতিবোধ ও স্বাভাবিক বিবেচনাশক্তি। এজিদ স্পষ্টই বলেছে ঃ

> আমি যাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি যাহার জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া এই কিশোর বয়সে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে অগ্রগামী, যাহার জন্য এতদিন কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনই সহ্য হইবেনা। এজিদের প্রাণ কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিবেনা। ..... জয়নাবলাভের প্রতিশোধ এবং সমুচিত শাস্তি অবশ্যই এজিদ তাহাদিগকে দিবে।আমার মনে যে ব্যথা দিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণে তাঁহাদের মনে ব্যথা দিব। এখনই হউক বা দুদিন পরেই হউক, এজিদ বাঁচিয়া থাকিলে ইহার অন্যথা হইবেনা; এই এজিদের প্রতিজ্ঞা।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ষষ্ঠ প্রবাহ]

প্রকৃতপক্ষে প্রণয়-প্রত্যাশাই ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে এজিদকে ক্রমান্বয়ে আসক্ত, মুগ্ধ, অভিভূত, হতাশ, রক্তাক্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, ক্রোধান্বিত, প্রতিশোধস্পৃহ ও অনুশোচনাদগ্ধ করে তোলে। প্রণয়ের প্রতিঘাতে এজিদের এই যে রূপান্তর তা তাকে বহুমাত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলেছে। “রূপজমোহ যে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে হৃদয় যথার্থ মানব-হৃদয় হইলেও সময়ে সময়ে পশুভাবে পরিণত হয়” (উদ্ধারপর্ব্ব, একবিংশ প্রবাহ)—প্রণয়-ব্যর্থ এজিদের মাত্রা-অতিক্রমী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লেখকের এই ব্যাখ্যা অযথার্থ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এজিদ-চরিত্র সৃষ্টিতে মশাররফ 'মেঘনাববধ কাব্যে'র রাবণ-চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হন বলে অনুমান করা যায়।[৪২] পুরাণ ও ইতিহাসের এই দুই 'ভিলেন' চরিত্র উনিশ শতকীয় নবচেতনায় প্রাণিত দুই মহৎ শিল্পীর হাতে নতুন তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অমিত শক্তির অধিকারী এই দুই চরিত্রেরই নিয়তি-নির্ধারিত বিপর্যয় ও পতন সম্পূর্ণ মানবিক এবং করুণা ও দীর্ঘশ্বাস উদ্রেককারী। কাজী আবদুল ওদুদ এজিদ-চরিত্রের পরিকল্পনায় রাবণ-চরিত্রের সাদৃশ্য ও প্রভাব নির্দেশ করেছেন।[৪৩] তবে সমালোচকের সতর্ক বীক্ষণে যথার্থই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে ঃ

> ... মধুসূদনের বেলায় ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিরোধ ঘটেনি — পক্ষান্তরে মশাররফ হোসেন শিল্পী ও ব্যক্তি-চৈতন্যের টানা-পোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত।[৪৪]

'প্রচণ্ড প্রতাপে, নিষ্ঠুর নির্যাতনে, ঈর্ষা-হিংসা, কূট-ষড়যন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা প্রবণতায়' এজিদ যে মহাভারতের দুর্যোধনের সমগোত্রীয়, — সে-ধারণাও কেউ কেউ পোষণ করেছেন।[৪৫]

এজিদ কেবল 'বিষাদ-সিন্ধু'র কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়, কাহিনীর নিয়ন্ত্রকশক্তিও সে। হাসান-হোসেন বা কারবালার কাহিনী এই উপন্যাসে উপলক্ষ মাত্র, মূল লক্ষ্য এজিদ, তার প্রেমতৃষ্ণার ভয়াবহ পরিণাম-নির্দেশ। তাই "শিল্পী মশাররফ এজিদ-চরিত্র রূপায়ণেই তাঁর শ্রেষ্ঠ মনোযোগ অর্পণ করেছিলেন"।[৪৬]

এই উপন্যাসে এজিদের পাপ ও প্রেমের অবস্থান সমান্তরাল। প্রেম তার জীবনকে আনন্দ-সুখে পূর্ণ করেনি, পক্ষান্তরে পাপ তার জীবনকে বেদনা-বিষে করে তুলেছে জর্জরিত। নিয়তি-নির্ধারিত এক মানবভাগ্যের করুণ পরিণতি নেমে এসেছে এজিদের জীবনে। প্রণয়-বঞ্চিত আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত এক বিক্ষত মানুষের করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনী হয়ে উঠেছে 'বিষাদ-সিন্ধু'। যথার্থই ঃ

> ইতিহাসের প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয়, এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয়-সিন্ধু।[৪৭]

একমাত্র এজিদই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রাণবন্ত চরিত্র, যার বিকাশ ও বিবর্তন আছে। অন্যসব চরিত্রই ভালো বা মন্দ এই মোটা দাগে বিভক্ত। এ-প্রসঙ্গে আবু হেনা মোস্তফা কামালের মন্তব্য স্মরণযোগ্য ঃ

> ... 'বিষাদ-সিন্ধু'র অধিকাংশ চরিত্রই হয় নিরঙ্কুশ ভালো, নয়তো নির্ভেজাল মন্দ। কাহিনীর ধর্মীয় পটভূমির কথা মনে রাখলে — যারা এজিদের পক্ষে তারা মন্দ এবং যারা হাসানের পক্ষে তারা ভালো বলে উপস্থাপিত হবে — সেটা স্বাভাবিক। এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে 'বিষাদ-সিন্ধু'র চরিত্রসমূহ প্রায়শ নির্দিষ্ট ছকের বাইরে যেতে পারেনি। ... ফলে কাহিনীর

Dhaka University Institutional Repository

> প্রয়োজনে অসংখ্য চরিত্রের আবির্ভাব ঘটলেও পাঠকের স্মৃতিতে তাদের স্থায়িত্ব জোনাকির মতো, জ্যোতিষ্কের মতো নয়।[৪৮]

ধর্ম, ন্যায়, নীতি ও সত্যের সপক্ষে ভূমিকা পালন করেছেন হাসান, হোসেন, হানিফা, গাজী রহমান, আক্তার ও জয়নাব। মারওয়ান, সীমার, জাএদা, মায়মুনা ঈর্ষা, স্বার্থ, লোভ, নিষ্ঠুরতার প্রতীক। মাবিয়া এবং অলিদ চরিত্র কিছুটা ভিন্নধর্মী। মাবিয়া এজিদের পিতা হলেও পুত্রের সব অন্যায় ও দুষ্কর্মই তিনি অনুমোদন করেননি। তাঁর সচেতন বিবেকের পরিচয় মেলে 'মহরমপর্ব্বে'র ষষ্ঠ প্রবাহে। এজিদ-সেনাপতি অলীদ-চরিত্রেও বিবেকবোধ ও বিবেচনাশক্তির পরিচয় আছে।

ধর্মপ্রাণ হাসান ও হোসেন চরিত্রে সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন ও পরিচয় 'বিষাদ-সিন্ধু'তে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সার্থকভাবে প্রতিফলিত। হাসান-চরিত্র সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি ঃ

> ... ইমাম হাসানের চরিত্র বাস্তবিক বড় মধুর করে 'বিষাদ-সিন্ধু'কার এঁকেছেন। যে বৃদ্ধ নিজের মনের বিষে তাঁকে বর্শা ফেলে মেরেছিল তার প্রতি ও তাঁর প্রাণঘাতী স্ত্রী জাএদার প্রতি তাঁর যে ব্যবহার তা বড় সৌজন্যময়।[৪৯]

হোসেনও ধর্মপ্রাণ সজ্জন, তাঁর মধ্যে কর্তব্যবোধ, নির্ভীকতা, আবেগপ্রবণতা, ক্ষমাশীলতা ও সরলতার প্রকাশ আছে। তবে এজিদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় হোসেন অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ। তাঁর ভূমিকা অনেকটাই পূর্ব-নির্ধারিত। তবুও অভাবিত মানবিক সংকটের মুখে যখন অস্তিত্ব বিপন্নপ্রায় তখনও চিন্তা ও আচরণে হোসেন অনেক বেশী জীবন্ত ও প্রাণময়।

নারীচরিত্রের মধ্যে জয়নাব , জাএদা ও মায়মুনা উল্লেখযোগ্য। এক অর্থে, 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী অনুসারে জয়নাবই এই বিনাশী সমর -সংঘাতের মূল কারণ। তার সঙ্গে হোমার বিরচিত গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াডে'র হেলেনের তুলনা করা যেতে পারে। সামগ্রিক বিচারে জয়নাবই 'বিষাদ-সিন্ধু'র নায়িকা। তার অন্তর্দহন ও ট্রাজেডীও গভীর। এই চরিত্রটির পরিকল্পনাতেও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা-চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। সমালোচক বলেছেন ঃ

> ... 'মেঘনাদবধে'র সীতা-চরিত্রের মাধুর্য ও কোমলতার অনেকখানি সমাবেশ ঘটেছে 'বিষাদ-সিন্ধু'র জয়নাব-চরিত্রে। গ্রন্থের শেষের দিকে জয়নাবের যে দীর্ঘ আত্মবিলাপ রয়েছে তারসঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।[৫০]

তবে হাসান-হোসেন যেমন এজিদ-চরিত্রের পাশাপাশি অনুজ্জ্বল, তেমনি জয়নাবও জাএদার কাছে নিষ্প্রভ।

Dhaka University Institutional Repository

জাএদা 'বিষাদ-সিন্ধু'র উপাখ্যানের "সর্বাপেক্ষা জীবন্ত মানবী"।[৫১] জাএদা এজিদের সমানধর্মা। সে এজিদের মতোই প্রেমের দাবী পূরণ করতে গিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর-অমানবিক হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনা। সামান্যতম হলেও, এজিদের অনুশোচনাবোধ আছে, কিন্তু জাএদা চরিত্রে তার লেশটুকুও মেলেনা। জাএদা চরিত্রে "প্রেমিক নারীর ঈর্ষা এবং সপত্নীদ্বেষের তীব্র রূপ" প্রকাশিত হয়েছে এবং তা "একটি অসাধারণ নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিকারের ছবি"।[৫২] "জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবেনা" (মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ)—এই উপলব্ধি থেকেই জাএদার মনে প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে ঈর্ষা। মায়মুনার সঙ্গে আলাপচারিতায় তার অন্তরের গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে ঃ

> যে আমার হইলনা, আমার মুখের দিকে যে ফিরিয়া তাকাইলনা, তাহাকে ঔষধে বশ করিয়া লাভ কি বোন ।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ]

স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা এক ব্যথিত নারীর করুণ আর্তিই এখানে ফুটে উঠেছে। প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা জাএদার একসময় মনে হয়েছে, "এখন শীঘ্র মরণ হইলেই আমি নিস্তার পাই" (মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ)। মায়মুনা যখন তাকে স্বামী হত্যার পরামর্শ দিয়েছে তখন সে এই প্রস্তাব তীব্রভাবে অগ্রাহ্য করে বলেছে ঃ

> ... এই দুঃখে যদি মরিয়াও যাই, আরও শত শত প্রকার দুঃখ যদি ভোগ করি, সপত্নী-বিষম বিষে আরও যদি জর্জ্জরিত হই, পরমায়ুর শেষপর্যন্ত যদি এই দুঃখের শেষ না হয়, তথাপিও উহা পারিবনা; আমার স্বামী আর আমি—আমার প্রাণের প্রাণ—কলিজার টুকরা আর আমি— ।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ]

একদিকে মায়মুনার প্রলোভন, প্ররোচনা, কূট-পরামর্শ, ও সপত্নীবাদের অন্তর্জ্জালা, অপরদিকে স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রীতি ও আকর্ষণ—এই টানাপোড়েনে ক্ষণিক মূহূর্তের জন্য হলেও জাএদার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ঃ

> জাএদা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া গেলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেও স্থির হইয়া বসিতে পারিলেননা। পুনরায় নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। একদিকে রাজভোগের লোভ, অপরদিকে স্বামীর প্রণয়, এই দুইটী ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। ... কতবার পরিবর্তন করিলেন, দুরাশা-পাষাণ ভাঙ্গিয়া তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম দুঃখভার

Dhaka University Institutional Repository

> চাপাইয়া দিলেন, তথাচ স্বামীর প্রাণের দিকেই বেশী ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণদণ্ডের যেদিকে স্বামীর প্রাণ, সেইদিক একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ]

এই গভীর আত্মদ্বন্দ্ব স্বামীহত্যার আয়োজনের মুহূর্তে আবার জেগে উঠেছে, কিন্তু তা ক্ষণিক বিদ্যুৎচমকের মতোই মিলিয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে ঈর্ষা আর লোভ ঃ

> ... অল্পে অল্পে দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাএদা দেখিলেন দীপ জ্বলিতেছে। এমাম হাসান শয্যায় শায়িত — জয়নাব বিমর্ষবদনে হাসানের পদ দুখানি আপন বক্ষে রাখিয়া শুইয়া আছেন। ... জাএদা বিষের পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে ক্ষান্ত দিয়া কি ভাবিয়া আর খুলিলেন না। হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্য্যন্ত, সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে সে ভাব থাকিলনা। তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি খুলিয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢালিয়া দিলেন।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ষষ্ঠদশ প্রবাহ]

সপত্নীবাদের এই যে বিষময় ফল 'বিষাদ-সিন্ধু'তে বিবৃত হয়েছে, তাতে মশাররফের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ছায়া ফেলেছে বলে সমালোচকের যে ধারণা[৫৩] আমাদের বিবেচনায় তা অমূলক নয়।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণে মশাররফ হোসেনের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ যে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাসঙ্গিক অলোচনা করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিবেচনায়, মশাররফের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারেনি মূলত তাঁর কবিসুলভ আবেগোচ্ছ্বাসের জন্য। ধর্ম ও আদর্শের অনুশীলন যাঁদের চরিত্রে সর্বাধিক, তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা না পেয়ে হয়ে উঠেছে 'ধর্মাচারের সমষ্টি-মাত্র'। তবে এর বাইরে একমাত্র সীমার ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র 'স্বাভাবিক মানুষ' হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে, কেউই নিরঙ্কুশ 'অমানুষ' বা 'শয়তান' হিসেবে চিত্রিত হয়নি।[৫৪]

পুঁথির জগৎ থেকে মশাররফ 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী চয়ন করলেও এই উপাখ্যানে তিনি যে শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়তন ও স্বভাবে মহাকাব্যিক লক্ষণাক্রান্ত এই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ভাষাসম্পদ। সমকালে 'বিষাদ-সিন্ধু'র আলোচনায় সঙ্গত কারণেই এর ভাষা-প্রসঙ্গই অধিক গুরুত্ব ও বিবেচনা লাভ করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত বিশ্লেষণ করলে মীরের ভাষা-সাফল্যের স্বরূপ বোঝা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার বিশুদ্ধতার প্রশ্নে মন্তব্য করে যে, 'বিষাদ-সিন্ধু'র মতো গ্রন্থ "বঙ্গভাষা বিস্তৃতির আর একটি নূতন পথ" এবং এর ফলে "মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি মুসলমানদিগের শ্রদ্ধা" জন্মাচ্ছে।[৫৫] "ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না"—'সিন্ধু'র ভাষাকে লক্ষ্য করে 'ভারতী'র (ফাল্গুন ১২৯৩)[৫৬] এই মন্তব্যে 'সুলভ সমাচার' (১৯ বৈশাখ ১২৯৩)[৫৭] কিংবা 'ঢাকা প্রকাশে'র (৪ আশ্বিন ১২৯৩)[৫৮] মতেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'চারুবার্ত্তা'র (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) সমালোচনায় বলা হয়, 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতার "লিপিশক্তি অতি মনোহর", "ভাষা বিশুদ্ধ মধুর ও লালিত্যপূর্ণ"। মশাররফের মতো "বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা" যে অনেক শিক্ষিত হিন্দুও লিখতে পারেননা, সেই কথাটিও আলোচক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[৫৯]

"ঐতিহাসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্বীকার করতে হয় 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ভাষা"[৬০]—সমালোচকের এই মন্তব্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা-বিশ্লেষণে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কাব্যের দ্যোতনা, আবেগের স্পন্দন, ধ্বনির ব্যঞ্জনা আর অলঙ্কারের প্রাচুর্য ,'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা-শরীরে এক ধরণের শ্রী ও কান্তি এনে দিয়েছে—অনায়াসেই স্বতন্ত্র স্বাদ অনুভব করা যায় এই ভাষায়। যেমন ঃ

> যে নগরের সুখসাগরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলা করিতেছিল, মহানন্দের স্রোত বহিতেছিল, রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, প্রধান প্রধান সৌধ আলোকময় পরিশোভিত হইয়াছিল, ঘরে ঘরে নৃত্য সহিত বাজনার ধূম পড়িয়াছিল, রঞ্জিত পতাকাসকল হেলিয়া জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল — তৎসমুদয় বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে মহানন্দবায়ু থামিয়া বিষাদ-ঝটিকা বেগে রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল। মাঙ্গলিক পতাকারাজি নতশিরে হেলিতে দুলিতে পড়িয়া গেল। রাজপ্রাসাদের বাদ্যধ্বনি, নূপুরের ঝন্‌ঝন্‌ সুমধুর কণ্ঠস্বর আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিলনা। সুহাস্য আস্ফালন বিষাদকালিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল।
>
> [উদ্ধার পর্ব্ব, ষষ্ঠ প্রবাহ]

উৎসব-আনন্দে মুখর রমণীয় প্রফুল্ল পরিবেশ বিপক্ষ ঘটনায় আকস্মিকভাবে কেমন নীরব ও নিরানন্দ হয়ে গেলো তার একটি উজ্জ্বল ছবি এখানে অঙ্কিত হয়েছে।

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষায় আবেগ আছে, চিত্রধর্মিতা, নাটকীয়তা আছে, আছে গীতিময়তা, গতিশীলতাও আছে। এজিদের প্রেমতৃষ্ণা,অন্তর্জ্বালা, আবেগ, অস্থিরতা ও মনোদ্বন্দ্ব প্রকাশে এই ভাষার সহায়তা উল্লেখযোগ্য। যেমন, রূপজ মোহে আচ্ছন্ন বিভ্রান্ত-বিক্ষত এজিদের ট্রাজিক-উপলব্ধির প্রকাশ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> প্রথম কথাতেই জয়নাবের মনের ভাব এজিদ অনেক জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হস্তে সুতীক্ষ্ম ছুরিকাও দেখিয়াছেন, সে অস্ত্র এজিদের বক্ষে বসিবেনা; যাঁহার অস্ত্র, তাঁহারই বক্ষ, তাঁহারই শোণিত, — কিন্তু বিনা আঘাতে, বিনা রক্তপাতে, নিজ হৃদয়ের রক্ত যে আজীবন শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে অদৃশ্যভাবে ঝরিতে থাকিবে, তাহাও এজিদ বুঝিয়াছিলেন।
>
> [উদ্ধার পর্ব্ব, একবিংশ প্রবাহ]

জয়নাব-প্রত্যাখ্যাত এজিদের অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও আহত পৌরুষ যখন বিক্ষুব্ধ অভিমানে চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন একজন প্রেম-ভিক্ষু বিপর্যস্ত মানুষের প্রতিকৃতি পাঠকের সম্মুখে ভেসে ওঠে।

সদ্য-বিবাহিত, যুদ্ধাহত কাসেমের অন্তিমকাল যখন আসন্ন, তখন তিনি শোণিতসিক্ত দেহে পত্নী সখিনার কাছে উপস্থিত হন। এইসময়ে তাঁর যে আচরণ ও উক্তি তাতে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে ঃ

> ... কাসেমের পরিহিত শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া পড়িতেছে। কাসেম অশ্ব হইতে নামিয়া সখিনাকে বলিলেন, 'সখিনা। দেখ, তোমার স্বামীর শাহানা পোষাক দেখ। আজ বিবাহ সময়ে উপযুক্ত পরিচ্ছেদে তোমাকে বিবাহ করি নাই, কাসেমেরই দেহবিনির্গত শোণিতধারে শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে পরিণত হইয়া বিবাহবেশ সম্পূর্ণ করিয়াছে। এই বেশ তোমাকে দেখাইবার জন্য বহুকষ্টে শত্রুদল ভেদ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আইস, এই বেশে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ শীতল করি। সখিনা। আইস, এই বেশেই আমার মানসের চিরপিপাসা নিবারণ করি ।
>
> [মহরম পর্ব্ব, পঞ্চবিংশ প্রবাহ]

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার বড়ো বৈশিষ্ট্য এর কাব্যধর্মিতায় । নির্বাচিত তৎসম শব্দের ব্যবহার, ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ, অনুপ্রাসের ধ্বনিতরঙ্গ, 'সিন্ধু'র গদ্যকে অনেকসময় কাব্যের কাছাকাছি পৌছে দেয়। তাঁর শিল্প-স্বভাবের একান্ত অনুবর্তী ছিলো এই প্রবণতা, সে-কারণেই বোধহয় 'বিষাদ-সিন্ধু'কে তিনি আখ্যাও দিয়েছেন 'মহাকাব্য' বলে। তাঁর আবেগনির্ভর গীতল গদ্যের নমুনা ঃ

> এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত যুগলচক্ষে এখন আর জল নাই। ...... যদি কিছু পড়িবার হয়, যদি এজিদের অক্ষিদ্বয় হইতে এইক্ষণে কিছু পড়িবার থাকে, তবে কি পড়িবে? ... না, না, না, সে জল নহে। যে দুইএক ফোঁটা পড়িবে, সে দুইএক ফোঁটা জল নহে — জল হইবার কথা নহে। মর্ম্মাঘাতের আহতস্থানের বিকৃত শোণিতধার, মর্ম্মাঘাতে ক্ষতস্থানের রক্তের ধারা, দুই চক্ষু ফাটিয়া পড়িবে। জগৎ দেখিবে, — এজিদের চক্ষে জল পড়ে নাই।
>
> [উদ্ধার পর্ব্ব, ঊনত্রিংশ প্রবাহ]

Dhaka University Institutional Repository

এজিদের অন্তরের শুশ্রূষাহীন বেদনা ও রক্তক্ষরণের এই আবেগময় প্রকাশ যে গদ্য ও কাব্যের ব্যবধান কমিয়ে আনে, সে-কথা অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায়।

কখনো কখনো অতি হ্রস্ব বাক্যে পৌনঃপুনিক ক্রিয়াপদ সংযোজনে ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস 'বিষাদ-সিন্ধু'র গদ্যরীতির আরেকটি বিশেষত্ব ঃ

> ভ্রাতৃগণ? চিন্তা কি — সাজ সমরে ! বন্ধুগণ! সাজ সমরে — বাজাও ডঙ্কা.,— উড়াও নিশান, — ধর তরবারি — ভাঙ্গ শিবির, — মার এজিদ, চল নগরে, দাও আগুন, পুড়ুক দামেস্ক।
>
> [উদ্ধার পর্ব্ব, ষড়বিংশ প্রবাহ]

কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস মীরের গদ্যরীতির আরেক পরিচিত ভঙ্গি। পাঠককে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণ, অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস লক্ষণীয় ঃ

> পাঠক, ঐ শুনুন - ডঙ্কা। তুরী — ভেরীর বাদ্য ! শুনিতেছেন? জয়ধ্বনির দিকে মন দিয়াছেন?
>
> [এজিদবধ পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ]

শিল্প ও ভাষারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মশাররফের ঋণ উল্লেখযোগ্য।[৬১] বঙ্কিমের সংযম ও পরিমিতিবোধ মশাররফের ভাষায় অনুপস্থিত থাকলেও বঙ্কিমী-গদ্যের প্রবহ- মানতা, গীতল স্বভাব, আবেগ ও অলঙ্কার-শোভার বৈশিষ্ট্য এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। ভাব ও ভাষায় মাঝে-মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব। যেমন নীচের দুটি অংশের সঙ্গে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশের তুলনা করা যেতে পারে। প্রেমজ মোহে আচ্ছন্ন বিরহতাপিত দীর্ণ -হৃদয় এজিদের খেদোক্তি ঃ

> হয় দেখিবেন, না হয় শুনিবেন, এজিদ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশা নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোন নির্জ্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্রধামে চলিয়া গিয়াছে।
>
> [মহরম পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ]

এ-ছাড়া, আসন্ন বিচ্ছেদ-মুহূর্তে কাসেমের প্রতি সখিনার আবেগ-গাঢ় উচ্চারণ স্মরণীয় ঃ

> যেখানে শত্রুর নাম নাই, এজিদের ভয় নাই, কারবালা প্রান্তরও নাই, ফোরাত-জলের পিপাসাও যেখানে নাই সেইস্থানে যেন আমি তোমাকে পাই ...।
>
> [মহরম পর্ব্ব, পঞ্চবিংশ প্রবাহ]

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদদ্বয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের উপসংহার-মন্তব্যের ভাব-ভাষাগত সাদৃশ্য আদৌ কষ্ট-কল্পনা নয় ঃ

> তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও, যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও ।
>
> [অষ্টম পরিচ্ছেদ, যুদ্ধক্ষেত্রে]

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা মূলত তৎসম শব্দনির্ভর সাধু-রীতির অনুবর্তী। মীরের শব্দ -চেতনার বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অলঙ্কার প্রয়োগে তেমন অভিনবত্ব নেই, সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যিক প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায়। নির্মিত উপমা-রূপকের কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ পেশ করা গেলো ঃ

> সখিনা নব অনুরাগে পরিণয়-সুত্রে তোমারই প্রণয়-পুষ্পহার কাসেম আজ গলায় পরিয়াছিল।
>
> [মহরম পর্ব্ব, পঞ্চবিংশ প্রবাহ]

এবং,

> ... যেদিন এজিদের নয়নচকোর জয়নাবের মুখ-চন্দ্রিমার পরিমলসুধা পান করিয়াছে, সেইদিন এজিদ জয়নাবকেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাবরূপ সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে ...।
>
> [মহরম পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ]

কিংবা,

> জয়নাবের হৃদয়ের ধন, অমূল্য-নিধি, সুখ-পুষ্পের আশালতা, সেই হাসান ত আর বাহ্যজগতে জীবিত নাই। ... তাহার সুখতরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিনা তুফানে আজ কয়েকদিন হইল ডুবিয়া গিয়াছে।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ঊনবিংশ প্রবাহ]

চিত্রকল্প-নির্মাণে মশাররফের নৈপুণ্য কেমন প্রকাশিত তার নমুনা ঃ

> ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। একটি সামান্য বৃক্ষপত্রে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য্য বিভাসিত হইতেছে।
>
> [মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োবিংশ প্রবাহ]

এবং,

> কাসেমের পরিহিত শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া পড়িতেছে।
>
> [মহরম পর্ব্ব, পঞ্চবিংশ প্রবাহ]

Dhaka University Institutional Repository

আবার,

> সমরাঙ্গনে অস্ত্রাগ্নি নির্বাণ হইয়াছে, কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। উর্দ্ধে অগ্নিশিখা — নিম্নে রক্তের খেলা। রক্তমাখা দেহসকল, রক্তস্রোতেই ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, গড়াইয়া যাইতেছে।
>
> [এজিদবধ পর্ব্ব, দ্বিতীয় প্রবাহ]

কিংবা,

> এখন আর সূর্য্য নাই — পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী সবেমাত্র ঘোমটা খুলিয়াছেন। তারাদল দলে-দলে দেখা দিতে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ কেহ সন্ধ্যা সীমন্তিনীর সীমান্ত-উপরিস্থ অম্বরে ঝুলিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটিমিটিভাবে চাহিতেছেন — ঘৃণার সহিত চক্ষু বন্ধ করিতেছেন, আবার দেখিতেছেন।
>
> [এজিদবধ পর্ব্ব, পঞ্চম প্রবাহ]

'বিষাদ-সিন্ধু'র আলোকে মীরের গদ্যরীতি বিষয়ে আলোচনায় সমালোচক এই উপাখ্যানে 'বাক্য গঠনে বঙ্কিমী বাক্যবন্ধের প্রভাব', বাক্যসজ্জার বৈচিত্র্য, তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার, ক্রিয়াপদে সাবেকী প্রবণতা প্রত্যাহার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি, 'বিষাদ-সিন্ধু'তে গদ্যশিল্পী মশাররফের কৃতি ও সাফল্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> ... বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যের ভিত্তি নির্মাণে বন্ধন-শৃংখলার ব্যবহার করেছিলেন। ... সেই ভিত্তির উপর বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের শ্রী ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন সেই শ্রী-সম্পন্ন গদ্যপটভূমিতে তাঁর গদ্যরচনাকে উপস্থিত করেছিলেন। তাই তাঁর বাক্যসজ্জায়, পদগুচ্ছের অবস্থানে, খণ্ডবাক্যসজ্জায়, উক্তিধর্মী বাক্যরচনায়, নিত্যসম্বন্ধী ও পরস্পরসম্বন্ধী শব্দযুগলের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি তথা বঙ্কিমী গদ্যরীতির সফল অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। বাক্যসজ্জা ও শব্দসজ্জায় তাঁর স্বোপার্জিত নৈপুণ্য ছিল তা স্বীকার করতেই হয়।[৬২]

'বিষাদ-সিন্ধু'তে মীর বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের প্রচলিত ভাষারীতিই অনুসরণ করেছেন। এখানে তৎসম শব্দের প্রাধান্যের তুলনায় আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাও যে তিনি এইসব শব্দ স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করেছেন তা নয়। এ-বিষয়ে 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন, "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।" তবুও তিনি স্বজাতি ও স্বধর্মীয়দের নিন্দা ও

Dhaka University Institutional Repository

বিরূপ সমালোচনা এড়াতে পারেননি। 'উদ্ধারপর্ব্বে'র চতুর্থ প্রবাহে তিনি উল্লেখ করেছেন, "পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বের বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন" করার কারণে "স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন"। মশাররফ ব্যথিত চিত্তে আক্ষেপ করে বলেছেন, "শাস্ত্রের খাতিরে", "সমাজের কঠিন বন্ধন" ও "দৃঢ় শাসনে" নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে "কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলামমা"। ভাষা-ব্যবহারে তাঁর ছিলো উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মন। এখানে একজন লেখক-ব্যক্তিত্বের আন্তরিক উপলব্ধি ও সচেতন ভাষাশিল্পীর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

মশাররফের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক সিদ্ধি ও সাফল্যের পরিচয় এই গ্রন্থে নিহিত। সামগ্রিক বিচারে 'বিষাদ-সিন্ধু'ই যে মীরের শ্রেষ্ঠ গদ্য-নিদর্শন, এ-কথা বলা বোধকরি অসঙ্গত হয়না।

'বিষাদ-সিন্ধু' স্মরণীয় শিল্পকর্ম হলেও এর প্রকরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয় নয়। সমালোচকের দৃষ্টিতে 'বিষাদ-সিন্ধু'র ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ [৬৩] ঃ

ক. সংযমহীন অনিয়ন্ত্রিত আবেগ।
খ. অসঙ্গতি।
গ. অলৌকিকত্ব।
ঘ. উপ-কাহিনী সংযোজন।
ঙ. চরিত্রের প্রাচুর্য ।

'বিষাদ-সিন্ধু'র সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি লেখকের সংযমের অভাব, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ও অতি-কথনের ঝোঁক। কাজী আবদুল ওদুদ মন্তব্য করেছেন, "রোমান্টিক কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস — একই সঙ্গে সেইটি 'বিষাদ-সিন্ধু'-কারের শক্তি ও দুর্বলতার কারণ"।[৬৪] কখনো কখনো অনাবশ্যক দীর্ঘ বর্ণনা কাহিনীর গতি ব্যাহত করেছে, ফলে পাঠকের মনোযোগও হয়েছে ছিন্ন। মাঝে -মধ্যেই নীতিকথার উচ্চারণ শৈল্পিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে লেখকের অভিপ্রায়কে প্রকট করে তুলেছে।

'বিষাদ-সিন্ধু'তে কিছু অসঙ্গতিও চোখে পড়ে। বিশেষ করে এজিদের বয়স-সংক্রান্ত।[৬৫] সম্ভবত লেখকের অমনোযোগই এর কারণ।

লেখক এখানে সযত্নে অলৌকিকত্বের চর্চা করেছেন। এইক্ষেত্রে জঙ্গনামার পুঁথিকারদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকতা অনেকক্ষেত্রেই মানবিক পটভূমি ও

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব পরিবেশ-চেতনাকে ক্ষুণ্ন করেছে। বলাই বাহুল্য যে, এইধরনের প্রয়াস আধুনিক জীবনচেতনা ও শিল্পদৃষ্টির পরিপন্থী। এ-কথা সত্য যে ঃ

> ... মশাররফের উচ্চকণ্ঠ অতিলৌকিকতায় কোথাও সঙ্কোচ নেই, বাস্তব যৌক্তিকতার সঙ্গে সন্ধি করার চেষ্টাও নেই। আকাশবাণী সাধুকে পথ দেখায়, দুরাত্মাকে আতঙ্কিত করে। হোসেনের ছিন্ন শির বেহেশতে চলে যায়, কারবালার শহীদদের স্বর্গীয় দেবদূতরা সানন্দ আমন্ত্রণ জানায়, অন্ধকূপের গভীরে ঈশ্বরের ক্রোধের আগুনে এজিদ দগ্ধ হতে থাকে, পাহাড়ের দেয়ালঘেরা প্রান্তরে আবদ্ধ অশ্বারোহী হানিফা অন্ধ প্রতিহিংসায় ঘুরে বেড়ায়। পাপী এজিদ এবং পাপীর শাস্তা হানিফা উভয়েরই রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অতন্দ্র প্রতীক্ষা। বিষাদসিন্ধুর অতিলৌকিকতা বঙ্কিমী ছাঁদে নয়, মহাকাব্যের মেজাজে সাধা, — যেন বিশ্ববিধানের অনিবার্য সত্য — বাস্তবতার বিচার সেখানে নীরব।[৬৬]

অপ্রয়োজনীয় উপ-কাহিনী সংযোজন কাহিনীর মূল প্রবাহ ও গতিকে শ্লথ করেছে। পাশাপাশি কাহিনীর মহাকাব্যিক আয়তনের কারণে অনেক চরিত্র সংযোজন করতে হয়েছে, যার ফলাফল উপন্যাসের জন্য অনুকূল হয়নি। অপ্রধান চরিত্রের বিপুল সমাবেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক প্রধান চরিত্রগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেননি। আর সংখ্যাধিক্যের কারণে অপ্রধান চরিত্রের প্রতিও সুবিচার করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

'বিষাদ-সিন্ধু' বাঙলাসাহিত্যের একটি সমাদৃত গ্রন্থ। পাঠক ও সমালোচক উভয় তরফেরই অনুষ্ঠ প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে এই গ্রন্থ। বাঙলাসাহিত্যের সর্বাধিক বিক্রীত ও পঠিত গ্রন্থের তালিকায় 'বিষাদ-সিন্ধু'র নাম অন্তর্ভূক্ত। 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রকাশনা-তথ্যের স্পষ্ট হিসেব না পাওয়া গেলেও নানা সূত্র থেকে অনুমান করা চলে সবমিলিয়ে এর ত্রিশটিরও অধিক সংস্করণ প্রকাশিত এবং লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়।[৬৭] এই তথ্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র অসামান্য জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। এককালে বাঙালী মুসলমানের গৃহে 'বিষাদ-সিন্ধু' ধর্মীয় গ্রন্থের মর্যাদায় সংরক্ষিত ও পঠিত হতো ।

'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তার কারণে ভিন্ন ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হয়। এর একটি হিন্দী সংস্করণের সংবাদ জানা যায়। 'কাণ্যকুব্জ' পত্রিকার সম্পাদক বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী মঞ্জুল হিন্দীভাষায় এর তর্জমা করেন এবং এটি ১৯৩০ সালে এলাহাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়।[৬৮]

'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-সমালোচকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়। সেকালের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকাই এর প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশ করে। মূলত ভাষা-প্রসঙ্গ এই প্রশংসার সিংহভাগ জুড়ে থাকলেও এর অন্য দিকগুলোও অলোচকদের মনোযোগলাভে ব্যর্থ হয়নি। 'গ্রামবার্ত্তা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিকা' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)[৬৯] ও 'চারুবার্ত্তা (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)[৭০] 'করুণ রসে পরিপূর্ণ' 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠে 'অশ্রু সংবরণ করা যায়না বলে মন্তব্য করেছে। সুলভ সমাচার' (১৯ বৈশাখ ১২৯৩) একে 'পবিত্র সত্য উপন্যাস' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।[৭১] 'প্লাবনী করুণা রসে টলটল' 'বিষাদ-সিন্ধু' অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে 'বিচলিত' করেছিল।[৭২] সাহিত্যিক-সাময়িকপত্রসেবী শেখ আবদুর রহিম মন্তব্য করেছেন, 'বিষাদ-সিন্ধু'র বিষাদমাখা সুর যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে, ... তাহারাই জানেন, [মশাররফ] কি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'।[৭৩]

'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে'র বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৮৮৭) 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'উদ্ধার পর্ব্ব' সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এই চুম্বক-মন্তব্যে মশাররফের শিল্প-প্রতিভার যে মূল্যায়ন করা হয় তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> Mir Mosharraf Hossain's Bishad Sindhu, based on the events before and after the great battle of Karbala, is one of the best works in the Bengali Language. The earnestness and pathos of the work, its elevated moral tone and dignified diction, raise it to a high level, and mark a distinct departure, both in matter and in manner, from the current examples of imaginative writing in Bengali.[৭৪]

তবে 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমাদর-প্রশংসার পাশাপাশি বিরূপ সমালোচনাও কিছু কিছু হয়েছে। কায়কোবাদ তাঁর 'মহরম শরিফ' (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় 'বিষাদ-সিন্ধু'র কঠোর সমালোচনা করেন। 'মহরম শরিফ' রচনার কারণ হিসেবে তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনৈতিহাসিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, "মীর মোশাররফ হোসেন সাহেব কল্পনারাজ্যের কতকগুলি অবান্তর কথা লিখিয়া—ঘটনা উপন্যাস আকারে সাজাইয়া ইসলামের হৃদয়-পঞ্জরে তীব্র শেলাঘাত করিয়াছিলেন।"[৭৫] কায়কোবাদের বিবেচনায় 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী 'অবান্তর কথা', মশাররফ 'মুসলমান ধর্ম্ম ও জাতির উপরে ঘোর কলঙ্ক-কালিমার অনুলেপন' করেছেন, 'বিষাদ-সিন্ধু'জাতীয় রচনা 'পূতিগন্ধময় রাবিশ' ও 'কাল্পনিক বাজে কথায় পরিপূর্ণ'।[৭৬] অবশ্য উপসংহারে কায়কোবাদ স্বীকার করেছেন, 'মুসলমান বাংলাসাহিত্যের শৈশব অবস্থা'য় রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'শত দোষ থাকিলেও তাহা মাজ্জনীয়' এবং এই গ্রন্থই মশাররফকে 'অমর করিয়া রাখিয়াছে'।[৭৭]

'বিষাদ-সিন্ধু' নিয়তি-লাঞ্ছিত মানবভাগ্যের এক মর্মস্পর্শী গদ্য-মহাকাব্য। একদিকে নীতি , ন্যায় ও সত্য এবং অপরদিকে মানবের কামনা-বাসনা ও শিল্পের দায় — এই দুই টানাপোড়েনে মশাররফ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিধবিভক্ত হয়েছেন। মশাররফের ধর্মচেতনা ও স্বজাতির কাছে দায়বদ্ধতা তাঁকে অনিবার্যভাবে হাসান-হোসেনের পক্ষাবলম্বী করে তুলেছে, এখানে সত্যের জয়-বন্দনায় তাঁর মনোযোগ নিবেদিত। কিন্তু শিল্পী মশাররফের সহানুভূতি ও মমত্ববোধ যে এজিদের প্রতিও ধাবিত, তা-ও বিস্মৃত হওয়া চলেনা। বাহ্যত হাসান-হোসেনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত, কিন্তু শিল্প-মনোরাজ্যের গভীরে 'দুরাত্মা' এজিদই আন্তরিক অনুরাগ ও মমতায় প্রতিষ্ঠিত। শিল্পী মশাররফের অভিপ্রায়ের বিজয় সাধিত হয়েছে এই ধর্মাশ্রিত কাহিনীর শিল্প-রূপায়ণে। প্রকৃতপক্ষে, "... মানব-নিষ্ঠা মশাররফের শিল্পী-চৈতন্যে যে-নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো—তার প্রয়োগই 'বিষাদ-সিন্ধু' পুঁথি-সাহিত্যের উপাদান আশ্রিত হয়েও আধুনিক জীবন-বেদে রূপান্তরলাভ করেছে ..."।[৭৮]

বাঙলাসাহিত্যে মশাররফের স্থান-নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা করে যে-মন্তব্য করেছিলেন, 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রেক্ষাপটে মশাররফ হোসেনের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে সেই উক্তি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ঃ

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদ-সিন্ধু' তেমনই আজও পর্য্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয় ; বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্যকাব্যখানির সমান আদর। ... তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, সুদূর অতীতের কারবালা-প্রান্তরের ট্রাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর ট্রাজেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।[৭৯]

উদাসীন পথিকের মনের কথা

মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯০ খৃঃ)। এই গ্রন্থে লেখক 'উদাসীন পথিক' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, তবে স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বনামই মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রকৃত অধ্যায় সংখ্যা বিয়াল্লিশ। মুদ্রণ প্রমাদের ফলে শেষ অধ্যায়টি 'সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ' হিসেবে মুদ্রিত হওয়ায় অধ্যায় সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি জন্মে। এখানে অধ্যায় 'তরঙ্গ' নামে অভিহিত। প্রতিটি তরঙ্গের সূচনায় শীর্ষদেশে উপ-শিরোনামে অধ্যায়ের বিষয় সম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' একাধিক খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা লেখকের ছিলো। গ্রন্থের শেষে 'পথিকের নিবেদনে' লেখক বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> মনের কথার প্রথম স্তর মন খুলিয়া দেখাইলাম। কত স্তরে এবং কত তরঙ্গে এ কথার ইতি হইবে, তাহা পথিক অজ্ঞাত। তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে, পথিকের জীবনের ইতির সহিত কথার ইতি হইবে। আক্ষেপ রহিয়া যাইবে। কথা ফুরাইবে না। যত সত্বরে সম্ভব, ২য় স্তর প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

কিন্তু এই প্রতিশ্রুত '২য় স্তর' বা খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' মীরের গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'অতি আশ্চর্য্য উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৮০] 'ভারতী ও বালক' (বৈশাখ ১২৯৮) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "সমালোচ্য পুস্তকখানি ঠিক উপন্যাস নহে, ইহা উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনীপূর্ণ"।[৮১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একে 'উপন্যাস' হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।[৮২] মুনীর চৌধুরীর বিবেচনায় এটি মশাররফের 'আত্মজীবনীমূলক রচনা'।[৮৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতও অভিন্ন।[৮৪] গ্রন্থটি যে উপন্যাসই সে-সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন ক্ষেত্র গুপ্ত।[৮৫] তবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে নির্ভেজাল উপন্যাস বা নিছক আত্মকথা না বলে একে উপন্যাসের আদলে মশাররফের শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর বাস্তব ঘটনার আলেখ্য হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কাহিনী 'দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত'।[৮৬] এই কাহিনীর একদিকে রয়েছে নীলকর টি. আই. কেনীর সঙ্গে সুন্দরপুরের মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরীর দ্বন্দ্ব, রায়ত-প্রজার উপর কেনীর অত্যাচার-নিপীড়ন, নীলবিদ্রোহ ও কেনীর পরিণতি। কাহিনীর দ্বিতীয় ধারাটি গড়ে উঠেছে মশাররফ-জনক মীর মোয়াজ্জম হোসেনের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী-পতি সাগোলামের তিক্ত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এবং এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোয়াজ্জম হোসেনের দাম্পত্যজীবনের ঘটনা। অবশ্য এই সমান্তরাল দ্বি-ধারার কাহিনীটি মাঝে-মধ্যে একীভূত হয়েছে। মোয়াজ্জম হোসেন এই দুই কাহিনীর যোগসূত্র। নীলকর কেনীর সুহৃদ ও সহায় হিসেবে তিনি কাহিনীর প্রথম ধারার সঙ্গে যুক্ত, আবার দ্বিতীয় ধারাতেও তিনি উপস্থিত। বিষয়-সম্পত্তিগত পারিবারিক বিরোধের পটভূমিতে কাহিনীর দ্বিতীয় ধারায় সা গোলামের আবির্ভাব, কিন্তু পরে নীলবিদ্রোহের নেতা হিসেবে তিনি কাহিনীর প্রথম ধারার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়েন। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটিকে দুটি ধারায় বিভক্ত মনে হলেও এর পরিচর্যা মূলত কেনীকেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিচারে এই কাহিনী মূলত কেনী-কাহিনী।

এই উপ্যাখানের কাহিনী ও স্থান-কাল-পাত্র বাস্তবভিত্তিক।[৮৭] কেনী, প্যারীসুন্দরী, মীর মোয়াজ্জম, সা গোলাম—এইসব প্রধান পাত্র-পাত্রী আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্তর্গত বাস্তব ভূমিতেই আবির্ভূত। কেনীর অত্যাচারের কাহিনী সমকালীন নথিপত্রে সমর্থিত।[৮৮] মোয়াজ্জম হোসেনের সঙ্গে সা গোলামের বিরোধ,

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়া, মীর সাহেবের আমোদ-স্ফূর্তি ও তাঁর পত্নীর অকাল প্রয়াণ—এ-সব ঘটনার উল্লেখ মশাররফের 'আমার জীবনী'তেও মেলে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বাস্তব ঘটনার পটভূমিকায় রচিত একটি উপন্যাসধর্মী রচনা। তবে এতে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। প্লটবিহীন শিথিলবন্ধন কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের জন্য প্রত্যাশিত নিবিড় ঐক্যসূত্র গড়ে উঠতে পারেনি। 'ভারতী ও বালক' (বৈশাখ ১২৯৮) পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে একে 'উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করা হয়, "অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে—তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটী হয় নাই"।[৮৯] এ-প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য ঃ

> সত্যকথন অবিমিশ্র না হওয়ায় আত্মজীবনী হিসেবে এর মূল্য কমেছে, কল্পনা অবাধ হতে না পারায় এর গল্পরসে ঘাটতি পড়েছে।[৯০]

প্রকৃতপক্ষে এখানে "সত্য ও কল্পনার মিশ্র উপাদানে সৃষ্ট এমন একটি সাহিত্যরূপ ধরা পড়েছে, যা আমাদের পরিচিত আঙ্গিক-সমূহের কোন একটির অঙ্গীভূত করা চলেনা"।[৯১]

'উদাসীন পথিকের মনের কথায় অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তবে এক কেনী ছাড়া অন্য কোনো চরিত্রই বিকশিত হয়নি। অধিকাংশ চরিত্রই খণ্ড-চরিত্রের স্বল্পস্থায়ী কুশীলব। কেবল ভূমিকা পালনের জন্যই যেনো তাদের আবির্ভাব। তবে এ-ধারায় জকি কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্র। চরিত্র-নির্মাণ অপেক্ষা কাহিনী বর্ণনাতেই মশাররফের মনোযোগ অধিক নিবিষ্ট ছিলো বলে চরিত্রগুলো পূর্ণাবয়ব লাভ করেনি।

টি. আই. কেনী এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উজ্জ্বল চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি। লেখকের বর্ণনায় কেনীর পরিচয় ঃ

> সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক। যা করে—কেনী। ....নীলের উন্নতি, রেসমের উন্নতি, চতুর্দ্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়। ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দৌরাত্ম্য আগুনে দেশের লোক জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল।
>
> [চতুর্থ তরঙ্গ]

এর উপরে আবার 'কেনীর অনারারী মাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল'। তাই ঃ

> জমিদার কেনী— বিচারকর্ত্তা কেনী—মহারাজও কেনী। রাখেন তিনি, মারেন তিনি।
>
> [চতুর্থ তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

অমানবিক নিষ্ঠুরতা কেনী-চরিত্রের প্রধান বৈষিষ্ট্য। প্রজাপীড়নে তাঁর জুড়ি নেই। নীলচাষের জন্য রায়ত-প্রজার উপর তাঁর জুলুম-জবরদস্তি ছিলো সীমাহীন। অবাধ্য-অপারগ প্রজাকে শায়েস্তা করার জন্য 'শ্যামচাঁদে'র প্রয়োগ ছিলো অবাধ, বুনানী ধান ভেঙে নীলচাষ ছিলো অতি সাধারণ ঘটনা, প্রজার সম্পদ-সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং ঘরবাড়ী ভাঙচুর-লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ ছিলো তাঁর নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেনীর কয়েদখানা ছিলো অমানবিক অত্যাচারের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। জানা যায় ঃ

> এ গুদাম—বড় ভয়ানক বন্দীখানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না হউক, কয়েদী দুবেলা দুমুঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা-নয়, এ বন্দীখানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব—অন্য কারবার—বড় ভয়ানক স্থান। সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিসকাঁথা কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান। —ধান বাছ, চাল্ বাহির কর, জলে মিশিয়ে গিলে ফেল।
>
> [চতুর্থ তরঙ্গ]

কেনীর আক্রোশ, প্রতিহিংসা, কাম ও লোভের আগুনে নিরীহ-দরিদ্র রায়ত-প্রজার সোনার সংসার নিত্যই ভস্মীভূত হয়েছে।

কেনী ধূর্ত, কৌশলী, স্বার্থবুদ্ধিতাড়িত এবং সাহসীও। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালদের শায়েস্তা করার জন্য জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে গোপনে কুঠিতে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী মনোভাবের পরিচয় মেলে। জমিদার ভৈরববাবুকে বিপন্ন-নিঃস্ব করার কৌশল হিসেবে কেনী তাঁর খাজনা-লুটের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থকাম হয়ে অভিযুক্ত কেনী যখন আদালতে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন উদ্যোগী হয়ে ভৈরববাবুর সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে চৌদ্দহাজার টাকার দায় থেকে অব্যাহতি পান। স্বার্থোদ্ধারে নতিস্বীকারের কৌশল অবলম্বন করতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। সম্মুখ-সংঘর্ষে কেনী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপস্থিত থেকে তাঁর অনুচর-লাঠিয়ালদের উৎসাহিত করে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বার্থান্ধ কেনীর অত্যাচার-অবিচার-নিষ্ঠুরতা-অমানবিক আচরণের পাশাপাশি ক্বচিৎ কখনো বিবেচনা ও নীতিবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রতিশোধস্পৃহ ক্ষিপ্ত কেনী অবিশ্বাসী জকি গাড়োয়ানের বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন করে শূন্য ভিটেয় চাষ দিয়ে নীল বুনানীর নির্দেশদানের সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বলে সতর্ক করে দেন ঃ

> মুসলমানেরা কবরকে বড় মান্য করে। কোন কবরের উপর যেন চাষ দেওয়া না হয়। সাবধান।
>
> [উনবিংশ তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

এই বক্তব্য কেনীর বিবেচনাবোধের স্বাক্ষর। আবার মানবসেবাতেও তাঁর আগ্রহ দেখা যায় ঃ

> টি. আই. কেনী চিকিৎসাশাস্ত্র ভালই জানিতেন। নানা প্রকারের ঔষধ তাঁহার কুঠীতে থাকিত। কোন পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ চাহিলে বিনামূল্যে দান করিতেন।
>
> [ষোড়শ তরঙ্গ]

কেনীর চরিত্রে সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন লক্ষ্য করা না গেলেও উপরিউক্ত ঘটনাবলি তাঁর চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবিক-দিকে আলো ফেলে।

কেনী ইন্দ্রিয়পরায়ণ হলেও তাঁর পত্নীপ্রেম ছিলো প্রবল ও গভীর। পত্নীর প্রতি কেনীর একনিষ্ঠ অনুরাগের পরিচয় মেলে পত্নীর অবর্তমানে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ঃ

> মেমসাহেব বিলাতযাত্রা করিলেন টি. আই. কেনী তিনদিবস শয়নগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেননা। কোন কাজকর্ম্মও দেখিলেননা। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, সাহেব 'সোয়ার কামরায়।'.... মেমসাহেব বিলাত গিয়াছেন, তাহাতেই সাহেবের মন ভাল নাই।—কাজকামের দিকে তত মন নাই।
>
> [চতুর্দশ তরঙ্গ]

এ-ছবি পত্নীবিরহকাতর এক প্রেমিক স্বামী ও গৃহস্থ মানুষের, অত্যাচারী-বিষয়মত্ত-ইন্দ্রিয়াসক্ত কুখ্যাত নীলকর এখানে অনুপস্থিত।

জকি গাড়োয়ানের স্ত্রী ময়নাকে কেন্দ্র করে কেনীর এক আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অর্থের বিনিময়ে জকিকে বশ করে কেনী ময়নার সঙ্গে গোপন অভিসারে মিলিত হওয়ার অবাধ সুযোগ লাভ করে। ইন্দ্রিয়সুখই ছিলো কেনীর লক্ষ্য। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধ সেবন করে ময়না যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তখন বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত কেনী জকিকে বলেন, "ও ম্যান—তুম ক্যা কিয়া"। দুঃখ-শোচনায় কেনী দাঁতে আঙুল কাটেন। ময়নার মৃত্যুর পর কেনীর আচরণ এই গ্রাম্য রমণীর প্রতি তার প্রচ্ছন্ন অনুরাগজনিত শোক বলে অনুমিত হয় ঃ

> টি. আই. কেনী আজ সপ্তাহকাল নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। বিষয় বিভবের কথা ভুলিয়াছেন, মামলা মোকদ্দমার কথা ভুলিয়াছেন। ... কেনী কয়েকদিন হইতেই বিষাদিত, চিন্তিত, ভাবিত। সময় সময় সাদা চক্ষু সাদা জলে পরিপূরিত। কারণ কি? ...... সহস্র অবলার অঙ্গাবরণ হরণকালে যে হৃদয় একটুও নড়ে নাই, শত সহস্র প্রজার ঘরের চালের আগুন দেখিয়া যে হৃদয়ে ব্যথা লাগে নাই—জ্বালাও লাগাও লুটিয়া লও, এইসকল হুকুম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গের নিরীহ প্রজার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, কুলবধূর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি মহাপাপ কার্য্য দেখিয়া যে বিলাতী হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, যে চক্ষু ঐ সকল মহামারী ঘটনা দেখিয়া একটু নীচে নামে নাই, সে চক্ষে জল। গণ্ডস্থল ভাসিয়া বালিশ ভিজিতেছে। পালঙ্কের গদি ভিজিতেছে, ইহার মর্ম্ম কে বুঝিবে?

[ষোড়শ তরঙ্গ]

মিসেস্ কেনীও বিলাত থেকে ফিরে এসে কেনীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। স্বামীর প্রেমস্পর্শে আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব অনুভব করেছেন। লেখক আভাসে-ইঙ্গিতে কেনীর এই মনো-রূপান্তরের কারণ নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গটি হৃদয়হীন লম্পট কেনীর মমত্বশীল প্রেমিকে রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে।

কেনী জেদী, একগুঁয়ে, উদ্যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নীলবিদ্রোহের কালে যখন কেনীর জীবন ও সম্পদ বিপন্ন, তাঁর কুঠি ও গৃহের সকল কর্মচারী বিদ্রোহী প্রজাদের ভয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, সেই মুহূর্তেও কেনী ভেঙে পড়েননি। সংকট মোকাবিলার জন্য কলিকাতা থেকে চাকর-খানসামা-বাবুর্চি আমদানী করেছেন।

কেনী নীলচাষ আর জমিদারীর খাজনা আদায়ে বাঙালী কৃষক বা কর্মচারীর কোনো সাহায্য গ্রহণ করবেন না বলে 'স্থির সংকল্প' করেন। সরকারের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা এবং বিলাত থেকে কলের লাঙল ও মাড়াই কল আনেন ঃ

এদিকে কলের লাঙ্গল বিলাত হইতে আসিয়া পড়িল। নীল মাই জন্য নীল হউজেও বিলাতী কলকৌশল বসান হইল। নীলজমি চাষ, নীল কর্ত্তন, নীল মাই ইত্যাদি সমুদায় কলের কৌশলে, ইন্‌জিনের বলে সম্পন্ন হইবে, প্রজার সাহায্য কিছুতেই লওয়া হইবেনা। ইহাই কেনীর আন্তরিক সঙ্কল্প। করিলেনও তাই।

[ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ]

শুধু তাই নয়, 'গায়ের জ্বালায় আর মনের ক্ষোভে' কেনীর বিরুদ্ধাচারী নীলবিদ্রোহের নেতা সা গোলামের নামে কলের লাঙলের নামকরণ করেন। এ-কথা সঠিক যে, "কেনী সত্যবাদী না হউক, লাজুক না হউক, দয়াল না হউক, রাগ আছে, ঘৃণাও আছে।"

কেনী নিজের অহঙ্কার ও জেদ বজায় রাখতে গিয়ে ঋণী এবং নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখেও আপোষের চিন্তা করেননি, নরম হননি। কেনী নিশ্চিহ্ন হতে পারেন কিন্তু পরাজিত হতে জানেননা। পৌরুষের অহঙ্কার কখনোই ছাড়েননি তিনি, তাই অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারেন, "আমার বেতটুপী সার।

Dhaka University Institutional Repository

যদি নাই থাক্‌তে পারি যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া যাইব" (দশম তরঙ্গ)। ভোগে, প্রেমে, নির্মমতায়, আবেগে, সাহসে, প্রতিহিংসায়, লোভে কেনী-চরিত্রে 'বিষাদ-সিন্ধু'র এজিদের ছায়া যেনো দেখতে পাওয়া যায়।[৯২] কেনী প্রজাপীড়ক, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়া সত্ত্বেও অমানুষ কিংবা হৃদয়হীন বর্বরে পরিণত হননি, বরং রিপুনিয়ন্ত্রিত একজন মানুষ হিসেবেই চিত্রিত হয়েছেন।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় মীর সাহেব 'মোসলমান সমাজের সমুজ্জল রত্ন' হিসেবে অভিহিত। তিনি মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন। লেখকের বর্ণনায় জানা যায়, "মীরসাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী" (দ্বিতীয় তরঙ্গ)।

মীর সাহেব নীলকর কেনীর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, অবশ্য প্যারীসুন্দরীর ভাষায় 'কেনীর আজ্ঞাবহ'। কেনীর সঙ্গে তাঁর সখ্যতা এতোই গাঢ় যে, কেনী বিপদে-প্রয়োজনে তাঁর উদার সাহায্য ও পরামর্শ সবসময়ই পেয়ে থাকেন। প্রজা-শায়েস্তার জন্য কেনীর সাহায্যে লাঠিয়াল প্রেরণ কিংবা কেনীর বিপদ-মুহূর্তে ঝুঁকি নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানো—এ-সবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে মীর সাহেব করেছেন। উভয়ের মধ্যে একটা আন্তরিক সমঝোতা ছিলো। নীলবিদ্রোহের সময় যখন কেনীর জীবন ও সম্পদ উভয়ই বিপন্ন, সকলেই একে একে পরিত্যাগ করেছে তাঁকে, তখন একমাত্র মীরসাহেবই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। সেই সময়ে ঃ

> প্রকাশ্যভাবে কেনীর সহিত দেখাসাক্ষাত মীর সাহেবের আর সাধ্য নাই।প্রকাশ্য চিঠিপত্র চালাইতেও আর ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ২/১টী লোককে ফকীর সাজাইয়া ঝোলার মধ্যে চিঠি নিশীথ সময়ে অতি সাবধানে খবর আনা-নেওয়া করেন। নিজের লোকজন দ্বারা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া, অতি গোপনে শালঘর মধুয়ায় অপথে পাঠাইয়া দেন।
> [চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ]

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মীরসাহেবকে কেনীর পক্ষাবলম্বন করতে হলেও তাঁর বিবেক-বিবেচনা তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জন দেননি। কেনীর সব কাজই তিনি অনুমোদন করতে পারেননি। তাই কেনী যখন মীর সাহেবকে প্যারীসুন্দরীর প্রজাদের উপর তাঁর বিজয়ের কাহিনী, অর্থাৎ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কথা জানিয়ে পত্র দেন, তখন ঃ

> মীর সাহেব প্যারীসুন্দরীরর দুরবস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।
> [চতুর্থ তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

প্যারীসুন্দরী যখন কেনীকে শায়েস্তা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন, সেই সংবাদ শুনে মীর সাহেব তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন ঃ

> ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস। সাহেবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন সকলকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়।
>
> [একাদশ তরঙ্গ]

আবার কেনী পাংশার জমিদার ভৈরববাবুকে জব্দ করার কথা চিন্তা করলে মীর সাহেব তাঁকে ভৈরববাবুর মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে-বিষয়ে অনুরোধ করেন। এ-সব তাঁর স্বাজাত্য-প্রীতিরই নিদর্শন।

আমোদপ্রিয় মীর সাহেব ছিলেন শিথিল নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। উনিশ শতকের সামন্ত শ্রেণীর স্থূল আমোদ-প্রমোদের চর্চা তাঁর মধ্যেও ছিলো। যেমন ঃ

> ... মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে। দেশীয় নর্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দসাগরে হাবুডুব খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।
>
> [সপ্তম তরঙ্গ]

বিপত্নীক মীর সাহেবের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পরেও তাঁর আমোদ-প্রমোদে ভাটা পড়েনি। বরং এইসময়ে পত্নীর জ্ঞাতসারে আবাসগৃহের সংলগ্নস্থানেই রক্ষিতা পোষণ করতে কুণ্ঠিত হননি। রূপসী নাম্নী এই রক্ষিতাই তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর অকালমৃত্যুর কারণ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মীরসাহেবের পত্নীপ্রেম অকৃত্রিম ছিলোনা।

সা গোলাম এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কিন্তু লেখক বিষয়সম্পত্তিগত পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণের জন্য তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। সা গোলাম -চরিত্রের দুটি ভিন্নধর্মী দিক এখানে প্রকাশিত হয়েছে ঃ প্রথমত বিষয়লোভী, ধূর্ত, অবিশ্বস্ত এবং দ্বিতীয়ত নীলবিদ্রোহের নির্ভীক নেতৃপুরুষ হিসেবে।

সা গোলাম মীর সাহেবের ভ্রাতৃ-জামাতা। 'ঘর জামাই' হিসেবে শ্বশুরালয় সাঁওতাতেই তাঁর বসবাস। লেখক সা গোলামের পরিবার সম্পর্কে অন্যের জবানীতে অনেক মন্দ কথা বলেছেন। তাঁকে 'মূর্খ নিরক্ষর' বলে অভিহিত করে তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> সা গোলাম দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখ চোখা, মাথায় কোঁকড়া চুল, চক্ষু দুটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভ্রূকুঞ্চিত। শীঘ্র কথা, অস্পষ্ট কথা, বিশেষ মনোযোগ করিয়া না শুনিলে সে কথা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তিনি অনেক শিষ্টচারী করিয়া বিশেষ ঐক্যের সহিত সংসারের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন।
>
> [দ্বিতীয় তরঙ্গ]

সা গোলাম বিচক্ষণ, বিষয়বুদ্ধিতে পাকা। বিবাহের পর মীর সাহেব তাঁর হাতে জমিদারীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সা গোলামের উদ্যোগ ও চেষ্টায় বিষয়-সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিও হয়। কিন্তু সা গোলামের বিষয়-লোভ তাঁকে অমানুষের পর্যায়ে নিয়ে যায়। স্বার্থের মোহে তিনি দলিল চুরি, দলিল জাল, বিষ-প্রয়োগে মীর সাহেবকে হত্যার চেষ্টা এবং শেষপর্যন্ত জোর-জালিয়াতির মাধ্যমে মীর সাহেবের সম্পত্তি আত্মসাৎ ও তাঁকে ভদ্রাসন থেকে উচ্ছেদ করতে দ্বিধা করেননি। ভালোমানুষের ছদ্মবেশধারী কপট সা গোলামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের উক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে ঃ

> আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করেনা। ধর্ম্মভয় আমার অতি কম।
>
> [সপ্তম তরঙ্গ]

কার্যক্ষেত্রে সা গোলাম তাঁর এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণে কুণ্ঠিত হননি।

শঠতা, প্রবঞ্চনা, ক্রূরতা, অবিশ্বস্ততার বিপরীতে কৃষকদরদী নীলবিদ্রোহের নেতা সা গোলামের ভূমিকা এক আশ্চর্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী চিত্র। সা গোলামের চরিত্র এক নিকৃষ্ট ভিলেনের গণ-নায়কে উত্তরণ ও রূপান্তরের ইতিহাস। "মীর সাহেব নীলকরের পক্ষ, সা গোলাম প্রজার পক্ষ" (ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ)—সা গোলামের জন্য এ-এক গৌরব ও মর্যাদাময় স্বীকৃতি।[৯৩] কেনী তাঁর বিপর্যয়ের জন্য সা গোলামকেই যে দোষী সাব্যস্ত করেন তা বেশ বোঝা যায় যখন তিনি 'গায়ের জ্বালায় মনের ক্ষোভে' নীলের জমিচাষের জন্য বিলাত থেকে আনা কলের লাঙলের নামকরণ করেন 'সা গোলাম'। নীলবিদ্রোহের নায়কের এ-ও এক দুর্লভ সম্মান। জীবন বাজী রেখে কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে তিনি নির্যাতিত নীলচাষীকে সংগঠিত করে দোর্দন্ত প্রতাপ নীলকর কেনীর পতন ঘটিয়েছেন। "প্রজার পক্ষে থাকিয়া আশার অতিরিক্ত অর্থের মুখ দেখিতেছেন"—লেখকের ঈর্ষা-দ্বেষজনিত এই মন্তব্য নীলবিদ্রোহের নেতা সা গোলামের সাহসী ভূমিকার মহত্ত্বকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

সা গোলাম তাঁর বৈষয়িক ও আদর্শিক প্রতিপক্ষ মীরসাহেবকে অপদস্ত, জব্দ ও নিশ্চিহ্ন করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তা ব্যবহার করেননি। বরঞ্চ বিদ্রোহীদলের সিদ্ধান্ত হয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁহার [মীর সাহেব] প্রতি তাঁহার পরিবার পরিজন প্রতি বিদ্রোহী দল কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, এ কথা প্রধান বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কৌশলে তাঁহাকে কষ্টে ফেলিয়া আপন দলে আনিবে, ইহার চেষ্টা বিশেষরূপে হইয়াছে এবং হইতেছে।
>
> [চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ]

এক মহৎ সংগ্রামে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিদ্বেষ চরিতার্থ না করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য মীরসাহেবকে বিদ্রোহীদলে যোগদানের জন্য যে চাপ প্রয়োগ তা থেকে সা গোলামের উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মীরসাহেবের দ্বিতীয়া পত্নী দৌলতন্নেসার 'সমাধি' সাঁওতায় মীরসাহেবের পিতার কবরের পাশে দেয়ার ব্যাপারে সা গোলাম কোনো আপত্তি করেননি, যদিও "সাঁওতার বাড়ীঘর, জমীদারী, সে সময় সকলি সা গোলামের" (পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ)। সা গোলামের এই মনোভাব তাঁর মানবিক মহত্বের পরিচয় বহন করে। লেখকের অশ্রদ্ধা ও প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ সত্বেও রূপান্তরিত সা গোলাম পাঠকের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম এবং এই উপাখ্যানের একটি ডাইন্যামিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

পাংশার জমিদার ভৈরববাবু সম্ভ্রান্ত বংশীয় সংস্কৃতিমনস্ক বিদ্বান ব্যক্তি। অসাম্প্রদায়িক ও উদারহৃদয় মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। ভৈরববাবু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। কেনী তাঁকে কোনো কৌশলেই নিজ কব্জায় আনতে সক্ষম হননা। তাই বলেন ঃ

> লোকটী ভারী চতুর বটে। ... ভৈরববাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফাসাদে অগ্রসর হইতে চাহেন না। বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হননা। অথচ এরূপভাবে লিখিত পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি। বিনা ব্যয়ে খাজনার টাকা মাস মাস পান। .... নিজের লাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহেন না।
>
> [একাদশ তরঙ্গ]

এই ভৈরববাবুকে জব্দ ও বশ করার জন্য কেনী তাঁর খাজনার চালান লুটের যে ফন্দী আঁটেন, ভৈরববাবুর কৌশল ও বুদ্ধিমত্তায় তা বানচাল হয়ে যায়। লুণ্ঠিত তোড়ায় অর্থের বদলে পাওয়া যায় মাটির খাপড়া। 'বাঙালী বুদ্ধি'র কাছে কেনী পরাজিত হন। খাজনার চালান ও কাছারি লুটের অভিযোগ আদালতে নালিশ করে ভৈরবাববু কেনীর বিরুদ্ধে চৌদ্দ হাজার টাকার ডিক্রী লাভ করেন। কেনী নতিস্বীকার করলে ভৈরববাবু তাঁকে অর্থদণ্ড থেকে মুক্তি দেন। এই ঘটনায় ভৈরববাবুর বৃহৎ অন্তঃকরণ, মর্যাদাবোধ ও অনুকম্পার পরিচয় প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

আমলা-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তা হরনাথ ও দেবীপ্রসাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। হৃদয়হীনতা, অসততা, অবিশ্বস্ততা, স্বার্থপরতা, লোভ, কৃতঘ্নতা—এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। লেখক হরনাথের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

> হরনাথ মিশ্র মানুষ কিন্তু গঠিত পাষাণে। কুঠিয়াল নরব্যাঘ্র, তার চাকরের মনে মায়া-মমতা থাকা সম্ভবতই অসম্ভব।
>
> [অষ্টম তরঙ্গ]

তাই মামলা সাজানোর প্রয়োজনে স্বপক্ষীয় লাঠিয়ালদের বুকে সড়কি ও মাথায় লাঠির আঘাত করার কূটবুদ্ধি হরনাথ অনায়াসেই দিতে পারে। কেনীর সকল কুকর্মের সে মন্ত্রণাদাতা ও সহায়ক। কিন্তু কেনীর বিপদ-মুহূর্তে তাঁকে পরিত্যাগ করতে এই সুবিধা- বাদী আমলার কুণ্ঠাবোধ নেই। আবার কেনীর সুসময় ফিরে এলে মতলববাজ হরনাথ ও অন্যান্য কর্মচারীরা আনুগত্যের মুখোশ এঁটে তাঁর কাছে এসে জোটে। দেবীপ্রসাদও একই আদর্শে গঠিত। নিমকের মর্যাদা সে-ও রাখেনি। মীর সাহেবের অনুগ্রহভাজন আমলা হওয়া সত্ত্বেও সা গোলামের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মীর সাহেবকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও গৃহত্যাগী করতে তার বিবেক বিচলিত হয়নি।

জকি এই গ্রন্থের আর-একটি চরিত্র। সে ছিলো কেনীর গাড়োয়ান। কেনীর কল্যাণে তার ভাগ্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে, বিনিময়ে কেনীর কাছে তার স্ত্রী ময়নাকে উৎসর্গ করতে হয়। এতে তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা, প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর জাগেনি। বরঞ্চ সে তার ভাগ্যপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেনীর পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বিবাহে উৎসাহিত হয়। জকির সুখ ও সৌভাগ্য যখন মধ্যগগনে তখন সুন্দরপুরের জমিদার কেনীবিদ্বেষী প্যারীসুন্দরীর সঙ্গে তার এক জ্ঞাতিভ্রাতার মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে। অর্থ ও উপঢৌকনে প্রলুব্ধ হয়ে সে কেনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। স্ত্রী ময়নার আত্মহত্যার পর জকি কেনীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে। বিচারে জকির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। একজন অর্থলোলুপ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ হিসেবে জকি চিত্রিত।

সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। প্রজাদরদী এই সামন্ত-রমণী প্রজার সুখ-দুঃখের সঙ্গে ছিলেন একাত্ম। প্রজাকল্যাণই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। তাই তাঁর জমিদারী এলাকায় যখন 'শ্বেতরাক্ষস' কেনীর লোভ ও অত্যাচারের হাত প্রসারিত হয় তখন তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন ঃ

> আমি থাকিতে আমার প্রজার প্রতি নীলকর ইংরেজ দৌরাত্ম্য করিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার প্রজার বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া কেনী নীল বুনিবে, ইহা আমার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে

Dhaka University Institutional Repository

> না। প্রজাদিগের দুরবস্থা আমি এই নারীচক্ষে কখনই দেখিতে পারিব না। যে উপায়ে হউক, প্রজা রক্ষা করিতেই হইবে। লোক, জন, টাকা, সর্দ্দার, লাঠিয়াল যাহাতে হয় তাহার দ্বারা প্রজার ধন, মান, প্রাণ, জালেমের হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে।
>
> [তৃতীয় তরঙ্গ]

অত্যাচারী কেনী সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা যেমন তিনি অন্তরে পোষণ করেন তেমনি তাঁর জুলুম-অত্যাচারের প্রতিকার বিষয়েও তিনি সচেতন। তাই তিনি কেনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

> ও বেলাতী কুকুর এদেশের সকলকেই দংশন করিবে। সে বিষে সকলেই জর্জ্জরীভূত হইবে। প্রথমেই এ ম্লেচ্ছের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে শেষে আমার জমিদারী পর্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত করিবে।
>
> [তৃতীয় তরঙ্গ]

কেনীর অত্যাচার ও ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাবদানের উদ্দেশ্যে প্যারীসুন্দরী কেনীর মেমকে আটক করার জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করেন। পীড়িত-অত্যাচারিত অসহায় প্রজার দুঃখ-বেদনা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেন ঃ

> .. যে ব্যক্তি যে কোন কৌশলে কেনীর মাথা আমার নিকট আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জন্য বাঁধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারী, বাড়ী, ঘর, নগদ টাকা, আসবাব যাহা আছে, সমুদয় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি সুন্দরপুরের সমুদয় সম্পত্তি কেনীর জন্য রহিল। অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব।..... দুরন্ত নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ।
>
> [দশম তরঙ্গ]

প্যারীসুন্দরী অবলা নারীমাত্র নন, তাঁর সাহস ও নির্ভীকতা তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। তিনি কেনীকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর কুঠি আক্রমণ করতে পাঠিয়েছেন লাঠিয়ালদলকে। ভীত বা দ্বিধান্বিত না হয়ে এ-নিয়ে তিনি গর্ববোধ করে বলেন ঃ

> আমার লাঠীয়াল কুঠী লুট করিয়াছে, দশজনের মুখে এ কথা শুনিয়াও আমার সুখ বোধ হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠী লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!
>
> [দশম তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

আবার ক্ষুদ্র লোভের বশবর্তী হয়ে যখন প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালদল কেনীর কুঠি আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয় তখন তিনি তাদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও ধিক্কার জানাতে কুণ্ঠিত হননা।

প্যারীসুন্দরী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত এক অসামান্য জননেত্রী। অভিন্ন শত্রুর মোকাবিলায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

> ... হিন্দু মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গল জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।
>
> [দশম তরঙ্গ]

প্যারীসুন্দরীর এই উদার মনোভাব ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চরিত্রের এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করে।

প্রজার সুখ-স্বস্তি ও নিজের সম্মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য কেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্যারীসুন্দরী সর্বস্বান্ত হন। সরকার তাঁর সমুদয় জমিদারী ক্রোক করেন। পরে অবশ্য তিনি বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে জমিদারী উদ্ধার করেন। স্বয়ং কেনী প্যারীসুন্দরীকে সমীহ করতেন প্যারীসুন্দরীর অর্থ-বিত্ত ও সাহস-বুদ্ধি তাঁর অপেক্ষা অধিক এ-কথা কেনী নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতো জাঁদরেল নীলকরও বলতে বাধ্য হন যে, "স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী—নাম করিতেও ভয় হয়" (একাদশ তরঙ্গ)।

ইতিহাসে উপেক্ষিতা নীল-সংগ্রামের এই বীর নারী তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, করুণা, সংকল্প, স্বাজাত্যবোধ ও প্রজাকল্যাণ-কামনার জন্য 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় অমর হয়ে রয়েছেন।

মশাররফ-জননী দৌলতন্নেসা মীর সাহেবের দ্বিতীয়া পত্নী। তাঁর চরিত্র চিত্রণে লেখক নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য-বর্ণনায় কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। দৌলতন্নেসার রূপ-বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন ঃ

> মাননীয়া দৌলতন্নেসা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা, পথিকের অসাধ্য। অপরের সহিত তুলনা করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান রমণী মধ্যে অনেক খুঁজিলাম পাইলাম না।
>
> [ষড়বিংশ তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতন্নেসার রূপ-গুণের বর্ণনা উপলক্ষে লেখক হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পত্নীবৃন্দ ও স্মরণীয় মুসলিম রমণীগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। লেখকের বক্তব্যে, "দৌলতন্নেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী" (ষড়বিংশ তরঙ্গ)।

দৌলতন্নেসা পতিব্রতা। স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আস্থা অপরিসীম। তাঁর বিবেচনাবোধও প্রবল। জানা যায় ঃ

> মীর সাহেব পৈতৃক বসতবাড়ী বিষয়সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছে। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতন্নেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত সযত্নে রাখিয়াছেন। পিতার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ স্বামী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামী পদসেবায় সর্ব্বদা রত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোনরূপ কষ্টের কারণ না হয় তদ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।
>
> [ষড়বিংশ তরঙ্গ]

স্বামীর প্রতি তিনি এতোটাই একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণা ছিলেন যে স্বামীর আমোদ-প্রমোদ কিংবা রক্ষিতা-পোষণকেও প্রসন্ন মনে অনুমোদনে দ্বিধা করেননি। এ-বিষয়ে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীর অভিযোগ-অনুযোগ তিনি হাসিমুখে উপেক্ষা করেছেন। ধনীর দুহিতা হলেও তাঁর মধ্যে গৌরব বা অহঙ্কার ছিলোনা। সংসারজীবনে মানিয়ে নেয়ার একটা প্রবণতা দৌলতন্নেসার ছিলো। এতে তাঁর অন্ধ পতিপ্রেম, সর্বংসহা উদারচিত্ততা ও চারিত্রিক মাধুর্যের পরিচয় মেলে। নারীর সনাতন সংস্কার তাঁর মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

কিন্তু তাঁর এই উদারতা ও নিস্পৃহভাবই তাঁর কাল হয়েছিল। মীর সাহেবের রক্ষিতা রূপসীর চক্রান্তে 'বিষাক্ত ঔষধে'র ক্রিয়ায় দৌলতন্নেসার জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়। দৌলতন্নেসার পরিণতি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও করুণ। কিন্তু তাঁর জীবন নিস্তরঙ্গ ও একরৈখিক, বৈচিত্র্য বা বিস্তার নেই সেখানে।

মিসেস কেনী নীলকর কেনীর যোগ্য সহধর্মিণীই শুধু নন, উপযুক্ত সহকারিণীও। কেনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহকে তিনি নিজের সৌভাগ্য বলেই বিবেচনা করেছেন। যথার্থই ঃ

> ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিতনা। নৃত্য, গীত, আহার, বিহার, আমোদ, রাজপ্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার সুন্দর ললাটে জুটিতনা।
>
> [ষষ্ঠ তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস্ কেনী বিচক্ষণ–বুদ্ধিমতী, আকিস্মক ঘটনার মোকাবিলা করার বুদ্ধি ও সাহস তাঁর আছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালদল কেনীর কুঠি আক্রমণ করলে মিসেস কেনী কৌশলে তাদের মধ্যে কয়েক তোড়া টাকা ছড়িয়ে দেন। উন্মত্ত-বিশৃঙ্খল লাঠিয়ালবৃন্দ এই টাকা কুড়াতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এই সুযোগে কেনীর লাঠিয়ালবাহিনী তাদের পরাস্ত ও বিতাড়িত করে। মামলা সাজানোর জন্য মিসেস্ কেনী কুঠিবাড়ীর জীর্ণ–পুরাতন আসবাব ও তৈজসপত্র চাকর দিয়ে ভাঙচুর করান। তারপর প্যারীসুন্দরী আর তাঁর লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে "কুঠিতে চড়াও, মালামাল লুট, বাক্স–আলমারী ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা অপহরণ—দিনে ডাকাইতি"— এইসব অভিযোগ আনয়ন করেন। কার্যসিদ্ধির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অন্তরঙ্গ খাতির জমাতেও তিনি দ্বিধান্বিত নন।

মিসেস কেনী আরামপ্রিয়, এদেশে বিলাস–ব্যসনে জীবনযাপনে অভ্যস্ত তিনি। 'হোম' সম্পর্কে তাঁর আবেগ ও আগ্রহ তীব্র হলেও বিলাসী কেনী–পত্নী 'হোমে' গিয়ে স্বচ্ছন্দ জীবনের সন্ধান ও সুযোগ না পেয়ে যথেষ্ট 'বিরক্ত' হন। ভারতবর্ষে যে সম্মান–মর্যাদা ছিলো অনায়াসলভ্য এখানে তা দুর্লভ। 'হোমে' চাকর–নোকর–হুকুমবরদার নেই, খাদ্য–খাবারের প্রাচুর্যও নেই। তাই 'বিরক্ত' কেনী–পত্নী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে কৌশলী মিসেস্ কেনী স্বামীকে ব্যক্তিগত সমস্যা–কষ্টের কথা না লিখে 'বিচ্ছেদ যন্ত্রণা' আর 'বিরহ বেদনা'র কারণেই তিনি ফিরে আসতে চান বলে জানান। কেনীর পত্নীপ্রেম যতোখানি আন্তরিক, মিসেস্ কেনীর পতি–অনুরাগ ততো নিখাদ ছিলোনা।

নারীহৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে পুরুষের মন ও আচরণ অনেকখানি ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনি। তাই 'হোম' থেকে ফিরে এসে তাঁর মনে স্বামীর ভাবান্তর সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে। তার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে ঃ

> প্রথম বজরায় স্বামীর করস্পর্শ—সে পরশে যেন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হয় নাই, সে অপূর্ব্ব বিজলী ছটা শরীরের নানাস্থানে খেলা করিয়া যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে অপূর্ব্ব রসময় প্রেমচুম্বনে প্রেমানুরাগ যেন বৃদ্ধি করে নাই। কারণ কি? .... একত্র একাসনে বসিয়াও হৃদয়কমল, অনুরাগপ্রতিভায় যেন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। গায়ে গায়ে মিশিয়া একত্র আহারেও যেন পূর্ব্বের ন্যায় সুখবোধ হয় নাই।— তৃপ্তি জন্মে নাই.... কেন এমন হইল? দোষ কাহার?
>
> [সপ্তদশ তরঙ্গ]

রমণীর মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা, সূক্ষ্ম বেদনা ও শাশ্বত সন্দেহই এখানে ফুটে উঠেছে।

মিসেস্ কেনী লোভ, শঠতা, ক্ষুদ্রতা ও নীচতা থেকে মুক্ত নন। যেমন 'হোম' থেকে ফেরার জন্য স্বামীকে মিথ্যা কারণ প্রদর্শন করেন, তেমনি আবার অসুস্থ কেনী চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গেলে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কুঠিবাড়ীতে সঞ্চিত সোনা-রূপার অলঙ্কার 'অনেক সরাইলেন'। কেনী দুরাত্মা বর্বর হলেও কখনো কখনো তাঁর সদ্‌গুণাবলীর সামান্য আভাস মিলেছে, কিন্তু কেনী-পত্নীর চরিত্রে তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত।

কেনীর লালসার আগুনে দগ্ধ এক মানব-পাখীর নাম ময়না। কেনীর এক দরিদ্র গাড়োয়ানের সুন্দরী স্ত্রী সে। কেনীর চোখে পড়ে স্বামীর উদ্যোগী ভূমিকায় তাকে সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়।

ময়না সংসারসুখ-বঞ্চিতা এক ভাগ্যহীনা অসহায় নারী। স্বামীর সহায়তায় তার সতীত্ব হয়েছে লুণ্ঠিত ; আবার সপত্নীর দুঃসহ জ্বালাও স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। তবু এই প্রবল মনোবেদনা সত্ত্বেও, যে-স্বামী তার সর্বনাশের মূল, তার ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় তাকে সতর্ক করার নৈতিক দায়িত্ব সে পালন করে। নারীত্বের প্রবল অবমাননায় আত্মগ্লানিতে বিদীর্ণ ময়না বলেছে ঃ

> একদিক স্বামী, অন্যদিকে দুরন্ত বাঘ। বাঘ হা করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া, আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল। আর বাঁচি কি করিয়া, যাই কোথা—কে রক্ষা করে?
>
> [দ্বাদশ তরঙ্গ]

সুগভীর অন্তর্জ্বালা ও পাপের ফসল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

রূপসী মীর সাহেবের রক্ষিতা। মীর সাহেবকে সম্পূর্ণ অধিকার করার মানসে সে মীর-পত্নী দৌলতন্নেসাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। সে ক্রূর, কপট, স্বার্থান্ধ, অমানবিক, ঈর্ষাকাতর, হৃদয়হীনা। তার কারণেই একজন সাধ্বী রমণী অকালে জীবন বিসর্জন দিয়েছে—একটি সংসার হয়েছে বিপর্যস্ত। তার মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাএদার অস্পষ্ট আভাস কল্পনা করা যায়। তবে তুলনায় নির্দ্বন্দ্ব ও শোচনাহীন এই চরিত্রটি আরো নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

লেখক 'উদাসীন পথিক', কাহিনী 'অসংলগ্ন', তাই ভাষাও 'সঙ্গতিরক্ষা'র পদ্ধতি মেনে চলেনি। তবুও মাঝে-মধ্যে এখানে মশাররফীয় গদ্যের ছন্দোময় প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

> দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী জগৎ অস্বীকার করিয়া লোকের চক্ষুর্জ্যোতি হরণ করিলেন। বিরামদায়িনী নিশা সমাগতা হইয়া পুরাতন দম্পতির বিচ্ছেদের পর মিলনসুখের সুযোগ করিয়া দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে তারাদল ফুটিতে ফুটিতে সময় সময় মিটিমিটিভাবে চাহিতে চাহিতে বিমানরাজ্যে বিহার করিতে করিতে ক্রমে রজনীর শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।
>
> [সপ্তদশ তরঙ্গ]

Dhaka University Institutional Repository

আবার অন্যত্র তৎসম শব্দনির্ভর সাধুরীতির মনোহর বর্ণনাভঙ্গির নমুনা ঃ

> এই পরিশূন্য ঘূর্ণায়মান জগতে রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। যে কাঞ্চনশৃঙ্গ নীলাকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে, হয়ত কালের প্রভাবে চূর্ণবিচূর্ণ সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। মহাসিন্ধুও কালচক্রে পরিশুষ্ক হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইয়া মরীচিকারূপে পথিকের ভ্রম জন্মাইতে পারে।
>
> [ষট্‌বিংশ তরঙ্গ]

পরিবেশ রচনায় মীরের গীতধর্মী ব্যঞ্জনাময় গদ্য যে কতো সহায়ক তার দৃষ্টান্ত দেয়া যায় ঃ

> শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত বায়ু জানালার খড়্‌খড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার রেসমী বসন সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে।
>
> [ষষ্ঠ তরঙ্গ]

ঘটনাকে বাস্তবানুগভাবে প্রকাশে ভাষার মেজাজও যে পাল্টে যায় সে নমুনাও এই উপাখ্যানে দুর্লক্ষ্য নয়। এখানে বিপক্ষদলের প্রতি আক্রমণ-রচনার জন্য স্বপক্ষীয় লাঠিয়ালদলকে কেনী যে ভাষায় ভর্ৎসনা-তিরস্কার করেছেন তাতে ঘটনা ও চরিত্রের বাস্তবতা ও স্বাভাবিকত্ব বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে ঃ

> সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুইতিনজন প্রধান প্রধান লাঠীয়ালের পৃষ্ঠে চাবুক সই করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ড্যাম সুয়ার, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান? পাঁয়তারা করিতে জান, লাঠি ভাজিতে জান, মারিতে জাননা? লাগাও, তাড়াও মার সুয়ার লোক্‌কো"—
>
> [চতুর্থ তরঙ্গ]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র ভাষা আগাগোড়াই সাধুরীতির। অবশ্য এই ভাষা পূর্বের তুলনায় অনেক সরল, তৎসম শব্দের ব্যবহারও অপেক্ষাকৃত কম এবং কথ্য ভাষাভঙ্গির ধাঁচ এখানে প্রচ্ছন্ন। 'ত্রিংশ তরঙ্গে'র 'মনের কথা'য় দুই গ্রাম্য রায়তের কথোপকথনে চরিত্রানুযায়ী সম্পূর্ণই কথ্য ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে,— কেবল একটি-দুটি ক্ষেত্রে সাধু ক্রিয়াপদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। "ভায়া! সত্তি সত্তি কি আর নীল হবেনা?"— দ্বিতীয় প্রজার এই প্রশ্নের জবাবে প্রথম প্রজা গ্রাম্য ভঙ্গিতেই বলেছে ঃ

> ভায়া ! শুন্‌লে কি নীল আর হবেই না। আমরা যদি ইচ্ছা করে বুনী তবে হবে। নীলকর সাহেবরা জবরাণ করে আর বুনিতে পারিবেন না। আমাদের ধানের জমীতে আর জবরাণে মার্কা দিয়া নীল জমীর সামিল করিতে পারিবেনা। যে জবরাণ কর্ত্তে খাড়া হবে সেই মারা যাবে। ভায়া! সে কি যে সে মুখের কথা নিশ্চয় জেন যে অত্যাচার করবে সেই জেলে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী ও বালক' (বৈশাখ ১২৯৮) পত্রিকা উল্লেখ করেছিল, "অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে— তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটী হয় নাই।"[৯৪] পত্রিকার এই মন্তব্য অসঙ্গত বা অসমীচীন নয়। কেননা এখানে একটি সংহত প্লটের অভাব সহজেই অনুভূত হয়। এই শিথিল-বন্ধন কাহিনীর ত্রুটিও কম নয়। স্থানে স্থানে লেখকের অমনোযোগ ও অসতর্কতার স্বাক্ষরও আছে। বানান ও ভাষার ত্রুটি-অশুদ্ধি যেমন আছে, তেমনি পাত্র-পাত্রীর পরিচয়গত অসঙ্গতিও আছে। জকির দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম কখনো ব্রজ কখনো মাখ্না, বিনোদ কখনো মীর সাহেবের খানসামা কখনো আবার তাঁর তোষাখানার জমাদার, কেনীর কুঠির গারদে আটক মীর সমসের আলীর পদবী পরিবর্তিত হয়ে 'মীরে'র স্থলে হয়েছে 'কাজী'।

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এখানেও লেখকের অতি-কথন কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করেছে। অনেকসময় লেখকের অবান্তর বক্তব্য পাঠকের মনোযোগ ছিন্ন করে দেয়। অহেতুক নীতিকথা বা আপ্তবাক্য উচ্চারণ তাঁর স্বভাবজ ত্রুটি। যেমন নিরাপরাধ কালু ও বাঁসীর মর্মান্তিক পরিণতি প্রসঙ্গে লেখকের খেদোক্তি ঃ

> হায়রে সংসার। হায়রে শত্রুতা। শত্রুতাসাধনে লোকে না পারে এমন কোন কার্য্যই নাই। ধন্য সংসার।।
>
> [অষ্টম তরঙ্গ]

কিংবা লেখকের সিদ্ধান্তের ঔচিত্য ও যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে এই বক্তব্য ঃ

> পাঠক। এইস্থানে লিখকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অস্বাভাবিক দোষের পোষকতাহেতু লিখক দোষী, তাহাতেই ক্ষমা প্রার্থনা। মিসেস্ কেনী এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়ে বিলাতী, সম্মুখে বিপদ আশঙ্কা, মিসেস্ কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা। এ অবস্থায় জাতীয় ভাষাতেই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত। আপনাদেরই অসুবিধা ও শ্রুতিকঠোর হইবে বলিয়া বাঙ্গলাভাষাতেই সে কথার ভাবার্থ আপনাদিগকে শুনাইতে হইল।
>
> [দ্বাদশ তরঙ্গ]

এই কাহিনীর শৈথিল্য, পারম্পর্যহীনতা, অসংলগ্নতা ও ভাষার ত্রুটি-অশুদ্ধি সম্পর্কে লেখক অসচেতন ছিলেন না। তাই পঞ্চদশ তরঙ্গের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছেন, "এ কথার বান্ধুনী, মিল গরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্যই নাই", ফলে "অসংলগ্ন, ভুলভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব' এবং সে-কারণেই লেখকের অনুরোধ "দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন"। 'মুখবন্ধে' তিনি 'পাঠক সমালোচনার ভয় আমার নাই' এই উক্তি করলেও, মাত্র দুটি বাক্যের পরেই আবার কাহিনীর অসঙ্গতি বা ভুল-ভ্রান্তির জন্য 'মার্জ্জনা প্রার্থনা' করেছেন। উপন্যাসের উপযোগী উপাদান থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের শিল্পচেতনার

Dhaka University Institutional Repository

অভাবের কারণে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' যথার্থ শিল্পমূর্তি না হয়ে শিল্প-ইতিহাস-আত্মকথার মিশ্র-রচনায় পরিণত হয়েছে। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত কাঠামো, চরিত্র, ঘটনাক্রম, ভাষা-সংযম ইত্যাদি সম্পর্কে লেখক সচেতন হলে এ-সব ত্রুটি অতিক্রম করা সম্ভব হতো।

তবুও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নানাকারণে উল্লেখের দাবী রাখে। এই গ্রন্থে বিবৃত নীলচাষ ও প্রজা-আন্দোলনের কাহিনী আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ হলেও বৃহদর্থে তা জাতীয় ইতিহাসেরই অঙ্গ। এই উপাখ্যানে মীরের সমাজসচেতন শিল্পী-মানসের গভীর পরিচয় প্রতিফলিত। তাঁর পারিবারিক ইতিবৃত্তেরও উৎস এই কাহিনী। মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ গ্রন্থের কাহিনীই যে ইতিহাস বা সমকালীন বাস্তব ঘটনাশ্রিত তারও দৃষ্টান্ত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। এই গ্রন্থের প্রকৃত গুরুত্ব ও গৌরব ইতিহাস-সংলগ্ন নীল-কাহিনী এবং এর গভীর সমাজবাস্তবতাবোধে।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র প্রথম খণ্ড 'প্রথম অংশ' নামে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে (১৯০০ খৃঃ)।[৯৫] প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় ঃ

> বস্তানীর প্রায় দশ আনা অংশ প্রকাশ হইল। ছয় আনা পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল যদি কোন মহানুভব মহাজনের মনে ধরে, আর সেই সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা দয়ালু জয় জগদীশের কৃপা হয় তবে অবশিষ্টাংশ প্রকাশের আশা করা যায়। নতুবা সৈয়দ ওলিওল্লার প্রকাশিত এই প্রথম অংশই বস্তানীর সমাপ্তি অথবা ইতি মনে করিতে হইবে।

চব্বিশটি নথিতে বিভক্ত 'বস্তানী'র 'প্রথম অংশে' কুড়িটি নথি সংগ্রথিত হয়েছে। 'বস্তানী'র সংরক্ষক ও মুদ্রণ-উদ্যোগী মশাররফের গুণগ্রাহী বগুড়ানিবাসী সৈয়দ ওলিওল্লাহ কুড়িটি নথি মুদ্রণের পর আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এই কুড়িটি নথি নিয়েই প্রথম অংশ প্রকাশ পায়। 'বস্তানী'র অগ্রন্থিত কিছু অংশ, কুড়িসংখ্যক নথির পরিশিষ্ট এবং একুশ ও বাইশ এই দুটি নথি, 'আমার জীবনী'র পরিশিষ্টে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তেইশ ও চব্বিশতম নথির প্রথমার্ধ এবং পরের কিছু অংশ অপ্রকাশিত থেকে গেছে। প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপনে' এর আভাস আছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> বস্তানী ২৪ নথীতে শেষ। নথীর পর গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয়, বস্তানীপ্রাপ্তির বিবরণ ও অপর হস্তে অর্পণের কারণ, "ফলশ্রুতি", "পরিণাম", সর্ব্বশেষে "বিদায়" অতি আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে। পাঠকগণের অনুগ্রহ না হইলে ঐ সকল বিষয় ক্রমে পচিয়া গলিয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইবে।

'বস্তানী'র চতুর্বিংশ নথির শেষাংশ হিসেবে চিহ্নিত একটি দীর্ঘ কবিতা 'হাফেজ' (জানুয়ারী ১৮৯৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৯৬] 'নবনূর' (আষাঢ় ১৩১২) পত্রিকায় নতুন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'গাজী মিয়াঁর গুলি' নামে একটাকা মূল্যের একটি যন্ত্রস্থ বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৭]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র প্রচ্ছদ বা আখ্যাপত্রে লেখকের নাম ছিলোনা। কেবল স্বত্বাধিকারী হিসেবে 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামের উল্লেখ মেলে। ইতোপূর্বে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় এই নামটি ব্যবহৃত হয়। 'বস্তানী'র কাহিনী ও পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক ছিলো। তাই সম্ভাব্য আক্রোশ ও প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যই হয়তো মশাররফ স্বনামে প্রকাশিত হতে চাননি।

কাহিনীর প্রকৃতি ও কাঠামোর আভাস দিয়ে লেখক বলেছেন ঃ

> গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে না আছে এমন কথা নাই। দুনিয়া-জাহানে যাহা আছে, সংসারক্ষেত্রে যত প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গাছা, আগাছা, পরগাছা, বিশাল, রসাল, মিষ্ট, কটু, কষায়, টক, অম্ল, মধুর, ছোট, বড়, সর্ব্বাঙ্গ কন্টক, সর্ব্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়নমনের তৃপ্তিকর, বিরক্তিকর যাহা আছে, গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে তাহার অভাব নাই। নথিসূত্রে প্রত্যেক নথি পৃথক পৃথক গাঁথা। আবার সূত্রে সূত্রে সংযোগ। নথি সাজান। একটু চিন্তা করিয়া নথি উল্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন।
>
> [ষষ্ঠ নথি]

এবং,

> গাজী মিয়াঁর মনের দুঃখে ও আনন্দে একপ্রকার হর্ষ-বিষাদে তুলিহস্তে চিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। সমাজের দুঃখ, সমাজের অবনতি দেখিয়া ঐ দেখুন, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষে অজস্র জলধারা ঝরিতেছে, বাম চক্ষে হর্ষের আভা প্রকাশ পাইতেছে।
>
> [দ্বাদশ নথি]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' মূলত পরস্পর-সম্পর্কিত কয়েকটি সামন্ত-পরিবারের ঈর্ষা ও স্বার্থকেন্দ্রিক অন্তর্কলহ এবং তাদের অন্তঃপুরের পাপ ও লজ্জার গুপ্ত-কথার ব্যঙ্গাত্মক চিত্রধর্মী কাহিনী। অর্থ-বিত্ত-সামাজিক মর্যাদা-বংশকৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় অভিজাত উচ্চশ্রেণীর নৈতিক স্খলন-পতন, স্বার্থ-প্রবঞ্চনা ও লালসা-লোভের বিচিত্র ও আপাত-অবিশ্বাস্য কাহিনী পরিবেশনই লেখকের মূল অভিপ্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

'বস্তানী'তে মুখ্যত দুটি সমান্তরাল কাহিনী বিবৃত ঃ কুঞ্জনিকেতনের কূট-কৌশলী ভূম্যধিকারিণী পয়জারন্‌নেসা ওরফে বেগম ঠাক্‌রুনের বেপরোয়া অনৈতিক জীবনযাপন এবং অপরপক্ষে জমদ্বারের জমিদারীর দুই প্রতিপক্ষ শরিক সোনা বিবি ও মনিবিবির দ্বন্দ্ব-কলহ, পাপাচার ও পরিণামের আখ্যান। এই দুই কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত হয়েছে একাধিক শাখা-কাহিনী।

মানব-চরিত্রের মন্দ ও অন্ধকার দিকগুলোই এই উপাখ্যানে উন্মোচিত। মহৎ জীবনাদর্শ, সুরুচি-শালীনতার শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, প্রেম-প্রীতি-কৃতজ্ঞতার মানবিক গুণাবলী 'বস্তানী'র মানব-মানবীর জীবনে অনুশীলিত হয়নি। তাই রমণীর সতীত্ব-দানে সানন্দ সম্মতি, লোকনিন্দা উপেক্ষা করে উপপতির মনোরঞ্জন, পুত্রের হাতে গর্ভধারিণীর লাঞ্ছনা, নির্বিচার লাম্পট্য-ক্রীড়ায় নিত্য তৃপ্তি, ন্যায়ালয়ের প্রতিনিধির অনাচার, অর্থের কাছে বিবেক-বিশ্বাস-মনুষ্যত্ব বিসর্জন, সংকোচহীন কৃতঘ্নতা— এইসব ঘটনা স্বাভাবিক জীবনযাপন ও জীবনাচরণের অঙ্গ হিসেবেই প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে এক ক্লেদাক্ত পরিবেশের বিবেকশূন্য, নীতি-বিবর্জিত, অসৎ ও চরিত্রহীন মানুষের কাহিনী এই 'বস্তানী'।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র কাহিনীর পটভূমি বাস্তব। 'ছঅলচতটটঅ ঘঅজএটটএ'-এ (৩১ অক্টোবর ১৯০০) প্রকাশিত এই বইয়ের সমালোচনায় বলা হয় ঃ

> It is a story relating mainly to the quarrel between two female and Muhammedan Zamindars in North Bengal.[৯৮]

মশাররফ হোসেন সমালোচকের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে 'আমার জীবনী'র ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টে 'প্রেরিত পত্র' শিরোনামে বলেন ঃ

> চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ। ১৯০০ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বস্তানী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন? দুশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন— রঙ্গপুর অঞ্চলের কোন মুসলমান জমিদারের ঘটনার ছায়া অবলম্বন করিয়া গাজী মিয়াঁ চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন।[৯৯]

তবে আমাদের জানা মতে, স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য-সাদৃশ্যে এই কাহিনীর কেন্দ্রভূমি তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দেলদুয়ার জমিদারী এস্টেট। 'ক্যালকাটা গেজেটে'র সমালোচক এই কাহিনীর উৎসস্থান কেনো উত্তরবঙ্গ এবং তারই সূত্র ধরে মশাররফ কেনো যে 'রঙ্গপুর' বলে অভিহিত করলেন তা রহস্যাচ্ছন্ন। অনুমান করা চলে, প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই হয়তো মশাররফ ঘটনা-স্থানের বিষয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। এখানে একটি কথা

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণযোগ্য যে, 'পয়জারনন্নেসা' বা 'বেগম সাহেবা' হিসেবে চিত্রিত দেলদুয়ার এস্টেটের অন্যতম শরিক করিমন্নেসার পিতৃভূমি রংপুরে এবং তাঁরাও ভূম্যধিকারী পরিবার।

আশরাফ সিদ্দিকী 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র সম্পাদনা-সূত্রে 'দেলদুয়ার স্টেটসংক্রান্ত একটি মুদ্রিত সুবৃহৎ মামলা-মোকদ্দমার ও দলিলপত্রের বাঁধানো বই' সংগ্রহ করেন। এই প্রামাণ্য তথ্য-দলিল ও অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে তিনি একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হন যে 'বস্তানী'র মূল রঙ্গভূমি দেলদুয়ারই এবং এর পাত্র-পাত্রীর কম-বেশী বাস্তব ভিত্তি আছে।[১০০] মশাররফের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা-গবেষণা করেছেন তাঁদেরও অভিমত, 'বস্তানী'র পটভূমি স্পষ্টতঃ দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ'।[১০১] এর 'চরিত্রগুলোর অধিকাংশই তাঁর দেখা এবং ... এর কাহিনী ও ঘটনাংশে দেলদুয়ার এস্টেটের নানা ঘটনা ছায়া ফেলেছে'।[১০২] আর এই কাহিনী যে সত্য ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারই যে এর মূল ক্ষেত্র মশাররফের সূত্রেও তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে 'আমার কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার কথা ও কার্য্যবিবরণ' শীর্ষক 'চতুর্থ কথা'য় মীর দেলদুয়ারবাসের কথা-প্রসঙ্গে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং 'বস্তানী'র 'ভেড়াকান্ত' যে স্বয়ং তিনি এবং 'বউ' যে বিবি কুলসুম সে-কথা জানিয়েছেন।[১০৩] 'আমার জীবনী'তেও (১ম খণ্ড) 'আমার জীবনীসংক্রান্ত কয়েকটি কথা' শীর্ষক বিজ্ঞাপনে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমার জীবনীর সহিত গাজী মিঞার বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংশ্রব আছে..'।[১০৪] 'বস্তানী' প্রকাশের পর যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মশাররফকে তার জন্য যে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয় তার আভাস মেলে 'আমার জীবনী'র প্রথম খণ্ডে।[১০৫] দেলদুয়ার এস্টেটের নেপথ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' (৭ ফাল্গুন ১৩০০/ ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪) পত্রিকায় মশাররফের বিপক্ষদলের তরফ থেকে যে-বিবরণ তুলে ধরা হয় তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ।[১০৬] 'বস্তানী'র কাহিনীর সঙ্গে এই তথ্য-বিবৃতি মিলিয়ে দেখলে এই উপাখ্যানের বাস্তব পটভূমি সম্পর্কে আর কোনো সংশয়ই থাকে না।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' কোন্ শ্রেণীর রচনা, এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একে 'একখানি বিচিত্র, সমাজচিত্র সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস'' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০৭] মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বিবেচনায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' উপন্যাসজাতীয় রস-রচনা, সুলিখিত উপন্যাস নয়'।[১০৮] মুনীর চৌধুরীর অভিমত, এটি 'স্বজীবনীমূলক রচনা হলেও ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনা'।[১০৯] আবদুল লতিফ চৌধুরী একে বলেছেন, 'বহু রেখাসমন্বিত সমাজ-জীবনের সমালোচনামূলক নক্সা'।[১১০] মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল 'বস্তানী'কে 'বহু শাখা-প্রশাখায়িত' একটি 'শিথিলবদ্ধ উপন্যাস' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১১১] ক্ষেত্র গুপ্তের বিশ্লেষণে 'বস্তানী' নক্শার লক্ষণযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'ব্যঙ্গোপন্যাস'।[১১২] মশাররফ দ্বাদশ নথির প্রারম্ভে উপন্যাসের প্রবণতা ও রস-সৃষ্টি সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে যে উক্তি করেন তাতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় তিনি 'বস্তানী'কে 'উপন্যাস' হিসেবেই গণ্য করতে চেয়েছেন। আবার দ্বাদশ নথিতেই লেখক কৌশলে 'বস্তানী'কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সমগোত্রীয় রচনা বলে ইঙ্গিত করেছেন। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' প্রকাশক 'বস্তানী'কে 'অতীতকালের একখানি বৃহৎ দর্পণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উপরিউদ্ধৃত মন্তব্য অনুসরণে লক্ষ্য করা যায়, আঙ্গিক ও রস-বিচারে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'কে কেউ উপন্যাস, কেউবা নক্শাজাতীয় রচনা হিসেবে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ একে আত্মজৈবনিক রঙ্গ-উপাখ্যান বলেও চিহ্নিত করতে চান। 'বস্তানী'র মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্যই মিশ্রভাবে আছে, কোনো উপাদানেরই একক প্রাধান্য নেই। তাই সামগ্রিক বিচারে 'বস্তানী'কে একটি উপাখ্যান-আশ্রিত রম্য-নক্শার মিশ্রজাতের রচনা বলাই সঙ্গত।

'বস্তানী'তে সংলগ্ন-অসংলগ্ন ঘটনা-বাহুল্যের কারণে নানা প্রকৃতি-বিশিষ্ট অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। কাহিনীর প্রয়োজনে এইসব লঘু-গুরু চরিত্রের আমদানী হলেও গ্রন্থটি বিশুদ্ধ উপন্যাস নয় বলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো চরিত্রই পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। চরিত্রের নামগুলো যথার্থই অভিনব এবং ব্যঙ্গাত্মক। পয়জারন্নেসা, জ্বালাতননেসা, ছিঁড়িয়া খাতুন, ভেড়াকান্ত, দাগাদারী, জয়ঢাক, সব্লোট চৌধুরী, ঘরভাঙ্গা সান্যাল, ধামাধরা সরকার, ধড়িবাজ ঠাকুর, উনপাঁজুরে ঘোষ, লাল আলু, চোট্টা মিয়া, ঋতুরাজ, বক্কেশ্বর, আকালের বঁধু, ধুম্বলোচন, কীলচোর বাগছি,, উলটপালট খাঁ, বেল্লীক মুন্সী, কালকূট রায়, পেটভরা গুহ, পাজী খাঁ, মরদুত খাঁ, কোটনা সিং—চরিত্রের এই বিচিত্র নামকরণে একদিকে যেমন হাস্যরসের খোরাক আছে, অপরদিকে এই নাম পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও অনেকখানি প্রতিফলিত করে।

মূলত 'বস্তানী'র কাহিনী পল্লবিত হয়েছে তিন সামন্ত-রমণী পয়জারন্নেসা, সোনা বিবি ও মনি বিবিকে অবলম্বন করে। ক্ষুদ্রতা-নীচতা-স্বার্থতাড়িত শিথিল চরিত্রের এই তিন রমণীই এই উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাকিম ভোলানাথ, সব্লোট চৌধুরী, ভেড়াকান্ত, দাগাদারী ও লাল আলু। ঋতুরাজ কিংবা জয়ঢাকের মতো চরিত্রও আছে। এ-ছাড়া এই কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে মোসাহেব, খানসামা, পেয়াদা, গোমস্তা, ভিখারিনী, দারোগা-পুলিশ, উকিল-মোক্তার, হাকিম-পেশকারসহ আরো অনেক অপ্রধান চরিত্র। এরমধ্যে কিছু চরিত্র অপ্রয়োজনীয়ও, উপাখ্যানে তারা কেবল প্রবেশ-প্রস্থানের ভূমিকাহীন নীরব কুশীলব।

Dhaka University Institutional Repository

পয়জারন্নেসা 'বস্তানী'র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কাহিনীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি। লেখক তাঁকে কখনো পয়জারন্নেসা, কখনো বেগম ঠাকুরানী, আবার কখনো বা বেগম সাহেব নামে অভিহিত করেছেন। তবে শেষোক্ত নামটিই গ্রন্থ-মধ্যে স্থায়িত্ব পেয়েছে। হটু-নটুর ভগ্নি, কার্ত্তিক-গণেশের জননী বিগত যৌবনা বিধবা পয়জারন্নেসা অরাজকপুর জমিদারীর মহিলা কর্ত্রী। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হন। স্বামীকে কখনো আমলে আনেননি। অকাতর অর্থব্যয় ও দেহ-সৌষ্ঠবের উদার আতিথেয়তায় তিনি হাকিম-উকিল-দারোগা-ডাক্তারকে তৃপ্ত করে নিজের কার্যোদ্ধার ও স্বার্থসাধনে সিদ্ধহস্ত। লেখক তাঁর স্বভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে জানান ঃ

> আমাদের বেগম সাহেব বনিয়াদি বেগম নহেন, কোন নবাবের ভগ্নী নহেন, শাহাজাদার জননী নহেন, নামমাত্র বেগম। কাজেই বেগম সাহেবের মত হাত দারাজ, মুখ দারাজ, পা দারাজ, নজর দারাজ, গলা দারাজ না দেখাইলে, যেন তেন প্রকারেণ জাঁকাল ভাব না ধরিলে, বেগমত্ব বজায় থাকেনা। এই হইল মূল বৃত্তান্ত, খাঁটি খবর। বেগম সাহেবের কাণ্ডকারখানা, কার্য্যপ্রণালী, ব্যবহার, ব্যয়বিধান, ব্যবস্থা সকলই অতিরিক্ত। বড় মানুষি দেখানই স্বভাব। বনিয়াদি চাল।
>
> [তৃতীয় নথি]

অকাল-বিধবা বেগম সাহেব ধুরন্ধর ভ্রাতৃযুগলের প্রচেষ্টায় কিভাবে মূল্যবোধবিবর্জিতা আধুনিকায় পরিণত হয়ে বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত তাঁর বিবরণ দিয়েছেন লেখক ঃ

> উপযুক্ত সহোদর ভ্রাতাদ্বয়, মন্ত্রের সাধন—কিম্বা শরীর পাতন চেষ্টা করিয়া, নিশি জাগিয়া, লিখা-পড়া শিখাইয়াছেন। সভ্যতা, শিল্প, বিজ্ঞান, চাতুরি, চালাকি, চাউনী, পদনিক্ষেপ, করমর্দ্দন, আঁখিঠার, অঙ্গভঙ্গী, হাসির কেতা বিস্তর শিখিয়াছেন। ভ্রাতাদ্বয়ের মন উচ্চ, কাঞ্চন শৃঙ্গ হইতেও উচ্চ, বেহদ্দ উদার। বিধবা ভগিনীকে মহানগরী কলিকাতা দেখাইয়া......... চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ফুটাইয়া ফুটিফাটার মত চৌচির করিয়া দিয়াছেন।.......... আমোদ-আহ্লাদ, আলাপ-পরিচয়, কথাবার্ত্তার কেতা, ধরন, দিবারাত্রের পরিশ্রমে, উপদেশে অতি অল্প সময় মধ্যে পাড়াগেঁয়ে ভাব হইতে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে।
>
> [তৃতীয় নথি]

বেগম সাহেব শালীনতাবর্জিত বেপরোয়া স্বাধীন জীবন-যাপনে আগ্রহী ও অভ্যস্ত। তিনি এখানে 'সাত মরদের গ্রীবা-ভঙ্গকারিণী', 'এটর্নী উকিল বারিষ্টারের মনোমোহিনী', 'রাজরাজেশ্বর মহাপ্রভুর প্রণয়িনী', 'নানা ফাঁদে নানা ছাঁদে প্রেমফাঁদ পাতিনী'-রূপে চিত্রিত (নবম নথি)। লেখক তাঁর পাপ ও স্খলনের যে-চিত্র এঁকেছেন তা ভয়াবহ, তাতে পেশাদার বারবণিতাও হার মানে। যেমন, ঋতুরাজবাবুর বাসায়

Dhaka University Institutional Repository

নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গিয়ে তিনি 'একদিন গায়ের বডী, পায়ের বিনামা পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছিলেন' (ষষ্ঠ নথি)। আবার অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে এক উকিল-উপপতির মনোরঞ্জনের সময়ে হাকিম-উপপতির দল উপস্থিত হলে পর্দার আড়াল থেকে বেগম সাহেব বলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। বোতাম কটা লাগিয়ে নিই' (দ্বাদশ নথি)। আর-এক দৃশ্যে তিনি উকিলবাবুর 'গলা ধরিয়া দুই গণ্ডে তিন চুমা দিয়া' তাকে বশীভূত করতে চান (দ্বাদশ নথি)। প্রতারক প্রণয়ীর উদ্দেশে আফসোস্ আর ক্ষোভ মিশিয়ে বলেন, 'ওরে কিছু রাখি নাই—সোনার স্বামীকে যা দেই নাই—সে যা পায় ধরে পায় নাই, তাও সেদে ; সাধ করে পায় ধরে হাতে তুলে দিয়েছি' (পঞ্চম নথি)।

স্বার্থোদ্ধারে বেগম সাহেব সবসময়ই তাঁর নিজস্ব কৌশল কাজে লাগিয়ে থাকেন। এ-বিষয়ে তাঁর রূপ-যৌবন ও ছলা-কলাই প্রধান সহায়। স্বার্থ যেখানে বাঁধা তার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে কোনো সংকোচ বা দ্বিধা কখনোই তাঁর ছিলোনা। আর এই আত্মনিবেদনের ভূমিকা হিসেবে চাটুবাক্যে ব্যক্তিটিকে আরো দ্রবীভূত করার ফন্দী তাঁর অজানা নয়। যেমন, হাকিম ভোলানাথের আনুকূল্যলাভের জন্য তিনি বলেন, 'আপনার অনুগ্রহেই আমার সকল জীবন, ধন, জাতি, খ্যাতি, শত্রু, মিত্র, জমিদারী সকলি আপনার দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' (তৃতীয় নথি)। ঋতুরাজবাবুর প্রতিও বেগম সাহেবের সৌজন্য ও অভ্যর্থনা অবারিত রূপ পায়। অতিথির যদি 'দেলখোস' হয় তাহলে 'হৃদয়াসন'- দানেও তাঁর সানন্দ সম্মতির অভাব নেই (ষষ্ঠ নথি)।

কিন্তু বেগম সাহেবের এই স্বেচ্ছাচারী জীবন একতালে চলেনি কিংবা তা সুখেরও হয়নি। সঞ্চিত বিত্তের অপব্যয়-অপচয় তাঁকে দারিদ্রের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। পাশাপাশি প্রাকৃতিক নিয়মে রূপ-যৌবনেও ক্রমশ ভাটা পড়ে। এককালের চিত্তহারিণী মক্ষীরানীকে তাঁর উপপতি ও ঘনিষ্ঠ সহচরেরা একে একে পরিত্যাগ করে। অসহায় বিত্তশূন্য নিঃসঙ্গ বেগম সাহেব অবশেষে চরম আত্মগ্লানি নিয়ে পরাশ্রয়ে অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস পান। গাজী মিয়াঁ নৈতিকতার চরম সীমা-লঙ্ঘনকারী নারীধর্মের বৈশিষ্ট্য বিসর্জনকারিণী এক স্বার্থ-সন্ধানী রমণীর জীবন যে কতো করুণ, গ্লানিময় ও অবমাননাকর হতে পারে তা বেগম সাহেবের জীবন-কাহিনীতে নির্দেশ করেছেন। গবেষকদের যৌক্তিক ধারণা, পয়জারন্‌নেসা বা বেগম সাহেবের চরিত্রটি মশাররফের এককালের 'অন্নদাত্রী' দেল-দুয়ারের বিধবা-জমিদার করিমন্‌নেসা খানমকে উপলক্ষ করে পরিকল্পিত।

সোনা বিবি জমদ্বারের বিধবা জমিদার। স্বল্পশিক্ষিতা এই রমণীর প্রথম জীবন কলুষমুক্ত থাকলেও, উত্তরকালে স্বামীর মৃত্যুর পর তা অক্ষুণ্ন থাকেনি। দুধভাই দাগাদারীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অনেকের কাছেই নির্দোষ মনে হয়নি। পুত্রের ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের জন্য দাগাদারীর জননী সোনা বিবিকেই অভিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত সোনা বিবির অনাচার সম্পর্কে সক্ষোভে বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> এই সোনা বিবি স্বামীর মৃত্যুর পর কি কল্লেন? কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী। দেবরে দেখল, রাখা দায়, যা ইচ্ছে তাই করুক। .... প্রথম ঝুপঝাপ, তারপরে টুপটাপ, তারপরে চুপচাপ—তারপরেই কাপকাপ, ঘোপঘাপ, তারপর ধরাধরী, ঝক্‌মারি, সর্ব্বশেষে দাগাদারী।
>
> [অষ্টাদশ নথি]

দাগাদারীর গ্রেফ্‌তার-মুহূর্তে সোনা বিবির ব্যাকুলতা ও আচরণ শালীনতার সীমায় আবদ্ধ থাকেনি (পঞ্চম নথি)। ভেড়াকান্তের সঙ্গেও তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। 'নিশীথরাত্রে একঘরে দুজনার কথা', 'বুকের কাছে গায়ে গায়ে ঘেঁষে বসা', 'ভেড়াকান্তের হাত টেনে বেথাস্থানে দেওয়া' (ঊনবিংশ নথি) — এই বিবরণ সোনা বিবি—ভেড়াকান্তের অন্তরঙ্গতার স্বরূপ উন্মোচিত করে দেয়।

জয়ঢাক সোনা বিবির একমাত্র পুত্র। এই পুত্রকে অবলম্বন করে তাঁর আশা-স্বপ্ন পল্লবিত হয়ে ওঠে। তিনি জয়ঢাকের বিবাহ দেন তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ও প্রতিদ্বন্দ্বী অপর মহিলা জমিদার মনি বিবির কন্যা ছিড়িয়া খাতুনের সঙ্গে। তাঁর গোপন অভিসন্ধি ছিলো পুত্র জয়ঢাককে দিয়ে শাশুড়ী মনিবিবিকে শায়েস্তা এবং কালক্রমে সম্পূর্ণ সম্পত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার। কিন্তু সোনা বিবির এই পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায় পত্নী ও শাশুড়ী-নিয়ন্ত্রিত পুত্র জয়ঢাকের বৈরী আচরণে। নানা সন্দেহ-অপপ্রচার-ঈর্ষা-কুমন্ত্রণায় পুত্র জয়ঢাকের মন তাঁর প্রতি বিষিয়ে ওঠে। সোনা বিবির জমদ্বার ত্যাগের মুহূর্তে দেহতল্লাসী করে তাঁকে বেআব্রু করার মাধ্যমে জয়ঢাক যে আচরণ করে তা চূড়ান্ত অভব্যতা ও বর্বরতাই শুধু নয় তাতে মাতা-পুত্রের সম্পর্কের শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। আক্রান্ত সোনা বিবির কাতর মিনতি যে-কোনো বিবেকবান মানুষকে স্পর্শ করে ঃ

> ওরে জয়ঢাক। আমায় বেইজ্জত করিস্‌না, আমার গায়ে এভাবে হাত দিস্‌না। আমার গায়ে কিছু নাই।.... ওরে, দোহাই তোর খোদা-রসুলের। আমাকে উলঙ্গ করিস্‌না। .... আমি তোরই মা। ওরে আমি তোরই জন্মদাতার ভালবাসার স্ত্রী। ও জয়ঢাক। তোর পায় ধরি বাবা। আমার পরনের কাপড় টেনে আমাকে বেআবরু করিস্‌না। ..... হায়। হায়। পেটের সন্তান, তুই আমার শরীরের সার—প্রাণের সার—কলিজার অংশ। হায়। হায়। তোর এই কাজ। তুই এই করিলি।
>
> [অষ্টম নথি]

পুত্রের বৈরিতা ও কাছের মানুষ দাগাদারীর প্রতারণার ফলে সোনা বিবি সংসারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। বিগত জীবনের পাপমুক্তি ও শান্তি-স্বস্তিলাভের জন্য অবশেষে তিনি পবিত্র মক্কাধামে গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সোনা বিবির চরিত্রটি অবাস্তব নয়, এতে দেলদুয়ার জমিদারী এস্টেটের অন্যতম তরফ বিধবা রাহাতন্নেসার ছায়া আছে। মশাররফ এঁর আনুকূল্য লাভ করেন। বেগম সাহেব বা মনিবিবির তুলনায় সোনা বিবির চরিত্র-চিত্রণে মশাররফের আক্রোশ ও বিরূপতা অপেক্ষাকৃত কম, বরং একধরনের সহানুভূতি ও করুণা তিনি অনুভব করেছেন।

'বস্তানী'র মনি বিবির চরিত্রটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইনিও জমদ্বারের এক বিধবা জমিদার। চারিত্রিক স্খলন ও উপপতি-লালনে ইনি বেগম সাহেব ও সোনা বিবির সমানধর্মা এবং স্থানবিশেষে এঁদের অগ্রগামী। এই চরিত্রটিও কাল্পনিক নয়, দেলদুয়ার এস্টেটের অন্যতম শরিক নজমন্নেসা খানমের আদলে মনি বিবির চরিত্র গড়ে উঠেছে।[১১৩]

স্বৈরিণী মনি বিবির জীবনযাপন পদ্ধতি যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আপত্তিকর, তেমনি তাঁর পরিণতিও ভয়াবহ ও করুণ। স্বামী-বর্তমানেই তাঁর অবৈধ প্রণয় ও ভোগ-লালসার সূচনা। বিধবা হওয়ার পর তাঁর অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। একাধিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া সোনা বিবির সঙ্গে তাঁর চির-বিরোধ। সোনা বিবিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন করতে নানা ফন্দী আঁটায় তাঁর জুড়ি নেই। ষড়যন্ত্র, কৌশল ও তোষণনীতিতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

মনি বিবির শেষজীবন বড়ো কষ্ট, বেদনা ও অবমাননার। তাঁর পূর্ব প্রণয়ী লাল আলু তাঁকে পত্নী দাবী করে আদালতে নালিশ এনে 'দেশময় কলঙ্ক' রটায়। তার এই কাজে উৎসাহ জোগায় সোনা বিবি ও ভেড়াকান্ত। মনি বিবি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে লাল আলুর সঙ্গে আপোষ-রফা করেন। তবে পূর্ব-সম্পর্কের জের টেনে লাল আলুকে এ-কথাও বলতে ছাড়েননা, 'তুমি চাইলেই পেতে, তোমাকে দিই নাই কি? আছে কি? রেখেছি কি?' (ত্রয়োদশ নথি)।

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত মনি বিবির জীবনের শেষ দিনগুলো বড়ো করুণ ও যন্ত্রণাময়। এই কুৎসিত রোগের প্রভাবে তাঁর অবস্থা হয় এইরকম যে ঃ

> পুঁজ রক্তের দুর্গন্ধে, গলিত মাংসের দুর্গন্ধে, পেটের নাড়ী পর্যন্ত উঠে পড়ে। দিনে দশ-বার বার বিছানা বদলাতে হয়, ধরে তুলতে হয়, ধরে বসাতে হয়। ছুকরি বাঁদী কেউ কাছে যেতে চায়না—দেউড়ি পর্য্যন্ত গন্ধে মাতিয়ে তুলেছে।
>
> [একাদশ নথি]

মনি বিবির অন্তিম মুহূর্তের চিত্তবিকার ও প্রলাপোক্তির মাধ্যমে তাঁর পূর্ব পাপের স্বীকৃতি ও অনুশোচনাবোধের আভাস মেলে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> দেখ। তুমি মাপ করো। তোমাকে ঠকায়ে তোমাকে ভুলায়ে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়ে, কত পাপ করেছি, পাপসাগরে ডুবেছি। তোমার নিজস্ব শরীরের যে যে স্থান অপরে ছুঁয়েছে, দেখ সেই সকল স্থান পচে গলে, হাড় পর্য্যন্ত জরজর হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। দোহাই তোমার। ... আমায় ক্ষমা কর। যাই যাই। আর মেরনা। ঐ অগ্নিময় সাপ। ও। উহ্ অগ্নিময় অজাগর—হাঁ হাঁ রবে জিহ্বা বার করে আসতেছে। ঐ আস্‌ল—ঠেকাও ঠেকাও।
>
> [সপ্তদশ নথি]

মনি বিবি পাপ ও বিকৃতির পরিচয়চিহ্নিত এক বিনষ্ট চরিত্র। নৈতিক স্খলন ও অনাচারের ভয়াবহ শাস্তি ও তীব্র গ্লানি তিনি ভোগ করেছেন।

বেগম সাহেব, সোনা বিবি ও মনি বিবি নারীধর্মের স্বভাববিচ্যুত ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত তিন অস্বাভাবিক রমণী,— অবাধ যৌন-স্বেচ্ছাচারের এক অনন্য ত্রিভুজ। দাগাদারীর গর্ভধারিণী এঁদের সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ, সঙ্গত ও সমীচীন ঃ

> মনি বিবি, সোনা বিবি,রূপসী বিবি, তামাসা বিবি, কাঞ্চন বিবি, রাইম বিবি, যিনি এখন বেগম হয়েছেন, তাঁর এক নাম রাইমনি, এঁরা সকলেই আপনা আপনি, সকলি এক, সকলি এক। সকলি এক। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।
>
> [অষ্টাদশ নথি]

'বস্তানী'র পুরুষ চরিত্র নারীচরিত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। তবুও এরমধ্যে অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ বিশিষ্ট। ভোলানাথ কৌশলী, কপট, অসৎ, মিথ্যাচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। পয়জারন্নেসা ওরফে বেগম সাহেবের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক। স্বার্থ-সুবিধালাভের জন্য বেগম সাহেবের স্তুতি-রচনায় অক্লান্ত তিনি। তাই প্রথম সাক্ষাতেই বিগলিত হয়ে বলে ওঠেন ঃ

> আপনার যখন দরকার হবে, ডেকে পাঠাবেন, আমি আসবো। দেখ্‌বো—শুন্‌বো। যাতে যা হয় তা করবো।... দিনে রেতে যখন যে সময় আপনার ইচ্ছা হয়—ডাকা, যাওয়া, চিঠি লিখার ক্ষমতা, জোরের সহিত—খুব শক্তভাবে আপনার রইল।... আপনার খাতিরে, কি অনুরোধে আমি কখনই ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করব না। যাতে আপনার সন্তোষের কারণ হয়, নিশ্চয় জানবেন, আমি তা করব।
>
> [তৃতীয় নথি]

ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বার্থান্বেষী আমলা হিসেবে হাকিম সাহেব চিহ্নিত। উপপত্নী বেগম সাহেবের অনুরোধ-অভিপ্রায়কে মর্যাদাদানের জন্য নিরাপরাধ ভেড়াকান্ত ও দাগাদারীকে কারাদণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হননি তিনি।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম ভোলানাথের আচরণ ও স্বভাব তাঁর দোসর 'কান্দে মিল গোছের' আর-এক হাকিম ঋতুরাজের চরিত্রেও প্রতিফলিত। লেখক তাঁর পরিচয় দিয়েছেন, 'বেঁটেখাট হৃষ্টপুষ্ট দিব্বি দুষ্ট চেহারা বেওফা কমিন', যার 'দাঁতভরা বিষ, অহঙ্কারে ভোর বিভোর মাতোয়ারা, সময় সময় জ্ঞানহারা—নাম ঋতুরাজ' (প্রথম নথি)। ঋতুরাজ শঠ, ভোগলিপ্সু, ধুরন্ধর ও জাতিবিদ্বেষী।

সব্‌লোট চৌধুরী জমদ্বারের একমাত্র পুরুষ জমিদার। কলহ-প্রতিপোষণ ও লাম্পট্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। ভোগ-বিলাসী জমিদারের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই তাঁর চরিত্রে উপস্থিত। তাঁর কূটচালে সোনা বিবি ও মনি বিবির বিরোধ স্থায়িত্ব পেয়েছে। স্বার্থতাড়িত কৌশলী সব্‌লোটের নিজের ভাবনায় বিষয়টি এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

> বিধবা জমিদার, যারা যমের দ্বারে দুঃখের তুফানে হাবুডুবু খেয়ে বেঁচে আছে—তারা আমার হাতের তলে ; কেউ কেউ পায়ের নীচে। একে দিয়া ওকে নড়াচ্ছি। ওকে দিয়া তাকে তাড়াচ্ছি।... স্বার্থের ঘুন পরিমাণ যেখানে আছে,—মারছি, ধরছি, বসাচ্ছি, উঠাচ্ছি, দৌড়াচ্ছি। আর চাই কি। আমার স্বার্থসিদ্ধি হলেই হল।
>
> [দ্বিতীয় নথি]

সব্‌লোট চৌধুরীর গীত-বাদ্যে আগ্রহ আছে, সুরাতেও অভ্যস্ত তিনি। তবে সবচেয়ে বেশী আসক্ত নারীদেহে। তাঁর যৌনতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য নিত্য-নতুন রমণীর প্রয়োজন। বাছ-বিচার নেই, এ-বিষয়ে তিনি যথেষ্টই উদার। রমণী-সংগ্রাহক ভেড়ুয়া খাঁর সঙ্গে সব্‌লোট চৌধুরীর কথোপকথনের ভেতর দিয়ে তাঁর নীতিহীনতা ও তীব্র ভোগলিপ্সার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত ঃ

> ত্রস্তপদে ভেড়ুয়া খাঁ গৃহ-দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল, "হুজুর। সে এলনা। তার জ্বর হয়েছে।" "তোর খালা কি বলল?" না, সেও আজ আসতে পারবেনা। তার জামাই, দুই ছেলে নিয়ে, সন্ধ্যার সময় এসেছে।" "তারপর উপায়?' "উপায় আর কি? শেষে নসার মার কাছে গিয়েছিলেম। সেও এলনা, বল্লে, শরীর খারাপ।" সবলোট আলী রাগতভাবে বলিলেন, "যা বেটা, তোর মাকে ডেকে আন্।"
>
> [দ্বিতীয় নথি]

'সব্‌লোট'—এই নামের ভেতরেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি প্রকাশিত।

'বস্তানী'র দাগাদারী চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি আছে। চরিত্রটিতে বিশিষ্ট লেখক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর পরিচয় প্রচ্ছন্ন। দাগাদারী যে একজন লেখক সে-তথ্য কাহিনীতে পাওয়া যায়। তিনিই সোনা বিবির প্রধান সহায় ও মন্ত্রণাদাতা। 'দাগাদারী সাহেব সর্বময় কর্ত্তা। তাঁহার আদেশ উপদেশেই

Dhaka University Institutional Repository

কার্য্য চলিতেছে' (একাদশ নথি)। ভেড়াকান্তের সঙ্গে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ বিদ্যমান। গাজী মিয়াঁ ওরফে ভেড়াকান্ত দাগাদারীর নিন্দা-সমালোচনায় মুখর, লেখক হিসেবে দাগাদারীর কৃতিকে নস্যাৎ করতে তৎপর, তাঁর চরিত্র-হননে উৎসাহী।

দাগাদারীর সঙ্গে সোনা বিবির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি বাহ্যত সোনা বিবির 'দুধভাই', কিন্তু অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নাগর। এই অবৈধ সম্পর্কের কারণেই যে দাগাদারীর দাম্পত্যজীবন বিপর্যস্ত সেই অভিযোগ স্বয়ং দাগাদারীর গর্ভধারিণীর। তাঁর প্রতি সোনা বিবির গভীর দুর্বলতা, অনুরাগ, প্রীতি ও আনুকূল্যের মর্যাদা অবশ্য দাগাদারী রক্ষা করেননি। দাগাদারী ধূর্ত, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক। তাঁর সীমাহীন লোভ ও অপ্রত্যাশিত প্রতারণার কারণে একসময় সোনা বিবির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বেগম সাহেবের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে দাগাদারী সোনাবিবির বিরুদ্ধাচারণ ও ক্ষতিসাধনেও কুণ্ঠিত হননা। নিন্দা-অপবাদে সোনাবিবিকে বিদ্ধ করে তিনি আত্মসুখ ও স্বার্থ হাসিল করতে উদ্যোগী হন। অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে বেগম সাহেবের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকেনি।

লাল আলু মোল্লাজীও এক ধূর্ত, অর্থলোলুপ ও ভোগলিপ্সু ব্যক্তি। সে অর্থলোভে মনিবিবির নামে স্ত্রী-স্বত্ব দাবী করে আদালতে মামলা দায়ের করতে প্ররোচিত হয়। অবশ্য মনিবিবির সঙ্গে ফয়সালাসাপেক্ষে সেই মামলা সে প্রত্যাহারও করে নেয়। এরপর লাল আলু কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত মনিবিবির সেবা-যত্ন-শুশ্রূষায় যে আন্তরিকতা প্রদর্শন করে তা যথার্থই তুলনাহীন। 'নাকে কাপড় দিয়া, কেহ সুগন্ধিমাখা রুমালে নাকমুখ বাঁধিয়া কাছে বসেন, সহ্য হইলে উঠিয়া চলিয়া যান'—এই যখন মনিবিবির রোগাক্রান্ত দেহের দুরবস্থা, তখনো লাল আলু মনি বিবির শিয়রে সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত। গাজী মিয়াঁর জবানীতে জানা যায় ঃ

> বলিহারি যাই লাল আলুকে। ধন্যবাদ দেই লাল আলুকে। সে নিজের স্নান-আহার পরিত্যাগ করিয়া মনি বিবির সেবা করিতেছে, প্রাণমন ঢালিয়া সেবা করিতেছে। মনের কথা মনের ভাব ঈশ্বর জানেন। হৃদয়ের টানে, মনের আকর্ষণে করিতেছে,— না হয় স্বার্থের জন্য খাটিতেছে। যাহাই হউক, স্বার্থের জন্য হইলেও, অমন পচা দেহের নিকট সর্ব্বদা কোন প্রাণী থাকিতে পারে? ধন্যবাদ লাল আলু! নিমকের সত্ব তুমিই বজায় রাখিলে।
>
> [সপ্তদশ নথি]

লাল আলুর চরিত্রে বিবর্তনের আভাস আছে। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা অতিক্রম করে তার চরিত্রে এক আশ্চর্য মানবিক ছোঁয়া লেগেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভেড়াকান্ত 'বস্তানী'র উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ভোড়াকান্তও বাস্তব চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের মীর মশাররফ হোসেন এবং গ্রন্থের গাজী মিয়াঁ ও ভেড়াকান্ত অভিন্ন। 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ থেকে স্পষ্টই জানা যায় 'বস্তানী'র অনেক ঘটনার উৎস মশাররফের নিজের জীবন এবং ভেড়াকান্ত চরিত্রটি তাঁরই প্রতিকৃতি।

লেখকের বক্তব্য ও অনুভূতি যথাযথভাবে প্রকাশের জন্যই ভেড়াকান্ত চরিত্রটি পরিকল্পিত। সকল মানবিক সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ আছে ভেড়াকান্ত-চরিত্রের আলোচনায়। 'বস্তানী'র অন্ধকারের বাসিন্দাদের বিপরীতে ভেড়াকান্তকে এক ব্যতিক্রমী-উজ্জ্বল আলোকাভিসারী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে। তবে পাঠকের কাছে তাঁর আচরণ ও ভূমিকা অবিতর্কিত নয় এবং তা বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণও হতে পারেনি।

ভেড়াকান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গাজী মিয়াঁ আলোকপাত করেছেন ঃ

> ভেড়াকান্ত লোক মন্দ নয়—কিন্তু বড়ই ব্যস্তবাগীশ। দোস্ত দুশমন জ্ঞান নাই। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য নাই। কাল কি খাইবে, কি ঘটিবে, কি হইবে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। খরচপত্রে হিসাব নাই, তবে যা বলিবে, যথাসর্ব্বস্ব ক্ষয় হইলেও তা রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। তোষামোদ, বরামোদ জানেনা। মিথ্যা প্রবঞ্চনার কাছেও যায়না। অন্যায় অত্যাচার দেখিলে, যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা পায়। নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরের উপকার করে। নিবাস গঙ্গার পার। কার্য্য গতিকে অরাজকপুরে বাস। অধিকাংশ লোকেই মুখে ভালবাসে, ভক্তিও করে।
>
> [সপ্তম নথি]

ভেড়াকান্ত অরাজকপুর ও জমদ্বারের জমিদারদের বিবাদ-বিরোধে নিরপেক্ষ থাকতে পারেননি। সোনাবিবির সপক্ষে থেকে তিনি অন্যদের বিরাগভাজন হন। 'ভেড়াকান্তের পৃষ্ঠপোষক একমাত্র সোনাবিবি', তাই ভেড়াকান্ত সোনা বিবির বিরুদ্ধ শিবিরের সকলেরই 'চক্ষুর শূল, হৃদয়ের কাঁটা, প্রধান শত্রুমধ্যে গণ্য' (সপ্তম নথি)। এক অজ্ঞাত কারণে অরাজকপুরের অন্যতম মহিলা জমিদার জ্বালাতননেসাও ভেড়াকান্তের প্রতি রুষ্ট ও বিরূপ। জ্বালাতননেসার বিশেষ অনুরোধে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বেগম সাহেব 'ভেড়াকান্তকে জব্দ করিতে, জেলে পুরিতে মহা পণ করিয়াছেন' (সপ্তম নথি)। শেষপর্যন্ত হাকিম-উকিল-জমিদারের সমবেত চক্রান্তে ভেড়াকান্তকে কিছুকাল কারাবাস করতে হয়।

ভেড়াকান্ত অনেক গুণে গুণান্বিত। পারিবারিক পরিমণ্ডলে তিনি সুখী পুরুষ, প্রগাঢ় তাঁর পত্নীপ্রেম ও সন্তান-বাৎসল্য। রাজভক্তি তাঁর হৃদয়ের গভীর প্রদেশে নিত্য লালিত। সামাজিক জীবনে উদার ও পরোপকারী ভেড়াকান্ত একজন লেখক হিসেবেও কৃতবিদ্য। তাঁর পত্নী এইসব সুকৃতি ও সাফল্যের মূল

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণা। ভেড়াকান্তের জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। মিথ্যা মামলা থেকে তাঁর মুক্তির জন্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'রোজানামাজ' পালন করে (ঊনবিংশ নথি)। কারাদণ্ডের রায় ঘোষণাকালে সহানুভূতিসম্পন্ন সর্বস্তরের লোক 'ভেড়াকান্তের প্রতি এই অন্যায় অবিচারের কথা শুনিয়া' কাচারি প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়, 'সকলের মুখই মলিন, অধিকন্তু অনেকের চক্ষে জল, সকলেই নীরব'। ক্রন্দনরতা ব্যথিত অবিদ্যার দলও আদালতে এসে ভীড় জমায়, কেননা 'ভেড়াকান্তকে সকলেই ভালবাসিত' (অষ্টাদশ নথি)।

গাজী মিয়াঁ ভেড়াকান্ত-চরিত্রে অনেক গুণ আরোপ করলেও তাঁর কার্যক্রমে তা যথাযথভাবে অনুশীলিত হয়নি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণই লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পুলিশকে উৎকোচে বশীভূত করে বিপদ-ত্রাণের পরামর্শ তিনিই সোনা বিবিকে দিয়েছিলেন। শঠতা, ষড়যন্ত্র ও কূটবুদ্ধিতেও তিনি দক্ষ। লাল আলু যখন স্ত্রী-স্বত্বের দাবীতে মনি বিবির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে, তখন ভেড়াকান্ত নানাভাবে তাকে মামলা প্রত্যাহার না করার জন্য প্ররোচিত করেন। তাঁর কূট-মন্ত্রণায় অনেকক্ষেত্রে সোনা বিবির মুশকিল আসান হয়েছে। তাঁর নৈতিক চরিত্রও কলুষমুক্ত নয়। সোনা বিবির সঙ্গে তাঁর আপত্তিকর সম্পর্কের কথা অবিদিত থাকেনি।

ভেড়াকান্ত চরিত্র পরিকল্পনায় অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতের অভিযোগ আছে। লেখক একটি আদর্শ চরিত্রের সমুদয় গুণাবলী আরোপ করেছেন ভেড়াকান্ত-চরিত্রে, তবে তা বিশ্বাস উৎপাদনের উপকরণে প্রকাশিত হয়নি।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বিচিত্র তাদের নাম ও কর্মকাণ্ড। 'বস্তানী'র চরিত্রসমূহের নাম কৌতুককর ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের দ্যোতক, কিন্তু তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই নামকরণ অনেকাংশে তাদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডকেই প্রতিফলিত করে। 'বস্তানী'র জগৎ তিমির তমসার জগৎ। এই অন্ধকারের অধিবাসীদের জীবন সুস্থ-শালীন-স্বাভাবিক নয়। লোভ, মোহ, স্বার্থ, অসূয়া, ধূর্ততা, প্রতারণা, ছলনা, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, জুগুপ্সা, অসততা, অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস, অনাচার, নীতিহীনতা, ভোগলিপ্সা—মানবপ্রকৃতির এইসব হীন প্রবৃত্তির দ্বারাই এই মানুষগুলো নিয়ন্ত্রিত, অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত। জীবনের মহৎ মূল্যবোধ ও শ্রেয়োচেতনা এদের কাছে অজানা বিষয়। ছদ্মনাম গ্রহণে লেখক রুচিবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দেননি। সমকালের মানুষ ও ঘটনাকে আড়াল করতে গিয়ে জীবনের ঘৃণ্য ও কদর্যের দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন কিন্তু জীবনের আনন্দ ও সততার দিকটি ততোখানি তুলে ধরতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

'বস্তানী'তে মশাররফের ভাষা এক নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। যদিও 'বস্তানী'র ভাষা সাধুরীতির, কিন্তু কথোপকথনে আছে মূলত কথ্যরীতির প্রয়োগ। মশাররফের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের গদ্যভাষার সঙ্গে 'বস্তানী'র ভাষার স্পষ্ট পার্থক্য ও ব্যবধান রচিত হয়েছে। এ-ভাষা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপ্রবাহকে ধারণ করার যোগ্য হয়ে উঠেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু' আর 'বস্তানী'র ভাষার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। একটি স্পষ্ট ভাষাগত বিবর্তন এখানে লক্ষ্য করা যায়।

রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-বিদ্রূপের বাহন হিসেবে 'বস্তানী'র ভাষা বিশেষ সহায়ক হয়েছে এ-কথা অনায়াসে বলা যায়। অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ মহিলা জমিদার পয়জারন্নেসা ওরফে বেগম সাহেবের সঙ্গে একান্ত নিভৃতে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের সুযোগ পেয়ে যে স্তুতিময় আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তার অভ্যন্তরে লেখকের ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকেনি ঃ

> আমি আজ এত সুখী হয়েছি যে এক মুখে প্রকাশের সাধ্য নাই। মুসলমান মধ্যে এরূপ ইনলাইটেন, এত উন্নত মন, উন্নত চিন্তা, উন্নত আশা, উন্নত চক্ষু, উন্নত হৃদয়, উন্নত বক্ষ,, আমি কখনও দেখি নাই। ধন্য শিক্ষা, ধন্য সাহস, শত সহস্র ধন্যবাদ, হাজার থ্যাঙ্ক, হাজার হাজার কোরনিস, হাজার হাজার নমস্কার, আপনার চরণ যুগলে।....... ধন্য ধন্য মেহমুডেন লেডী। এত উন্নত। ধন ধন্য পাড়াগাঁয়ের পর্দ্দানসীন জানানা। এত উন্নত।
>
> [তৃতীয় নথি]

অবশ্য 'বস্তানী'র ভাষা যে সর্বত্রই প্রশংসিত হয়েছে তা নয়। 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনায় বলা হয়েছিল, " his style is nevertheless ungrammatical and marked by East Bengalism and an absence of literary grace,"[১১৪] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এক আলোচনায় উল্লেখ করেন, 'বস্তানী' 'মফঃস্বলের ভাষায়' লিখিত।[১১৫]

উপন্যাসের আঙ্গিক, স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মশাররফ হোসেনের ধারণা সম্ভবত খুব স্পষ্ট ছিলোনা। তাই 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, কাহিনীর অসংলগ্নতা ও কেন্দ্রাভিমুখীনতার অভাবে একটি যথার্থ উপন্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। লেখকের অতিকথন প্রবণতা ও পরিমিতিবোধের অভাব 'বস্তানী'কে শিল্পের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থেকে বঞ্চিত করেছে। কাহিনীর চরিত্র ও ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি সে-সব চিত্রিত করতেন, তা হলে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শিল্পগুণ বৃদ্ধি পেতো বলে আমাদের বিশ্বাস।

'বস্তানী'র ত্রুটি ও অসঙ্গতি কম নয়। চরিত্রের নামকরণে সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। মুনীর চৌধুরী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে আবিষ্কার করেছেন, কখনো কটা লাহিড়ী রূপান্তরিত হয়েছেন মাথা পাগলা লাহিড়ীতে,

Dhaka University Institutional Repository

আবার কখনো মাথা পাগলা বসু কিংবা মাথা পাগলা রায়ে। আলকাতরা সান্যাল আকস্মিকভাবেই ঘরভাঙ্গা সান্যাল ও ঘরভাঙ্গা ঘোষে পরিণত হন। কটকটে বাবুর নাম কোথাও ফুটফুটে বাবু, আবার কোথাও বা ফিটফাট বাবু। অরাজকপুরের পুলিশ কর্মকর্তা তেছমার খাঁ স্থানবিশেষে হাতপাতা থানার দারোগা হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।[১১৬] পয়জারন্নেসা, বেগম সাহেব ও বেগম ঠাকরুন অভিন্নজন, কিন্তু এই গ্রন্থে তিন নামেই তাঁর বিচরণ। আসলে অনাবশ্যক চরিত্রের সংযোজন ও তাদের বিচিত্র নামকরণ লেখকের মনোযোগ-ভঙ্গ ও স্মৃতি-বিভ্রমের কারণ হয়েছে এবং অসঙ্গতি-দোষের উৎস এখানেই। চরিত্র-নামের ঐক্য রক্ষিত না হওয়ায় কখনো কখনো কাহিনীর গতি যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি মাঝে-মধ্যে পাঠকও বিভ্রান্ত হয়েছেন।

'গাজী মিয়ার বস্তানী'র আর-এক ক্রটি রুচি-বিকার। এই গ্রন্থে সুরুচির অভাব অত্যন্ত প্রকট। অনেকসময়ই গ্রাম্যতা ও স্থূলতা লেখক-মানসের অনুষঙ্গী হয়েছে। লেখক যাঁদের প্রতি বিরূপ ও বিদ্বিষ্ট, তাঁদের চরিত্র-চিত্রণে অনেকক্ষেত্রেই, প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের জন্য, গ্রাম্যতার আশ্রয় নিয়েছেন। অপছন্দের মানুষকে হেয় ও অবমানিত করার জন্য কুৎসিত মন্তব্য ও কদর্য বর্ণনায় লেখকের আগ্রহ কখনো নিঃশেষিত হয়নি। বিশেষ করে বেগম সাহেব ও মনি বিবির চরিত্র চিত্রণে তাঁর এই মানসিকতা বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করেছে। এমন কি তাঁর 'পৃষ্ঠপোষক' সোনা বিবির চরিত্রে কদর্য বর্ণনায় কালিমা লেপন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

রুচি-বিকারের যথেষ্ট উদাহরণ আছে 'বস্তানী'তে। ভেড়াকান্ত-সোনা বিবির অবৈধ সম্পর্ক বিষয়ে জানাতে গিয়ে বেগম সাহেব দাগাদারীকে বলেছেন ঃ

> ভেড়াকান্ত না হলে বুঝি আর জ্বরের লক্ষণ কেউ টের পায়না। সে হাত ধরে নাড়ী না দেখ্‌লে বুঝি আর আরাম বোধ হয়না। ... বুকে বেথা ধরল? ভেড়াকান্তের হাত টেনে বেথাস্থানে দেওয়া হল কেন? ..... স্ত্রীলোক অপর পুরুষের হাত আপন হাতে টেনে এনে বেদনা দেখাতে কোরতার মধ্যে হাত লয়ে গিয়ে দেখায়।.... আচ্ছা মানলাম, কোন স্থানে ফুললে হাতে টের পাওয়া যায়। সে ফুলো দেখ্‌তে, কতক্ষণ সময় লাগে? আধ ঘন্টার মধ্যে কি আর স্থান খুঁজে পাওয়া গেলনা।
>
> [উনবিংশ নথি]

লাল আলু মোল্লা স্ত্রী-স্বত্ব দাবী করে মনি বিবির বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করে। কিন্তু পরে অর্থলোভে সে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। এ-প্রসঙ্গে বক্কেশ্বর ও ঋতুরাজের আলাপচারিতায় শ্লীলতার সীমা অতিক্রান্ত হয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

" ...... লাল আলু মোকদ্দমা তুলে নিয়েছে। দরখাস্তে বলেছে যে, আমার এই ক্ষণে স্ত্রীর প্রয়োজন নাই। বয়স দোষে ইন্দ্রিয় আদি শিথিল হয়েছে, আর স্ত্রীর আবশ্যক নাই।"

ঋতু—"বাবা। দরখাস্ত দাখিল সময় ইন্দ্রিয় আদি সটান ছিল, ছয়মাস যেতে যেতে শিথিল হলো? দশ-বার হাজারের কমে আর শিথিল হয় নাই।"

[পঞ্চদশ নথি]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সঙ্গে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র তুলনা করেছেন কেউ কেউ।[১১৭] মশাররফ হোসেন নিজেও সুকৌশলে 'বস্তানী'কে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সমধর্মী রচনা হিসেবে প্রতিপন্নের চেষ্টা করেছেন (দ্বাদশ নথি)। তবে 'বস্তানী'তে 'দপ্তরে'র প্রেরণা ও প্রভাব কিছু থাকলেও, শিল্প-সমালোচনার ধারা অনুসরণ করে বলা যায় যে, 'কমলাকান্তের দপ্তরে' প্রতিফলিত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবীক্ষণ, প্রসন্ন রম্য-ব্যঙ্গ, ব্যক্তিগত অভিপ্রায়হীন সমাজ-সমালোচনা, প্রত্যাশিত পরিমিতিবোধ, অনবদ্য ভাষাশৈলী ও উচ্চাঙ্গের শিল্প-সামর্থ্য 'বস্তানী'তে অর্জিত হয়নি।

বাঙলাসাহিত্যের কিছু জনপ্রিয় নক্শার আদর্শও মশাররফের সম্মুখে ছিলো। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) ও 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২)— এইসব নক্শাজাতীয় রচনা কোনো না কোনোভাবে হয়তো মশাররফের প্রেরণার উৎস হতে পারে। কোনো কোনো সমালোচক 'বস্তানী'তে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর রচনা এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'র প্রভাব অনুমান করেছেন।[১১৮]

'এই গ্রন্থ যদি দর্পণ হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে এই বৃহৎ দর্পণখানা নিতান্তই সস্তা, সেকেলে ও গ্রাম্য'[১১৯]— মুনীর চৌধুরীর এই মন্তব্য একটু কঠোর। কেননা 'বস্তানী'র শিল্পমূল্য ন্যূন হলেও সমাজচিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব ও মূল্য অস্বীকার করলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' মশাররফের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এক অবাঞ্ছিত অন্ধকার জগতের কাহিনী। মূল্যবোধহীন ফাঁপা এক সমাজের অকল্পনীয় কুৎসিত জীবনাচরণ ও ভোগসর্বস্ব জীবনদর্শনের কাহিনী এই 'বস্তানী'। অর্থ ও আভিজাত্যও সেই নারকীয় ভুবনের কর্মকাণ্ডকে প্রলেপ দিতে বা প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেনি। উদ্ভট ও আপাত হাস্যকর নামকরণের অন্তরালে প্রকৃত পাত্র-পাত্রী বা স্থানের নাম গোপন করা হলেও মীরের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিতে এঁরা বাস্তব ও জীবন্ত। যে-কোনো কারণেই হোক মীরকে এই পরিবেশ ও তার অন্তর্গত অধিবাসীদের প্রতি বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ হতে হয়েছিল। আক্রান্ত মশাররফ তাই ভয়ঙ্কর এক স্থায়ী প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে শিল্পের শক্তি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন। এখানে কোনো 'বিশেষ' চরিত্র 'নির্বিশেষ' হতে পারেনি, শৈল্পিক নির্লিপ্ততাও অনুপস্থিত। দুঃসহ ক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালার প্রতিক্রিয়া তাই কখনো কখনো সংযমের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, বিনষ্ট নয় সৌজন্যের সুষমা, অতিক্রান্ত হয় শ্লীলতার গণ্ডি। বস্তুত "বস্তানী'তে মশাররফের ব্যক্তি-অভিপ্রায় চরিতার্থ হলেও শিল্পের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সফল হয়নি সে-কথা স্বীকার করতে হয়। সমালোচক 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'কে মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা' হিসেবে চিহ্নিত করলেও,[১২০] এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত, অবিতর্কিত বা গরিষ্ঠ-সমর্থিত নয়।

তবে নানা ত্রুটি, অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' 'কালের দর্পণ' এবং মশাররফের প্রচলিত শিল্পভুবনের বাইরে একটি স্বতন্ত্র শিল্পরীতির নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

হজরত ইউসোফ

মশাররফ হোসেনের 'হজরত ইউসোফ' উপাখ্যান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তার সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়না। 'আমার জীবনী'র প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩২৫) এই উপাখ্যানটি 'যন্ত্রস্থ' বলে বিজ্ঞাপিত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূত্র-উল্লেখ করেই 'হজরত ইউসোফ'কে মশাররফের মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করেছেন।[১২১]

অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে 'হজরত ইউসোফ' সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি মশাররফ হোসেনের উত্তরপুরুষদের নিকট থেকে 'হজরত ইউসোফ'-এর ষোলো পৃষ্ঠা গ্যালি প্রুফসহ মোট ৩৭৩ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।[১২২] এ-থেকে ধারণা করা যায়, 'হজরত ইউসোফ' গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হলেও অজ্ঞাত কারণে তা প্রকাশিত হয়নি।

মশাররফের 'মোস্লেম বীরত্ব' গ্রন্থের পরবর্তী এক সংস্করণে (১৩২১) 'ইউসুফ জুলেখা' নামে একটি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকী-সূত্রে জানা যায়, 'ইউসুফ জুলেখা'র পাণ্ডুলিপি মশাররফের পুত্রদের নিকটে সংরক্ষিত আছে এবং মীরের 'প্রেম-পারিজাত' ও 'ইউসুফ জুলেখা' ভিন্ন নামের অভিন্ন রচনা।[১২৩] আশরাফ সিদ্দিকীর এই অভিমত ও সিদ্ধান্ত যে সঠিক সে-সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পেরেছি 'প্রেম-পারিজাত' ও 'হজরত ইউসোফে'র মূল পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ আমাদের হাতে আসায়।[১২৪]

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ-জোলেখার চিরায়ত প্রেম-কাহিনীই 'হজরত ইউসোফে'র উপজীব্য। ৩৭৩ পৃষ্ঠার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি এই কাহিনী-পরিবেশনার মহাকাব্যিক আয়োজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের সংগৃহীত খণ্ড-পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে বিবৃত হলো।

'হজরত ইউসোফ' উপাখ্যানের পূর্বোক্ত ষোলো পৃষ্ঠা গ্যালি প্রুফ্ 'উপক্রমণিকা' নামে অভিহিত। মূল কাহিনীর প্রবেশক হিসেবে এই 'উপক্রমণিকা'য় পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা ইউসুফের বঙ্গানুবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

'হজরত ইউসোফ'-এর পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। আমাদের প্রাপ্ত ইউসুফ-জোলেখার প্রেম-কাহিনীর পাণ্ডুলিপির নাম 'প্রেম-পারিজাত'। এই নামকরণের বিভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় অভিহিত হয়েছে 'উদ্যান' হিসেবে এবং পরিচ্ছেদের উপ-বিভাগ চিহ্নিত হয়েছে 'কোরক' নামে।

'প্রেম-পারিজাত' বা 'হজরত ইউসোফ'-কাহিনীর কিছু নমুনা এখানে পেশ করা হলো। 'দ্বিতীয় উদ্যানে'র 'প্রথম কোরকে'র সূচনাতেই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু জোলেখার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে ঃ

> সন্তানসন্ততি মধ্যে মাত্র একটি কন্যারত্ন। নাম জেলেখা। বালিকাকাল উত্তীর্ণ হইয়া নবযৌবন কুসুমকোরক প্রস্ফুটিত।... একমাত্র কন্যারত্নই রাজ-পাটের অধিকারিণী। তিনিই ভাবী রাজরাজেশ্বরী। রাজকুমারী অল্পবয়সে বহু গুণে গুণান্বিতা— তিনি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী।... তৈমুস রাজনন্দিনীর ন্যায় সুশ্রী বালিকা সে-সময় আরবদেশে আর কেহই ছিলনা। বিবাহ উপযুক্ত বয়স হয় নাই,—তত্রাচ মহাপ্রবল প্রতাপান্বিত রাজকুমারগণ বিবাহ প্রার্থনায় সদা-সর্ব্বদা দূত প্রেরণ করিতেছেন,.... সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে রাজকন্যার অভিমত অনুসারে বিবাহ হইবে। এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই। .... দেশময় কথা রটিয়াছে যে, তিন বৎসর গত হইল—রাজকুমারী কি এক স্বপ্ন দেখিয়া সর্ব্বদাই মনে মনে কি যেন চিন্তা করেন। সহচরিদিগের সহিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন কাহার সহিত কোন কথা কহেন না। আমোদ-আহ্লাদে মন নাই, শরীরের প্রতিও যত্ন নাই। পিতামাতার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেও ইচ্ছা নাই। সর্ব্বদাই মৌন অবস্থায় দিনযাপন করেন।.... তাঁহার মনের সংবাদ তিনটি বৎসরের মধ্যে কেহ জানিতে পারে নাই।
>
> এইসকল কারণে রাজারাণী উভয়েই দুঃখিত, সর্ব্বদা চিন্তিত। সর্বস্ব ধন ঐ এক কন্যারত্ন, তাহার এই ভাব। দুঃখের সীমা নাই।... তাঁহারা উভয়ে অন্তরে অন্তরে মহা অসুখী।
>
> [দ্বিতীয় উদ্যান, প্রথম কোরক]

Dhaka University Institutional Repository

'স্বপ্নদৃষ্ট' প্রণয়ীর রূপ-কল্পনায় আবিষ্ট, বিরহ-তাপিতা জোলেখার চিত্তচাঞ্চল্য ও মানস-বিকারের অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন মশাররফ ঃ

> সে স্বপ্নদৃষ্ট প্রেমময় মনমোহন মূর্ত্তি, অন্তরের অন্তর হয় নাই। হৃদয়পট হইতে একবিন্দুও সরে নাই। কোন অঙ্গই মলীন হয় নাই। হৃদয় জানিতেছে, চক্ষু বন্ধ করিলে মানসচক্ষের আড়াল হইতেছে না। দিবারাত্র অন্তরে। হৃদয়ান্তরে সেই রূপেই নিমগ্ন। সেই রূপেই আত্মবিস্মৃতি, সেই রূপেই মুগ্ধ—সেই রূপেই সময় সময় জ্ঞানশূন্য। এ কি নিদ্রা? প্রেমিকের চক্ষে নিদ্রা? প্রেমিক কি প্রেমিকের রূপদর্শনে ক্ষণকাল বঞ্চিত থাকিতে পারে? অন্যমনস্কে কি প্রেমিকের চিত্তভ্রম জন্মাইতে পারে? সত্য প্রেমিকের অন্যমনস্ক কোথায়? যে হৃদয়রত্ন, হৃদয়ের মহারত্নধনকে ভুলিয়া, অন্যরূপে, অন্য কারণে অন্যমনস্ক হইবে? চক্ষুর তারাক্ষেত্র ঐ অঙ্কিতরূপ কি অন্যমনস্ক চক্ষুর অগোচর সম্ভবে?
>
> [দ্বিতীয় উদ্যান, প্রথম কোরক]

'তৃতীয় উদ্যানে'র 'দ্বিতীয় কোরকে' জোলেখা ও ইউসুফের সাক্ষাৎ-দৃশ্য চিত্রিত। এই অধ্যায়ে দৈববাণী-বাহক হজরত জিবরাইল (আঃ)-এর আবির্ভাব, দৈববলে বৃদ্ধা জোলেখার পুনরায় যুবতী-রূপলাভ এবং জোলেখা-ইউসুফের শুভ পরিণয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী বর্ণনায় মশাররফের নৈপুণ্য ও ভাষা-সৌকর্য এখানেও অনুপস্থিত নয়। ইউসুফ ও জোলেখার নিভৃতে সাক্ষাৎকালে জোলেখার অন্তরের গভীর প্রণয় ও অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন লেখক ঃ

> হাজরাত ইউসোফ-গৃহে, নির্জ্জনকক্ষে তৈমুসনন্দিনী জেলেখাসহ হাজরাত ইউসোফ কথা কহিতেছেন। ... বিবাহের পর যে যে ঘটনা হইয়াছিল, রাজবালা জেলেখা সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।
>
> আজ জেলেখার মুখশ্রী ফিরিয়াছে। লাবণ্যছটা প্রকাশ পাইয়াছে। জেলেখা বলিলেন—দেখ ইউসোফ—তুমি যাহা জানিতেনা তাহাও আজ তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। আজীজ মেসের—ইতি, আজীজ মেসেরের কথারও ইতি—এতদিন মরিলাম না কেন? তোমার মুখের কথা—হল স্বপ্নেই বলিয়াছিলে, স্বপ্নবাক্য আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাহার পর দৈববাণী। সেইজন্যই আত্মঘাতিনী হই নাই। এখন আর আশা কি? জীবনের শেষ দশা—আর আশা কি? একত্র মিলন ভিন্ন আর কোন আশা নাই।.... তুমি আমার নিদ্দৃষ্ট [নির্দিষ্ট]—আমি তোমার নিদ্দৃষ্ট [নির্দিষ্ট]।
>
> [তৃতীয় উদ্যান, দ্বিতীয় কোরক]

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়েই পরিণয়ের মাধ্যমে উভয়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও দুঃসহ বিরহের অবসান ঘটে। পরিণয়ের পর মিলন-মুহূর্তে জোলেখা ইউসুফকে গভীর আবেগে বলেন ঃ

> প্রিয়তম ইউসোফ। তুমি আমার হৃদয়ের অমূল্যনিধি। জীবনযৌবনের অধিকারী। বহু বৎসর গত হইল তোমার পদে বিক্রীত হইয়াছি। ... জেলেখা আজীবন তোমারই। সেই স্বপ্ন আজ সফল হইল। "'তুমি আমার নিদ্দৃষ্ট [নির্দিষ্ট], আমি তোমার নিদ্দৃষ্ট [নির্দিষ্ট]।"
>
> [তৃতীয় উদ্যান, দ্বিতীয় কোরক]

পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণিত ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে মশাররফ ধর্মীয় আবরণকে অপসারিত করে লোক-পুরাণের আশ্রয়ে রক্ত-মাংসের মানব-মানবীর প্রণয়োপাখ্যানই রচনা করেছেন। এখানে হজরত ইউসুফের পয়গম্বরের ভূমিকা অপেক্ষা প্রেমিকরূপই প্রতিষ্ঠিত। এই কাহিনীতে জোলেখা ও ইউসুফ রূপজমোহে আচ্ছন্ন প্রণয়মুগ্ধ নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত মানুষ। মানব-মানবীর প্রেমই এখানে প্রধান, ধর্ম কিংবা পাপ-পুণ্যের প্রসঙ্গ এই কাহিনীর আবরণ মাত্র। কারবালার কাহিনী 'বিষাদ-সিন্ধু'তে যেমন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও উপলব্ধি অপেক্ষা মানবীয় আচরণ ও আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি 'হজরত ইউসোফ' উপাখ্যানেও ধর্মীয় চেতনা ও আবহকে শিল্পের শাসন মানতে হয়েছে। এখানেই শিল্পী মশাররফের কৃতিত্ব ও জয়, এ-ই তাঁর শিল্প-মানসের বৈশিষ্ট্য।

তহমিনা

'তহমিনা' গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত মশাররফ হোসেনের একটি উপন্যাস। শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'হাফেজ' পত্রিকার ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ-এপ্রিল ও মে-জুন এই চার সংখ্যায় 'তহমিনা'র চারটি পরিচ্ছেদ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।[১২৫] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে সংযোজিত বিজ্ঞাপনে 'তহমিনা উপন্যাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পারস্য-বীর রোস্তম ও সামান গাঁ রাজ্যের শাহজাদী তহমিনার প্রণয়-কাহিনী নিয়ে 'তহমিনা' উপন্যাসটি রচিত। কাহিনী-উৎস সম্পর্কে মশাররফ জানিয়েছেন, "কবিগুরু ফেরদৌসী মহোদয়ের পদাঙ্ক চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই এই 'তহমিনা'।[১২৬] 'হাফেজ' পত্রিকায় চারটি পরিচ্ছেদেরই স্বতন্ত্র নাম দিয়েছেন লেখক, তা যথাক্রমে ঃ 'আভাস', 'কারণ', 'নিদ্রাভঙ্গ' ও 'নিশাপালা'।[১২৭] পরিচ্ছেদের নামকরণে কাহিনীর বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে। সৈয়দ মুর্তাজা আলী 'তহমিনা'কে 'রোমান্টিক প্রেম-উপাখ্যান' বলে অভিহিত করেছেন।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

তহ্‌মিনা সামান গাঁ নগরের অধিপতির একমাত্র কন্যা। তিনি 'রূপেগুণে স্বদেশ বিখ্যাত'। পারস্যসম্রাট কায়কাউসের প্রধান সেনাপতি রোস্তমের গুণবত্তা ও শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের কথা শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। রোস্তম ছাড়া অপর কাউকে তিনি বিবাহ্ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। জনক-জননীও তহ্‌মিনার মনোভাব বুঝতে পেরে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হন। এমন সময় একদিন মহাবীর রোস্তম মৃগয়া উপলক্ষে সামান গাঁ রাজ্যের 'প্রান্তসীমায় আসেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে সামান গাঁ-রাজ এই সংবাদ পেয়ে তহ্‌মিনাকে অবহিত করেন। তহ্‌মিনা বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রোস্তমের অশ্ব অপহরণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তারজন্য বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করেন।

এদিকে শিকার-শেষে পরিশ্রান্ত রোস্তম বৃক্ষের তলায় নিদ্রার আয়োজন করেন। তিনি যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন তহ্‌মিনার লোকজন তাঁর প্রিয় অশ্বটি অপহরণ করে নিয়ে যায়। অশ্ব-দর্শনে তহ্‌মিনার মনে রোস্তমের প্রতি ভালোবাসা আরো তীব্রভাবে জেগে ওঠে। অশ্বকে 'ভালবাসার ভালবাসা' বলে অভিহিত করে 'রাজনন্দিনী স্বহস্তে ঘোড়ার গা মার্জনা করিয়া উৎকৃষ্ট গোলাপজলে অশ্ববরের মুখ, চোক্ ধৌত করিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন'। অতঃপর তহ্‌মিনা অত্যন্ত যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে অশ্বের বিশ্রাম-ব্যবস্থা করে দেন।

'রজনী প্রভাত' হলে রোস্তম সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তার প্রিয় অশ্বটি অপহৃত হয়েছে। পদচিহ্ন অনুসরণ করে ক্রোধান্বিত রোস্তম অশ্বের সন্ধানে সামান গাঁ-য়ের দিকে চললেন। এদিকে রাজ্যময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, উন্মুক্ত তরবারি হাতে রোস্তম রাজধানী অভিমুখে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত প্রজাসাধারণ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করে। সামান গাঁ-য়ের সন্ত্রস্ত ও বিব্রত অধিপতিও এ-খবরটি অবহিত হন।

মহাবীর রোস্তম সামান গাঁ রাজপ্রাসাদের অনতিদুরে উপস্থিত হলে রাজ্যের অধিপতি সপারিষদ তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য 'দূর হইতে অভিবাদন করিতে করিতে নিকটে আসিয়া করজোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন'। তখন উত্তেজিত রোস্তম 'অতিশয় কর্কশ বাক্য' উচ্চারণ করে তাঁর অশ্ব দাবী করেন। রোস্তমের কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত সামান গাঁ-রাজ সবিনয়ে তাঁকে একরাত্রের জন্য আতিথ্য-স্বীকারের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং সেইসঙ্গে অশ্বপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেন। রাজার বিনয়, সৌজন্য ও আশ্বাসে মুগ্ধ ও তুষ্ট হয়ে রোস্তম আতিথ্য গ্রহণে স্বীকৃত হলেন। রোস্তমের অভ্যর্থনা-আপ্যায়ন-মনোরঞ্জনের জন্য রাজ্যে যথোচিত উৎসবের আয়োজন হয়। 'ক্রীড়া-কৌতুক নৃত্যগীতবাদ্য' মুখর এই আয়োজনে রোস্তম অত্যন্ত আনন্দিত ও তৃপ্ত হন।

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোৎস্নালোকিত এক অপূর্ব সৌন্দর্যবিচ্ছুরিত রজনীতে রোস্তম সামান গাঁ রাজপ্রাসাদে বিশ্রামরত। কিন্তু নানা চিন্তায় তাঁর চক্ষু নিদ্রাহীন। গভীর নিশীথে রাজকুমারী তহমিনা রোস্তমের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাতের জন্য তাঁর কক্ষে আসেন। তহমিনা সবিনয়ে রোস্তমের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও প্রণয়ের কথা নিবেদন করে উভয়ের পরিণয় প্রার্থনা করেন। তহমিনার রূপলাবণ্যে রোস্তম মুগ্ধ ও অভিভূত হন এবং তাঁর সাহচর্যে রোস্তমের অন্তরেও দ্রুত প্রণয়াসক্তি জন্ম নেয়। তহমিনা তাঁর পিতার নিকট পরিণয়-প্রস্তাব পেশের জন্য রোস্তমকে অনুরোধ করেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের এখানেই সমাপ্তি।

এই পরিচ্ছেদের শেষে তিনি 'তহমিনা' উপন্যাসের প্রকৃতি, পারসিক ও বাঙালীর মূল্যবোধের পার্থক্য এবং কাহিনী-বর্ণনায় স্থানগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিষয়ে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। কাহিনী পরিবেশনে তিনি যে দৃঢ়ভাবে মহাকবি ফেরদৌসীকে অনুসরণ করেছেন সে-কথাও জানিয়েছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিষয় 'বিবাহ' বিবরণ, সেই আভাসও তিনি এখানে দিয়েছেন।

ফেরদৌসীর 'শাহনামা' থেকে চয়িত মশাররফের এই 'তহমিনা' উপন্যাসটি যেহেতু অসম্পূর্ণ, তাই এর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবে যে-অংশটুকু[১২৯] আমরা পাঠের সুযোগ পেয়েছি তার ভিত্তিতে বলা যায়, মশাররফের ছন্দোময় গীতল ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য এখানেও উপস্থিত। 'তহমিনা'র মধ্যে লেখক 'পল্লবিত ভাষায় অবাধ কল্পনার স্ফূর্তি সাধন করেছেন'[১৩০]— সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ।

প্রকৃতি-বর্ণনা ও পরিবেশ-রচনায় মশাররফের ভাষা যে কতো জীবন্ত ও বিষয়মুখী তার দৃষ্টান্ত কাহিনীর প্রারম্ভ-অনুচ্ছেদটি ঃ

> তুরান রাজ্য অন্তর্গত সামান গাঁ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী প্রান্তর। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত। চতুর্দ্দিকে যেন দাউ দাউ করিয়া অগ্নি-শিখাসম রৌদ্রতেজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। বায়ু বেগহীন। বৃক্ষপত্র সকল নিঃরবে স্থির। মধুমাসের প্রথম ভাগ। অনাবৃষ্টিহেতু বহুদূরব্যাপী, ধূলি-কণাসকল ধূমাকারে প্রান্তর হইতে আকাশপথ ঘিরিয়া রহিয়াছে। রবিতাপে সময় সময় ঐ ধূমপুঞ্জ হইতে ধূলিকণাসকল অগ্নিকণার ন্যায় চাকচিক্য দেখাইয়া, ধূমপুঞ্জে মিশাইয়া যাইতেছে।
>
> [প্রথম পরিচ্ছেদ]

হ্রস্ব বাক্য এবং ক্রিয়াপদের স্বল্প ব্যবহার এই গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নিসর্গ ও নারীর একীভূত রূপমাধুরীর বর্ণনা লেখকের কল্পনা-শক্তি ও ভাষাসৌকর্যের পরিচয় প্রতিফলিত করে ঃ

> হঠাৎ সর্ব্বপ্রকার কিরণ জ্যোতিঃ সকলি যেন মন্দীভূত হইল। পূর্ণ শশধরের পূর্ণজ্যোতিঃর উপর দিয়া একখণ্ড কাল মেঘ বায়ুগতিতে আসিয়া পড়িল। রোস্তম স্থিরনেত্রে দেখিলেন, কালমেঘ

Dhaka University Institutional Repository

> নহে। বহু সংখ্যক মুখচন্দ্রিমার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ও লাবণ্যছটায় উদ্যানস্থ উজ্জ্বল আলো, গগনস্থ সুধাংশুর কিরণ সকলে মলিনভাব ধারণ করিয়াছে। মেঘের ছায়ার ন্যায় যে দেখিয়াছিলেন, তাহা মেঘ নহে। রমণীগণের কেশগুচ্ছের সুচিক্কণ কৃষ্ণ আভা। চক্ষে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণে কিছু প্রবেশ করিল। গাত্রাভরণের সপ্তস্বর মিশ্রিত মনোপ্রাণ মুগ্ধকারী বন্‌বন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ।
>
> [চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

অতি–কথন ঝোঁক ও কখনো কখনো অনাবশ্যক বিষয়–ব্যাখ্যা মশাররফ–মানসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের ধারণা ও মত পোষণের সুযোগ তিনি প্রায়শই গ্রহণ করে থাকেন। কাহিনীর জন্য তা অনেকসময়ই অসঙ্গত ও অপ্রত্যাশিত। যেমন, প্রণয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেছেন ঃ

> আমি ভালবাসি—ভালবাসাও ভালবাসে—সে ক্ষেত্রে কথা স্বতন্ত্র, তাহাতে আশা থাকে।— জীবন ভার বোধ হয়না, যদি ভালবাসা যথার্থ হয়, পরস্পর জীবনমরণের দায়িত্ব বোঝে, সে জ্ঞান মাথায় থাকে। তবে চিরবিরহেও সুখ আছে। সে প্রেমে প্রেমত্ব আছে, সে প্রেমের তত্ত্ব আছে। নিরাশ বিশ্বাস নাসারন্ধ্রে কখনই বহিবেনা, মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস।
>
> [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

চরিত্রের শ্রেণীস্তরভেদে সংলাপের ভাষারও তারতম্য হয়েছে এখানে। রাজনন্দিনী তহমিনার নির্দেশে যারা রোস্তমের অশ্ব–অপহরণে গমন করে তাদের কথোপকথনে মূলত কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের আচরণ, রঙ্গ–রসিকতা ও পারস্পরিক আলাপচারিতায় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রতিফলিত ঃ

> "ওহে ভায়া। ঘাড়ে যে মাথা থাকবে না তা ত বুঝি। কিন্তু দাদা। এক প্রেমের খাতিরে কতজনের জান মারা যাবে। প্রেম পিরিত কি বালাই।" তৃতীয় ব্যক্তি সক্রোধে বলিল—"প্রেম পিরিত কর। ওদিক যে গলার বাঁন্দন দাঁতে কেটে ছিঁড়ে দুই টুকরা করে ফেল্লে? আর ত রাখা যায় না।"
>
> [প্রথম পরিচ্ছেদ]

কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে পাঠককে সম্বোধন ও তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন মশাররফের আর–একটি প্রিয় প্রবণতা। বিশেষ করে 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এই বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রতিফলিত। 'তহমিনা'তেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রিয় পাঠকগণ! হাসিবেন না। মাথার দিব্বি দিয়া বলিতেছি, হাসিবেন না।
[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

খ. পাঠক পূর্ব্ব কথা মনে করুন। [ঐ]

গ. পাঠক! ভাবিতে পারেন কথাটা কিরূপ হইল। [ঐ]

আখ্যান-পরিকল্পনায় কোনো অভিনবত্ব নেই, ভাষা-সঙ্গতিও পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি, লেখক আতিশয্য ও আবেগও বর্জন করতে পারেননি— এ-সব ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'তহমিনা'য় প্রণয়োপাখ্যানের যে আবহ রচিত হয়েছে, তাতে একটি আকর্ষণীয় কাহিনীর সম্ভাবনার আভাস সূচিত। জনপ্রিয় পুরাণ-কথা যে মশাররফের শিল্পচর্চার উৎস হয়েছে, 'তহমিনা' তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

নিয়তি কি অবনতি

'নিয়তি কি অবনতি' রচনাটি 'সম্পূর্ণ সত্য ঘটনামূলক জীবন্ত উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত। এটি 'কোহিনুর' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩০৫ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) প্রকাশিত হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে সংযোজিত বিজ্ঞাপনে "নিয়তি কি অবনতি' উপন্যাসের উল্লেখ মেলে। তবে গ্রন্থটি প্রকাশের সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই।

স্নেহান্ধ জমিদার মাতামহের এক অকালপক্ক দৌহিত্রের বিচিত্র খেয়াল-খুশী চরিতার্থের কাহিনী এই 'নিয়তি কি অবনতি'। নানা বিষয়কর্মে নিপুণ এক শিক্ষিত মুসলমান জমিদার। তিনি 'অতি বিচক্ষণ', 'বিদ্যাবুদ্ধিতে দেশের মধ্যে অদ্বিতীয়', 'বয়সে প্রাচীন', 'সংসারলীলাতেও পরিপক্ক ষোল আনা'। কিন্তু এই বিষয়-প্রাজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধের সকল গুণই অবিকশিত ও ব্যর্থ হয়েছে নাতির আবদাররক্ষার কারণে।

এই ব্যক্তিত্বহীন জমিদারের সাতবছরের নাতির আবদাররক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য নিত্য তাকে তার বয়স, মর্যাদা ও ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ করতে হয়। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

> নাতি যাহা বলেন নানা তাহাই শুনেন।...... বাইজী, খেমটাওয়ালী, যাত্রার দল, কবির দল, ঢপ্ গাজীর গান, জারির দল নাতির খাতিরে সদা সর্ব্বদা খাটিতে প্রস্তুত। নাতি কোন সময় কি শুনিতে চায় তাহার ঠিকানা নাই। ইংরেজ ব্যাণ্ডের দল বারমেসে চাকর। তাহারা প্রহরে প্রহরে বাদ্য করে, বাঁশি বাজায়। সদর দেউড়িতে নহবত—সিংহদ্বারে নহবত।

নাতির আব্দারে নানাকে স্নান করতে গিয়ে অগণনবার জলে ডুব দিতে হয়। নাতির মনোরঞ্জনের জন্য তাকে প্রতিদিন 'বর' সেজে 'বাদ্যভাণ্ড, হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, আরদালী, খাস বন্দুক, নিসান,

Dhaka University Institutional Repository

আশাসোটা, বোম বন্দুক, ইংরেজী বাজনা' বাজিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে 'বিবাহ আমোদ' ও বজরায় আনন্দোৎসব সম্পন্ন করে 'বধূ'সহ 'সন্ধ্যার পর পুনরায় পূর্ণ সাজে..... বিশেষ ধূমধামে বাটীতে আগমন' করতে হয়। নাতির ইচ্ছায় রাত্রে নিত্যই গান-বাজনা-নাচের আসর বসে। 'নাতি প্রায় দিগম্বর বেশে' থাকলেও নৃত্য-গীতের ভালো-মন্দ সম্পর্কে মতামতদান ও 'বকশিশ্ হাঁকিতে' যথেষ্ট পটু।

নাতির এই কৌতুক-ক্রীড়া আর আবদার-অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নানা নিরূপায়। তাই তার কোনো মনোবাঞ্ছাই অপূর্ণ রাখেননা। তিনি যেন নাতির ইচ্ছাপূরণের যন্ত্রবিশেষ। তার আবদার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যখন সে হিন্দুদের বিগ্রহ মদনমোহন ঠাকুরকে দেখে বায়না ধরে, 'ঐ পুতুলটা আমি চাই'। নানা পরধর্মসহিষ্ণু এবং 'কত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর নানার এলাকায় বিনা বিঘ্নে ভোগ করিলেও' নাতির কারণে ব্রাহ্মণদের পীড়ন করে তিনি বিগ্রহ করায়ত্ত করেন। অবশ্য এই ক্রীড়া-সামগ্রীর প্রতিও নাতির আগ্রহ-আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়না। নাতির আদেশে অচিরেই 'মদনমোহনকে কচুবনে যাইতে হইল'। পত্রিকায় এই অসমাপ্ত কাহিনীর এই পর্যন্তই ছাপা হয়েছে। পত্রিকা-সম্পাদক এই বিগ্রহ-দখল প্রসঙ্গে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সংখ্যায় এই কাহিনীর পাদটীকায় মন্তব্য করেন ঃ

> হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে "কোহিনুরের' আবির্ভাব। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এইরূপ কথার প্রচার, উহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ; কিন্তু আমরা কি করিব, বাস্তবিক পক্ষেই এইরূপ ঘটনা এদেশে এককালে ঘটিয়াছিল। লেখক সেই চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। হিন্দুর দেবতাকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিয়া নানা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। হিন্দুর দেবতাকে লাঞ্ছিত করিয়া বাহাদুরি লওয়া কোন মুসলমান জমিদারেরই উচিত নহে। কেননা উহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে ও প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের প্রাণে আঘাত দেওয়া মুসলমান ধর্ম্মে বিধিসিদ্ধ নহে—উহা মহাগ্রন্থ কোরানে নিষিদ্ধ।....[১৩১]

'নিয়তি কি অবনতি'র এই অসমাপ্ত অংশটুকুর ভেতরে কাহিনীর যে আভাস মেলে তাতে উপন্যাসের সম্ভাবনা সূচিত হয়নি। প্রকরণগত কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও এখানে লক্ষ্য করা যায়না। ভাষা আড়ষ্ট, প্রকাশভঙ্গি দুর্বল, উপস্থাপনা অভিনবত্বহীন। অনুমান করা চলে, মীরের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিতে জাগ্রত অথবা শ্রুত কোনো ঘটনার রূপায়ণ এই কাহিনী। 'সম্পূর্ণ সত্য ঘটনামূলক জীবন্ত উপন্যাস', কাহিনী সম্পর্কে এই উল্লেখ এই ধারণাকে আরো দৃঢ় করে। নিজে জমিদারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও এই সম্প্রদায়ের অসঙ্গত আচার-আচরণ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। 'জমীদার দর্পণ' ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' এর যথার্থ উদাহরণ। "নিয়তি কি অবনতি'র নানা ও নাতির চরিত্রে উচ্চবিত্তের খেয়াল-খুশী ও তার অনুচিত লালন-প্রশ্রয়ের চিত্র প্রতিফলিত। বাস্তব 'নানা' বা 'নাতি'র প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন বিরূপতাও এই রচনার প্রেরণা হতে পারে। "নিয়তি কি অবনতি' মশাররফের অকিঞ্চিৎকর রচনা, এখানে তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও শিল্প-শক্তির পরিচয় অনুপস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

নাটক-প্রহসন

বসন্তকুমারী নাটক

'বসন্তকুমারী নাটক' মশাররফ হোসেনের নাট্যকর্মের প্রথম নিদর্শন। নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৭৩ সাল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। ভূমিকায় মশাররফ এই নাটকটিকে তাঁর 'অনুরাগতরুর দ্বিতীয় কুসুম' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রকাশকালের দিক থেকে এটি তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। এর স্বল্প পূর্বে তাঁর 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' বইটি প্রকাশিত হয় (জানুয়ারী ১৮৭৩/ পৌষ ১২৭৯)। কাজী আবদুল মান্নান অনুমান করেছেন, প্রকাশ পরে হলেও হয়তো 'গৌরী সেতু'র পূর্বেই 'বসন্তকুমারী' রচিত হয়। আবার এ- ও হতে পারে যে, 'গৌরী সেতু' অকিঞ্চিৎকর রচনা বলে 'সঙ্কোচের জন্য' 'বসন্তকুমারী'কেই দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩২]

'বসন্তকুমারী নাটক'টি উৎসর্গিত হয় বঙ্গদেশের মুসলিমসমাজের নেতৃপুরুষ নবাব আবদুল লতিফকে। উৎসর্গ-পত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মশাররফের সঙ্গে নবাব আবদুল লতিফের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো এবং মশাররফ তাঁর প্রীতি ও আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

লেখকের ভূমিকা-সূত্রে জানা যায়, মশাররফ 'বসন্তকুমারী নাটক' রচনার প্রেরণা পান তাঁর 'অকপট প্রিয় মিত্র সাহিত্যানুরাগী' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী বজলাল করিমের নিকট থেকে। প্রথম নাট্যপ্রয়াস যে ত্রুটিহীন নয় সে-কথা সবিনয়ে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি মশাররফ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন ঃ

> নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম ; ইহাতে নানাদোষ সম্ভাব অবশ্যম্ভাবী ; যে সকল দোষ আর যে সকল ভ্রম থাকিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিয়া উৎসাহ দান করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

'এডুকেশন গেজেট' (১১শ্রাবণ ১২৮০)-সূত্রে জানা যায়, রচনার ৫/৬ মাস পর "বসন্তকুমারী নাটক'টি লাহিনীপাড়ায় মশাররফের বাসভবনে অভিনীত হয়।[১৩৩]

মশাররফ 'বসন্তকুমারী নাটকে'র 'প্রস্তাবনা'য় সূত্রধাররূপী নট-নটীর কথোপকথনে একটি অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর সমকালীন সামাজিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, তা হলো 'মুসলমান লেখকের প্রতি হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার পরিচয়'।[১৩৪] নট 'বসন্তকুমারী নাটক'টি অভিনয়ের প্রস্তাব দিলে নটী রচয়িতার

Dhaka University Institutional Repository

নাম জানতে চায়। নট জানায় নাটকটি 'কুষ্টিয়ানিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত'। নাম শুনেই নটী বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে, "ছি ছি!। এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।" উদারমন নট তখন পাল্টা প্রশ্ন করেছে, "কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্থ হলো?" নটী তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে, "তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক মুসলমান।" এরপর নট যা বলেছে তা মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত সম্প্রদায়বিদ্বেষ বিলুপ্তপ্রয়াসী মশাররফেরই চিন্তাদর্শের প্রতিধ্বনি— "অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।"

'বসন্তকুমারী' রাজকীয় আবহে রচিত একটি মানবিক ট্রাজেডীর কাহিনী। সংক্ষেপে এখানে 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী পরিবেশিত হলো।

বীরেন্দ্র সিংহ ইন্দ্রপুরের রাজা। তিনি বিপত্নীক। তাঁর ইচ্ছা, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিবাহ প্রদান করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু বিদূষক প্রিয়ম্বদের প্ররোচনায় যুবরাজের বিবাহ বিলম্বিত করে রাজা বৃদ্ধাবস্থায় রেবতী-নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজার এই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'-গ্রহণ রাজ্যে বিশেষ নিন্দা-সমালোচনা ও হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করে।

নতুন রানী রেবতী শিথিল চরিত্রের রমণী। সে সুদর্শন যুবরাজ নরেন্দ্রের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। প্রথমে দূতী দাসী ও পরে পত্রের মাধ্যমে রানী প্রণয় প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু রানীর সম্পর্কের শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী অনৈতিক প্রণয়-নিবেদন নরেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করে।

এদিকে ভোজপুরের রাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী স্বপ্নে যুবরাজ নরেন্দ্রকে দর্শন করে তাকে লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উৎকণ্ঠিত রাজা সকল বৃত্তান্ত অবহিত হয়ে স্বয়ম্বর-সভার ব্যবস্থা করে। বসন্তকুমারীর চিত্রপট দর্শনে তার প্রতি আকৃষ্ট নরেন্দ্রও আমন্ত্রিত হয়ে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হয়। বসন্তকুমারী তার আকাঙ্ক্ষিত জনকেই পতিত্বে বরণ করে।

রানী রেবতী তার কুবাসনা চরিতার্থ করতে না পেরে নরেন্দ্রকে জব্দ করার ফন্দী আঁটতে থাকে। নরেন্দ্রের বিবাহ তাকে আরো বেশী ঈর্ষান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। রাজার নিকটে রানী রেবতী তার সতীত্বনাশ-চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ আনে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে। স্ত্রৈণ রাজা রেবতীর এই কপটতা ও ষড়যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে। রানীর ইচ্ছানুসারে রাজা বীরেন্দ্র যুবরাজকে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দণ্ড প্রদান করে। নির্দোষ যুবরাজ পিতৃ-নির্দেশ মান্য করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে এবং নব-পরিণীতা পত্নী বসন্তকুমারীও তার অনুগামিনী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যুবরাজের সস্ত্রীক আত্মবিসর্জনের পরপরই রাজা বীরেন্দ্র যুবরাজকে লিখিত রেবতীর প্রণয়-পত্র পাঠ করে সমুদয় বিষয় অবহিত হয়। রাজা তৎক্ষণাৎ পাপিষ্ঠা রানীকে হত্যা করে। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে জর্জরিত, নির্দোষ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রাজা বীরেন্দ্র নিজের ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্তের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'ই যে এই মর্মান্তিক পরিণতির মূল কারণ এই কাহিনী তা-ই নির্দেশ করে।

'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনী-উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায়না। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কার্ত্তিবিলাসে'র (১৮৮৫) সঙ্গে এর কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। তবে বাঙলার লৌকিক কাহিনীতেও এই ধারার গল্প-কথার সন্ধান মেলে। কেউ কেউ তাই ধারণা করেছেন, কাহিনীর জন্য মশাররফ প্রচলিত লোককাহিনীর কাছেই ঋণী, যোগেন্দ্রচন্দ্রের কাছে নন। উভয়ের কাহিনী-পরিকল্পনার উৎস অভিন্ন।[১৩৫]

'বসন্তকুমারী নাটক'টি তিন অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম সংস্করণে দৃশ্য-সংখ্যা ছিলো এগারো। দ্বিতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়। অতঃপর চূড়ান্ত দৃশ্য-বিন্যাস দাঁড়ায় এইরকম ঃ প্রথম অঙ্কে পাঁচ, দ্বিতীয় অঙ্কে চার ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। মশাররফ দৃশ্যকে চিহ্নিত করেছেন 'রঙ্গভূমি' নামে। এই নাটকে আটটি গান, একটি পদবন্ধ প্রেমপত্র ও একটি অমিত্রাক্ষর পদ্যস্তুতি স্থান পেয়েছে। 'বসন্তকুমারী নাটক'টি সংস্কৃত রীতি-প্রভাবিত। নাটকের ভূমিকা স্বরূপ, 'প্রস্তাবনা' অংশ সংযোজন এবং সূত্রধারের মাধ্যমে নাট্য-বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত-দান, সংস্কৃত নাটকের রীতি-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাহিনীর অনুষঙ্গে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রধান চরিত্রগুলো রাজকীয় আবহে লালিত। কাহিনীর প্রয়োজনে ঠিক নয়, অনেকটা যেনো প্রক্ষিপ্ত হয়ে দু-একটি প্রাকৃত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে বীরেন্দ্র সিংহ ও রাজকুমার নরেন্দ্র সিংহই প্রধান। উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র দুটি—রেবতী ও বসন্তকুমারী। অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে বিদূষক প্রিয়ম্বদ ও মালতীর কথা বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। নাটকটির কলেবর ক্ষীণ হওয়ায় অত্যন্ত দ্রুত কাহিনীর পট-পরিবর্তন হয়েছে। তাই চরিত্রগুলোর যথাযথ বিকাশ হয়নি। অনেকসময় তারা আভাসেই মিলিয়ে গেছে। একটি-দুটি চরিত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সব চরিত্রই কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও অবিকশিত।

"নাম-চরিত্র বসন্তকুমারীকে নায়িকা বলে অনুমান করা স্বাভাবিক হলেও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন রেবতী"[১৩৬]—সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। মূলত রেবতীই এই নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও বিকশিত চরিত্র। এক অর্থে সে-ই 'এই নাটকের প্রাণ'। তার আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড নাটকের কাহিনীকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং বিপর্যয়-পরিণতিকে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করেছে। রেবতী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিকৃত রুচির এক রমণী। তার চরিত্রে কপটতা, অপকৌশল, প্রতিহিংসা ও অমানবিক হিংস্রতার পরিচয় মেলে। বৃদ্ধ রাজার প্রতি যৌবনধর্মের স্বাভাবিক কারণেই সে বীতরাগ। সে অকপটে বলেছে ঃ

> রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলাতে পারেননি। ..... মন যারে ভালবাসে না, চোক তারে ভালবাসবে কেন?
>
> [প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম রঙ্গভূমি]

অন্যত্র উদ্ভিন্ন-যৌবনা রেবতীর মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ঃ

> তার যৌবন অবস্থা মধ্যম অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে, আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন? আমি বা তাকে ভালবাসবো কেন? মণিমুক্তা আরা ভাল ভাল গয়না ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়, ভালবাসার অঙ্গ অনেক।
>
> [ঐ]

একদিকে তার বিকর্ষণ রাজার প্রতি, অপরদিকে গভীর আকর্ষণ-বোধ করে সে যুবরাজের প্রতি। শরীর ও মনোধর্মের কারণেই রেবতী সুদর্শন যুবরাজ নরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার এই প্রণয়-পথ নিষ্কণ্টক ছিলো না। তাই নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ-কামনায় তাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। রাজাকে বিভ্রান্ত, বশীভূত ও তার সঙ্গে দূরত্ব-রচনার জন্য সে কপট মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। নরেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান ও বিবাহ তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমহানির মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে তার চরম শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। বিফল-বাসনার রিক্তা রমণী রেবতী ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে ঃ

> আমার প্রাণে আর সয়না। নরেন্দ্র বিবাহ কোরে এসে মনের আনন্দে নব যুবতীর সঙ্গে সুখভোগ কোরবেন, আর আমি তাই দেখবো, আমার প্রাণে তাই সহ্য হবে, আমি মনে মনে পুড়ে মরব? এ কখনই হবে না।
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম রঙ্গভূমি]

রেবতীর নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে নরেন্দ্র-বসন্তকুমারীর করুণ মৃত্যু হয়। রেবতীকেও জীবন দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

> যুবরাজ আমিই তোমার জীবননাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে।
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় রঙ্গভূমি]

Dhaka University Institutional Repository

—তার এই অন্তিম স্বীকারোক্তি তার চরিত্রে মানবীয় গুণ আরোপ করে। সে যে কেবল অনৈতিক কুকর্মেই উৎসাহী তা নয়, অন্তত একবার হলেও বিবেকের শাসন সে মেনেছে।

রক্ত-মাংসের মানুষের কামনা-বাসনার কদর্য রূপের প্রকাশ আছে রেবতীর চরিত্রে। রেবতী সপত্নী পুত্রের প্রতি প্রেম-নিবেদনের মাধ্যমে তার হৃদয়গত কামজ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' রেবতীর মনে এই অবৈধ প্রেমের লালন অশোভন ও অনৈতিক বটে, তবে তা অস্বাভাবিক নয়। রিরংসা-শাসিত তার চরিত্রে মহৎ উপলব্ধির সুযোগ নেই। অনিয়ন্ত্রিত যৌবনধর্মের প্রবল স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে সে এক অসহায় নারী। তবে নাট্যকার নাটকের হ্রস্ব-পরিসরের কারণেই হয়তো রেবতীর দ্রুত শাস্তি-বিধান নিশ্চিত করেছেন, তার মনোদ্বন্দ্ব দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ দেননি। ফলে রেবতী চরিত্রটি পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ভোজপুর-রাজকন্যা বসন্তকুমারীর নামানুসারেই এই নাটকের নাম। তবে এই নাম-চরিত্রটি নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সম্যক প্রস্ফুটিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বসন্তকুমারী 'জটিলতাহীন নমনীয় সরল আবেগের'[১৩৮] প্রতিনিধি। বিবাহ-পূর্বকালে তার প্রণয়-পীড়িত রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সে উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল, বিরহকাতরা। স্বপ্নে দৃষ্ট যুবরাজ নরেন্দ্রকে স্বয়ম্বর-সভায় পতিত্বে বরণ করার ভেতর দিয়ে তার সাময়িক বিরহের অবসান ঘটে। কিন্তু স্বল্পকাল বিবাহিত জীবন উপভোগের পর চক্রান্তের ফলে প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছা-সহমরণের ভাগ্যবরণ করে নিতে হয় তাকে।

বসন্তকুমারী পতিব্রতা রমণীর আদর্শ। তার সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ধারণা সনাতনকালের, পিতা-পুত্রীর আলাপচারিতায় তা ধরা পড়ে ঃ

> .... নারীজাতির সতীত্বই যথার্থ গৌরব, পতিভক্তি ভূষণই রমণীর প্রধান ভূষণ। মণিমুক্তা অলঙ্কারে সুরূপাকেই অধিক সুন্দরী দেখায়, কিন্তু পতিভক্তি অমূল্য ভূষণে সুরূপা কুরূপা উভয়েই সুন্দরী। .... লজ্জাই অবলার অমূল্য বসন।.... মিষ্টভাষিণী নম্রস্বভাবা সত্যবাদিনী ধীরা এবং স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হলেই যখন তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম বেশভূষায় স্বামীর ভালবাসা হতে ভালবাসিনা।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় রঙ্গভূমি]

রানী রেবতীর চক্রান্তে বিপন্ন স্বামীর মুক্তির জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। স্বামীর ক্লেশ তাকে কাতর ও বিহ্বল করে তোলে। 'চিরসঙ্গিনী' বসন্তকুমারী স্বামীর মৃত্যুদণ্ডও অবশেষে ভাগ করে নিয়েছে।

বসন্তকুমারী সহজ, সরল ও সাধারণ। ঐতিহ্যগত নারীধর্মের পরিচর্যাই তার চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত। পাঁচটি দৃশ্যে তার আগমন। এরমধ্যে একটি দৃশ্যে সংলাপবিহীন তার উপস্থিতি, শেষ দৃশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

কেবল আত্মাহুতির জন্যই তার আবির্ভাব। এই চরিত্রটি লেখকের যথেষ্ট মনোযোগ লাভ করতে পারেনি। রেবতীর তুলনায় বসন্তকুমারী অনেকাংশে নিষ্প্রভ ও আকর্ষণহীন।

রেবতীর সহচরী মালতী তার সকল দুষ্কর্মের সহায়ক ও সাক্ষী। মধ্যযুগের কুটনী-চরিত্রের আদলে সৃষ্ট এই ধরনের টাইপ চরিত্রের সন্ধান মশাররফের সমকালে বেশ পাওয়া যায়। বসন্তকুমারীর সহচরী মেঘমালা হাস্য-পরিহাসে প্রগল্‌ভ, উচ্ছল প্রাণবন্যায় প্রবাহিত। তবে এ-সবই টাইপ চরিত্র।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে বীরেন্দ্র সিংহই তুলনামূলকভাবে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হতে পেরেছে। পুত্রের বিবাহের পূর্বেই তার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ, রাজ্যশাসনকার্য অবহেলা করে তরুণী ভার্যার সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যলাভের চিন্তা-চেষ্টা এবং যাচাই না করে রেবতীর অভিযোগে যুবরাজকে প্রাণদণ্ড দানের ভেতরে বিপত্নীক এই রাজন্যের বিবেচনা ও ব্যক্তিত্বের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তার পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত প্রজাসাধারণের নিন্দা-সমালোচনার কারণ হয়েছে। নতুন রানীও তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। অথচ তার রাজ-মহিষীর ব্যর্থ মনোরঞ্জন-প্রয়াস হাস্যকর ও বিরক্তি উৎপাদক। রাজা বীরেন্দ্রের স্ত্রৈণ-ভাব কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। যেমন, রুষ্ট রানীর মান-ভঞ্জনের জন্য যখন আক্ষরিক অর্থেই তার 'পদধারণ' করে সকাতরে বলে ঃ

> প্রিয়ে ! তোমার পায় ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত যাবে, তা হলে পত্র নেওয়া দূরে থাক্ ছুতুমও না। পায় ধরি—নেও, আর মনে ব্যথা দিওনা।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

এই আচরণ ও মনোভাব সাধারণ ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণ পুরুষের, একজন রাজন্যের শৌর্য-বীর্য-মর্যাদার সঙ্গে কোনোক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শেষ দৃশ্যে তার আত্মোপলব্ধি ঘটে। পাপিষ্ঠা রানীর জীবন-সংহার, নিরপরাধ আত্মজের জন্য বিলাপ ও অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে তার হৃত রাজকীয় মর্যাদা কিছুটা পুনরুদ্ধার হয় এবং সেইসঙ্গে তার মানবীয় গুণের পরিচয় তুলে ধরে।

যুবরাজ নরেন্দ্র সুশীল, পিতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমিক, প্রজাহিতৈষী এবং অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী দ্বারা ভূষিত। নির্দ্বন্দ্ব ও নাট্যগুণহীন এই চরিত্রটি তার অন্তর্গত স্বভাবের কারণেই প্রাণ পায়নি। গ্রাম্য রমণীদের আলাপচারিতায় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে ঃ

> যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে নাই। রাজা-রাজড়ার ঘরের ছেলে যে এমন লাজুক হয় তা বোন্ কখনও শুনিনি। পাড়া-পড়সীর মেয়েছেলে নজরে পোড়লে অমনি মাথাটি হেঁট কোরে চলে যান। এতবড় হয়েছেন, তবু উঁচু নজরে কারো পানে চাননা।
>
> [প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ রঙ্গভূমি]

Dhaka University Institutional Repository

শেষ দৃশ্যে পিতৃ-আজ্ঞা বলে নিজের মৃত্যুদণ্ডও প্রসন্ন মনে সে মেনে নেয়। নরেন্দ্রের এই বিনীত ও শোভন আচরণ বাস্তব জীবনে প্রত্যাশিত সদ্গুণ হিসেবে বিবেচিত হলেও, নাটকে চরিত্র-বিকাশের জন্য তা সহায়ক হয়নি।

অন্যান্য চরিত্রও, যেমন রাজমন্ত্রী বৈশম্পায়ন কিংবা যুবরাজের সহচর শরৎকুমার, বৈশিষ্ট্যহীন ও গতানুগতিক। এরমধ্যে বিদূষক প্রিয়ম্বদ চরিত্রটি কিছূটা উল্লেখযোগ্য। হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ, বিদূষকের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে আছে বাস্তব-বুদ্ধি ও উদর-চিন্তা।বাচালতা, স্থূলতা, কৌতুক—এ-তার পেশাগত পুঁজি। তার প্ররোচনাতেই রাজা দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হয়। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেই আকস্মিকভাবে সে বিদায় নিয়েছে। নাটকে কৌতুক-রঙ্গের ভেতর দিয়ে বিদূষক যে প্রচ্ছন্ন বিবেকের ভূমিকা পালন করে থাকে এখানে সেই পরিচয় অনুপস্থিত।

'বসন্তকুমারী নাটকে' নিম্নশ্রেণীর দু-একটি চরিত্র খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরেও প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বক্তব্য ও সংলাপে এদের অবস্থান মাটির খুব কাছাকাছি। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যটি সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনা-উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। সুরমা ও বিমলা নাম্নী দুই গ্রাম্য রমণীর আলাপচারিতায় তাদের বৈশিষ্ট্য চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। রাজ-পরিবার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এখানে প্রতিফলিত। এদের বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য উল্লেখ করার মতো। যেমন, বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভার্যা গ্রহণের ঔচিত্য সম্পর্কে সরমা যখন বলে, 'রাজার তো চোখ ছিল', তখন বিমলা জবাব দেয়—'চোক্ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়'। পাশাপাশি দু'জন প্রজার কথাবার্তার ভেতরে তাদের দিনযাপনের গ্লানি ও অবিবেচক রাজার প্রতি তীব্র ধিক্কার প্রকাশিত ঃ

> প্রত্যহ দিনের বেলা না খেয়ে থাকতে হয়, আর বাঁচিনা। বেটা উচ্ছিন্ন যাক, এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়েমানুষের গোলাম, সে কি মানুষ?
>
> [প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ রঙ্গভূমি]

উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রের তুলনায় এইসব সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরুষ-রমণীর চরিত্র অধিক উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রকাশিত। এই দৃষ্টান্ত মশাররফের অন্য রচনাতেও পাওয়া যাবে।

মশাররফের ভাষা-প্রসঙ্গে তাঁর নাটক-প্রহসনের পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটক' বিশেষ মনোযোগ ও বিবেচনা দাবী করে।

এই নাটকের সংলাপে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরিবেশ ও চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে সেই ভাষারও তারতম্য ঘটেছে। যেমন 'পুষ্পোদ্যানে' রাজা বীরেন্দ্র সিংহের উক্তি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

মনোরম পুষ্প নয়নের প্রীতি সাধন, চিত্তের সন্তোষ সাধন, আর সুবাসে হৃদয়ে আনন্দ জন্মে।

[প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

রাজা ও রানীর একান্ত অন্তরঙ্গ কথোপকথন ঃ

তুমি কি পাগল হয়েছ। দেহ কি কখনও আত্মা ছেড়ে থাকতে পারে? না ছায়াই কখনো কায়ার অন্তর হতে পারে? অলি কি কখন নবকলি ফেলে থাকতে পারে? দেখ প্রিয়ে চকোর কি করে সুধাকরের পূর্ণ কলেবর হেরে সুধাপানে বঞ্চিত থাকবে?

[প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম রঙ্গভূমি]

এই নাটকেই চরিত্রানুযায়ী সংলাপ যে কতো মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে তা এই দুই গ্রাম্য রমণীর আলাপচারিতায় ধরা পড়ে ঃ

সরমা। — দিদি ভাল আছিস ত। আজ যে ভারি ফিটফাট। সেজেগুজে কোথা গিয়েছিলে? আবার কি দিন ফিরেছে?

বিমলা। — (হাস্যমুখে) তুই যে অবাক কল্লি। দিনকাল নেই বলে কি সাধ নাই? দাঁত পড়ে, চুল পাকে কত লোকের, প্রাণ যেমন, তেমনই থাকে। লোকে নিন্দা করবে বলে বুড়ীরা ছুঁড়িদের মত সাজগোজ করেনা বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

[প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ রঙ্গভূমি]

কিংবা সাধারণ প্রজার সংকল্প ঃ

বলি ও বেয়াই। রাজা বেটা বুড়োকালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। রাতদিন অন্তঃপুরেই থাকে ; আর ক'দিন আসবো, প্রত্যহই আসছি যাচ্ছি, একদিনও বেরোয়না, তা বিচার কোরবে কি? যেতে আসতে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল।

[প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ রঙ্গভূমি]

চরিত্র, পরিবেশ ও প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনুসারে চলিত রীতির ভাষাপ্রয়োগেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে 'বসন্তকুমারী'র পাত্রপাত্রী তাদের স্বভাব ও আবহ অনুসারে আচরণ করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন রাজা, যুবরাজ বা মন্ত্রীর সংলাপের ভাষা মার্জিত ও সাধু-ঘেঁষা। অন্তঃপুরবাসিনী রানী বা দাসীর ভাষা সেই তুলনায় সামান্য সহজ ও ঘরোয়া এবং গ্রাম্য রমণী বা প্রজার কথোপকথনে আটপৌরে কথ্যভাষার পরিচয় মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

'বসন্তকুমারী'তে কথ্য ভাষারীতি ব্যবহৃত হলেও, ক্রিয়াপদে মাঝেমধ্যে সাধু-চলিতের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

রাজতক্তে বসিলে মনের গতিও ফিরে যায়।

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম রঙ্গভূমি]

সম্বোধনের ঐক্যও সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। প্রথন অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে রাজা বীরেন্দ্র মন্ত্রী বৈশম্পায়নকে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে শরৎকুমারের নরেন্দ্রের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারে অসঙ্গতি দেখা যায়। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে রানী রেবতী রাজা বীরেন্দ্রকে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে বসন্তকুমারী নরেন্দ্রকে সম্বোধনে যুগপৎ 'আপনি' ও 'তুমি' ব্যবহার করেছে। এই অসঙ্গতি মশাররফের অমনোযোগেরই ফল।

বক্তব্যকে তীক্ষ্ম ও লক্ষভেদী করার জন্য প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার মশাররফের শিল্পরীতির এক জনপ্রিয় কৌশল। 'দুদিনের চাঁদ হলে ঘরে বসেই দেখতে পাব' কিংবা 'বলতে সহজ গড়ে উঠা কঠিন'— বাক্যে এইসব পুরাতন প্রবচনের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে। নতুন অনুষঙ্গে নতুন প্রবচন নির্মাণের মাধ্যমে বক্তব্যকে তাৎপর্য-দানের প্রয়াসও আছে এই নাটকে। যেমন, রমণী-বিলাসী বৃদ্ধ রাজার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন,—'মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়'।

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা এই আপ্তবাক্যের সারত্ব প্রতিপন্নের জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা। তাই পূর্ব থেকেই এর পরিণতি যেনো অনেকটা নির্দিষ্ট। কাহিনীর বিস্তার, চরিত্রের বিকাশ কিংবা নাটকীয় দ্বন্দ্ব এখানে যথাযথভাবে পরিচর্যা-লাভে সক্ষম হয়নি। অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপ 'বসন্তকুমারী'র নাট্যিক গুণ ক্ষুণ্ণ করেছে।

'বসন্তকুমারী নাটকে' মশাররফ-মানসের কিছু প্রবণতা চিহ্নিত করা চলে। যৌবনের উন্মেষকালে পঠিত 'কাদম্বরী' গ্রন্থটি তাঁর লেখকজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[১৩৯] 'বসন্তকুমারী নাটকে'ও এই 'কাদম্বরী' গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। যুবরাজ নরেন্দ্র সহচর শরৎকুমারকে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' পাঠ করে শোনায় দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। ব্যক্তিজীবনের স্মৃতি, রুচি ও অনুরাগ তাঁর শিল্প-সাহিত্যে যে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রমাণ 'বসন্তকুমারী নাটকে' এই 'কাদম্বরী' প্রসঙ্গ।

'বসন্তকুমারী'র প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বিরহকাতরা বসন্তকুমারীর মনোবেদনার সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রণয়-পীড়িত এজিদের বিভ্রমের প্রকাশে কিছু আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। বসন্তকুমারী-জনক

Dhaka University Institutional Repository

ভোজপুরের রাজা বিজয় সিংহের আত্মজার প্রতি স্নেহ-দৌর্বল্য স্মরণ করিয়ে দেয় দামেস্ক-অধিপতি এজিদ-পিতা মাবিয়ার পুত্রস্নেহের কথা। বসন্তকুমারীকে উদ্দেশ্য করে রাজা বলেন ঃ

> মা তুমি আমার সর্ব্বস্ব, ভোজপুর রাজ-বংশে তুমিই একমাত্র মণি, মা যথার্থ কথা বলো তোমার কি অসুখ হয়েছে?

কিংবা,

> তোমার চক্ষে জল কেন? তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার সেই একপ্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির মন কেন মা? তোমার অভাব কি? তুমি আমার একমাত্র কন্যা, এ রাজ্যধন সকলি তোমার। তোমার মনে কোন দুঃখের কারণ না হইলে চক্ষে জল আসিবে কেন মা! মা! তোমার মনের কথা বলো।

মাবিয়ার উপলব্ধিও একই সূত্রে গাঁথা ঃ

> তুমিই আমার একমাত্র পুত্র। এই অকূল বিভব, সুবিস্তৃত রাজ্য এবং অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সকলই তোমার। ..... বল ত, তোমার কিসের অভাব? কি মনস্তাপ? .....তুমি সর্ব্বদাই মলিনভাবে বিষাদিত চিত্তে বিকৃতমনার ন্যায় অযথা চিন্তায় অযথা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতেছ। ..... আমি পিতা, আমার নিকট কিছুই গোপন করিওনা। মনের কথা অকপটে প্রকাশ কর।
>
> [বিষাদ-সিন্ধু, মহররম পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ]

ব্যাকুল জনকের উৎকণ্ঠার সম্মুখে বসন্তকুমারীর আচরণের সঙ্গে এজিদের বিষণ্ণ-জবাবের মিল সতর্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়না। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সূচনা-অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের এই কথোপকথনের আভাস 'বসন্তকুমারী'তে পাওয়া যায়।

প্রথম নাট্যরচনার দুর্বলতা ও ক্রটি এখানে অস্পষ্ট নয়, তবুও সমালোচক 'বসন্তকুমারী'র কাহিনীর সাদৃশ্যযুক্ত পূর্ববর্তী 'কীর্ত্তিবিলাস' নাটকের তুলনায় এর সাফল্য যে অধিক সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

> ... যা জি. সি. গুপ্তে ['কীর্ত্তিবিলাস'] নেই, তা হল 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী-গ্রন্থনের সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল।[১৪০]

মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্যাদর্শ মীরের পরবর্তী নাটক-প্রহসনে ছায়া ফেললেও, 'বসন্তকুমারী'তে তার

Dhaka University Institutional Repository

আভাস মেলেনা। সামগ্রিক বিচারে, প্রথম নাট্যকর্ম 'বসন্তকুমারী'তে মশাররফ যে শিল্প-সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা উপেক্ষণীয় নয়।

জমীদার দর্পণ

'জমীদার দর্পণ' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ/১৮৭৩ খৃস্টাব্দ) মশাররফ হোসেনের চতুর্থ গ্রন্থ ও দ্বিতীয় নাট্যপ্রয়াস। তাঁর খ্যাতির মূলে এই শিল্পকর্মটির বিশেষ অবদান আছে। নাটকটি মশাররফের জ্ঞাতিভ্রাতা পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলীকে উৎসর্গিত। সমাজ-সংলগ্ন এই নাটকটি মশাররফের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত।

মশাররফ নিজে ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান, তাঁর প্রধান আত্মীয়বর্গ প্রায় সকলেই জমিদার, জীবিকা-সূত্রে তিনি ছিলেন জমিদারী এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষ। জমিদারী-প্রথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার কারণে এই সম্প্রদায়ের সদর-অন্দরের কোনো কথা ও কাহিনী তাঁর অবিদিত ছিলোনা। লোকহিতৈষণার প্রেরণায় তিনি জমিদারের অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের কথা তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি। এক নির্মোহ শৈল্পিক দৃষ্টি ও প্রবল সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে তিনি রচনা করেন 'জমীদার দর্পণ' নাটক। জমিদারের লাম্পট্যদোষ, শোষণ-কৌশল, প্রজা-পীড়ন ও অর্থের প্রভাবে বিচার-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ—এই হলো 'জমীদার দর্পণে'র মূল উপজীব্য।

অসহায় প্রজার ক্রন্দন-আহাজারি তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। নাটকের 'প্রস্তাবনা'য় নট-নটীর সঙ্গীতে প্রজার প্রতিকারহীন দুর্দশা-দুঃখের বর্ণনা আছে ঃ

মরি দুর্ব্বল প্রজার পরে অত্যাচার।
কতজনে করে, করে জমীদার।।
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর।।
জমীদার ধরে জরিমানা করে
মনোসাধ পুরে, নাশিছে প্রজার।।

এই উৎপীড়ক জমিদারশ্রেণীর স্বরূপ উন্মোচনে তিনি বদ্ধপরিকর। শ্লেষ ও বিদ্রূপ মিশিয়ে এদের স্বভাব ও আচরণের পরিচয় দিয়েছেন সূত্রধারের মাধ্যমে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

....মফস্বলে একরকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর। শহরে তাদের কেউ চেনেনা, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র ; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয়না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পার পায়না। বলব কি জান্‌ওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

[প্রস্তাবনা]

'জমীদার দর্পণ' নাটকের পট উন্মোচিত হয়েছে কোশলপুর গ্রামে। হায়ওয়ান আলী এই কোশলপুরের জমিদার। তার লাম্পট্যের কথা সুবিদিত। নারীলোলুপ এই জমিদার গ্রামের এক নিরীহ দরিদ্র কৃষক আবু মোল্লার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী নূরুন্নেহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পতিব্রতা নূরুন্নেহার জমিদারের কু-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর জমিদারের নির্দেশে নূরুন্নেহারকে করায়ত্ত করার কৌশল হিসেবে তার স্বামী আবু মোল্লাকে জবরদস্তি ধরে আনা হয়। কিন্তু এতেও যখন নূরুন্নেহার জমিদারের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাকে বলপূর্বক পেয়াদারা ধরে আনে হায়ওয়ান আলীর কাছে। অন্তঃসত্বা গৃহবধূ নূরুন্নেহারের উপর পাশবিক অত্যাচারের ফলে তার মৃত্যু হয়। এদিকে মুক্তি পেয়ে আবু মোল্লা তার নিহত স্ত্রী নূরুন্নেহারের মৃতদেহ আবিষ্কার করে ভদ্রাসনের নিকটস্থ এক বাগানে। মামলা রুজু হওয়ার পর এলো বিচারের পালা। বিচারের নামে শুরু হয় প্রহসন। আর্থিক মূল্যে হায়ওয়ান আলী বিচার ক্রয় করে। সাক্ষী ও ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের মিথ্যাভাষণ এবং স্বয়ং বিচারকের পক্ষপাতিত্বে হায়ওয়ান আলী বেকসুর খালাস পায়। এরপর শেষদৃশ্যে আবু মোল্লা তার ক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে জানায় যে, মামলায় জয়লাভের পর হায়ওয়ান আলী তার ঘরবাড়ী ভেঙে তাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছে। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

'জমীদার দর্পণ' নাটকটি যে সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া গেছে। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার উল্লেখ করেছে, " 'জমীদার দর্পণ নাটক' যে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।" 'জমীদার দর্পণে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতেও এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়।[১৪১] মশাররফ স্বয়ং তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

জমিদার দর্পণ হাতে লিখিয়া আমার বাটীতে কুমারখালীতে কয়েকবার অভিনয় করা হয়। শেষ অভিনয় দিনে আনার মোল্লাকে ['এই মোল্লার স্ত্রীই জমিদারের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছিল'--পাদটীকা] উপস্থিৎ করিয়া দর্শকগণকে দেখান হইয়াছিল। সত্য ঘটনামূলক নাটক অভিনয় সময় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই জীবিত।[১৪২]

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত বলে মহলবিশেষ সঙ্গতকারণেই রুষ্ট হন। নাটকের 'উপহার'-পত্রে মশাররফ এ-বিষয়ে ইঙ্গিতও দিয়েছেন এই বলে, 'অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে'।

'জমীদার দর্পণ' তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রায়তন নাটক। প্রতিটি অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য সংযোজিত। এখানে দৃশ্য অর্থে 'গর্ভাঙ্ক' ব্যবহৃত হয়েছে। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র মতো 'জমীদার দর্পণে'ও সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে সূত্রধার ও নট-নটীর সহায়তায় নাটকের বক্তব্য-বিষয় সম্পর্কে আভাস-দানের জন্য 'প্রস্তাবনা'-অংশটি পরিকল্পিত। নাটকে একটি পদবন্ধ প্রস্তাবনা ও একটি শোকোচ্ছ্বাস এবং দশটি গান সংযুক্ত হয়েছে। মূলত এই পদবন্ধ রচনা ও গান মূল কাহিনীর প্রবেশক এবং ঘটনাপ্রবাহের সংযোজক। কাহিনীর গতি-সঞ্চার ও দর্শকের শ্রান্তি-বিমোচনে এই গানগুলো বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই নাটকের দুটি পর্ব ঃ প্রথমত হায়ওয়ান আলী কর্তৃক কূলবধূ নূরুন্নেহারকে সম্ভোগের বাসনা, তার সতীত্বনাশ ও পরিণামে মৃত্যু এবং দ্বিতীয়ত অপরাধী জমিদারের বিচার-প্রহসন, অব্যাহতি-লাভ ও অত্যাচারিত আবু মোল্লার প্রতি প্রতিশোধগ্রহণ। প্রকৃতপক্ষে নূরুন্নেহারের মৃত্যুতে নাট্যিক ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়েছে, পরবর্তী অংশ কেবল বিচারের প্রহসন ও বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশের জন্যই পরিকল্পিত। এই অংশ টুকু 'প্রস্তাবনা'য় সূত্রধার-কথিত নক্‌শারই প্রতিফলিত রূপ।

'জমীদার দর্পণ' দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র (১৮৬০) প্রভাবজাত শিল্পকর্ম বলে কেউ কেউ মনে করেন। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, এই প্রভাবের মাত্রা এতোই অধিক যে তা "স্থলবিশেষে সরাসরি অনুকরণ বলে ভ্রম হয়"।[১৪৩] প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যগত বিষয় বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে 'জমীদার দর্পণে'র প্রতিতুলনা করেন।[১৪৪] পরবর্তীকালে সমালোচকবৃন্দ উভয় নাটকের সাদৃশ্য-আবিষ্কারের প্রয়াস পান। দৃশ্য-পরিকল্পনা, চরিত্র-চিত্রণ, সমাজদৃষ্টি, রায়ত-প্রজার প্রতি সহানুভূতি, রাজশক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নামকরণ—এইসব বিষয়ে উভয় নাটকের সাদৃশ্য স্পষ্ট। তবে শিল্পবোধ, শিল্পসামর্থ্য, রচনারীতি ও নাট্যরসসৃজনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য।[১৪৫] গভীর জীবনদৃষ্টি, শৈল্পিক উৎকর্ষ, গণচেতনা ও রচনারীতির দিক থেকে 'নীলদর্পণে'র শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সংশয়াতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

'বসন্তকুমারী'র মতো 'জমীদার দর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলোও যথাযথ বিকাশলাভ করেনি। প্রায় সব চরিত্রই 'টাইপ'। এরা যেনো নাট্যকারের ইচ্ছা-পূরণের হাতিয়ার, ছক-কাটা সীমাবদ্ধ ভূমিকা পালন করেই অন্তর্হিত হয়েছে। এর ভেতরে হায়ওয়ান আলী ও নূরুন্নেহারই কেবল ব্যতিক্রম। নিম্নস্তরের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে জিতু মোল্লা, হরিদাস বৈরাগী, কৃষ্ণমণি ও গ্রাম্য চাষার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হায়ওয়ান আলী এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে কোশলপুরের জমিদার। 'হায়ওয়ান' অর্থ 'জানোয়ার',

Dhaka University Institutional Repository

এই নাম-পরিচয়ের ভেতরেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। হায়ওয়ান আলী নারীলোলুপ নিষ্ঠুর স্বভাবের এক অত্যাচারী জমিদার। নৈতিকতার কোনো ধার সে ধারেনা। ভোগবিলাস ও প্রমোদমত্ততায় তার জীবন নিবেদিত। তার মধ্যে হৃদয়হীন বর্বরতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হায়ওয়ান আলীকে লক্ষ্য করে সাধারণভাবে জমিদারগোষ্ঠীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমিরণ যে বক্তব্য পেশ করেছে তাতে এই লম্পট জমিদারের চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত ঃ

> বলতেও লজ্জা করে ব'ন ; শুনতেও লজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়। জমীদার হোলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন। ঘরের খবর চাকরেরাই জানে। .... বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই। এঁরাই আবার বড় লোক! সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে। সৎকাজের বেলায় একপয়সা মা বাপ। কিন্তু ওদিকে কল্পতরু! চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিভ্ লক্‌লক্ করে। তা বোন এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

হায়ওয়ান আলীর কামনা-লালসায় অগণন রমণীর সতীত্ব বিনষ্ট হয়েছে। গ্রাম্য গৃহবধূ নূরুন্নেহার তার নতুন শিকার। দীর্ঘদিন ধরে তাকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে সে। তার তীব্র লালসার পরিচয় মেলে মোসাহেবদের সঙ্গে আলাপচারিতায়। কোনো মানবিক বিবেচনা তার কাছে প্রশ্রয় পায়না। তাই জনৈক মোসাহেব নূরুন্নেহার অন্তঃসত্ত্বা এই কথা জানালে হায়ওয়ান এই তথ্য নস্যাৎ করে দিয়ে বলে ওঠে ঃ

> না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য মিছিমিছি একটা রটনা কচ্ছে, আমি তাতেই ভুলে গেলাম আর কি! একি ছেলের হাতের পিঠে।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

মোসাহেব যখন বলে, 'আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী', তখন বেপরোয়া হায়ওয়ান অতি স্বাভাবিক কণ্ঠেই জানায়, ' হ'ক তায় ক্ষতি কি?' (ঐ)। তার লাম্পট্য-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সে 'সর্বস্ব' কবুল করতেও দ্বিধান্বিত নয়।

তার নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা, বর্বরতা ভয়ঙ্কর-রূপ নিয়ে প্রকাশিত। নূরুন্নেহারের সতীত্বহানির অপকর্মে অন্তঃসত্ত্বা নূরুন্নেহারের অনুনয়-বিনয়-কাতরোক্তি কিছুতেই সে কর্ণপাত করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

হায়ওয়ান আলী কৌশলী, ধুরন্ধর, ধূর্ত। নুরুন্নেহারকে বাগে আনার জন্য সে যেমন কৌশল অবলম্বন করেছে তাতে তার ধূর্ত ও নিকৃষ্ট মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। কার্যোদ্ধারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রলুব্ধ করে সে। কাউকে 'মোটা বখশিস্', কাউকে 'গালভরে চিনি', কাউকে 'মনের মতো খুশী' করার প্রতিশ্রুতি দেয়। পাশবিক অত্যাচারে নূরুন্নেহারের মৃত্যু হলেও সে বিহ্বল বা বিমূঢ় না হয়ে ঘটনা চাপা দেয়ার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থ আর অপকৌশলে সে শেষপর্যন্ত হত্যার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

হায়ওয়ান আলীর নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রায়ত-প্রজারা নিরাপদ নয়। বিনা অপরাধে প্রজাকে কয়েদ করা, তার উপরে অত্যাচার ও জরিমানা আদায় এ-ছিলো অতি-স্বাভাবিক ব্যাপার। বিনা কসুরে আবু মোল্লাকে ধরে এনে হায়ওয়ান আলী বলে ঃ

> আরে আবু। তুই জানিস্ আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?
>
> [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

কি তার অপরাধ তা জানার আগেই জমিদার আবু মোল্লার অর্থ-জরিমানা করে, 'হারামজাদাসে পঁচাশ রোপেয়া, জ'রবানা আদা কর'। অর্থদানে অপারগ আবু মোল্লার মাথায় ইট চাপানো হয়। আবার কোনো প্রলোভনেই নূরুন্নেহার হায়ওয়ান আলীর বশীভূত না হওয়ায় ক্রোধান্বিত জমিদার তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে এনে তার শ্লীলতাহানি করেছে। তার অবাধ অত্যাচার ও নিষ্ঠুর শোষণে রায়ত-প্রজার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ ও নিরাপত্তাহীন।

হায়ওয়ান আলী আর-দশজন জমিদারের মতোই স্তুতিপ্রিয়। সর্বক্ষণ মোসাহেব-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। তার সকল অপকর্মের সহায়, ইন্ধনদাতা, সমর্থক ও বাস্তবায়নকারী এই মোসাহেবের দল। ভোগ-বিলাস আর প্রমোদ-কৌতুকে তার আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে তার পারিষদবর্গের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়।

হায়ওয়ান ভণ্ড ও কপট ধর্মাচারী। নীতি ও ধর্মের শ্রেয়োচেতনার বিনষ্টকারী সে। ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধী কর্মকাণ্ডে সে লিপ্ত। অথচ নামাজ আদায়ে তার আগ্রহ বিদ্যমান। এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতা তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। নূরুন্নেহারকে করায়ত্তের কৌশল হিসেবে তার স্বামী আবু মোল্লাকে আটক করার নির্দেশ দিয়ে কুকর্মের সঙ্গীদের সে আহ্বান জানায় ঃ

> নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারমাজাদাকে ধরে আনুক।
>
> [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

এই দৃশ্যে নেপথ্যে পরিবেশিত একটি গানে হায়ওয়ান আলীর কপট ধর্মাচারকে কটাক্ষ করা হয়েছে ঃ

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি?
মধুমাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্মবেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি?
সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ
মুখে বিভূ-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি?

হায়ওয়ান আলী কূটবুদ্ধিতে পাকা। বিচার বা আইনের প্রতি তার শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নেই, আছে ভীতি। 'বিষদাঁত ভাঙ্গা' ইংরেজী আইনের ভয়েই স্বাধীনভাবে সে দুষ্কর্ম করতে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত ঃ

.. আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

এই নাটকে একমাত্র হায়ওয়ান চরিত্রটিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত। স্বল্প হলেও নাটকীয়তার উপকরণ এই চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। মনুষ্যধর্মের কোনো বৈশিষ্ট্যই তার চরিত্রে নেই। তার পাপের পরিণাম সীমাহীন, সে শোচনা ও বিবেকশাসনের উর্ধে অবস্থিত এক পাশবশক্তির প্রতীক হিসেবে রূপায়িত।

আবু মোল্লা একজন দরিদ্র প্রজা। সে নিরীহ, অসহায় ও নির্বিবাদী। জমিদারের রোষে সে সর্বস্বহারা হয়েছে। তার ব্যক্তিগত সুখ-স্বস্তি-আনন্দ যেমন একদিকে অন্তর্হিত হয়েছে, তেমনি তার সংসারজীবনও হয়েছে বিপর্যস্ত। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ বা চেতনাও নেই তার মধ্যে। নিতান্ত অদৃষ্টবাদী সে। তার নিজের কথাতেই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত ঃ

আমি তো কোন অপরাধ করিনি ; তবে জুলুম কেন? .... সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, ... কেউ চড়া কথা বল্লে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই।.... একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করেনা।.... এ আল্লা, তুই জানিস্ আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হক-না হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?

[প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের জুলুম, নিজের অপমান-অবমাননা, স্ত্রীর শ্লীলতাহানি ও মৃত্যু—এ-সব ঘটনায় তার বিহ্বলতা, ক্রন্দন, অসহায়ত্ব, ভাগ্যের দোহাই-দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে তার ভূমিকা একজন দুর্বলচিত্ত ও নিষ্ক্রিয় মানুষের। তার বিচার-প্রার্থনার মধ্যেও অনুকম্পা ও করুণালাভের ভঙ্গি নিহিত। 'দোহাই ধর্ম্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম হয়েছে' (তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)-বলে তার ক্রন্দনধ্বনি ও অশ্রুধারা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারেনি। এই শেষ দৃশ্যেই 'দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে' এসে আবু মোল্লা সকাতরে জানায় যে জমিদার তাকে ভদ্রাসন থেকে উচ্ছেদপূর্বক গ্রামছাড়া করেছে। তার এই দুরবস্থার বর্ণনা করুণা ও সহানুভূতি অর্জন করলেও, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ না থাকায় তা কিছুটা বিরক্তিও উৎপাদন করে।

জীতু মোল্লা শঠতা, কপটতা, মিথ্যাচার ও স্বার্থসিদ্ধির এক অনন্য চরিত্র। নাটকের বিচার-দৃশ্যে সাক্ষী হিসেবে স্বল্প উপস্থিতি সত্ত্বেও তার আচরণ ও বৈশিষ্ট্য মনে দাগ কাটে। আদালতে সে নিজের পরিচয় দিয়েছে ঃ

> কোরান পড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, দুটো আহেরের কথা কই যাতে দীন দুনিয়ার ভালাই হবে। বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই, মানিকপীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর এইসকল আমার কাজ—
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

জীতু মোল্লা চারবার হজ করেছে, সারারাত জেগে নামাজ পড়ে আর আল্লাহর নাম জিকির করে,— এমন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ অবলীলাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে যায়। এতে তার কোনো সংকোচ বা দ্বিধা নেই। আদালতে সে জানায়, পত্নীর চরিত্র সম্পর্কে সন্ধিগ্ধ আবু মোল্লার প্রহারেই নূরুন্নেহারের মৃত্যু হয়। তস্‌বি স্পর্শ করে সে হায়ওয়ান আলীর মহানুভবতার কথা স্মরণ করেছে ঃ

> আহা, অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই। বড় দীনদার, বড় দাতা ; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।
>
> [ঐ]

নামাবলী গায়ে, ফোঁটা-তিলকশোভিত, হস্তেগলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুড়জালি, সর্বক্ষণ হরিনাম জপরত আর-এক ধর্মধ্বজী হরিদাস বৈরাগী। সে জীতু মোল্লার সমানধর্মা। মোল্লার মতোই সে কপট ও ভণ্ড। জীতু মোল্লা ও তার সাক্ষ্যের মর্মার্থ অভিন্ন। বৈরাগী বলে, 'ফেরেববাজ' আবু মোল্লাই চরিত্রহীনতার কারণে স্ত্রীকে হত্যা করেছে। হায়ওয়ান আলী যে সচ্চরিত্র, সজ্জন, দয়ার্দ্রচিত্ত ও ধর্মপ্রাণ সে-কথা জানাতে ভোলেনা ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক বড় ধার্ম্মিক, গরীবলোকের প্রতি ভারী দয়া ।

[ঐ]

এই দুই ধর্ম-ব্যবসায়ী তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকার বিপরীত আচরণ করেছে।

সিরাজ আলী হায়ওয়ান আলীর অগ্রজ। নূরুন্নেহারের মৃত্যু-সংবাদ শুনে সে ছুটে আসে। হায়ওয়ান আলীকে তার কুকর্মের জন্য তিরস্কার করে এবং তার কুসঙ্গী মোসাহেবদেরও ধিক্কার দেয়। এইপর্যন্ত তার আচরণ প্রত্যক্ষ করে তাকে অনেকটা বিবেকী ভূমিকাপালনকারী মানুষ হিসেবে গণ্য করার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়। মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে ভর্ৎসনা-বাণী উচ্চারণ করেনি সে, আইনের ভয়ই তাকে বিচলিত করেছে। তার ভাষ্য ঃ

> হায় ! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেককাল হলে আর এত ভাবতে হতোনা। .... এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবিনা।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

লম্পট অনুজকে রক্ষার ব্যবস্থা-বুদ্ধি তার মাথাতেই আসে। নূরুন্নেহারের মৃত্যু তাকে বিচলিত করেনি। সহোদরের আসন্ন বিপদই তাকে সক্রিয় করেছে। সিরাজ আলী তাই মহৎ জীবনভাবনার অনুসারী নয়, সে-ও জমিদারী-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন এক বিবেকবর্জিত মানুষ।

জামাল জমিদারের করিৎকর্মা চাকর। সে অসৎ ও পীড়ক। আবু মোল্লাকে আটক করতে গিয়ে 'কোমর খোলাই' বাবদ উৎকোচ গ্রহণ করে এবং তাকে পীড়ন-অপদস্থ করতেও ছাড়েনা। আইনের ভয়ও আছে তার মনে। জামাল হায়ওয়ান আলীর বশংবদ চাকর হলেও জমিদারের সব আদেশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও দ্বিধাহীনচিত্তে পালন করেনি। তার মধ্যে বিবেচনা ও বিবেক-দংশনের কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। নূরুন্নেহারকে অপহরণ করার পর তার চিত্তলোক আলোড়িত হয়েছে এই কাজের ঔচিত্য নিয়ে ঃ

> .... আমরা চাকর, হুকুম কল্লে আর অদুল কত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে। মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরাণ। এ কাজটা বড় অন্যায় হোচ্ছে। কি করি? এর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে! এ তো দিগ-বিদিগ জ্ঞান কিছুই নাই, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার! আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

এই নাটকে একমাত্র জামাল-চরিত্রেই কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাবোধ ও মানসিক প্রতিক্রিয়া আছে।

আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জজ, ব্যারিস্টার, উকিল, পেশ্‌কার, ডাক্তার এইসব চরিত্রের মধ্যে জজ ও ডাক্তার উল্লেখযোগ্য। বিচারের নামে যে প্রহসন অনুষ্ঠিত হয় আদালতে ইংরেজ জজ ছিলো তার প্রধান নায়ক। মূর্খ-অজ্ঞ ব্যাপারীকে জুরীর আসনে বসানো, আদালতে তুড়ি-শিষ দিয়ে গান-নৃত্য ও সাক্ষী ডাক্তারের সঙ্গে রসালাপ, বিচারে প্রকাশ্যে পক্ষপাতিত্ব তার পবিত্র পেশাকে কলঙ্কিত করেছে। তার মন্তব্য ও আচরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাস্যরসের খোরাক হয়েছে। ডাক্তার কানিংহাম পেশাগত নিষ্ঠা ও সততা প্রদর্শনে ব্যর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের দোসর। নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে আরজান ব্যাপারী কিংবা দুই গ্রাম্য চাষার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

এই নাটকে নারী-চরিত্র তিনটি ঃ নূরুন্নেহার, আমিরণ ও কৃষ্ণমণি। কাহিনীর হ্রস্বতার কারণে চরিত্রগুলো পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়নি। এরমধ্যে নূরুন্নেহারই কিছুটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হতে পেরেছে।

নূরুন্নেহার 'জমীদার দর্পণ' নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। তাকে অবলম্বন করেই কাহিনীর সূচনা ও সমাপ্তি। সতীত্বরক্ষায় সে দৃঢ় সংকল্প, অত্যাচারী জমিদারের প্রতি তার আছে ক্ষোভ, স্বামীপ্রেমে একনিষ্ঠ, চারিত্রিক দৃঢ়তা সবমিলিয়ে নূরুন্নেহার বিশেষ উজ্জ্বলতা নিয়ে উপস্থিত। স্বামী আবু মোল্লার তুলনায় নূরুন্নেহারের চরিত্র অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল।

নূরুন্নেহার সতীত্ব-সচেতন একজন দৃঢ়চিত্ত রমণী। ভীতি বা প্রলোভন কোনো পদ্ধতির কাছেই সে আত্মসমর্পণ করেনি। হায়ওয়ান আলী তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেও সফল হতে পারেনি ঃ

> টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলেনা।
>
> [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

জমিদারের দূতী কৃষ্ণমণি নূরুন্নেহারকে যখন রাত্রে হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানায় গিয়ে তার মনোরঞ্জনের প্রস্তাব ও পরামর্শ দেয়, তখন সতীত্বরক্ষায় ব্যাকুল নূরুন্নেহার বলে ঃ

> অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্ব্বেন? এই কি তার ধর্ম্ম?— এ বড় দারুণ কথা, আমা হোতে এমন কর্ম্ম হবেনা। তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হোতে এমন কুকাজ হবেনা— আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবোনা। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্বো।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণমণি উপর্যুপরি প্ররোচনা দিলেও নূরুন্নেহার তা 'ঘৃণা ও বিরক্তি' সহকারে প্রত্যাখ্যান করে ঃ

> .... সে কাজ আমি পার্ব্বো না, জান থাকতে তো নয়। আগে আমায় মারুন, তারপর যা ইচ্চে তাই করবেন ।
>
> [ঐ]

শেষপর্যন্ত নূরুন্নেহার লম্পট জমিদারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অন্তিমকালে গভীর বেদনা ও আত্মগ্লানিতে জর্জরিত নূরুন্নেহার বলেছে ঃ

> হা খোদা! আমার কাপালে এই ছিলো। নারীকুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না। হায় এই জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল! জন্মেই কেন মরে গেলামনা। তা হলে এতো লাঞ্ছনা সইতে হতোনা! .... হায় হায় জাত গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হোলো, প্রাণও গেলো....।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

নূরুন্নেহারের মধ্যে গভীর পতিপ্রেম বিদ্যমান। আবু মোল্লাকে যখন জমিদার ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে, তখন তার দুর্দশা কল্পনা করে দিশাহারা ও ব্যাকুল নূরুন্নেহার বলে ঃ

> .... রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মারবে, কতবারই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে। তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই....। টাকার জন্য তাঁকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেল্‌বে।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

যে দৃঢ়তা, ক্ষোভ, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদস্পৃহা আবু মোল্লার চরিত্রে নেই, তা নূরুন্নেহারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। জমিদারের অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভমিশ্রিত বক্তব্য ঃ

> পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন ? এই কি জমীদারের বিচের, জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ও মা তা গেলো মাটি চাপা। উল্টে দিনে ডাকাতি ।
>
> [ঐ]

জমিদার সম্পর্কে সে নির্ভয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে ঃ

> দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে ! এই কি তাঁর বিবেচনা? .... হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো, তবে এর বিচের হোতো!
>
> [ঐ]

Dhaka University Institutional Repository

নূরুন্নেহার চরিত্রটি স্বাভাবিক ও গতিশীল। তার চরিত্রে নারীধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। নিজের সম্ভ্রম-সতীত্ব রক্ষায় সে মরিয়া, সুখী দাম্পত্য-জীবনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় শঙ্কাগ্রস্ত, স্বামীর বিপদ-মুহূর্তে মমত্বশীল প্রেমময়ী পত্নীর ভূমিকা পালন, অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার-কামনায় কাতর নূরুন্নেহার উনিশ শতকীয় স্খলিত চরিত্র সামন্ত প্রভুদের কামনা-লালসার শিকার বঙ্গ-রমণীর এক প্রতীক-চরিত্র।

কৃষ্ণমণি হরিদাস বৈরাগীর বৈষ্ণবী। বৈরাগীর মতো সে-ও অর্থলোলুপ, নীতিবিবর্জিতা, কপটী ও ভণ্ড। 'কুটনী' চরিত্রের আদর্শ ও আদলে সে চিত্রিত। অর্থের লোভে সে গৃহস্থবধূকে স্বৈরিণী হতে প্ররোচিত করে। হায়ওয়ান আলীর কুকর্মের সে এক প্রধান সহায়। নূরুন্নেহারকে সম্মত করাতে জমিদার কৃষ্ণমণিকে ব্যবহার করে। জমিদারের এই 'কুটনী' দূতী নূরুন্নেহারকে প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করে বলে ঃ

> আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তা'হলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে ! তুমি উল্টে আবার তার ডবল ঘরে আন্তে পারবে ।
>
> [ঐ]

নূরুন্নেহার তীব্র প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দূতীর এই অশোভন-অনৈতিক প্রস্তাব যখন অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণমণি তখন তাকে বশীভূত করার জন্য সুখৈশ্বর্যের লোভ দেখায়, হুমকি দিতেও ভোলেনা ঃ

> সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জান্তে পারবেনা ! .... তুমি রাজার রাজরাণীর মত সুখে থাকবে। দেখ জমীদার, সে কি-না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে, জাবরান কল্লেও তো করতে পারে । সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বেনা ! ..... যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটেমাটিতে একেবারে উল্‌কুড় উঠিয়ে দিয়েছে। মা আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি....।
>
> [ঐ]

কৃষ্ণমণি দিব্যি দিয়েও মিথ্যাচারে কুণ্ঠিত নয়। আবু মোল্লাকে কয়েদ করার ঘটনা ও কারণ তার অবিদিত নয়। কিন্তু সে না-জানার ভান করে বলে ঃ

> দুই চোখের মাথা খাই মা! আমি কিছুই শুনিনি ! ধরে নিয়ে গেছে সে কি? কেন, আবু তো দোষ করবার লোক নয় !
>
> [ঐ]

এই দুষ্ট রমণী আবুর উপর জমিদারের পীড়নের কথা শুনে কপট সহানুভূতি প্রকাশ করে বলে, 'আহা-হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ !' নাটকে কৃষ্ণমণির ভূমিকা ও অবস্থান স্বল্পস্থায়ী হলেও চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

আমিরণ আবু মোল্লার ভগ্নি। সে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না, সহানুভূতিশীলা এক রমণী। জমিদারগোষ্ঠীর সদর-অন্দরের অনেক খবরই তার জানা। তার দীর্ঘ বক্তব্যে জমিদার-শ্রেণীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। নারীলোলুপ জমিদারকে সে সর্বভুক্ 'ছাগলের জাত' হিসেবে তুলনা করেছে। তার বক্তব্যে জমিদারের লাম্পট্যই শুধু চিহ্নিত হয়নি, সেই সঙ্গে 'সাএবদের' সাহচর্যে আত্মপ্রসাদ লাভের বিষয়টিও অভিহিত হয়েছে। তবে এই অপ্রধান চরিত্রটি আভাসেই মিলিয়ে গেছে, বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিশেষ. উল্লেখযোগ্য। ভাষা-সাফল্যের প্রসঙ্গে মশাররফের নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে এই নাটকটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। আদালতের দৃশ্যের সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই নাটকের ভাষা কথ্যরীতির এবং তা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে প্রকাশিত। পূর্ববর্তী 'বসন্তকুমারী নাটকে'র তুলনায় 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা সহজ, প্রসঙ্গানুগ ও কথ্যরীতি নিয়ন্ত্রিত।

'জমীদার দর্পণ' নাটকে চরিত্রের শ্রেণী অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও মানস-প্রবণতা প্রতিফলনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গি ও রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকের ত্রিবিধ ভাষাগত শ্রেণীকরণ সম্ভব ঃ ক. উচ্চ অভিজাত ও সহযোগী মধ্যশ্রেণী, খ. নিম্নশ্রেণীর গ্রামীণ রায়ত-প্রজা, পাইক-বরকন্দাজ, গ. ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।

জমিদার হায়ওয়ান আলী ও তার মোসাহেবদল এবং সিরাজ আলী, নট-নটী, উকিল-মোক্তার প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এদের ভাষা বিশুদ্ধ ও মার্জিত। যেমন, হায়ওয়ান আলীর বক্তব্য ঃ

> তোমরা বোধ কর সামান্য ; কিন্তু আমি বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাবচরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য।
>
> [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

কিংবা,

> আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক। বিধির নির্বন্ধ দেখ, 'চাষার হাতে গোলাপ ফুল', এ কি প্রাণে সয়? 'হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়কাকে খায় !'
>
> [ঐ]

মাঝে-মধ্যেই তৎসম শব্দের ব্যবহারে সাধুরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও এই ভাষা মূলত কথ্য গদ্যরীতির উপরেই স্থাপিত। প্রসঙ্গত মোসাহেবের ভাষার নমুনাও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

> দেখুন হুজুর। আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা আদায় হবে না? জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় করে নিয়ে আসুক।
>
> [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

সেকালের রীতি অনুসারে জমিদার তার শরাফতি প্রদর্শনের জন্য মাঝে-মধ্যেই আরবী-উর্দু-ফারসী মিশিয়ে সংকর-শব্দের বাক্য প্রয়োগ করেছে। যেমন, বিশেষত উদ্দেশ্য হাসিল ও ক্রোধ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হায়ওয়ান আলীর এইধরনের বাক্যালাপের নমুনা ঃ

> চোপরাও হারামজাদা। আব্‌তাক হাম্‌রা সামনে মু'খোল্‌কে বাত কাহ্‌তা হায় ! আভি লে যাও। লে যাও। ..... ঘন্টেকা দারমিয়ান রোপেয়া আদা কর।
>
> [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

শুধু জমিদার নয় তার পেয়াদাও স্থানবিশেষে নিজের ক্রোধ ও গুরুত্ব প্রদর্শন এবং ভীতি-সঞ্চারের জন্য বলে ওঠে, 'তেরা বাতমে বায়ঠেগা?' (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। কনস্টেবল ও ইন্সপেক্টরও এর ব্যতিক্রম নয়।

'জমীদার দর্পণ' নাটকে ভাষাগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জিত হয়েছে রায়ত-প্রজা ও নিম্নশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর সংলাপ-নির্মাণে। ভাষাভঙ্গির কারণেই তাদের উদ্দেশ্য-প্রবণতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। এদের ভাষা অমার্জিত, অশুদ্ধ ও গ্রাম্যতাদুষ্ট। ভাষা-প্রয়োগে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা নেই, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেছে।

লম্পট জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতে গিয়ে এক গ্রাম্য রমণী আমিরণ সহজ ভাষায় বলেছে ঃ

> ওরা ছাগলের জাত ! .....বলতেও লজ্জা করে ব'ন, শুনতেও লজ্জা। ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোক্ টাটায়, জমীদার হোলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

আঞ্চলিক বুলির প্রয়োগ ধর্মধ্বজী ধড়িবাজ জিতু মোল্লার ভাষাকে গতিশীল ও স্বভাবানুগ করে তুলেছে। যেমন ঃ

> হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত কতেছে আমি সেদিন আবু মোল্লার খানকাঘরে বসে সারারাত আল্লা আল্লা করে—জেহীর করেছি ; নামাজ পড়েছি।
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

তবে আঞ্চলিক বুলিবিশিষ্ট গ্রাম্যভাষার নিপুণ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় দুই চাষার কথোপকথনে। গ্রামীণ পরিবেশের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। নূরুন্নেহারের মৃতদেহ দেখে দ্বিতীয় চাষা প্রথম চাষাকে

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা করে, "মামুজি, কি নকমে মাল্লে?" প্রথম চাষা "আমি কি দেখতে গিছি" বলায় দ্বিতীয় চাষা তখন বলেছে ঃ

> বুঝিছি বুঝিছি, ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁঝের বেলা আমাগোর বাড়ীর পাছ্ কানাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীর মদ্দিও আসে ; বেটার চাল-চলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জোলা বড় হ্যাকমত করে বলে ছ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর দিনে মুনিব বলে মানবো ; নাত্তিরে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে ন্যাত কর্ব্বোনা।
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

এই ভাষা যে মাটির কতো কাছাকাছি এবং চরিত্রকে বাস্তবতায় চিত্রিত করতে সক্ষম তা অনায়াসে উপলব্ধিযোগ্য।

চরিত্রকে জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত করার প্রয়োজনে ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে ভাঙা ভাঙা উর্দু-হিন্দী মিশ্রিত বাঙলা ব্যবহৃত হয়েছে। এই খিচুড়ী ভাষা প্রয়োগে চরিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি রস-সঞ্চারও হয়েছে। যেমন, ম্যাজিস্ট্রেটের উক্তি ঃ

> ও হটে পারেনা। টুমি আসামীর পক্ষে আছে। টোমার বক্টৃটা শেষে হোতে পারে। .... টোমার আর কি আছে ?
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আদালতে জজের বক্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

> নেই নেই হাম টোমকো জুরী করেংগা। টোমারা ক্যা নাম?
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

কিংবা ব্যারিস্টারের সংলাপ ঃ

> নেই, ও বাত নেই, টুম কুচ গোলমাল শোনা হ্যায় ?
>
> [ঐ]

সংলাপ-রচনার ক্ষেত্রে মশাররফ সবসময়ই পাত্র-পাত্রীর শ্রেণীগত পরিচয় ও সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় এনেছেন।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণে মশাররফ প্রসঙ্গত যথেষ্ট পরিমাণে উপভাষা ব্যবহার করেছেন। এতে চরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

যেমন পরিস্ফুট, তেমনি আবহও স্পষ্ট হতে পেরেছে। 'নকমে', 'নজ্জা', 'বাস্তব্বি', 'মদ্দি', 'দহিন', 'ন্যাত', 'জেহীর', 'অজ', 'এহেবারে', 'কহনো', 'আহের', 'বিচের', 'নেগে', 'উল্‌কুর', 'হ্যাল', 'নেওয়াতী', 'ক্ষ্যামতা', 'নাঙ্গুনা', 'কাপ', 'নাত্রে', 'কোষ্টা', 'কতেছে', 'ক্যা', 'টাহা',—কুষ্টিয়া-ফরিদপুর এলাকার এইসব আঞ্চলিক বুলি মশাররফ ব্যবহার করেছেন। ব্যবহৃত আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী-ইংরেজী শব্দের সংখ্যাও কম নয়।

প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার মশাররফের অন্যান্য রচনার মতো 'জমীদার দর্পণে'ও লক্ষণীয়। তবে এখানে তুলনামূলকভাবে প্রবচন প্রয়োগ প্রাসঙ্গিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ঃ

ক. চাষার হাতে গোলাপ ফুল।
খ. পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।
গ. কাকের উপরে কামানের আওয়াজ।
ঘ. গাল ভরে চিনি দেব।
ঙ. রাজা বাদী, উত্তর না দি'!
চ. কে জানে তোর খেম্‌টা আর কে জানে তোর শঙ্করা!

অধিকাংশই প্রচলিত প্রবচন হলেও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। দু-একটি প্রবচনে পূর্বসূরী নাট্যকারদের প্রভাব আছে।

প্রজাবিদ্রোহের ইন্ধন জোগাতে পারে এমন আশঙ্কায় বঙ্কিমচন্দ্র এই নাটকের প্রচার অনুমোদন না করলেও 'জমীদার দর্পণে'র ভাষার বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁর বিবেচনায় এই নাটকটি 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় প্রণীত' এবং এর বিশেষ গুণ এই যে, 'মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই'। সর্বোপরি এর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত, 'অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ'।[১৪৬]

প্রকরণগত দিক দিয়ে 'জমীদার দর্পণ' উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম এ-কথা সমালোচকবৃন্দ স্বীকার করেননি। এতো দ্রুতবেগে পট পরিবর্তন হয়েছে যে কাহিনীর নাট্যিক দ্বন্দ্ব যথাযথভাবে দানা বাঁধাতে পারেনি। একই কারণে চরিত্রসমূহও বিকশিত হতে পারেনি। তাই সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন, " 'জমীদার দর্পণ' বাস্তবের অবিকল চিত্র হওয়া সত্ত্বেও চরিত্র বিস্তৃতি ও শৈল্পিক উপাদানের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে নাটকটি নক্সাধর্মী হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই"।[১৪৭]

'জমীদার দর্পণে'র প্রকৃত মূল্য এর সমাজচিত্র অঙ্কনে, সামাজিক আবেদনে। বৃটিশ-শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণকালে সামন্তশোষণের স্বরূপ, অসহায় রায়ত-প্রজার দুরবস্থা, বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি-দুর্নীতি

Dhaka University Institutional Repository

এবং অত্যাচার-অবিচারমোচনে রাজশক্তির প্রতি নির্ভরতা ও প্রতিকার প্রার্থনার চিত্র এখানে রূপায়িত। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকটি 'কালের দর্পণ' হিসেবে পরিগণিত।

সমাজবাস্তবতার অনন্য দলিল হওয়ার কারণে 'জমীদার দর্পণ' সম্পর্কে সমকালীন প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট তীব্র হয়েছিল। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার এ-বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাবনা প্রজাবিদ্রোহের প্রেরণা হতে পারে এই আশঙ্কায়, 'জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়' বিবেচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নাটকটির বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১৪৮] 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বলা হয় ঃ

> গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, আমরা যখন উহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম যে পর্য্যন্ত পাঠ শেষ না হইল, কোনক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের মনে নানাভাবের উদয় হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে ক্রোধানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।[১৪৯]

শৈল্পিক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা, অভিপ্রায়গত অস্পষ্টতা এবং স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও 'জমীদার দর্পণ' সমকালে যথেষ্টই সমাদৃত হয়।

'জমীদার দর্পণ' সম্পর্কে একটি বড়ো অভিযোগ এই যে, এখানে প্রতিকার-পন্থার প্রেরণায় নিগৃহীত রায়ত-প্রজার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি তো বটেই উপরন্তু হা-হুতাশ করে রাজদ্বারে সকাতর প্রার্থনা নিবেদনের প্রয়াস অবলম্বিত হয়েছে। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। তবে জমিদারের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অসন্তোষ-প্রতিবাদের ইঙ্গিত একেবারে মুছে যায়নি। যেমন, জমিদার হায়ওয়ান আলীর কুকর্মের অন্যতম সহায়ক জামালের মধ্যে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য হলেও সুপ্ত বিবেক জেগে ওঠে এবং প্রতিবাদের সুর জাগে তার কণ্ঠে ঃ

> এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে। মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরাণ। এ কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে।
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

জমিদারের বিরুদ্ধে নূরুন্নেহারের ক্ষোভও চাপা থাকেনি। সে হায়ওয়ান আলীর অত্যাচারকে 'দিনে ডাকাতি' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছে, 'দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে' (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)। আরো স্পষ্ট ও নির্ভীক বক্তব্য পেশ করেছে দক্ষিণপাড়ার এক প্রজা। দুশ্চরিত্র জমিদার এই প্রজার কন্যার প্রতি আসক্ত হলে সে কোনো আবরণ না রেখে সরাসরি জমিদারকে জানিয়ে দেয়, "দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে ন্যাত কর্ব্বো না" (তৃতীয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে নট উপস্থিত হয়ে বলে 'চোখের উপর এমন অন্যায় সংঘটিত হলো, 'দীনহীন প্রজার ধনমান প্রাণ পর্য্যন্ত গেলো', কিন্তু বেদনা ও ক্ষোভের কথা 'তার প্রতিশোধ পর্য্যন্ত হলোনা' (তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের সঙ্গে মশাররফের উত্তরকালের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। 'বস্তানী'র উপরে 'দর্পণে'র প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। 'বস্তানী'তে ব্যক্তি ও স্থানের ব্যঙ্গাত্মক নামের যে সমাহার, তার সূচনা 'দর্পণে'। এখানে ব্যক্তির নাম 'হায়ওয়ান আলী', স্থানের নাম 'বিলাসপুর', জেলার নাম 'বেইনসাফ', থানার নাম 'ধর্মশালা'। এই প্রতীকী কৌতুককর নামকরণের বহুল সাক্ষাৎ মেলে 'বস্তানী'তে। সেখানে স্থানের নাম 'অরাজকপুর', 'জমদ্বার', থানার নাম 'হাতপাতা', গ্রামের নাম 'নেংটিচোরা' এবং ব্যক্তির নাম 'সব্‌লোট', 'ভেড়াকান্ত', 'দাগাদারী', 'পয়জারন্‌নেসা', 'ছিড়িয়া খাতুন' ইত্যাদি। জমিদারের নৈতিকতাহীন অনাচার উন্মোচন উভয় গ্রন্থেরই মূল উদ্দেশ্য। লাম্পট্যবিচারে হায়ওয়ানের সঙ্গে সব্‌লোটের গভীর আত্মীয়তা আবিস্কার সম্ভব, উভয়েই সমানধর্মা। 'জমীদার দর্পণে'র উচ্চশ্রেণীর বাসিন্দাদের মতো 'বস্তানী'র অধিবাসীদেরও নৈতিকতাহীন অন্ধকার বিবরে বাস। মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, বিবেচনা, প্রীতি, করুণা, সহানুভূতি, মমতা, দয়া এইসব সদ্‌গুণাবলী উভয়ক্ষেত্রেই দূরগামী বিষয়।

উনিশ শতকে সমাজচিত্রপ্রধান 'দর্পণ'–নাটক রচনার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) এ–ধারার প্রথম নাটক। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় অজ্ঞাত নাট্যকারের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), মশাররফের 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরানী দর্পণ' (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) ও 'চা–কর দর্পণ' (১৮৭৫)। এরমধ্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণগত দিক দিয়ে 'নীলদর্পণ' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। 'দর্পণ'– নাট্যধারায় এরপরেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'জমীদার দর্পণ'।

'নীলদর্পণে'র মতো 'জমীদার দর্পণে'রও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কোনো কোনো সমালোচকের অভিমত, 'জমিদার দর্পণ' নাটকের পূর্বে 'সামন্ততন্ত্রের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত অন্য কোনও লেখক হানতে পারেননি'।[১৫০] প্রকৃতপক্ষে জমিদারের লাম্পট্যদোষ উদ্‌ঘাটন, রায়ত–প্রজার প্রতি সামন্তপ্রভুর নির্মম নিগ্রহ, সমাজের পরজীবী শোষণ–সহায়ক শ্রেণীর স্বরূপ নির্ণয়, স্বার্থতাড়িত ধর্মধ্বজী মানুষের মুখোশ উন্মোচন, দুর্নীতিগ্রস্ত বিচার–ব্যবস্থার নিখুঁত রূপায়ণ 'জমীদার দর্পণ' নাটকটিকে যুগ–চিত্র ও কালের দলিল হিসেবে মর্যাদাদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এর উপায় কি?

'এর উপায় কি?' মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন ও তৃতীয় নাট্যরচনা। প্রহসনটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে। মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর খস্‌ড়ায় উল্লেখ আছে, "১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে 'এর উপায় কি' প্রহসন প্রকাশ হয়"।[১৫১] 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় (২৪ ফাল্গুন ১২৮০) 'অতি সত্বরে প্রকাশ হইবে' বলে এর বিজ্ঞাপন বের হয়। 'এর উপায় কি?' প্রহসনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১ কার্তিক ১২৯৯ বঙ্গাব্দে টাঙ্গাইল হতে।

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়, প্রথম প্রকাশের কালে তিনি প্রহসনটি উৎসর্গ করেন তাঁর জনৈক 'প্রিয়তম বন্ধু ভ্রাতাকে'। কিন্তু 'পুস্তক ভাল নহে' সর্বত্র এই বিরূপ ধারণা প্রচারিত হওয়ায় 'বন্ধুবর বড়ই লজ্জিত হন'। বিব্রত বন্ধুর স্বস্তির জন্য দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক উৎসর্গপত্রটি প্রত্যাহার করে নেন। এ-প্রহসনের প্রথম প্রকাশ সমাদৃত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণে 'লেখকের কয়েকটী কথা'য় মশাররফ জানান ঃ

> প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি, কীটের উদরস্থ হওয়ায়, ২য় বার প্রকাশে বাধ্য হইলাম। লাভের আশা — প্রথম সংস্করণে মোট বিক্রয় ১৬।। টাকা। এবারে উই, আর্শুলা, তেলাপোকা এবং ইঁদুরের দংশন হইতে রক্ষা পাইলেই পরম লাভ।

'বান্ধব' পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৮৩) এর বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়, 'সুলভ' পত্রিকাতেও প্রহসনটির আলোচনা স্থান পায়। কিন্তু এই সমালোচনাও নিন্দাবাচক, — "প্রথম সংস্করণে 'সুলভ প্রভৃতি' কয়েকখানি পত্রিকা বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিবার বলিয়াছিলেন"।

প্রথম মুদ্রণের অনাদর সত্ত্বেও সমাজহিতৈষণার গরজে লেখক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান হন। ভূমিকায় বলেছেন ঃ

> প্রায় এক যুগান্তর 'এর উপায় কি?' পুনঃরায় প্রকাশ হইল। বিষয়টী ভাল নয়, — কিন্তু রাধাকান্তবাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মতে এয়ার খুঁজিলে যে না পাওয়া যায় তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে হইতেছে। কত পরিবারের চক্ষের জল, অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ নহে, — কোনও সত্য ঘটনার কতক সময়ের চিত্রই 'এর উপায় কি?'।

Dhaka University Institutional Repository

'এর উপায় কি?' একাঙ্কভুক্ত চারটি দৃশ্য-সম্বলিত প্রহসন। দৃশ্য এখানে 'রঙ্গভূমি' নামে চিহ্নিত। পূর্ববর্তী নাটক দুটিতে সংস্কৃত-রীতির নান্দী-প্রস্তাবনা সংযুক্ত হলেও এই প্রহসনটি সেই প্রভাবমুক্ত। এই প্রহসনে ছয়টি গান আছে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশ এবং কাহিনীর সরসতা ও গতিময়তার জন্য এই গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এরমধ্যে কোনো কোনো গান মশাররফের 'সঙ্গীত লহরী' (১৮৮৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রহসনটি সুরাসক্তি ও বারবণিতা-গমনের উনিশ শতকীয় একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে এ-ধরনের অনাচার ও চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনী ও বিবরণ অপ্রচুর নয়। মশাররফের জীবনেতিহাসও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। সমাজদেহ থেকে এই ব্যাধি নির্মূলের জন্য দু-ধরনের প্রয়াস অবলম্বিত হয়েছিল ঃ এক. সভা-সমিতির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সামাজিক আন্দোলন, দুই. নক্শা-নাটক-প্রহসন রচনার ভেতর দিয়ে এইসব কু-প্রথা ও কু-অভ্যাস নিরাকরণ। এই সামাজিক অনাচারকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে রঙ্গ-ব্যঙ্গের এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার।[১৫২]

সুরাপান ও গণিকা-সংসর্গ উনিশ শতকের বাঙলায় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এতে দাম্পত্যজীবন বিড়ম্বিত ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। 'এর উপায় কি?' প্রহসন এই সমস্যারই কৌতুককর রূপায়ণ। রাধাকান্ত শিক্ষিত বিত্তবান শহুরে 'বাবু'। মুক্তকেশী তার স্ত্রী,—সুন্দরী ও সহনশীলা। রাধাকান্ত মদ্যপ এবং গণিকালয়ে নয়নতারা-নাম্নী এক অবিদ্যার কাছে তার নিত্য যাওয়া-আসা। স্ত্রীর প্রতি রাধাকান্তের যে-কেবল অবহেলাই আছে তা নয়, তাকে পীড়ন-অপমান করতেও তার দ্বিধা নেই। অসহায়া মুক্তকেশীর এই বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তারই প্রিয় সখী রাইমণি। মূলত এই সখীর কৌশলেই রাধাকান্তের বোধোদয় হয়। গভীর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় জর্জরিত রাধাকান্ত তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অতঃপর রাধাকান্ত-মুক্তকেশীর বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন নব-অনুরাগে সিক্ত হয়। মূলত এই কাহিনী অনাচারী ভ্রষ্টচরিত্র গণিকামগ্ন রাধাকান্তের গৃহে প্রত্যাবর্তনেরই কাহিনী। এই কাহিনী নির্ধারিত পরিণতি-নির্দেশক বলেই অনেকাংশে তা বৈচিত্র্যহীন।

এই প্রহসনে চরিত্রের আধিক্য নেই। তবে দু-একটি যেমন, সন্ন্যাসীদাস ও হাকিম নগেন্দ্রবাবু চরিত্রের আবির্ভাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন।[১৫৩] পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধাকান্ত ও মদনবাবু। এ-ছাড়া আছে সন্ন্যাসীদাস, জগা ও হাকিম নগেন্দ্রবাবু। নারীচরিত্র তিনটি, — নয়নতারা, মুক্তকেশী ও রাইমণি।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে রাধাকান্তই প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই এই প্রহসনের ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত। উনিশ শতকের ভোগলিপ্সু স্খলিত চরিত্র 'বাবু'র প্রতীক সে। সুরাপান, লাম্পট্য ও রক্ষিতা-পোষণে সে

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যস্ত। রাঁড়-অন্ত প্রাণ রাধাকান্ত তাই নয়নতারাকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

> জগৎ তোমার আমি তোমার, প্রাণ তোমার, রাধা তোমার, কান্ত তোমার।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

রক্ষিতার মনোরঞ্জনে তার মধ্যে কল্পতরু-ভাব জেগে ওঠে ঃ

> টাকার জন্যে তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে? নয়নের তারাকে কড়া কথা বলে গেছে? — রাধাকান্তবাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া বলে গেছে? এ দুঃখ রাখি কোথা? ধিক্ আমার টাকায় ... ।। শতধিক্ আমার চৌদ্দপুরুষে । সে বেটার বাড়ী কোথা? ... তুমি যে তার দোকান শুদ্দ কিনতে পার, তা বোধহয় সে বেটা জানেনা ? নয়ন। তোমার কমি কিসে? কাপড়ের দাম কত?.... এই দশ টাকা কাপড়ের দাম, আর পাঁচ টাকা বেটাকে বক্সিস দিও।
>
> [ঐ]

পত্নী মুক্তকেশীর ভাষায় রাধাকান্তের "লজ্জা ত নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই"। তার এই নির্লজ্জতার চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় যখন সে 'বোতল বগলে গ্লাস হস্তে মাতাল অবস্থায়' তার উপপত্নী ও মদ্যপ বন্ধুকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে। এদের উপস্থিতিতে রাধাকান্ত পত্নীর সঙ্গে সে আচরণ করে তা অশালীন, অভব্য ও বর্বরোচিত। পত্নী মুক্তকেশীকে প্রকাশ্যে সে বলে ঃ

> ভয় পেয়েছ? গা কাঁপছে যে? .... ছি ছি। আমায় লজ্জা দিলে? ছি লক্ষ্মী। আমার এয়ারের মজলিসে মাটি কল্লে। .. ছি ছি। চেয়ে দেখ, দেখ তোমার জোড়া মিলিয়ে এনেছি। ... আমার কোলে বস, না না আমার মাথায় বস, মান করেছ — বিবিজান মান করেছ? ... একটু মদ খাও দেখি ... সব রাগ মাটি হবে।
>
> [দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

নয়নতারার মনোতুষ্টির জন্য পত্নী মুক্তকেশীকে প্রকাশ্যে পীড়ন করতেও তার বাধেনি। আবার বলে উঠেছে, "মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে এই পালঙ্কে শুইয়ে — তুমি আমি খাড়া পাহারা দেব।" রাধাকান্তের এই অমার্জিত আচরণ তার সমানধর্মী ইয়ার মদনবাবুও অনুমোদন করতে পারেনি। মদনবাবু রাধাকান্তকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভৎর্সনা করলে রাধাকান্ত অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলে ঃ

> মুক্তকেশী কিছু ঘুষঘাস দিয়েছে? না গোপনে যেতে বলেছে?
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

কিংবা মদনবাবুকে লক্ষ্য করে রাধাকান্তের এই উক্তি ঃ

> তোমার চক্ষে মুক্তকেশীকে ভাল লেগে থাকে, স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে এসো। না হয় ঘরে যাও। কেউ রোখবার নাই, খোলা মহল দেদার লোট।
>
> [ঐ]

Dhaka University Institutional Repository

এই বক্তব্য রুচিবিকার ও অশ্লীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

রাধাকান্ত রক্ষিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য এতোটাই বিবেকশূন্য ও অমানবিক হয়ে পড়ে যে, সে নয়নতারার প্ররোচনায় পত্নী মুক্তকেশীকে হত্যার সংকল্পও করে। তবে এক্ষেত্রে তার আচরণ একেবারে নির্দ্বন্দ্ব নয়। পত্নীকে হত্যা করতে এসে ক্ষণিকের জন্য হলেও সে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে ঃ

> নয়নতারার মন যোগাতে ঘরের স্ত্রীকে— না —পারব না। ... নয়নতারার কথায় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, এখন এমন হলো কেন? কি করি ... ফিরে যাই। ... মারবই — এক দিক্ ত ফরসা করে দেই। একবার মুখখানা দেখে নেই। জন্মের মত মুখখানা দেখে নেই। চিরদুঃখিনীর মুখখানা দেখে নেই। দেখব ? মুখ দেখে যদি মায়া হয়! না, তা হবেনা ; মন বেঁধে একবার বই – দুবার তাকাব না।
>
> [চতুর্থ রঙ্গভূমি]

হীনচেতা ইন্দ্রিয়াসক্ত, ভব্যতা ও মনুষ্যত্ববর্জিত রাধাকান্তের চরিত্রে এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী বিষয় এবং তা মানবিক স্পর্শে সিক্ত।

পত্নীর নিকট থেকে চরম শিক্ষা লাভ করে রাধাকান্তের বোধোদয় হয়। অনুশোচনায় দগ্ধ হয় সে ঃ

> পাপে প্রায়শ্চিত্ত আছে। সুখান্তে দুঃখ আছে। তবে আর কেন? বুঝেছি। ... আমার দোষ? যথার্থই আমার দোষ। আমার দোষে এই হলো? কি বলে মুক্তকেশীকে দোষী করব, সে পথে ত আমিই কাঁটা দিয়েছি। হায় হায়! আমার সর্ব্বনাশ আমিই করেছি, আপন পায়ে আপনি কুড়ল মেরেছি। ... আপন স্ত্রীকে যতনে রাখলে কখনই এমন হতো না। এত তাচ্ছিল্য, এত অন্যায়, এত ঘৃণা না করলে কখনই এত হতোনা। ... আমি বেশ্যার মায়ায় না ভুললে মুক্তকেশী কখনই আমায় ভুলতো না।
>
> [চতুর্থ রঙ্গভুমি]

শেষপর্যন্ত রাধাকান্তের 'ঘাড়ের ভূত' নেমে গিয়ে সে গৃহমুখীন হয়।

রাধাকান্ত উনিশ শতকের নষ্ট-চরিত্র 'বাবু'দের যোগ্য প্রতিনিধি। ভোগ-লালসা যে মানুষকে কতো নীচে নামাতে পারে তার প্রমাণ মেলে রাধাকান্ত-চরিত্রে। রাধাকান্ত-চরিত্রটি সরলরৈখিক নয়, বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এই চরিত্রটি অনেকাংশে বিকশিত হতে পেরেছে।

মদনবাবুও আর-এক সুরাসক্ত গণিকাভক্ত 'বাবু'। সে রসিক, গীতবাদ্যপ্রিয়। সঙ্গীতে আগ্রহ ও অধিকার আছে। চরিত্রহীন হলেও তার বিবেক-বিবেচনা একেবারে লুপ্ত হয়নি। তাই রাধাকান্তের গৃহে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নয়নতারা যখন অশিষ্ট আচরণ করে তখন মদনবাবু বলে উঠে ঃ

> তুই বেটি ভারি পাজী। ভদ্রলোকের বাড়ী এসে — একি? যা তোর বাবাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর, আমি বাড়ী যাই।
>
> [দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

পত্নীর অবমাননায় উদ্যোগী-উৎসাহী রাধাকান্তকে ভৎর্সনা করতেও মদনবাবু দ্বিধাবোধ করেনা। মদনবাবু রাধাকান্তের গৃহ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা-অনীহার ভাবকে সমর্থন করেনি। তার বক্তব্য ঃ

> সকল দিকেই দেখতে হয়। চিরকালটা মদ খেয়ে রাঁড়ের বাড়ী পড়ে থাক্‌বেন, ঘরের কথা মুখে আনবেননা। ছি ছি। কেউ কি মদ খায়না? না বেশ্যা রাখেনা।
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

পত্নীকে অবহেলা যেমন মদনবাবু অনুমোদন করেনা, তেমনি বহুভোগ্যা বারবণিতার কাছে আত্মসমর্পণ তা-ও তার সমর্থন পায়নি। কেননা বারবণিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার অজানা নয়। তাই সে কৌশলে গানের ভেতর দিয়ে অর্থলোলুপ নয়নতারাকে কটাক্ষ করেছে, 'কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয়' (তৃতীয় রঙ্গভূমি)।

মদনবাবু সুরা ও বেশ্যাসক্ত হলেও গৃহ সম্পর্কে উদাসীন নয়। তাই গণিকাগৃহে গভীর রাত পর্যন্ত অবস্থানে দ্বিধাবোধ করে ঃ

> আর থাকতে পারিনা। এত রাত হয়েছে আজ আর কথা নেই। গিন্নী ঝাঁটা হাতে করেই আছেন। ক ঘা যে খেতে হবে তা গিন্নীর হাত, আর আমার কপাল।
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

যথেষ্ট রসবোধ আছে তার মধ্যে। যেমন, গণিকালয়ে তাকে দেখে হাকিম নগেন্দ্রবাবু কাপড় দিয়ে নিজের মুখ আবৃত করলে মদনবাবু বলে ওঠে ঃ

> আর ঢাকবেন না, চিনেছি। চাঁদের আলো কি কাপড়ে ঢাকা পড়ে?
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

'আপনি মহৎ ব্যক্তি', এই উক্তির মাধ্যমে হাকিম নগেন্দ্রবাবুকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতেও সে নিরুৎসাহ বোধ করেনা।

'এর উপায় কি?' প্রহসনের প্রায় সব কুশীলবই চরিত্রহীন, মদ্যপ, লম্পট। সন্ন্যাসীদাস কিংবা হাকিম

Dhaka University Institutional Repository

নগেন্দ্রবাবুও এই দলভুক্তই। এরমধ্যে সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও সন্ন্যাসীদাস চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সুরাপানে তার মাত্রাজ্ঞান প্রায়শই লুপ্ত হয়, পাঁড় মাতাল যাকে বলে — সন্ন্যাসীদাস তা-ই। অনর্গল বকে যাওয়া বাচাল-স্বভাব তার। রস-রসিকতা করতে গিয়ে অনায়াসে শ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রম করা তার স্বভাবের অন্তর্গত। যেমন, গায়ে কাদা কেনো লেগেছে, — এই প্রশ্নের জবাবে সন্ন্যাসীদাস বলেছে ঃ

> ওরে, ছোঁড়া! মাছ ধর্ত্তে গেলেই গায়ে কাদা লাগে।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

তার বাগ্-বৈদগ্ধ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন ঃ

> আমিও চাষার নন্দন নয় জানিস। জাতি কৈবর্ত্ত বামুনের ঝাঁক মারি।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

হাকিম নগেন্দ্রবাবু ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ। পেশাগত মর্যাদা ও লোকলজ্জার ভয়ে অনিচ্ছসত্ত্বেও অনেকসময় নিজেকে ভোগবঞ্চিত রাখতে হয়। নয়নতারাকে লক্ষ্য করে তাকে বলতে শোনা যায় ঃ

> ... পরের চাকুরি করি, চারদিক নজর রেখে চলতে হয়। তোমার বাড়ীতে আস্‌তে কি আমার ওজর আছে?
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

গোপনে হাকিমের গণিকালয়ে গমন সেকালের সমাজের নৈতিকতার চিত্রকে প্রতিফলিত করে। পতিতার নোকর জগা লোভী, ধড়িবাজ ও সুবিধা-স্বার্থ আদায়ে তৎপর। এই চরিত্রগুলো অস্পষ্ট, অবয়বলাভের পূর্বে আভাসেই যেনো তারা মিলিয়ে গেছে।

নয়নতারা এই প্রহসনের প্রধান নারীচরিত্র। সে পেশাদার রূপোপজীবী। গণিকা-স্বভাবের সব বৈশিষ্ট্যই আর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কার্যোদ্ধারে কপট-কৌশলী, অর্থলোলুপতায় হৃদয়হীনা, মিথ্যা ভাষণে পটু, অশ্লীল-কদর্যতায় নিমগ্ন, ঈর্ষা-অভিসন্ধিতে পরিচালিত, অমানবিক আচরণে অকুণ্ঠিত এক বিনষ্ট নারীর প্রতিচ্ছবি নয়নতারায় প্রতিফলিত।

কপটতা নয়নতারার গণিকা-জীবনের সাফল্য-সমৃদ্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে গৃহীত। তার কপট কৌশলের কথা জানিয়েছে সে ঃ

> একখানা ঢাকাই শাড়ী দেখিয়ে পাঁচজনার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

Dhaka University Institutional Repository

উপপতি রাধাকান্তকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার জন্য সে তার সংসার ভাঙার ফন্দী আঁটে। মুক্তকেশীকে হত্যার জন্য রাধাকান্তকে সে প্ররোচিত করে। 'ছুরির উল্টা পীঠে গলা কাটিতে উদ্যত' হয়, আবার উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সংকল্প ব্যক্ত করে। তার এই অভিনয় কেবল 'পথের কাঁটা' মুক্তকেশীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল মাত্র। আবার তার গৃহে হাকিম-উপপতির আগমনের ক্ষেত্রে প্রথমে তার পরিচয় না পেয়ে নয়নতারা বলে ওঠে ঃ

> কোন বেটা নবাবপুত্র এসেছে যে এগিয়ে না আন্‌লে আর আস্‌তে পারেন না। আমি যেন ঘরের মাগ্ হয়ে পড়েছি।
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

কিন্তু পরক্ষণেই তার কথার সুর পাল্টে যায় আগন্তুকের পরিচয় জানতে পেরে। "পথ ভুলেছেন নাকি? মাপ কর্বেন"— এই কথা বলে হাকিম 'নগেন্দ্রবাবুর পরিধেয় ধরিয়া' সে প্রবেশ করে। মুহূর্তে বিরক্তির ভাব আনন্দ-আহ্লাদে পরিণত হয়। তার শঠতা-কপটতার আরো পরিচয় আছে। বহুভোগ্যা এই রমণী পালাক্রমে একাধিক উপপতির মনোরঞ্জনে তৎপর। রাধাকান্ত বাইরে গেলে সে মদনবাবুর সঙ্গসুখ উপভোগ করে এবং রাধাকান্তের পুনরাগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার জন্য ভৃত্য জগাকে নির্দেশ দেয়, — 'বাবু এলে কেসে উঠিস্' (প্রথম রঙ্গভূমি)। আবার অন্যত্র মদনবাবুকে 'তুমি একটু বসো, আমি আস্‌চি— মাথা খাও যেওনা' (তৃতীয় রঙ্গভূমি) বলে বসিয়ে রেখে হাকিম নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তার বাসায় চলে যায়।

নয়নতারার সীমাহীন লোভ তাকে অমানবিক হতে সাহায্য করে। রাধাকান্তকে পত্নী-হননে প্ররোচিত করতে তার কোনো কুণ্ঠাবোধ নেই। এ-বিষয়ে তার গোপন অভিসন্ধি স্বগতোক্তিতে প্রকাশ পায় ঃ

> মুক্তকেশী গেলেই এদিকের পথ খুলাশা হয়। আর যাবে কোথা? নয়নতারা ঝাঁটা মারবে আর দুহাতে লুটবে। ওর যা যা আছে সকলই হাত করব। মুক্তকেশীর ভাল ২ অলঙ্কার আছে শুনেছি, সেগুলো তো কালকেই হাত করব। এখন একটু আড় করে বসে যা ইচ্ছা সেই কর্ত্তে পারব।
>
> [তৃতীয় রঙ্গভূমি]

নয়নতারার আচরণ ও উক্তিতে যে অমার্জিত ভাব, অশ্লীলতা, কদর্যতা ও রুচিবিকারের স্বাক্ষর মেলে তা তার পেশা ও সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, রাধাকান্তের উদ্দেশ্যে তার পত্নীকে উপলক্ষ করে নয়নতারা যে-কথা বলে তাতে ভব্যতা-শালীনতার বিন্দুমাত্র প্রলেপও নেই ঃ

> তুই তোর মাকে নিয়ে থাক্। আমি তোর মুখ দেখবো না ....।
>
> [দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা,

ভাল চাও, বাড়ী চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাংব।

[দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

নয়নতারার ব্যবহার ও বক্তব্যে বিরক্ত মদনবাবু তাকে যখন ভৎর্সনা করে তখন সে রাধাকান্তের পত্নীকে জড়িয়ে কদর্য ইঙ্গিত করে — " ওদিকে যোগাড় হল নাকি ?" অশিষ্ট আচরণ ও উক্তির ভেতর দিয়ে নয়নতারার বারবিলাসিনী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

গণিকা প্রেম-প্রীতির বশ নয়, সে কেবল অর্থের নিয়ন্ত্রণ মানে। সঙ্গতকারণেই নয়নতারার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে অর্থলিপ্সা। মদনবাবুর গানে নয়নতারা-চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত ঃ

এই ত ঠাকুর চাতুরী বুঝিতে পার নাই ।
শতজন মন তারা কথায় যোগায় ।।....
কার তারা কে বলিবে, তারা কার নয়।
কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয়।।

[তৃতীয় রঙ্গভূমি]

মুক্তকেশী রাধাকান্তবাবুর সহধর্মিনী। সুরাসক্ত গণিকামগ্ন স্বামীর অবহেলায় তার দাম্পত্যজীবন বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত। সে সরল, সহনশীল, অদৃষ্টবাদী, স্বামী-অনুরাগিণী। স্বামীসোহাগবঞ্চিতা এক অসহায় সর্বংসহা নারীর প্রতীক সে। তার তীব্র মনোবেদনার কথা সে ব্যক্ত করেছে ঃ

আমি যে একজন তাঁর বাড়ীতে আছি, আমায় যে কখনও বিয়ে করেছিলেন, ... এ তাঁর মনে আছে কিনা সন্দেহ। চিরকাল আইবুড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে রইতেম তাতেও দুঃখ হতনা, থেকে — নেই, আমার আমার নয়, আমি যার, সে পরের। আমি দিনরাত কাঁদি। সে মনেও করেনা, এ দুঃখ আর কারে বলি।

[দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

ব্যক্তিগত সারল্য আর নির্বিচার পতিভক্তি অনেকাংশে তার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। সখী রাইমণি তাই তাকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

এখন কলিকাল সোজা কথায় কাজ চলেনা, হাবা মেয়ে হলে ভাতার জব্দ থাকেনা, নরম গরম দুই চাই।

[দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদী ও দৃঢ়সংকল্প এক বলিষ্ঠ রমণীতে পরিণত হয়েছে।

রাইমণি এই প্রহসনের অপ্রধান চরিত্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মূলত তার দৃঢ়তা, বাস্তবতাবোধ, বুদ্ধি-কৌশল ও দায়িত্বচেতনার ফলে একটি বিপর্যস্ত দাম্পত্যজীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অসহায় মুক্তকেশীর মধ্যে সে-ই দৃঢ়তা ও প্রতিবাদের চেতনা সঞ্চারিত করেছে। মুক্তকেশীকে লক্ষ্য করে সে বলেছে ঃ

> তুমি এত সয়ে থাক। আমি হলে এতদিন যা মনে হত, তাই কর্ত্তেম। কা'র মুখের দিকে চাইতেমনা। কয়েদির মত দুবেলা দুট খাব, আর মনের আগুনে গুমরে মরব, একটি কথাও বলতে পার্ব্বনা। বল ত এত কার প্রাণে সয়?
>
> [দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]

মুক্তকেশীর মতো সে অদৃষ্টে বিশ্বাস করেনা, সব ঘটনাকেই বাস্তবতার নিরিখে বিচার করে। তার বুদ্ধিমত্তা ও এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই মুক্তকেশীকে সংকট থেকে উদ্ধার করেছে।

হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-পরিহাস, বেদনা-দুঃখ, কান্না-দীর্ঘশ্বাস— প্রহসনের উপজীব্য এ-বিষয়গুলো 'এর উপায় কি?' প্রহসনে প্রতিফলিত হয়েছে। বারবণিতার শঠতা-প্রগল্ভতা, পতিতালয়ের ফরমায়েস-খাটা চাকরের ধূর্তামি, বিত্তবান-অভিজাত-শিক্ষিত বাবুদের স্খলন ও ভোগলিপ্সা, গৃহবধূর মর্মবেদনা প্রকাশে ভাষা তার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

বারবধূ নয়নতারার কপটতা, কৌশল, ছলনা ও বাক্চাতুরীর পরিচয়চিহ্নিত ভাষার নমুনা ঃ

> অত রসিকতা ক'রনা। মাগ্‌কে আর নাচ দেখিয়ে কাজ নেই, শেষে বেঁধে রাখা দায় হবে। আমার জ্বালাতেই দিনরাত মাথা দিয়ে আগুন উঠ্ছে। আবার তার চোক্ কান ফুটিয়ে, আর কাজ নেই।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

বারবণিতার ধনী নাগর রাধাকান্তের মুক্তহস্ত পতিতা-সেবার সঙ্কল্প প্রকাশের ভাষা ঃ

> ছি ছি! মরে যাই। গলায় কলসি বেঁধে উলুবনে ডুবে মরি। দশটাকার কাপড়ের জন্যে মুখ ভারি। মদন দাদা! একি আর গায়ে সয়? এত বড় তার বাপের যোগ্যতা! টাকার জন্যে কড়া কথা বলবে? ... এই দশটাকা কাপড়ের দাম, আর পাঁচ টাকা বেটাকে বক্‌সিস দিও। ক্যা বাৎ হ্যায়।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

Dhaka University Institutional Repository

পতিতালয়ের আর-এক অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র সন্ন্যাসী দাসের আত্মপরিচয়-দানের ভেতরে যে কৌতুক ও রঙ্গরস নিহিত, তা বেশ উপভোগ্য ঃ

> আমিও চাষার নন্দন নয় জানিস? জাতি কৈবর্ত্ত বামুনের ঝাঁক মারি। আমি কি কম লোকের সন্তান। আমার বাবার বাবা, যে-টাই মাছ ধর্ত্ত, ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। বাবা রাজার হাট চেন? সেই রাজার হাটের দক্ষিণে রাণীর হাট, ঠিক বিবির হাটের পাশেই কদীর হাট, সেই আমার পিতামহের জন্ম-মাটি, নামটাই কি যেমন তেমন— নাম হনুমান দাস।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

চরিত্রের অস্বাভাবিকতা এই আত্ম-মশ্‌করার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভাষা এখানে চরিত্রকে সনাক্ত করতে যথেষ্টই সহায়ক হতে পেরেছে।

মশাররফের এই রচনাতেও প্রবাদ-প্রবচন, উপমা-অনুপ্রাসের সার্থক ব্যবহার আছে। 'মাছ ধর্ত্তে গেলেই গায়ে কাদা লাগে', 'ফেটে চৌচির হয়োনা', 'আসে লক্ষ্মী যায় বালাই', 'খুরে নমস্কার', ইত্যাদি প্রবচন পুরাতন এবং বহুল ব্যবহৃত হলেও এর যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োগের ফলে এ-গুলো বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। অনুপ্রাসের ব্যবহার বক্তব্যকে যেমন সরস ও বিষয়মুখী করেছে তেমনি ভাষাও প্রাঞ্জলতা পেয়েছে ঃ

> ওর শাস্ত্রেই আছে, রাণ্ডির বাড়ী ব্রাণ্ডি, এয়ারের বাড়ী বিয়ার, শালার বাড়ী স্যাম্পিন, শিকারে সেরি, আর বোর্টে পোর্ট, এই হোল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

'এর উপায় কি?' প্রহসনে কথ্য ভাষারীতি মশাররফের পূর্বের দুটি নাটকের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট ও পরিণত।

'এর উপায় কি' প্রহসনে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। বিশেষ করে শেষোক্ত প্রহসনের প্রভাব স্থানবিশেষে স্পষ্ট। একাধিক ক্ষেত্রে সংলাপগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। [১৫৪]

'এর উপায় কি?' প্রহসন সম্বন্ধে অশ্লীলতা ও রুচিবিকারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। বন্ধুর নামে প্রদত্ত প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্র পরবর্তীতে প্রত্যাহারের এটাই প্রধান কারণ। 'বান্ধব' পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৮৩) প্রকাশিত সমালোচনায় এই প্রহসনে 'অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়ি' এবং 'কল্পনায় ও

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় যারপরনাই জঘন্য রুচির' নিন্দা করা হয়।[১৫৫]

উপরিউক্ত অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন নয় তার নিদর্শন এই প্রহসনে পাওয়া যায়। যেমন, বারবণিতা নয়নতারা তার জন্মের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে যা বলেছে তা চূড়ান্ত অশ্লীল ঃ

> বাবা কেমন চিনিনা, কখন দেখি নাই, সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে, তাতে বেশ দশ টাকা লাভ করেছি।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

সন্ন্যাসী দাসও সোৎসাহে তার জন্মের কদর্য কাহিনী পরিবেশন করেছে ঃ

> আমি সন্ন্যাসীর আশীর্বাদি ছেলে — তারকেশ্বরের মোহন্ত তখন হয় নাই, তা হলে মোহন্তের আশীর্ব্বাদেই হতেম। আমি হতেই মার বেঁজ নাম, বাবার আঁটকুড়ো নাম কার ২ আইবুড় নাম ঘুচে গেছে।
>
> [প্রথম রঙ্গভূমি]

'দুঁশ ভাতারী', 'বাঞ্চৎ গরুখেক নেড়ে', 'মাগী', 'হারামজাদি'—এইসব অশিষ্ট শব্দের অকুণ্ঠ ব্যবহারও আছে এখানে। অবশ্য এই অশ্লীল বক্তব্য, রুচিহীন বর্ণনা ও অশিষ্ট শব্দ ব্যবহারের যুক্তি হিসেবে এইটুকু কেবল বলা যায় যে, পতিতালয়ের আবহ এবং এই নিষিদ্ধ পল্লীর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের ভাষা বা আচরণের স্বাভাবিকত্বই এতে প্রকাশিত হয়েছে। মূলত বাস্তবতাবোধের প্রয়োজনেই এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

শিল্পমূল্যে ন্যূন হলেও উনিশ শতকের বাঙালীসমাজের সুরা ও বারবণিতা-সংসর্গে চরিত্রহীনতা ও রুচি-বিকার নিরাকরণের মহৎ অভিপ্রায়ে রচিত এই প্রহসনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সেই প্রেক্ষাপটেই বিচার্য।

বেহুলা গীতাভিনয়

'বেহুলা গীতাভিনয়' গদ্য-পদ্য-গীতসম্বলিত লৌকিক নাট্যধারার অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা। দেশীয় যাত্রাপালার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'বেহুলা গীতাভিনয়' প্রকাশিত হয় ৭ আশ্বিন ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। ছয় অঙ্কে বিভক্ত এই গীতাভিনয়ের মোট দৃশ্য-সংখ্যা কুড়ি। দৃশ্য অভিহিত হয়েছে 'গর্ভাঙ্ক' হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্রে পাঠ্য' শীর্ষক ভূমিকায় লেখক এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> বেহুলা লখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রী-মহলে বেহুলার কাহিনী — বড়ই আদরের। ... এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষা দোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিতসমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভস্মেই সুবর্ণ কণা, সামান্য প্রস্তরেই কহিনুর এবং দারইয়াই নূরের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে — দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি মনসার ভাসানই "বেহুলা গীতাভিনয়"। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত সমাজের কথঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

মনসার ভাসান বা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বাঙলার জনপ্রিয় লোকপুরাণ। সম্প্রদায়নির্বিশেষে বাঙালীসমাজে এই কাহিনীর সমাদর। মশাররফ এই কাহিনীকেই তাঁর 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র উপজীব্য করেন। কাহিনীগত বিষয়ে মৌলিকত্ব নেই, তবে উপস্থাপন-কৌশল ও কাহিনীর রূপায়ণ লেখকের নিজস্ব শিল্পচিন্তার ফসল।

চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগর পরম শিবভক্ত ও মনসা-বিদ্বেষী। তার বাণিজ্যযাত্রা যাতে শুভ হয় সে-জন্য পত্নী সনকা দেবী মনসার পূজার আয়োজন করে। কিন্তু এতে ক্রুদ্ধ চাঁদ সওদাগর পত্নীকে ভর্ৎসনা করে মঙ্গলঘট ভেঙে ফেলে এবং মনসার অনিষ্ট-শক্তি অগ্রাহ্য করে বাণিজ্যযাত্রা করে। এদিকে মনসা এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে চাঁদের বাণিজ্য-বহর ডুবিয়ে তাকে প্রাণে না মেরে 'পথের কাঙ্গাল' করে ছাড়ে। সপ্তডিঙ্গা হারিয়ে নিঃস্ব চাঁদ সওদাগর বন্ধু চন্দ্রকেতুর গৃহে গেলে বন্ধু কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। এরপর চন্দ্রকেতু দেবী মনসার ভক্ত জেনে চাঁদ সওদাগর তার প্রদত্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে। বন্ধুর আশ্রয় ত্যাগ করে চাঁদ বেণে এক ভট্টাচার্যের গৃহে অসম্মানজনক গৃহভৃত্যের কাজ গ্রহণ করে।

কিছুকাল পর চাঁদ সওদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার সপ্তপুত্রের মধ্যে একমাত্র জীবিত পুত্র 'নখিন্দরে'র (লখিন্দর) বিবাহের আয়োজন করে। নিছনি নগরের সায়া বণিকের কন্যা বেহুলার সঙ্গে সাড়ম্বরে লখিন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর মনসার ক্রূর প্রতিহিংসার ফলে বাসরঘরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় চাঁদ-পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে তার জীবনলাভের আশায় অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ভেসে চলে। অনেক স্থান ঘুরে বেহুলা এসে উপস্থিত হয় 'নেত ধোপানীর ঘাটে'। নেত ধোপানীকে সঙ্গে নিয়ে বেহুলা দেবসভায় উপস্থিত হয়ে দেবী মনসার কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চায়। মনসা বেহুলার ত্যাগ-তিতিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে লখিন্দরসহ চাঁদ বেনের সাত পুত্রকে পুনর্জীবিত করে এবং নিমজ্জিত সপ্তডিঙা ফিরিয়ে দেয়। বিজয়িনী বেহুলা দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে 'চাম্পাই নগরে' প্রত্যাবর্তন করে। 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। কাহিনী-সমাপ্তির পর লেখক 'পরিশিষ্ট চাঁদ সদাগরের বাড়ী' এবং 'পরস্পর সকলের মিলন এবং আনন্দসূচক গান'— এই আভাস দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন।

এই ছকে বাঁধা কাহিনীর চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। তাই চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মৌলিকত্ব বা নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ এখানে নেই বললেই চলে। প্রধান-অপ্রধান অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই গীতাভিনয়ে। চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ-ছাড়া লখিন্দর, চন্দ্রকেতু, সায়া বণিক, চূড়ামণি ঘটক, গোঁসাই দাস ঠাকুর, সনকা, মনসা, নেত ধোপানী প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। মাঝি-মাল্লা, দেব-দেবতা, চাকর-নফর— এইধরনের চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়।

মনসা ও চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। চাঁদ সওদাগরই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। তার সাহস, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা তাকে পুরুষকারের অনন্য প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্নেহ-বাৎসল্য ও মানবিক উপলব্ধিতেও সে সিক্ত। দেব-দ্রোহী চাঁদ বেণে মনসার পূজা-প্রচারের প্রতিবন্ধক হিসেবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অসীম সাহসে সে পত্নী সনকার নিষেধ ও অমঙ্গল-বাণীকে অগ্রাহ্য করে বলে ঃ

আজ ছাড়িব ডিঙ্গে, বাজায়ে সিঙ্গে,
দেখি মনসা কিবা করে।।

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

তার স্পষ্ট বক্তব্য ঃ

> মনসা ঠাকরুন আমার সর্বনাশ করবেন, এ কথায় চাঁদ সদাগর কিছুতেই থাকবার নয়। অন্য কথা বলে বাধা দিলেও বা বুঝে দেখতেম।

[ঐ]

পৌরুষদীপ্ত চাঁদ বেণে ধ্বংস হতে পারে কিন্তু পরাজিত হতে জানেনা। বিপর্যয়, ক্ষতি, দুঃখ, শোকে তার মধ্যে ভাবান্তর নেই, বিচলিত হয়না সে। মনসার উক্তিতে চাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আভাস মেলে ঃ

বাণিয়া বেটার কথা সহ্য নাহি যায়।।
এই পাপে হইতেছে তার বংশ ক্ষয় ।
তবুও হলনা তার, জ্ঞানের উদয়।।

Dhaka University Institutional Repository

মনেতে বেদনা দিতে বাঁকি রাখি নাই।
কান্দিলনা কোনদিন এমন বালাই।।
শোকেতে কাতর নয় কঠিন এমন।

[প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আসন্ন বিপদ ও ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েও চাঁদ বেণে ধীর-স্থিরভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও মোকাবেলা করতে চায়। মনসার কোপে পড়ে তার সপ্তডিঙ্গা দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়। নিজে সর্বস্বহারা হয়েও উদ্‌ভ্রান্ত, বিপন্ন, শোককাতর মাঝি-দাঁড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে চাঁদ বলেছে ঃ

> ভয় কি? গেছে সাত ডিঙ্গে চিন্তা কি? প্রাণ থাক্‌তে ভাবনা কি? দৈব বিপদে আর দুঃখ কি? স্থির হও, স্থির হও, সকলই পাওয়া যাবে, এখন স্থির হও।
>
> [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

আবার গভীর অরণ্যে নিঃসঙ্গ-নিঃসহায় চাঁদ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিপদ-দুঃখকে অতিক্রম করার জন্য বলে ওঠে ঃ

> আমি চন্দ্র বণিক আমার ভাবনা কি? অভাব কি? আমার দুঃখ কি? কিসের ভয়? যাব — এই বনজঙ্গল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অবশ্যই একদিন লোকালয় পাব। চেষ্টায় অসাধ্য কি আছে? সুখদুঃখ ভোগের জন্যই মানব। .... ছি ! ছি ! আমি নিতান্তই কাপুরুষ, আমি নিতান্তই অমানুষ, আমি নিতান্তই দুর্বল, উৎসাহবিহীন, সাহসহীন যে এই সামান্য দুঃখে অস্থির হয়েছি। ... ধিক্ আমার জীবনে! শত ধিক্ —
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

চাঁদ সওদাগর নিজের বিশ্বাস ও আদর্শে অটল। শৈব চাঁদ প্রবল মনসাবিদ্বেষী। তার বিপন্ন-মুহূর্তের সহায় ঘনিষ্ঠ মিত্র চন্দ্রকেতু মনসার ভক্ত জেনে চাঁদ তার সাহায্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে।

বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ-বাসর প্রহরায় চাঁদ সওদাগর স্বয়ং নিযুক্ত হয়। এখানেও তার একমাত্র লক্ষ্য মনসাকে প্রতিহত করা। ভীতা সনকাকে লক্ষ্য করে চাঁদের উক্তি ঃ

> তোমার — দেবী ঠাকুরাণীর আজই ত সময়। এই — রাত্রেই ত তার, বিষ ঝাড়বার রাত্র। আসুন দেখি আজ দেখি? চাঁদ বেণে, সাবধান হয়েছে। এবারে কাছা দিয়েছে। সাহসে ভর করে লাঠি হাতে করেছে।

প্রবল পরাক্রান্তশালী দেবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এক মানবসন্তান।

Dhaka University Institutional Repository

মহাবলী রাবণের মতোই তেজস্বী, নির্ভীক, দৃঢ়চিত্ত চাঁদ সওদাগরের পরাজয় তার বাহিরে নয় অন্তরে। মনসার ষড়যন্ত্রে সে সর্বস্বান্ত হলেও পরাজয় মানেনি; তার দৃপ্ত পৌরুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে প্রজ্জ্বলিত। কিন্তু এই অমিততেজ চাঁদ বেণে তার একমাত্র জীবিত পুত্র লখিন্দরের অকালমৃত্যুতে শোকে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তার বিলাপধ্বনি ও হাহাকার মর্মস্পর্শ করে ঃ

> লখিন্দর ! বাবা লখিন্দর। ..... লোহার ঘরে রেখেও তোকে রাখতে পাল্লেম না। লখিন্দর। তোকেও হারালেম। হায় ! হায়। আমার সকলই বিফল হলো। আশাভরসা যত্নপরিশ্রম, সকলই মাটি হলো। লখিন্দর। একবার চোখ তুলে চাও বাপ। তোর ছয় ভাই এই বাসরে সারা হয়েছে, ছয়জনকে এই বাসর ঘরে হারিয়েছি। মানুষের সম্মুখে কাঁদি নাই। চাঁদ বেণের চক্ষের জল, আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পারে নাই। লখিন্দর। প্রাণের প্রাণ বাছা। আমায় তুই আজ কাঁদালি। ..... বাপধন ! উঠে বস, সোনার মুখে এ সকল কাল-দাগ কিসে হল বাপ।
>
> [পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

অন্যান্য কোনো পুরুষ-চরিত্রই পূর্ণাবয়ব লাভ করেনি। কাহিনীগত সীমাবদ্ধতার কারণে লখিন্দরের চরিত্রটি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বরং বন্ধুবৎসল-হৃদয়বান ও পরোপকারী চন্দ্রকেতু, ভট্টাচার্য মহাশয়ের ধড়িবাজ চাকর গণ্ডগোল, সায়া বণিকের চতুর গৃহভৃত্য রামা, প্রভুভক্ত বটু সারেঙ্গ — স্বল্প পরিসরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত।

নারী-চরিত্রের মধ্যে বেহুলাই প্রধান চরিত্র। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সে চাঁদ সওদাগরের সমানধর্মা। তার দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞা, তিতিক্ষা, ধৈর্য, ত্যাগ ও পতিভক্তি তাকে এক ব্যতিক্রমী স্বতন্ত্র নারীতে রূপান্তরিত করেছে। বাসরঘরে বৈধব্য-বরণের ভাগ্যকে সে স্বীকার করে নেয়নি ঃ

> সতী মায়ের পেটে যদি বেহুলা জনমিয়া থাকে।
> সতীর ক্ষমতা কত, দেখাবে ভবে সবাকে।।
> এই মরা পতি যদি আমি জিয়াইতে পারি।
> সার্থক জীবন হবে জগতে জনম নারী।।
>
> [ষষ্ঠ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

বেহুলার এই প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠ পতিপ্রেম শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

> আমি ভিক্ষা চাই। আমি অবলা অসহায়া পতিহারা বালিকা,— ভিক্ষা চাই। ছ মাস অনাহারে – – অনিদ্রায়, মরা কোলে করে জলে ভেসে বেড়াচ্ছি। সকল দেবদেবীর চরণে দুখিনির এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা। — আমার প্রাণপতির প্রাণ — আমাকে ভিক্ষা স্বরূপ দান করুন। — দোহাই আপনাদের। হতভাগিনীর প্রতি দয়া করে — আমার পতিকে জীবিত করুন। এই ভিক্ষা মাঙ্গি।

[ষষ্ঠ অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

—দেবসভায় বেহুলার এই করুণ আর্তি মনসাসহ সব দেব-দেবীকেই গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। বেহুলা শেষপর্যন্ত স্বামী লখিন্দরসহ চাঁদ সওদাগরের অপর ছয় পুত্র এবং সপ্তডিঙা ফিরিয়ে আনে। কঠোর ব্রতিনী বেহুলা এই কাহিনীর দ্বিতীয়াংশের সম্পূর্ণ পট জুড়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।

সনকা বাঙলার শাশ্বত কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর প্রতীক। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় বিহ্বল, পুত্রশোকে কাতর সে। ধৈর্য-ত্যাগে সে অনন্যা। স্বামীর কটুবাক্য সহ্য করেও সে তারই মঙ্গল-কামনায় দেবী মনসার পূজা করে। গ্রাম্য রমণীর চিরাচরিত শুভাশুভের সংস্কার সে মান্য করে। মঙ্গলঘট ভেঙে ফেলে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যযাত্রায় অগ্রসর হলে শঙ্কিতা সনকা কাতরকণ্ঠে স্বামীকে বলে ঃ

যেয়না যেয়না নাথ তুমি আজি যাইওনা।
ভেঙ্গেছে মঙ্গলঘট অমঙ্গলে পা বাড়িওনা।।
হবেনা মঙ্গল তোমার অমঙ্গলে যাত্রা করি।
আজিকার দিন থাক ঘরে বিনয়ে মিনতি করি।।

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

সনকার জীবন শোক-দুঃখে জর্জরিত। ছয়পুত্রের অপঘাত মৃত্যু তার অন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাই একমাত্র জীবিত পুত্র লখিন্দরের বিবাহ-প্রসঙ্গে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ঃ

কাঁপিছে আমার হিয়ে, বিয়ে নাম শুনি কানে।
বাসরঘরের কথা জাগিয়ে উঠিল প্রাণে।।
সোণার পুত্তলি ছয়, হল ক্ষয় সেই ঘরে।
সে ঘরের নামে আমার পরাণ কেমন করে।।

[চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

নিয়তির নির্বন্ধে বাসরঘরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হলে জননী সনকার আহাজারি ঃ

সাত পুত্র যার মরে বাসরে ।
সে অভাগী কিসে থাকে প্রাণে ধরে ।।

[পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদ-পত্নী সনকা বাঙালীর গ্রামীণ গার্হস্থ্যজীবনের অতি-পরিচিত প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত।

মনসা 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মূলত তার পূজা-প্রচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনীর জন্ম। সে ক্রূর, কুটিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং পাশাপাশি দয়ালুও। চাঁদ সওদাগর তার পূজা-প্রচারের প্রতিবন্ধক বিবেচনায় মনসা তাকে নির্বংশ ও সর্বস্বান্ত করার উদ্যোগ নেয়। মনসার ক্রোধের আগুনে ভস্মীভূত হয় চাঁদের সুখের সংসার। সনকা মনসার ভক্ত হলেও সে তার ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকেনি। বাসরঘরে বেহুলা-লখিন্দরকে দেখে মনসার মধ্যে প্রসন্নভাব জাগে, কিন্তু পরক্ষণেই চাঁদ বেণের দর্প ও তিরস্কার ধ্বনিতে ক্রোধান্বিত মনসা লখিন্দরকে দংশন করে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। শেষ দৃশ্যে মনসার দয়া ও ক্ষমার পরিচয় মেলে। বেহুলার স্তবে তুষ্ট মনসা বলেছে ঃ

> তোমার মত সতী-সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীর পতিকে অসময় হরণ করে কার সাধ্য? তুমি পতিধনে বঞ্চিত হবেনা। .... আশীর্বাদ করি তুমি আজীবন পতিসুখে সুখি থাক। — লখিন্দরের ঔরষে তোমার সন্তানসন্ততী হক্, চিরকাল তোমার সিঁতের সিন্দুর বরজায় থাকুক।
>
> [ষষ্ঠ অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

মনসার এই ক্ষমাশীল অন্তরের প্রসন্নতা তার চরিত্রের ভিন্ন একটি দিক উন্মোচিত করে।

গীতবহুল 'বেহুলা গীতাভিনয়ে' সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্র ব্যবহার আছে। গদ্যের পাশাপাশি পয়ার, ত্রিপদী ও ছড়ার ছন্দে রচিত পদ্যও সংলাপের মাধ্যম হয়েছে। এই গীতাভিনয়ের নিতান্তই সাদা-মাটা ও নিরাভরণ ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। তবে নিম্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের কথোপকথনে ভাষা চরিত্রানুগ হয়েছে। মুসলিম সারেঙ্গ বট্টুর উক্তিতে আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ চমৎকারভাবে প্রকাশিত ঃ

> দোহাই আল্লাহর মানো।
> কোরাণেরই মাথা খাই।
> খোদার কসম তৌবা,
> ঝুটা কভু কহি নাই।।
> এবে বি করনা ঝুট,
> এই দিনু নূরে হাত।...
> খোদার ফজলে সবে,
> আছে ছহি ছালামত।।
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

Dhaka University Institutional Repository

আটপৌরে হাল্‌কা চালের গার্হস্থ্য কথোপকথনের নমুনা ঃ

> ওগো। শাস্তি হয় নাই। খুড়ীমার ঝাঁটা খড়ম এখনও ভাঙ্গে নাই। ভাবছ কি বাছা। কার পাকা কলা চুরি কর্ত্তে এসেছিলে, তা জান? সে দেবদেবতা কিছু মানেনা। কার ধার ধারেনা, সেই চাঁদ সদাগরের বাগান।
>
> [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই গীতাভিনয়ে ভাষাশৈলীর তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি।

'বেহুলা গীতাভিনয়' মশাররফ হোসেনের অকিঞ্চিৎকর রচনা। কাহিনী লেখকের উদ্ভাবিত নয় বলে এতে কল্পনার বিস্তার সম্ভব হয়নি, নির্দিষ্ট ছকের ভেতরেই তাঁকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। উল্লেখযোগ্য শিল্প-বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরও নেই এখানে।

মশাররফ হোসেন যে লোকসংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন তার নিদর্শন 'বেহুলা গীতাভিনয়'। হিন্দু-লোকপুরাণের এই কাহিনী নির্বাচনে লেখকের অসাম্প্রদায়িক শিল্পদৃষ্টির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

টালা-অভিনয়

মশাররফ হোসেনের 'টালা-অভিনয়' প্রহসনটি শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত মাসিক 'হাফেজ' পত্রিকার ১৮৯৭ সালের মার্চ-এপ্রিল এবং মে-জুন দুটি যুক্তসংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 'টালা-অভিনয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাব আছে। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে (১৩০৬/১৮৯৯) সংযোজিত মশাররফের গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'টালা-অভিনয়ে'র উল্লেখ মেলে। অবশ্য পাদটীকায় মন্তব্য করা হয়েছে, " কোন কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হয় নাই। পত্র লিখিলে মূল্য ও বিবরণ জানিতে পারিবেন।" এই প্রহসনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে।[১৫৬]

মীরের অনেক রচনাতেই সমাজসচেতনতার পরিচয় আছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশকেই তিনি সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। 'টালা-অভিনয়' সমকালীন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রহসন।[১৫৭] পত্রিকায় প্রহসনের শেষ কিস্তিতে 'লেখকের বিদায়' শীর্ষক শিরোনামের 'বিজ্ঞাপনে' মশাররফ জানিয়েছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> যে বৎসর পড়িয়াছে, তাহাতে আমার ন্যায় বহুপারিবারিক লোকের একস্থানে টেঁকসই হইয়া ঠিকভাবে থাকা সহজ নহে। বাধ্য হইয়া কলিকাতা যাওয়া আবশ্যক হইল। যে সকল কথা শুনা যাইতেছে, প্রতিদিন খবর আসিতেছে, তাহাতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া আর যাইতে ইচ্ছা হইলনা। ... প্রিয় সু-হৃদ এন, বি, এস, রেলওয়ের কোন মুসলমান স্টেশন মাষ্টার উপদেশ দিলেন — এ সময় যাওয়া উচিত নহে। ... মনে যাহাই থাকুক, আর অগ্রসর হইলামনা। সাহসেও কুলাইলনা। ঐখানে থাকিয়া কল্পনাচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই কলম সহায় কালীতে আঁকিয়া সাধারণের সুমুখে ধরেছি। লিখক স্বচক্ষে কিছুই দেখে নাই। পরস্পর শুনা, শক্তির চালনা আর মনের কল্পনা এই তিন যোগে যাহা জমিয়াছে, তাহাই আঁকিয়া মনের ভাব তুলিতে লিখিয়া ও তুলিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি। যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কল্পনার অভিনয়ের সহিত প্রত্যক্ষ অভিনয় একবার মিল করিয়া সুবিচার করিবেন। ইহাই প্রার্থনা। [১৫৮]

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এই ঘটনার মূল উপজীব্য।[১৫৯] আদালতের ডিক্রী পাওয়ার পর কলিকাতার টালা-অঞ্চলে একটি জমির দখল নিতে গেলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। জমিটি ছিল কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার জমিদার মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৩১-১৯০৮)। এই জমির উপর স্থানীয় মুসলমানেরা একটি চালাঘর নির্মাণ করে তা মসজিদ হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু আদালতের রায়ে তাদের এই দাবী টেকে না। আদালতের সাহায্যে মহারাজার লোকজন দখল নিতে গেলে ১৮৯৭ সালের ৩০ জুন প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এর জের পরদিন অর্থাৎ ১ জুলাই পর্যন্ত চলে। সরকারী হিসেব মতে দাঙ্গা ও পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত ও প্রায় ২০ জন আহত হয়। অবশ্য নিহত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা এরচেয়ে বেশী ছিলো বলেই অনুমান। পুলিশ-পক্ষে কেউ নিহত না হলেও অফিসার ও সেপাই মিলিয়ে ৩৪ জন আহত হয়। এই হাঙ্গামা কলিকাতায় বিশেষ ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের ৮৭ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে এরমধ্যে ৮১ জনের শাস্তি হয়। দাঙ্গা প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুরু হলেও, শেষপর্যন্ত তা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল কলিকাতাবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যেও। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আইনরক্ষাকারী সংস্থা দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ায় এই বিবাদ কিছুটা ইংরেজ বনাম মুলসমানে রূপ নেয়।

টালা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতার কতিপয় প্রভাবশালী মুসলিম নেতা এইমর্মে এক প্রচারপত্র (ফতোয়া) প্রকাশ করেন যে, বিরোধীয় চালাঘরটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ হিসেবে গণ্য হতে পারেনা। কেননা মসজিদ বলে কথিত ঘরটি যে-জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দ এই হাঙ্গামার নিন্দা করে তাঁদের ফতোয়ায় মন্তব্য করেন, অন্যের জমির উপর কেউ মসজিদ তৈরী করতে পারে না, যে-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ নয় তার উপরে মসজিদ নির্মাণ করা যায় না এবং কোনো জমির মালিক যদি অনুমতি না দেয় তবে তার জমির ওপরে জুম্‌আর নামাজ আদায় জায়েজ নয়। নেতৃবৃন্দের এই প্রচারপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত হলেও এর পেছনে সম্ভবত বৃটিশ সরকারের প্রেরণাও অনুপস্থিত ছিলোনা।

টালা-হাঙ্গামার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের দায়িত্বই ছিলো বেশী। ঘটনাপ্রবাহ এবং নেতৃবৃন্দের প্রচারপত্রও এই ধারণা সমর্থন করে। টালা-ঘটনায় মশাররফ হোসেন বিশেষ বিচারবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। এই ঘটনায় স্বজাতি-স্বধর্মীদের প্রতি আবেগবশত কোনো অন্যায় সমর্থন ও সহানুভূতি তিনি দেখাতে চাননি। বরঞ্চ ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। সমকালে আরো দু-একজন শিক্ষিত মুসলমান এই ঘটনাটির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। যেমন 'কোহিনুর' পত্রিকায় 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের চর্চাহীনতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডাঃ মহম্মদ মীর আলী মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> সাহিত্যালোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত ও হিতাহিতজ্ঞানের বিকাশ হয়। মুসলমানগণের কাণ্ডজ্ঞানহীন গোঁড়ামি সময় সময় উগ্রমূর্তি ধারণ করতঃ 'টালা-হাঙ্গামার' ন্যায় যেরূপ বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকে, তাহাও তিরোহিত হইতে পারে।[১৬০]

টালা-ঘটনায় মশাররফ যে কাণ্ডজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার পেছনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিও হয়তো কোনও ভাবে তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। মীর নেতৃবৃন্দের দ্বারা উদ্বুদ্ধ বা অনুরুদ্ধ হয়ে, অথবা অন্য কোনো প্রেরণাতেই এই প্রহসন রচনা করুন না কেন, এর পেছনেও প্রচ্ছন্ন ছিলো রাজভক্তি।

মশাররফ হোসেনের অন্তরে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি-ইচ্ছা ও অসাম্প্রদায়িক-চেতনার শেষ স্বাক্ষর এই 'টালা-অভিনয়' প্রহসনটি। 'টালা-অভিনয়' মীরের মানস-পরিবর্তনের অন্তিম পর্যায়ের রচনা। এর কিছুকাল পরেই 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে (১৮৯৯) এই পরিবর্তন স্পষ্ট রূপ নিয়ে উপস্থিত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে মৌলবী ও পুরোহিতদের প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা যে আন্তরিক ছিলোনা শুধু তাই নয়, তাদের চক্রান্ত ও উস্কানিই এই দাঙ্গার মূল কারণ, প্রহসনে এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে।[১৬১] এখানে হিন্দু-মুসলিম মিলনের কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টাকে মশাররফ বিদ্রূপ করেছেন। মৌলবী ও বিদ্যারত্ন যে উভয়েই কপট, তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে আন্তরিক নয়, মীর তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ বা রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে লক্ষনীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

টালা-অঞ্চলের একখণ্ড জমির দখল নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে যে-দাঙ্গা হয়, সে ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'টালা-অভিনয়' রচিত। মশাররফ জানতেন, জমির দখল প্রতিষ্ঠার জন্য কথিত চালাঘরটিকে মসজিদ প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। তিনি আরো লক্ষ্য করেছিলেন, সমাজের উচ্চবিত্তের খাঁ সাহেব—রাজাসাহেবরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হা-অন্ন দরিদ্র নীচুতলার মানুষকে ধর্মের নামে উত্তেজিত করে দাঙ্গা বাধায়।

'টালা-অভিনয়', এই প্রহসনের নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমানের প্রতি মশাররফের সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে উচ্চবিত্তের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন বিরূপতাও চোখ এড়ায় না। ' কারা খাটে, কারা খাটে শোয়'- এই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব অসমাধ্য থাকলেও তবু তা উত্থাপিত হয়েছে। 'সভ্যতার পিলসুজ' এই ভদ্রেতর শ্রমজীবী মানুষ। একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি বেশ জোরালোভাবেই বলিয়েছেন ঃ

> ভদ্রলোক নিয়েই তোমার মরণ। আমরা খাটী, আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করি, ধান জন্মাই, সুযোগ সুবিধা করে দেই। সাহেবরা বাড়ী বসে থেকেই, ছায়ায় বিছানো পেতেই ভদ্রলোক। আমরা জোগায়ে না দিলে, আমরা ছোটলোক বলে রাজী না হলে, তাঁরা ভদ্রলোক হবেন কোথা হতে? তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে কে?

মীরের মানসিক-গঠন, কাল ও শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই প্রহসনের দুয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি যে সহানুভূতির ইঙ্গিত মেলে তার মূল্য কম নয়।

প্রহসনের প্রথাগত উদ্দেশ্য সমাজের কোনো কুরীতি, অনাচার বা অসঙ্গতি মোচনের জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে তা উপস্থাপিত করা। এই উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই ব্যঙ্গের অপরিহার্য উপস্থিতি। ইতোপূর্বে মশাররফ বারবণিতা-গমন ও সুরাসক্তির সমস্যা নিয়ে 'এর উপায় কি?' (১৮৭৫) প্রহসন রচনা করেন। 'এর উপায় কি?'র তুলনায় প্রহসন হিসেবে 'টালা-অভিনয়' শিল্পমূল্যে বিশিষ্ট নয়।

' টালা-অভিনয়ে'র এক-দুই স্থানে কিছু ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যঙ্গের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন, আমাদের সমাজে ধর্মশাস্ত্র পাঠ বিশেষ পুণ্যের কাজ হিসেবে স্বীকৃত। কেবল সেই লোভেই অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ ও ধারণাহীন হয়ে এর চর্চা হয়ে থাকে। এই শূন্যগর্ভ প্রচেষ্টা সম্পর্কে লেখকের ব্যঙ্গোক্তি ঃ

> দোয়াদরুদ কিছুই নহে, সেই প্রকার কথার উচ্চারণ মাত্র। অর্থসংযোগ কিছুই নাই। তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসের সহিত তাহাই পড়িতে লাগিলেন।

থানা-পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণা তা-ও প্রকাশ পেয়েছে এইখানে। যেমন, 'মৌলবী বেশধারী

Dhaka University Institutional Repository

সয়তানের চেলা,' মানব –জনমে অপরাধসূত্রে যার সঙ্গে থানা-পুলিশের ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সে সাগ্রহে কর্মভাগে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছে ঃ

> আমি ভাই থানার লোকজনকে ছাড়তে পারবো না। চিরকাল তারা আমাদের, আমরা তাদের। প্রাণ গেলেও সে বন্ধু বান্ধবদিগকে আমার দল ছাড়তে পারবেনা। আমি সেই দিকেই গড়লেম।

মাম্‌দো, লেল্‌লু, ঘোঁঘোঁ — এই নামগুলোও বেশ কৌতুককর। 'ইবলিশ্‌ মুন্সীর মন্ত্রের ফল', 'বেলেল্লা মৌলবীর ফতুয়া' বা 'সপত্নী পুত্র নহি'— এই ধরনের টুক্‌রো মন্তব্য হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

এই প্রহসনের গঠনরীতি কোনো প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেনি। অঙ্ক ও দৃশ্যভাগও সংজ্ঞাসূত্র বহির্ভূত। মশাররফের অন্য নাটক-প্রহসনেও অঙ্ক বা দৃশ্যভাগ সম্পর্কে সচেতনতার কিছু অভাব লক্ষ্য করা যায়।

মশাররফ হোসেনের এই প্রহসনটির চরিত্রগুলো পূর্ণাবয়ব নয়, ছায়ামাত্র এবং উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই তাদের আবির্ভাব। মোটামুটি তিন শ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঃ ক. মৌলবী, বিদ্যারত্ন, শয়তান-সভার ভূতপ্রেত চেলা-চামুণ্ডা, খ. নজু-ফজু-কালুর মতো খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণীর মানুষ, গ. খাঁ সাহেবের মতো উদ্দেশ্যতাড়িত কৌশলী মানুষ, আদালতের নাজীর বাবু ইত্যাদি। যেহেতু প্রহসনটির পরিসর অতি সংক্ষিপ্ত, তাই কোনো চরিত্রেরই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেনি। এক-দুইজনকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে চিনে নেওয়া যায়। মৌলবী বা বিদ্যারত্ন উভয়ই ধান্ধাবাজ-ধড়িবাজ, স্বল্প পরিসরে সেই পরিচয় গুপ্ত থাকেনি। আপন উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ত শয়তান-সভার ভূতপ্রেত চেলাচামুণ্ডারা সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বেশ উজ্জ্বল। তবে নজু-ফজু-কালুর মতো নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলো সামান্য রঙের রেখায় হলেও বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। খাঁ সাহেবের সংলাপে বোঝা যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কৌশল অবলম্বনে সে সিদ্ধহস্ত। তবুও চরিত্রগুলো পূর্ণ নয়, রেখা-ইঙ্গিত মাত্র।

ভাষা-ভঙ্গি অর্থাৎ সংলাপ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিশ্র-রীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের গুরুচণ্ডালী প্রয়োগও আছে এখানে। বানান অশুদ্ধির দৃষ্টান্তও প্রচুর। সবক্ষেত্রেই একে মুদ্রণপ্রমাদ বলে সিদ্ধান্ত করবার কারণ নেই। যেমন, এস্তে (আস্তে), কাঁদে (কাঁধে) , স্বান্ত্রি (সান্ত্রী), ঘুনিয়ে (ঘণিয়ে), রিষীবর (ঋষিবর), দাঢ়ী (দাড়ী), সুধু (শুধু), বাঁদে (বাঁধে), শুপথ (সুপথ), ইত্যাদি। 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহে' (অর্থাৎ, আল্লাহর শক্তির উপর আর কোনো শক্তি নেই)— হাদীসের এই উক্তিটির অশুদ্ধ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে প্রহসনে, "লা হওল বেলা, কুয়াত বেল্লাহে"। মাঝে-মধ্যে আরবী-উর্দু শব্দের সুন্দর প্রয়োগ সরসতা এনেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ হোসেনের 'টালা-অভিনয়' প্রহসনটি শিল্প-গৌরবে নয়, সমকালীন একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিশ্বস্ত রূপায়ণের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রহসনটি বক্তব্যে যতখানি মূল্যবহন করে, শিল্পকর্মে ততখানি সমৃদ্ধ নয়। তাঁর পূর্বের প্রহসন 'এর উপায় কি?'-র সঙ্গে তুলনা করলেও এই রচনাটির দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চোখে পড়বে। সমকালের একটি বিশেষ ঘটনাকে মীর শৈল্পিক-নির্লিপ্তিতে বিচার করে তার নিরপেক্ষ সাহিত্যায়নের চেষ্টা করেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাই বলা যায়, সাহিত্যিক উৎকর্ষে নয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিরিখেই এর যথার্থ মূল্য।

কবিতা-সঙ্গীত-পদ্য

গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু

'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু' মশাররফ হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ক্ষুদ্রায়তন এই পদ্য-পুস্তিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮। 'গৌরী-সেতু'র প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৮৭৩।

প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে গ্রন্থ-রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়ঃ

> পূর্ব্বদেশগামী রেলওয়ে কোম্পানী গৌরী নদীতে যে আশ্চর্য্য সেতুবন্ধন করিয়াছেন তাহা বোধহয় পৃথিবীর সভ্য সমাজের অবিদিত নাই। আমি একদা কৌতুকচ্ছলে প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত মীর মসাঃরফ্ হুসেনকে গোরাই ব্রিজ সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে অনুরোধ করায় তাহার পরদিবসই এই গোরাই ব্রিজ লিখিয়া আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। যদিও বিষয় ভাল নয় বলিয়া বন্ধুবর জনসমাজে প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমি নিতান্তই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এবং বিশেষ কোন সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশে এই গোরাই ব্রিজ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

মশাররফের জন্মগ্রাম লাহিনীপাড়ার সন্নিকটে গোরাই বা গৌরীনদীর উপর সেতু-নির্মাণের বিচিত্র বিবরণই এই কাব্য-পুস্তিকার উপজীব্য। সমসাময়িক ঘটনা যে মশারফের অনেক রচনারই উৎস, এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটি তারই পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, কোনো দিক দিয়েই 'গৌরী-সেতু' উল্লেখযোগ্য রচনা নয়। বিষয় অতি সাধারণ এবং প্রকরণগত দিকও দুর্বল ও আটপৌরে। পয়ার ছন্দের পুরাতন চালে রচিত 'গৌরী সেতু' কাব্যে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সহজেই আবিষ্কার করা যায়।[১৬২] ভারতচন্দ্রের শব্দ-ভাষা-অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য মশাররফে প্রতিফলিত। যেমন ভারতচন্দ্রে আছে ঃ

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।

[অন্নদামঙ্গল কাব্য]

মশাররফের 'গৌরী সেতু'তে পাওয়া যায় ঃ

ঢাকায় চলিয়া গেল ঢাকাই বাঙ্গাল।
শিলেটে শিলটী যায় বাঁধিয়া জাঙ্গাল।।

এখানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আরো স্পষ্ট। 'ইংরেজী নববর্ষ' কবিতায় বিলাতী রমণী প্রসঙ্গে গুপ্তকবি বলেছেন ঃ

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।।

'গৌরী সেতু'তে শেতাঙ্গিনীর বর্ণনায় মশাররফ বলেছেন ঃ

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী" কটা কটা কেশ।
মুখে গন্ধ, সব মন্দ, সুধু ভাল বেশ।

অনুপ্রাস-বাহুল্যও ঈশ্বর গুপ্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন ঃ ৯

কেবা কার ভালবাসা কেবা কার নারী।
অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ দেখে চিনিবারে নারি।।

এর সঙ্গে তুলনীয় গুপ্তকবির এই পংক্তিটি ঃ

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা।

এই বৈশিষ্ট্যহীন ক্ষুদ্র পদ্যপুস্তকে লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি ও বর্ণনানৈপুণ্য কেবল উল্লেখ করার মতো। যেমন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিবি সুরা ঢালি গেলাসেতে করি,
দিতেছে সাহেব মুখে আ মরি আ মরি।
বিড়ালাক্ষী শাদামুখী ধবল বসন।
বাতির আলোতে আরো উজ্জ্বল বরণ।
বুক উচ্চ কুচগিরি অর্দ্ধ আবরণ।
কে বলিবে আছে তার উপরে বসন?
শান্তিপুরে ডুরে পরা আমাদের মেয়ে।
শতগুণে ভাল তারা বিবিদের চেয়ে।।

'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' পদ্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (পৌষ ১২৮০)। এই নাতিদীর্ঘ সমালোচনায় 'গৌরী সেতু' সম্বন্ধে মাত্র তিনটি শব্দের এক হ্রস্বতম বাক্যে মন্তব্য করা হয়েছে, "পদ্য মন্দ নহে"।[১৬৩] আলোচনার সর্বাংশ জুড়ে আছে মশাররফের ভাষানৈপুণ্যের সর্বোচ্চ প্রশংসা এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-প্রচেষ্টার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের বাঙলা ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা। মশাররফ যে এ-বিষয়ে পথিকৃৎ এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব সেই উল্লেখও করেছেন সমালোচক।[১৬৪]

একালের একজন সমালোচক 'গৌরী সেতু' সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন-মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> রচনা মধ্যম শ্রেণীর। বক্তব্যও সার্বজনীন নয়। তবে চাক্ষুষ বর্ণনাটি মন্দ হয়নি। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তাঁর মতামত বেশ আধুনিক ও কৌতূহলোদ্দীপক, কোথাও কোথাও ঝালমস্‌লাদার মুখরোচক।[১৬৫]

প্রকাশকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, বন্ধুর অনুরোধে মশাররফ একদিনে এই ক্ষুদ্রায়তন পদ্যটি রচনা করেন। 'বিষয় ভাল নয়' বিবেচনা করে লেখক এর প্রকাশ-বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরিকল্পনাহীন অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর বিষয় অবলম্বনে রচিত পদ্যের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মশাররফ সচেতন ছিলেন। আর মশাররফ ছিলেন মূলত গদ্যশিল্পী। পদ্যকার হিসেবে তাঁর সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয়। তাই 'গৌরী সেতু'-সহ তাঁর অন্যান্য পদ্যরচনা বিষয় বা প্রকরণগত দিক দিয়ে শিল্প-সফল রচনা হয়ে উঠতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত লহরী

কালক্রম-বিচারে 'সঙ্গীত লহরী' মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় পদ্যগ্রন্থ[১৬৬] এবং প্রকাশিত সপ্তম গ্রন্থ। 'সঙ্গীত লহরী'র প্রকাশকাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (১৮৮৭ খৃস্টাব্দ)। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবের মোট ৯১টি গান সংকলিত হয়েছে। গানগুলি কোন্ সুর ও তালে গীত হবে প্রতিটি গানের শীর্ষে তার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে সংকলিত বেশকিছু গান মশাররফের কোনো কোনো গ্রন্থে, বিশেষ করে নাটক ও প্রহসনে, ব্যবহৃত হয়েছে। এ-থেকে ধারণা করা যায়, তাঁর সঙ্গীতরচনার প্রাথমিক প্রয়োজন সম্ভবত নাট্যরচনার জন্যই অনুভূত হয়েছিল। পরে কাঙাল হরিনাথের প্রেরণায় তিনি কিছু বাউলগানও রচনা করেন।

সঙ্গীতে মশাররফের যে বিশেষ আগ্রহ ও অধিকার ছিলো নানাসূত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিকতা ও উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁর মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ জন্মে। মশাররফের পিতা এবং পদমদীর নবাব মীর মহম্মদ আলী গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। পিতার সঙ্গীতচর্চার স্মৃতি এবং নবাব সাহেবের সান্নিধ্য মশাররফকে এ-বিষয়ে অনুরাগী ও অভিজ্ঞ করে তোলে। মীর-পত্নী বিবি কুলসুমও সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন এবং 'সঙ্গীত লহরী'র গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিলো।[১৬৭]

'সঙ্গীত লহরী'র গানগুলিকে বিষয়-বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায় ঃ

ক. প্রেম-বিরহমূলক গীতিগুচ্ছ
খ. স্বাদেশিকতায় প্রোজ্জ্বল জাতীয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত
গ. হাস্যরসাত্মক, রঙ্গব্যঙ্গমূলক গীতিগুচ্ছ
ঘ. রাজপ্রীতিজাত প্রশস্তি-গীতি
ঙ. অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ বাউলপদ
চ. মিশ্রভাবের গান

এরমধ্যে প্রেম-বিরহমূলক গীতিগুচ্ছের সংখ্যাই অধিক। সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় ৬৪টি। বিচ্ছেদজনিত হাহাকারে পূর্ণ এই ধরনের কিছু গানে মশাররফের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের কয়েকটি গান খণ্ডিত ও হ্রস্ব, পক্ষান্তরে কয়েকটি গান দীর্ঘ ও পদ্যধর্মী।

এখানে সংকলিত জাতীয় উদ্দীপনামূলক কয়েকটি গানে মশাররফের স্বদেশচিন্তার আভাস প্রতিফলিত। অবশ্য পাশাপাশি রাজপ্রীতি ও রাজপ্রশস্তির প্রবণতাও লক্ষ্যযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

'সঙ্গীত লহরী'র কোনো কোনো গানে রঙ্গ-ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩, ৫৩, ৬০, ৬২ ও ৬৪ সংখ্যক গান এই পর্যায়ভুক্ত। ৬৪ সংখ্যক গানে হাস্যরসের বেশ খোরাক আছে। নায়িকার প্রেমাস্পদ হাকিম হওয়ায় তার মধ্যে যে নির্ভয়ভাব ও গৌরববোধ জেগেছে, তারই ফলে তার মুখে শোনা যায়, 'আর আমি ভয় করি কারে এখন আমার ক্ষমতা অপার'। অবশ্য মশাররফের হাস্যরস সর্বত্রই যে নির্মল ও সূক্ষ্ম, তা নয়। স্থূলতা ও রুচিবিকারের পরিচয়ও দু-একটি গানে আছে।

মশাররফের বাউলাঙ্গের পদগুলোই 'সঙ্গীত লহরী'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাউলপদকর্তার অনুকরণে 'মশা' ভণিতাযুক্ত পনেরোটি বাউলাঙ্গের পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বাঙলাসাহিত্যে শখের বাউলগান রচনার দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে কাঙাল হরিনাথ এবং তার পরেও এই ধারা প্রবহমান ছিলো। এই ধারায় মশাররফ হোসেনের একটি উচ্চ-আসন আছে। মশাররফ বাউলগান রচনার প্রেরণা লাভ করেন তাঁর সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের নিকট থেকে।[১৬৮]

মশাররফ কেমন করে বাউলগান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন, তার একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। কাঙাল-শিষ্য রায়বাহাদুর জলধর সেন সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

> আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর মশার্‌রফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙ্গালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরচাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙ্গাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলের লোকেরা সেই রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন ; তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না।" মশার্‌রফ বলিলেন "সে কি রকম কথা! তা কি হয়?" কাঙ্গাল বলিলেন "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও, তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" মশার্‌রফ হাসিয়া বলিলেন "আমি ত গান করিতে জানিনা।" কাঙ্গাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জাননা বটে কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশার্‌রফ বলিলেন "তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিয়া যাইতেছি!" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন।[১৬৯]

মশাররফ তৎক্ষণাৎ রচনা করলেন, 'রবেনা দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে'— এই গানটি। এই প্রক্রিয়ায় দলভুক্ত হলেন তিনি। এইভাবেই বাউলগান রচনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ হোসেনের বাউলগানের মূল সুর জীবনসায়াহ্নে পারাপারের ব্যাকুলতা। একটি আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনা গানগুলোর উপর ছায়া ফেলেছে। মর্মকথা হলো, দিন ফুরিয়ে এসেছে— পারের ডাক শোনা যাচ্ছে, অথচ মন এখনো রঙ্গরসে কাল কাটাতে চায়, পারের ভাবনা ভাবেনা। এই অনিত্যতার সংসারে কেউ কারো নয়, নশ্বর দেহ গত হলে সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

বাউলচেতনার ভাবপরিমণ্ডলে সিক্ত 'সঙ্গীত লহরী'র বাউলাঙ্গের গানগুলো। জীবন-নদীর পারে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এই গানটিতে ঃ

মনে কি আছে রে মন, হবে কেমন,
যেদিন হতে হবে পার।
সে যে অকূল পাথার, নাই পারাপার,
সাধ্য বা কার, হয়রে পার।
বিনে তার কৃপা তরী, সুকাণ্ডারী,
নিয়োজিত কর্ণধার।

[৭৮ সংখ্যক গান]

৮১ সংখ্যক গানটি বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিমায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এখানে অনিত্যতার সংসারের শেষ পরিণাম দির্দোশিত হয়েছে ঃ

রবেনা দিন চিরদিন,
সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার, নামটি রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ,
সোনার অঙ্গ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।।

বাউলসম্প্রদায়ের মতো মশাররফও জাত-ধর্ম সম্পর্কে উদার মতের পরিচয় দিয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর আন্তরিক প্রতিবেদন ঃ

মিছে ভাই জাতির বিচার, আচার ব্যভার,
মিছেরে এই দুনিয়াদারী।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা,

দেখ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ইসা,
নানক, নিতাই জটাধারী।
অরে ভাই অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা,
মোহাম্মদ পয়দা তাঁরি।।

তাই,

অরে নাই ভেদাভেদ, বর্ণবিভেদ,
কিছু প্রভেদ, কাছে তারি
মশা কয়, ধোকায় পড়ে বোঝা হয়ে
করি আমরা মারামারি।।

[৮৫ সংখ্যক গান]

স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মব্যবসায়ীর প্রকৃত স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে একটি গানে (৯০ সংখ্যক গান)।

'সঙ্গীত লহরী'র বাউলাঙ্গের কোনো কোনো জনপ্রিয় পদ অন্য পদকর্তার নামে প্রচারিত হতে দেখা যায়। মশাররফের ৮১ সংখ্যক গানটি কাঙাল হরিনাথের নামেও প্রচারিত হয়েছে।[১৭০]

'সঙ্গীত লহরী' সম্পর্কে ১৮৮৭ সালের বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের পরিশিষ্টে সংযোজিত সালতামামী প্রতিবেদনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

> Whatever Mir Masharruf writes deserves attention .... the collection of his short poetical pieces may be ranked in point of style and language with those of the best Bengali poets of the day.[১৭১]

অবশ্য সমাদর বা প্রশংসার পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াজাত নিন্দা-সমালোচনার সাক্ষাৎও মেলে। 'সুধাকর' পত্রিকায় (৯ চৈত্র ১২৯৬) 'মীর সাহেবের ধর্ম্মবিশ্বাস' নামীয় এক প্রবন্ধে 'সঙ্গীত লহরী'র ৮ সংখ্যক গানের প্রসঙ্গে মশাররফকে তীব্র ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করা হয় ঃ

> আহা। মির সাহেবের কি উদার মত। কি উদার ভাব। ইসলাম ধর্ম্মে কি অটল বিশ্বাস। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ইসা, মহম্মদ (দরূদ), অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ কিম্বা বর্ণবিভেদ কিছুই নাই। আরও মোটা কথা এই যে, শুধু মানুষের নিকট নহে, স্বয়ং

Dhaka University Institutional Repository

> আল্লাহতালার নিকটই ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। (নাউজুবেল্লাহে মেনহা)। প্রকৃত ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাসী মুসলমানের হৃদয় হইতে এরূপ ভয়ংকর কথা বাহির হইতে পারে কি?[১৭২]

'সঙ্গীত লহরী'র বাউলাঙ্গের পদে ব্যবহৃত 'মশা' ভণিতা সম্পর্কেও 'সুধাকরে' ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে বলা হয় ঃ

> পাঠক! এ মানুষ বা গবাদি দংশনকারী ছোটখাট মশা নয়; ইনি ইসলামধর্ম্মে আঘাতকারী দ্বিহস্ত দ্বিপদবিশিষ্ট মনুষ্যরূপ বৃহৎ মশা ওরফে মীর মশাররফ হোসেন।[১৭৩]

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গদ্যশিল্পী মশাররফের কাব্যচর্চায় কবি-প্রতিভা কিংবা শিল্পনৈপুণ্যের উল্লেখযোগ্য কোনো স্বাক্ষর নেই। ভাব-ভাষা-ভাবনায় মীরের কাব্য-কবিতা বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক। এ-ক্ষেত্রে মশাররফের অন্যান্য পদ্য-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 'সঙ্গীত লহরী'র একটি স্বতন্ত্র মূল্য আবিষ্কার করা যায়। ধর্মীয় ভাবনার গণ্ডিবদ্ধতা থেকে এটি মুক্ত। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত গানগুলিতে কিছুটা ভাব-বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়। সামগ্রিক বিচারে বলা চলে, মশাররফের পদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই 'সঙ্গীত লহরী' গীতিগুচ্ছ পুস্তক।[১৭৪]

মৌলুদ শরীফ

ধর্মীয় উদ্দেশ্যসাধনে গদ্যে-পদ্যে রচিত মশাররফ হোসেনের 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ২ নভেম্বর ১৮৯৪। এই সমাদৃত গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩১৯ সালে। লেখকের 'ভূমিকা'য় 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট, আবশ্যকতা ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ সংস্করণে লেখকের পুত্রদের বক্তব্য থেকে জানা যায় ঃ

> খোদা ও রসুলের প্রতি কেবলাগাহ্ মরহুম পরম বিশ্বাসী, আর খোল্‌ফায়ে রাশেদীন ও আছহাব (রাঃ) মণ্ডলী এবং আহ্‌লে বয়েতের প্রতি তিনি অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। কেবলাগাহ্ সাহেবের অধিকাংশ গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই মৌলুদ শরীফ তন্মধ্যে অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর গুণকীর্তনই মৌলুদ শরীফের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকর্তা তাই বলেন ঃ

> এই মহাপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত প্রত্যেক মুসলমানের জ্ঞাত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সময় ও অবসরমত পবিত্র মিলাদ শরীফের আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।
>
> [ভূমিকা]

আলোচ্য গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে হাম্দ, নাত, রসুলের জন্মকথা, মেয়ারাজ কাহিনী, হজরত বেলালের অসামান্য রসুলপ্রীতির প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। মূলত পদ্যে রসুল-প্রশস্তি হলেও মাঝে-মধ্যে গদ্যে বিষয়ের ধারাভাষ্য রচিত হয়েছে।

প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদীতেই 'মৌলুদ শরীফ' রচিত। ধর্মীয় উদ্দেশ্য-সংলগ্ন গ্রন্থখানি অত্যন্ত সাদা-মাটা ভাব ও ভাষায় রচিত। তবুও এই গতানুগতিক রচনায় উল্লেখ করার মতো কিছু পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

ললাটে লিখেছ যাহা, খণ্ডিবে না আর তাহা,
তবু কাঁদি মনের আবেগে।

[হাম্দ]

রসুল-বন্দনার কিছু অংশ ঃ

কোথায় আরবভূমি কোথা বঙ্গ কোথা তুমি,
নত শিরে নমি আমি ; মোহাম্মদ এয়া রসুলোল্লাহ।

কিংবা,

সে মালা শোভে যে গলে,
ভাগ্যবান সে মানবকুলে,
তোমাতে যার ভরসা-আশা।
সেই খোদাতালা ভালবাসা।।
এয়া নবী সালাম আলায়কা—

আবার,

আঁখিতে আগুনপোরা,—
মুখেতেও বিষ ভরা
নিঃশ্বাসেতে যেন ঝড় বয়।।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠাবান ভক্তের অনুভূতি নিয়ে মশাররফ 'মৌলুদ শরীফ' রচনা করেন। হজরতের জীবনকাহিনী কিংবা বেহেশ্‌ত-দোজখের বর্ণনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থূল রুচি ও গ্রাম্যতার পরিচয় মেলে। এখানে পুঁথিসাহিত্যের প্রভাব স্পষ্টই প্রতিফলিত। বেহেশ্‌তের সুখভোগের বর্ণনায় মশাররফ বলেছেন ঃ

অপূর্ব্ব যুবতী নারী,—
দাঁড়াইবে সারি সারি,—
মণিময় রত্ন আভরণে।
সাজিয়ে অপূর্ব্ব সাজে,
বীণা বীণ হাতে বাজে—
আর বাজে ঘুঙ্গুর চরণে।।

কিংবা,

'শারাবন তহুরা' পোরা—
যার ইচ্ছা পিয়ে তারা,—
ইচ্ছামাত্র তৃপ্ত হয় প্রাণ।।

দোজখের বর্ণনায় লেখক রুচির কিংবা শিল্পের পরিচয় দেননি ঃ

হয়েছেন কুক্কুরী,
অই যে সকল নারী,
জাঁহাবাজ ছিলেন তাহারা।

ধর্মপ্রেরণাশ্রিত এই গ্রন্থ স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের নিকটে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ এই ধারণাকে সমর্থন করে। একজন সমালোচক উল্লেখ করেছেন, 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ বাঙলা গজল এবং মশাররফ হোসেনই বাঙলা গজলের জনক।[১৭৫] মশাররফের গজল অনেকের প্রেরণা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ইসলাম-প্রচারক মুন্‌শী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন তাঁর 'আসল বাঙ্গালা গজল' পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ

> ১৩০৭ সালের ২৬শে বৈশাখ তারিখে, কুষ্টিয়ার নিকটস্থ ছেউড়িয়ার সভায় সুবিখ্যাত লেখক জনাব মীর মশাররফ হোসেন মরহুম সাহেব তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন। মীর সাহেবের নিকটে বাঙ্গালা গজল শুনিয়া বাঙ্গালা গজল লিখিতে আমার ও বাগ্মীবর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা মরহুমের ইচ্ছা হয়। পরে ঐ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পোড়াদহের নিকটে নফরকান্দি গ্রামে, চিন্তা বিবির বাটীর সভায় প্রথম আমরা উভয়ে মিলিয়া গজল লিখি।[১৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

তবে সর্বত্রই যে 'মৌলুদ শরীফ' সমাদৃত হয়েছিল, এমন নয়। 'নবনূর' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩১১) গ্রন্থটির একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে বিশেষত ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আপত্তি উত্থাপন করে লেখকের প্রতি কটাক্ষ করা হয়। সমালোচক বলেছেন ঃ

> মৌলুদের বৃত্তান্ত মুসলমানের অবশ্য জ্ঞাতব্য। সকলের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে, বুঝিলাম। কিন্তু অনুবাদে যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারিলামনা। ইহার ভাষা অদ্ভুত খিচুড়ীবিশেষ। তাঁহারা বলিবেন সাধারণ মুসলমানের বোধ সৌকর্য্যানুরোধেই এরূপ করা হইয়াছে, কিন্তু যাহারা বসুন্ধরা, সীমন্তিনী, সসাগরা ধরা, পনুরের গিরি উল্লঙ্ঘন আশা, জলধি কল্লোল, অন্ধের বিধু-দর্শন ইত্যাদি বিশুদ্ধ আভিধানিক শব্দরাজি গলাধঃ করিতে পারে, তাহাদের জন্য এমন অদ্ভুত ভাষার ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারিত, মনে হয়। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা প্রবীণ গ্রন্থকার অনেক ভাল বুঝেন, সন্দেহ নাই।[১৭৭]

মশাররফ 'অসঙ্কোচে বাঙ্গালা ব্যাকরণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন' করেছেন এই অভিযোগের পাশাপাশি মোহাম্মদ (সঃ) 'প্রভু ও মহাপ্রভু শব্দে বিশেষিত হইলে তাঁহার পবিত্র নামের মর্য্যাদা কিছু বাড়ে কি'— এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। তবে সমালোচক শেষপর্যন্ত বলেছেন, "যাহা হউক, ধর্ম্মজ্ঞান লাভে কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া এই গ্রন্থের সুপ্রচার বাঞ্ছনীয়।"[১৭৮]

বিবি খোদেজার বিবাহ

'বিবি খোদেজার বিবাহ' প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)। লেখকের 'নিবেদনে' গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায় ঃ

> মুসলমান জগতে "বিবি খোদেজার" পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ বিবি খোদেজা সমগ্র মুসলমানের জননী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন। বিবি খোদেজাই হাজরত মহাম্মদ মস্তফার মাননীয়া প্রিয় সহধর্ম্মিনী। .... সেই মহা মাননীয়া বিবি খোদেজা দেবীর বিবাহ ঘটনা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার আদিঅন্ত পাঠ করিলেই, বিবাহ সম্বন্ধের পবিত্রতা, বিচিত্রতা, পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্ত চিত্র, হাজরতের সহিষ্ণুতা, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, কর্তব্য-জ্ঞান, অবস্থানুযাই ব্যবস্থা এবং বিবি খোদেজার পতিভক্তিসহ, সর্ব্বস্ব ত্যাগ, স্বামীগতপ্রাণা অবলার হৃদয়ের বল ও একাগ্রতা বিষয়ের সপ্রমাণ সমুজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকরণগত দিক দিয়ে 'বিবি খোদেজার বিবাহ' কাহিনী-কাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত রচনা। এই কাব্যটি মোট সাতটি পরিচ্ছেদ বা 'স্তবকে' বিন্যস্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদে বিবি খোদেজার স্বপ্নদর্শন এবং সন্ন্যাসী কর্তৃক সেই স্বপ্নের রহস্যভেদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সন্ন্যাসী স্বপ্নের মর্মার্থ সম্পর্কে জানান ঃ

পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী, পবিত্র খোদেজা সতী,
সুবিখ্যাত আরব নগর।
সেই দেবী পুনঃরায়, ঈশ্বরের অভিপ্রায়,
পরিণয়সূত্রের বন্ধনে,
মুখে বাঁধা পড়িবেন, মহাসুখে রহিবেন,
প্রাণের প্রতিম স্বামী সনে।
সে স্বামী সামান্য নয়, মহাশক্তি শক্তিময়,
সমুজ্জ্বল প্রভাময় মণি,
হাশেম বংশেতে জন্ম, প্রকাশিয়ে সত্যধর্ম্ম,
জগপূজ্য হইবেন তিনি।

স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা বিবি খোদেজাকে গভীরভাবে স্পর্শ ও প্রাণিত করে।

দ্বিতীয় স্তবকে হজরতের পিতৃব্য আবু তালেব ও পিতৃস্বসা আতকা বিবির মধ্যে হজরতের বিবাহ-বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু পিতৃব্যের সাময়িক আর্থিক দৈন্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহের প্রসঙ্গটি স্থগিত থাকে এবং উপার্জনের জন্য হজরতের কর্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তৃতীয় স্তবকটিতে আছে বিবি খোদেজার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ। তাঁর এই ব্যবসা-বাণিজ্য তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি বিশ্বস্ত ও কর্মঠ একজন কার্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা নিলে তাঁর কাছে হজরতের নাম প্রস্তাব হয়। হজরতের গুণবত্তার কথা শুনে বিবি খোদেজা তাঁকে দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করেন।

চতুর্থ স্তবকে বিবি খোদেজার গৃহে হজরতের আগমন ঘটে। বিবি খোদেজা অন্তরাল থেকে সব দেখে-শুনে সন্তোষের সঙ্গে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন মোহাম্মদ (সঃ) -কে। অতঃপর হজরতের নেতৃত্বে শ্যামদেশে বাণিজ্যদল প্রেরিত হয়। গোত্রীয় আভিজাত্যের কারণে হজরতের এই চাকুরী গ্রহণ অনেকেই অনুমোদন করতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ। নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মোহাম্মদ (সঃ) বাণিজ্যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মোহাম্মদ (সঃ)-এর মাথার উপর একখণ্ড মেঘের ছায়াদান এবং তিনদিনের পথ একদিনে অতিক্রম— এইসব অলৌকিক ঘটনা ষষ্ঠ স্তবকে সংযোজিত হয়েছে। অগ্রগামী মোহাম্মদ (সঃ) মক্কায় ফিরে এসে বাণিজ্যের সাফল্যের কথা বিবি খোদেজাকে জানালে তিনি প্রীত হয়ে তাঁকে বিপুল উপঢৌকন দান করেন।

সপ্তম স্তবকে মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি অনুরক্ত বিবি খোদেজার শুভ পরিণয় সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয় ঃ

খোদেজা রাণীর যত সহচরীগণ,
বাদ্য-আদি নৃত্য-গীতে হইল মগন।
আহারান্তে যাত্রীগণ বিদায় হইয়া,
চলিলেন নিজ গৃহে আনন্দে মাতিয়া।
গুরুজন কায়মনে করি আশীর্ব্বাদ,
হজরতে রাখিয়া সবে রাণীর প্রাসাদ।
চলিয়া গেলেন সবে আপন গৃহেতে,
হাজরতের গুণগান করিতে করিতে।

পয়ার -ত্রিপদীতে রচিত এই কাহিনী-কাব্যটি শিল্পমূল্যে অতি ন্যূন। মূলত পুঁথির রুচি-অভ্যস্থ স্বল্পশিক্ষিতজনের শিল্পতৃষ্ণা নিবারণের জন্যই এই ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও প্রয়োজন অনুভব করেন মশাররফ। 'বিবি খোদেজার বিবাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক তাঁর এই ধর্মাশ্রিত রচনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাঁর এই জাতীয় সব পুস্তক সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য। মশাররফ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, 'সমাজের চৌদ্দ আনা লোকে'র জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। আর যেহেতু 'মুসলমানসমাজে পদ্যের বড়ই আদর', তাই তিনি পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদীতেই ধর্মাশ্রিত এইসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিক্ষিত-রুচিশীল পাঠকের কাছে যে 'বিবি খোদেজার বিবাহ' সমাদৃত হবেনা সে-সম্পর্কে মশাররফ যথার্থই অনুমান করেছিলেন, "…. নব্যদলে নবীন লিখক ভ্রাতাগণ মধ্যে বিবি খোদেজার বিবাহ আদরণীয় হইবে না ইহা লিখকের মনে ধ্রুব বিশ্বাস।"

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১২) 'বিবি খোদেজার বিবাহ' পুস্তকের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে আখ্যায়িকা অংশে এ গ্রন্থখানি অপ্রীতিকর নহে। পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্ত চিত্র, হজরতের সহিষ্ণুতা, সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত, কর্তব্যজ্ঞান, বিবি খোদেজার পতিভক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি মীর সাহেব বেশ সরলভাবে মাধুর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিবি খোদেজা হজরত মহম্মদের সহধর্ম্মিণীরূপে সমগ্র মুসলমান সমাজের জননী স্বরূপিণী। সুতরাং এই রমণীরত্নের পবিত্র পরিণয় কাহিনী মুসলমান ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সাদরে ও সম্ভ্রমে গৃহীত ও পঠিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মুসলমান কবি বলিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট মীর সাহেব উৎসাহলাভের যোগ্য।[১৭৯]

লক্ষ্য করা যাবে, এই আলোচনায় আলোচক গ্রন্থের 'কবিত্বের' অর্থাৎ শিল্পমূল্যের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছেন এবং কেবল মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত কবি বলেই মশাররফ প্রেরণার যোগ্য— এই মত পোষণ করেছেন। এই প্রেরণাসঞ্চারী মন্তব্য স্পষ্টই উদার পৃষ্ঠপোষকতাজাত, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব স্বল্পই।

হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ

'হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ' নামীয় কাহিনী-কাব্যের প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩১২ সাল। 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' শিরোনামে মশাররফ গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন ঃ

> পরমপূজ্য হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-র পবিত্র জীবনের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, তৎসমুদয় ক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিব মনে করিয়াছি। .... সেই আশার কুহকে মাতিয়াই হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাতে ইসলাম ধর্ম্মের সত্যতার জীবন্ত ও জ্বলন্ত জ্যোতিঃ নবভাবে উদীত-চালিত, রক্ষিত-পরীক্ষিত, আদৃত-সম্মানিত ও সম্মিলিত হইয়া, দিক্-দিগন্তরব্যাপী ধী-শক্তিসম্পন্ন মহাশক্তির আবির্ভাবে বহু অন্তরের বিঘোর অন্ধকার বিশদরূপে বিদূরিত করিয়া এক উপাদেয় ঘটনার অবতারণা করিয়াছে; সেই উপাদেয় ঘটনাই আজ পাঠকসমীপে উপস্থিত করিতেছি।

হজরত ওমরের ইসলামধর্ম গ্রহণের নাটকীয় ঘটনাই এই কাহিনীর উপজীব্য। কিভাবে ইসলাম ও রসুল-বৈরী ওমর ইসলামের সেবকে রূপান্তরিত হন, মূলত সেই কাহিনীই লেখক পরিবেশন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁথিসাহিত্যের আদর্শে পয়ার ছন্দে রচিত এই কাব্যের শিল্পগুণ স্থানে স্থানে খুবই দুর্বল ঃ

ওমরের হৃদে বল দ্বিগুণ বেড়েছে,
হাত বাড়াইয়া একজনেরে ধরেছে।
একজন সেইজন দলের প্রধান,
ধরিয়া ওমর তারে মারিয়া পট্‌কান।
ভূমিতলে নিক্ষেপিয়ে বক্ষোপরি তার,
বসে দু'আঙ্গুল দেয় চক্ষেতে তাহার।

[পঞ্চম অংশ]

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় (১৫ মাঘ ১৩১২) মশাররফের 'হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবনলাভ', 'হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ' ও 'হজরত বেলালের জীবনী'— একত্রে এই তিনটি গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় ঃ

> ... সহজবোধ্য ভাষায় কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মীর সাহেব জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নিরক্ষর মুসলমানগণ যেন অনায়াসে গ্রন্থের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই মীর সাহেবের গ্রন্থগুলি সাদাসিধা কথায় লিখিত। সুতরাং এ সকল পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন।[১৮০]

উপর্যুক্ত মন্তব্য 'হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ' কাব্যগ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়ন বলে বিবেচনা করা যায়।

হজরত বেলালের জীবনী

'হজরত বেলালের জীবনী' একটি ক্ষুদ্র কাহিনী-কাব্য। গ্রন্থটি আশ্বিন ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন ঃ

> হজরত বেলালের জীবনী প্রকাশ হইল। ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিলে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অটল বিশ্বাস, মুসলমান ধর্ম্মে অচল ভক্তি বিষয় বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। অশিক্ষিত বর্ব্বর ব্যক্তির মনেও যে ঈশ্বর-প্রেম, জ্বলন্তরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মাতওয়ারা করিয়া তুলে, তাহার দৃষ্টান্ত হজরত বেলাল। সত্য-পথ প্রদর্শক মহা মাননীয় পয়গম্বর হজরত রসুল মকবুল (দঃ) প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

> কিরূপ ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা দেখাইতে হয়, তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তই হজরত বেলাল। এমনই ভালবাসা, এমনই হৃদয়ের আকর্ষণ যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নাম মুখে উচ্চারণ হইতেই কলেজা ফাটিয়া গেল। কি চমৎকার নিদর্শন! হজরত বেলালের জীবনীতে অনেক শিক্ষাপ্রদ কথা আছে।

হজরত বেলাল ইসলামের প্রথম যুগের একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনকথাই এই কাহিনীর উপজীব্য। 'হজরত বেলালের জীবনী' গ্রন্থের কাহিনী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে ইসলামধর্মনিষ্ঠ ক্রীতদাস বেলালের প্রতি তাঁর মূর্তি-পূজক প্রভুর অমানুষিক ও বর্বরোচিত নির্যাতন এবং হজরত আবুবকরের আনুকূল্যে বেলালের মুক্তি ও মহানবী (সঃ)-এর সান্নিধ্যলাভ। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে 'হজরত বেলালের আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি ও জীবন-শেষ' প্রসঙ্গ।

ধর্মীয় প্রেরণা ও প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত মশাররফের সব রচনার বৈশিষ্ট্যই অভিন্ন এবং এর মূল্যায়নও একই সূত্রে গ্রথিত। একজন সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "শিল্পসৃষ্টির চেয়ে হজরত বেলালের সহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিষ্ঠা চিত্রিত করার সচেতন প্রয়াস কাব্যের সর্বত্র সুপরিস্ফুট।"[১৮১] এই ধরনের গ্রন্থ-রচনার সার্থকতা বিষয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' (১৫ মাঘ ১৩১২) যে অভিমত পেশ করে তা 'হজরত বেলালের জীবনী'র জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য— "... ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ এতৎ পাঠে উপকৃত হইবেন"।[১৮২] মশাররফের প্রয়াস এই উদ্দেশ্যকেই মূলত সফল করেছে।

হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ

'হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ' মশাররফ হোসেন রচিত একটি কাহিনী-কাব্য। এই ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থটির প্রকাশকাল কার্তিক ১৩১২।

মহানবী (সঃ)-এর পিতৃব্য হজরত আমীর হামজার ইসলাম-গ্রহণ বৃত্তান্তই মূলত এই ক্ষুদ্র কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সঃ) প্রতি প্রতিমা-পূজক কোরেশদের নিগ্রহ-নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধ আমীর হামজার প্রতিশোধ গ্রহণ, মহানবী (সঃ)-এর অনুরোধে হামজার ইসলাম-গ্রহণ ও ফলে ইসলামধর্মের শক্তিবৃদ্ধি এবং মোহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কোরেশদের অব্যাহত বিদ্বেষ-ষড়যন্ত্রের কাহিনী এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যাকাশে পূর্ণশশী হেলিয়া দুলিয়া—
পশ্চিম গগন প্রান্তে যাইছে চলিয়া।
সাড়া শব্দ নাহি আর নগর ভিতরে,
নিস্তব্ধ হয়েছে মক্কা সুপ্ত ঘরে ঘরে।
কেবল খর্জ্জুর শাখা বায়ুর তাড়নে,
শন্‌শন্‌ শব্দ করে আন্‌চান্‌ মনে।

[প্রথম সর্গ]

কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর নেই, বরং নিরাভরণ গদ্যভঙ্গির পংক্তিমালাতেই সজ্জিত 'মদিনার গৌরব', যেমন ঃ

খ্রীষ্টের ছয়শত বাইশ সনের,
বিশে জুন তারিখের শেষাংশ রাত্রের।
হজরত ছাড়িয়া মক্কা যান মদিনায়,
বাঙ্গালা হিসাবে জ্যৈষ্ঠ মাস কহা যায়।

[দশম সর্গ]

মোস্লেম-বীরত্ব

মশাররফের 'মোস্লেম-বীরত্ব' কাব্যগ্রন্থটিও ধর্মীয় প্রেরণার বশে রচিত। এর প্রকাশকাল ২০ জুলাই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে। মশাররফের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে স্বত্বাধিকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ

> মোস্লেম-বীরত্ব পুস্তকখানি ... তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। মোস্লেম জাতি যে অন্যায়রূপে করে তরবারি ধারণ করে নাই— অন্যায়, অত্যাচার করিয়া মোস্লেম ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, কেবলমাত্র সত্যধর্ম্মের জ্বলন্ত জ্যোতি প্রভাবে যে সমস্ত স্থানে বিজয়ী হইয়াছে—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রচার করিয়াছেন।

গ্রন্থ-নামেই অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। এখানে বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত তিনটি যুদ্ধেই হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমপক্ষ বিজয়লাভ করেন। মূলত মুসলিম-বাহিনীর গৌরবময় বিজয়-কাহিনী ও মুসলিম যোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের কথা তুলে ধরাই ছিলো লেখকের অভিপ্রায়।

'মোস্লেম-বীরত্ব' পয়ার ছন্দে রচিত, স্থানবিশেষ গদ্য-বর্ণনাও সংযোজিত হয়েছে। কাব্যসৌন্দর্যের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এখানে দুর্লক্ষ্য। অলঙ্কারহীন সাধারণ গাদ্যিক বর্ণনা ধর্মভীরু পাঠককে তৃপ্ত করলেও শিল্প-রসিকের চিত্তকে সিক্ত করতে পারেনা। যেমন ঃ

আবু সুফিয়ান বলে আর বলিও না,
এখন যাইব যুদ্ধে উতলা হ'ও না।

[বদরের যুদ্ধ, দশম সোপান]

কিংবা,

খৃষ্টের ছয়শত পঁচিশ সনের,
আরম্ভেই কোরেশেরা, কারণে যুদ্ধের—
করিল মদিনা যাত্রা উপরোক্ত ভাবে,
ত্রি-সহস্র সৈন্য লয়ে শত্রু পরাভবে।

[ওহোদের যুদ্ধ, তৃতীয় সোপান]

প্রকৃতপক্ষে মশাররফ ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভা, বিচলিত শিল্পবোধ ও পরিবর্তিত মানস নিয়ে 'মোস্লেম-বীরত্ব' ও সমধর্মী কাব্য-কবিতা রচনা করেন। তাঁর এই সৃষ্টিসমগ্র রূপান্তরিত এক শিল্পীর বিশেষ উদ্দেশ্যসংলগ্ন শিল্পসাধনার স্বাক্ষর।

বাজীমাৎ

মশাররফ হোসেনের পরিবর্তিত মানস ও শিল্পদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় চিহ্নিত 'বাজীমাৎ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল কার্তিক ১৩১৫। 'বাজীমাৎ' বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'মশাররফ রচনা-সম্ভারে'ও গ্রন্থটি সংকলিত হয়নি। 'বাজীমাৎ' সম্পর্কে মোহাম্মদ ইদরিস আলী একটি পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন।[১৮৩] মূলত এই প্রবন্ধই 'বাজীমাৎ' সম্পর্কে পরবর্তী সব আলোচনার উৎস।

'বাজীমাৎ' রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক সমাজচিত্র। পদ্যাকারে নক্‌শাধর্মী রচনা এটি। 'বাজীমাৎ' মূলত "স্বৈরাচারিণী ভূম্যধিকারিণী ও কপট উমেদারের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কাহিনী"।[১৮৪] প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কিরূপ ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা দেখাইতে হয়, তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তই হজরত বেলাল। এমনই ভালবাসা, এমনই হৃদয়ের আকর্ষণ যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নাম মুখে উচ্চারণ হইতেই কলেজা ফাটিয়া গেল। কি চমৎকার নিদর্শন। হজরত বেলালের জীবনীতে অনেক শিক্ষাপ্রদ কথা আছে।

হজরত বেলাল ইসলামের প্রথম যুগের একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনকথাই এই কাহিনীর উপজীব্য। 'হজরত বেলালের জীবনী' গ্রন্থের কাহিনী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে ইসলামধর্মনিষ্ঠ ক্রীতদাস বেলালের প্রতি তাঁর মূর্তি-পূজক প্রভুর অমানুষিক ও বর্বরোচিত নির্যাতন এবং হজরত আবুবকরের আনুকূল্যে বেলালের মুক্তি ও মহানবী (সঃ)-এর সান্নিধ্যলাভ। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে 'হজরত বেলালের আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি ও জীবন-শেষ' প্রসঙ্গ।

ধর্মীয় প্রেরণা ও প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত মশাররফের সব রচনার বৈশিষ্ট্যই অভিন্ন এবং এর মূল্যায়নও একই সূত্রে গ্রথিত। একজন সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "শিল্পসৃষ্টির চেয়ে হজরত বেলালের সহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিষ্ঠা চিত্রিত করার সচেতন প্রয়াস কাব্যের সর্বত্র সুপরিস্ফুট।"[১৮১] এই ধরনের গ্রন্থ-রচনার সার্থকতা বিষয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' (১৫ মাঘ ১৩১২) যে অভিমত পেশ করে তা 'হজরত বেলালের জীবনী'র জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য— "... ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ এতৎ পাঠে উপকৃত হইবেন"।[১৮২] মশাররফের প্রয়াস এই উদ্দেশ্যকেই মূলত সফল করেছে।

হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ

'হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ' মশাররফ হোসেন রচিত একটি কাহিনী-কাব্য। এই ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থটির প্রকাশকাল কার্তিক ১৩১২।

মহানবী (সঃ)-এর পিতৃব্য হজরত আমীর হামজার ইসলাম-গ্রহণ বৃত্তান্তই মূলত এই ক্ষুদ্র কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সঃ) প্রতি প্রতিমা-পূজক কোরেশদের নিগ্রহ-নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধ আমীর হামজার প্রতিশোধ গ্রহণ, মহানবী (সঃ)-এর অনুরোধে হামজার ইসলাম-গ্রহণ ও ফলে ইসলামধর্মের শক্তিবৃদ্ধি এবং মোহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কোরেশদের অব্যাহত বিদ্বেষ-ষড়যন্ত্রের কাহিনী এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ ও প্রকরণে এই গ্রন্থের সঙ্গে পুঁথিসাহিত্যের সাদৃশ্য ও আত্মীয়তা সহজেই আবিষ্কার করা যায় ঃ

হজরত অলিদ কথা শুনিয়া তখন।
নির্ব্বাক রহিলেন সরে না বচন।।
নীরব দেখিয়া তারে কোরেশ সকল।
হাসিয়া উঠিল সবে করে খলখল।।
পরে করে কায়মনে সেই পুতুলেরে।
দন্ডবৎ নমস্কার অতি ভক্তি ভরে।।
যোড় করে করে সবে এই প্রার্থনা।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর পুরাও বাসনা।।

মদিনার গৌরব

'মদিনার গৌরব' ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারায় রচিত একটি কাব্য। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩১৩। 'প্রিয় পাঠকগণ সমীপে লিখকের নিবেদনে' মশাররফ বলেছেন ঃ

> পরম কারুণিক খোদাতাআলার আদেশে হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (দঃ) মক্কানগর হইতে পবিত্র মদিনা শরিফে যে হেজরত করেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই 'মদিনার গৌরব' লিখিত হইল। ... হেজরতের কারণ কি? এবং মদিনাবাসিগণ নিকট হজরত কিরূপ গৌরবান্বিতভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাই 'মদিনার গৌরব'।

'মদিনার গৌরব' কাব্যটি চৌদ্দ সর্গে বিভক্ত। কোরেশদের অত্যাচার-নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) অনুচর-অনুসারীসহ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনাবাসী হজরতকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই মদিনা নগরীতে তাঁর জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। এখানে আগমনের পর ইসলামধর্ম বিশেষ শক্তিসঞ্চয় ও প্রসারলাভ করে। হজরতের যোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় মদিনার সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হলো 'মদিনার গৌরব' কাব্যের উপজীব্য।

অন্য কাব্যের সঙ্গে তুলনায় 'মদিনার গৌরবে' কিঞ্চিৎ শিল্প-সৌন্দর্যের স্পর্শ আছে। যেমন মক্কার প্রকৃতি বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ

ত্রিযাম অতীত নিশি আরবগগনে,
চলিয়াছে তারাদল লয়ে সঙ্গিগণে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যাকাশে পূর্ণশশী হেলিয়া দুলিয়া—
পশ্চিম গগন প্রান্তে যাইছে চলিয়া।
সাড়া শব্দ নাহি আর নগর ভিতরে,
নিস্তব্ধ হয়েছে মক্কা সুপ্ত ঘরে ঘরে।
কেবল খর্জ্জুর শাখা বায়ুর তাড়নে,
শন্‌শন্‌ শব্দ করে আন্‌চান্‌ মনে।

[প্রথম সর্গ]

কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর নেই, বরং নিরাভরণ গদ্যভঙ্গির পংক্তিমালাতেই সজ্জিত 'মদিনার গৌরব', যেমন ঃ

খ্রীষ্টের ছয়শত বাইশ সনের,
বিশে জুন তারিখের শেষাংশ রাত্রের।
হজরত ছাড়িয়া মক্কা যান মদিনায়,
বাঙ্গালা হিসাবে জ্যৈষ্ঠ মাস কহা যায়।

[দশম সর্গ]

মোস্লেম-বীরত্ব

মশাররফের 'মোস্লেম-বীরত্ব' কাব্যগ্রন্থটিও ধর্মীয় প্রেরণার বশে রচিত। এর প্রকাশকাল ২০ জুলাই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে। মশাররফের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে স্বত্বাধিকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ

> মোস্লেম-বীরত্ব পুস্তকখানি ... তাঁহার অন্যতম কীর্তি। মোস্লেম জাতি যে অন্যায়রূপে করে তরবারি ধারণ করে নাই— অন্যায়, অত্যাচার করিয়া মোস্লেম ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, কেবলমাত্র সত্যধর্ম্মের জ্বলন্ত জ্যোতি প্রভাবে যে সমস্ত স্থানে বিজয়ী হইয়াছে—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রচার করিয়াছেন।

গ্রন্থ-নামেই অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। এখানে বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত তিনটি যুদ্ধেই হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমপক্ষ বিজয়লাভ করেন। মূলত মুসলিম-বাহিনীর গৌরবময় বিজয়-কাহিনী ও মুসলিম যোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের কথা তুলে ধরাই ছিলো লেখকের অভিপ্রায়।

'মোস্লেম-বীরত্ব' পয়ার ছন্দে রচিত, স্থানবিশেষ গদ্য-বর্ণনাও সংযোজিত হয়েছে। কাব্যসৌন্দর্যের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এখানে দুর্লক্ষ্য। অলঙ্কারহীন সাধারণ গাদ্যিক বর্ণনা ধর্মভীরু পাঠককে তৃপ্ত করলেও শিল্প-রসিকের চিত্তকে সিক্ত করতে পারেনা। যেমন ঃ

আবু সুফিয়ান বলে আর বলিও না,
এখন যাইব যুদ্ধে উতলা হ'ও না।

[বদরের যুদ্ধ, দশম সোপান]

কিংবা,

খৃষ্টের ছয়শত পঁচিশ সনের,
আরম্ভেই কোরেশেরা, কারণে যুদ্ধের—
করিল মদিনা যাত্রা উপরোক্ত ভাবে,
ত্রি-সহস্র সৈন্য লয়ে শত্রু পরাভবে।

[ওহোদের যুদ্ধ, তৃতীয় সোপান]

প্রকৃতপক্ষে মশাররফ ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভা, বিচলিত শিল্পবোধ ও পরিবর্তিত মানস নিয়ে 'মোস্লেম-বীরত্ব' ও সমধর্মী কাব্য-কবিতা রচনা করেন। তাঁর এই সৃষ্টিসমগ্র রূপান্তরিত এক শিল্পীর বিশেষ উদ্দেশ্যসংলগ্ন শিল্পসাধনার স্বাক্ষর।

বাজীমাৎ

মশাররফ হোসেনের পরিবর্তিত মানস ও শিল্পদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় চিহ্নিত 'বাজীমাৎ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল কার্তিক ১৩১৫। 'বাজীমাৎ' বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'মশাররফ রচনা-সম্ভারে'ও গ্রন্থটি সংকলিত হয়নি। 'বাজীমাৎ' সম্পর্কে মোহাম্মদ ইদরিস আলী একটি পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন।[১৮৩] মূলত এই প্রবন্ধই 'বাজীমাৎ' সম্পর্কে পরবর্তী সব আলোচনার উৎস।

'বাজীমাৎ' রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক সমাজচিত্র। পদ্যাকারে নক্শাধর্মী রচনা এটি। 'বাজীমাৎ' মূলত "স্বৈরাচারিণী ভূম্যধিকারিণী ও কপট উমেদারের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কাহিনী"।[১৮৪] প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

জীবন্ত বলের খেলা হয় দিনরাত।
ভরা কোটে হইতেছে কত কিস্তি মাত।।
বেচাল চালিয়া কেহ হয় কুপকাত।
তাহাদেরই এই ছবি নাম বাজীমাত।।
যদি খেলা জান ভাই খেল এক হাত।
ছুটিবে মনের ধাঁধা ঘুচিবে উৎপাত।।[১৮৫]

'বাজীমাৎ' প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ইদরিস আলী বলেছেন ঃ

> পুথির নামের সার্থকতা রেখে লেখক স্বীয় বক্তব্যকে 'দাবার চালে'-র রূপে চোদ্দ চালে ভাগ করেছেন ; বিভিন্ন এই চালের পর 'বাজীমাত' করে তবে তার উপসংহার হয়েছে। অসংযত স্বভাব জমিদার-পত্নী, স্বার্থ সাধনায় তৎপর আমলা পেয়াদা পাইক, ভাগ্যান্বেষী খল খায়ের খাহ্ ও উমেদার প্রভৃতি কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, বড়ে রূপে ছকের উপর 'চালের তালে' দৌড়াদৌড়ি করেছে।[১৮৬]

ভাব-ভাষা-ভাবনায় 'বাজীমাৎ' নিতান্ত গতানুগতিক রচনা। এই কাব্যের ভাষা-প্রসঙ্গে সমালোচক উল্লেখ করেছেন ঃ

> তৃতীয় ও চতুর্থ চাল ত্রিপদীতে এবং পুথির বাকী অংশ সম্পূর্ণই পয়ারে রচিত। ভাষা সরল ও সহজ। আড়ম্বরহীন ভাষা, কিন্তু লেখকের হাতে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। শব্দ সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গিতে সরসতা আনবার লক্ষ্য যেন লেখকের সর্বত্র বর্তমান ছিল। আর পূর্বাপর একটা শ্লেষ এই প্রকাশকে যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঘটনা সন্নিবেশে কিছু শিথিলতা রয়েছে বলে কাহিনী একটু গোলমেলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভাষার এই প্রাঞ্জলতা পুথি পাঠে ক্লান্তি আনেনা এবং কোনরূপ ছন্দ-দুষ্টতা পাঠককে বিব্রত করেনা।[১৮৭]

সমালোচকের এই মূল্যায়ন সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। এতে কাব্যসৌন্দর্য স্বল্পই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকরণগত দৌর্বল্যের পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়, যেমন ঃ

দেখিলেন রসগোল্লা আড়ালে থাকিয়া,
কোন সন্দ নাই আর ইহাকে দেখিয়া।
সত্যই পুলিষ বটে সাজে চেনা যায়,
হাবে ভাবে বলিতেছে বাজে লোক নয়।[১৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের নাম-বিভ্রান্তির ত্রুটিও ঘটেছে এই কাব্যে। সূচনায় একটি চরিত্রের নাম সেরাজদ্দী, কিন্তু উত্তরপর্বে সে মনিরদ্দী নামে পরিচিতি।[১৮৯]

পদ্যে রচিত এই সামাজিক নক্‌শাটি রচনা হিসেবে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র সমানধর্মা।[১৯০] রস ও রুচি উভয়তই এই সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব। অশ্লীলতা ও রুচি-বিকারের যে পরিচয় এখানে মেলে তা 'বস্তানী'কে অতিক্রম করে গেছে ।

উত্তরজীবনে মশাররফের অসাম্প্রদায়িক চেতনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। 'বাজীমাতে' তাঁর এই মানস-রূপান্তরের স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর উক্তি ও মন্তব্য ক্ষোভ-অসন্তোষ-অসহিষ্ণুতা ও অবিবেচনা-প্রসূত বলে মনে হতে পারে। যেমন ঃ

> বিশ্বাসঘাতক হিন্দু দুষ্ট প্রবঞ্চক,
> যেই পাত খায় ফোঁড়ে এমনি পাতক।

কিংবা,

> সাজাইতে মিথ্যা কথা হিন্দু বাহাদুর।

স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গবঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠে। মশাররফ হোসেন এর শিকার হতে পারেন এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

'বাজীমাৎ' কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব ঘটনা কিংবা মশাররফের ব্যক্তিগত স্মৃতি বা অভিজ্ঞতার যোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে এই কাহিনী কিংবা লেখকের শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির মাধ্যম হলেও তা কোনক্রমেই শিল্প-সাফল্যের উপায় হয়ে ওঠেনি।

প্রবন্ধ -আলোচনা-ইতিহাস

গো-জীবন

মশাররফ-রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক বিতর্ক ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় 'গো-জীবন' (১২৯৫)-কে কেন্দ্র করে। মশাররফের অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর এই 'গো-জীবন' গ্রন্থ। তিনি যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে উদ্যোগী ছিলেন সে-পরিচয়ও এখানে প্রতিফলিত।

Dhaka University Institutional Repository

'আহমদী' পত্রিকায় (১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ, ১৫ পৌষ ১২৯৫) বেনামীতে রচিত 'গো-জীবনে'র তিনটি প্রস্তাব ('গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা', 'গোধন কি সামান্য ধন' ও 'গো-মাংস') প্রকাশিত হয়। 'আখবারে এসলামীয়া' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৯৫) এই প্রস্তাবসমূহের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। মশাররফ-রচিত প্রস্তাব ও তার প্রতিবাদ সংকলিত হয় 'গো-জীবন' গ্রন্থে। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয় 'পরিশেষে লিখকের কয়েকটি কথা' নামীয় একটি প্রতিবেদন।

'হিন্দু মোসল্মান উভয় সম্প্রদায় সমীপে' শিরোনামে গ্রন্থের ভূমিকায় মশাররফ বলেছেন ঃ

> আশা ছিল, ভারতের প্রতি হস্তে গো-জীবন অর্পণ করি। অবস্থার গতিকে তাহা পারিলামনা। করুণাময় ভগবান কৃপায় মাত্র দুই হাজার গো-জীবন আপনাদের পবিত্র হস্তে অর্পণ করিতেছি ; গ্রহণ করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন।
>
> গো-জীবনের চির অরি, প্রতিবাদকারী মহাত্মাগণ গো-জীবনে সুতীক্ষ্ম ছুরিকাসম লিখনি আঘাতে যে প্রকার ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিলে পরম প্রীতিলাভ করিব।

'গো-জীবন' উৎসর্গিত হয়, 'পঞ্চবিংশতি কোটী ভারত-সন্তান করে'। লেখক ঘোষণা করেন, 'দুই হাজার কাপী বিনামূল্যে বিতরিত হইবে'। জনমত গঠনের জন্য লেখকের প্রত্যাশা ছিলো ঃ

> ... গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দ্দু এবং হিন্দিভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্র ধাম মক্কা মোয়াজ্জমায়, পুণ্যক্ষেত্র বোগদাদে, মোসল্মানরাজ প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লিতে এবং আজমীর শরিফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান ২ মৌলবী মৌলানা, মহামতীগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বরে হয় পুনঃপ্রকাশ হইবে।

কিন্তু লেখকের এই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

এলাহাবাদের 'গো-রক্ষিণী সভা'র পক্ষ থেকে মশাররফকে লিখিত শ্রীমান স্বামীর পত্রে (১০ জানুয়ারী ১৮৮৯) তাঁর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় ঃ

> আপনার প্রস্তাবগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে আমার নিকট পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনার 'গো-মাংস' বিষয়ক প্রস্তাবটি যাহা শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইব। মহাশয়ের ন্যায় সজ্জন লোকের দ্বারা দেশের

Dhaka University Institutional Repository

> যথেষ্ট উপকার হইতেছে, তাহা আমার মত ক্ষুদ্রজনের বলা বাহুল্য মাত্র। ভরসা করি আপনি মধ্যে ২ গো-হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া আমার উপদেশকের পদ গ্রহণ করিবেন।

কেউ কেউ ধারণা করেছেন, 'গো-রক্ষিণী সভা'র সঙ্গে মশাররফের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিলো এবং এই সমিতির কার্যক্রমে সহায়তার জন্যই 'গো-জীবন' প্রকাশ করেন।[১৯১]

গো-হত্যা হিন্দু-মুসলমান বিবাদ-বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে 'গো-রক্ষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ তীব্র আকার ধারণ করে। এ-নিয়ে সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামাই কেবল সংঘটিত হয়নি, বিতর্কমূলক অনেক পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হয়েছে।[১৯২] মশাররফের 'গো-জীবন' এই জাতীয় পুস্তকের মধ্যে বিশিষ্ট রচনা হিসেবে চিহ্নিত।

'গো-জীবনে'র প্রস্তাবসমূহে মশাররফ গো-রক্ষার জন্য অনুনয় ও আবেদনের পাশাপাশি গো-সম্পদের উপকারিতা ও গো-মাংসের অপকারিতা সম্পর্কে যুগপৎ যৌক্তিক ও আবেগী বক্তব্য পেশ করেছেন স্ব-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত আপন বিশ্বাসে নিষ্ঠ মশাররফ প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছেন ঃ

> আমি মোসলমান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ি গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাব বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব। মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব। ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পরাধীন--কিন্তু মন স্বাধীন।
>
> [প্রথম প্রস্তাব]

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও প্রীতির স্বার্থে গো-মাংস ভক্ষণের অভ্যাস-ত্যাগের জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন, কেননা তাতে ঃ

> ধর্ম্মে আঘাত লাগেনা, গো-মাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মেনা। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়েনা। প্রাণের হানিও বোধ হয়—হয়না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা,

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বারবার বলিবনা। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি?

[প্রথম প্রস্তাব]

'গো-জীবন' প্রসঙ্গে হিন্দু-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় মীরের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতি প্রয়াস অভিনন্দিত হয়। 'ভারতী ও বালক' (চৈত্র ১২৯৫) পত্রিকা প্রতিক্রিয়া জানায় ঃ

> পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, যেরূপ অপক্ষপাতীভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।[১৯৩]

'অনুসন্ধান' (১৫ বৈশাখ ১২৯৬) এ-সম্পর্কে মন্তব্য করে ঃ

> মীর মোশাররফ হোসেন মহাশয় স্বয়ং মুসলমান হইয়াও গো হত্যার প্রতিকার বিষয়ে যে এই পুস্তক লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে প্রকৃতই হৃদয়বান বলিতে হয়।[১৯৪]

কিন্তু অপরপক্ষে মুসলমানসমাজে মশাররফ এই গ্রন্থ রচনার জন্য ধিকৃত ও নিন্দিত হন। এ-বিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন 'আখবারে এসলামীয়া' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী নৈমুদ্দীন। 'আহমদী' পত্রিকায় (১৫ শ্রাবণ ১২৯৫) 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'আখবারে এসলামীয়া'য় মশাররফের রচনার কড়া প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। প্রতিক্রিয়া এতোই প্রবল হয়ে ওঠে যে, তাঁকে 'কাফের' আখ্যাদানের পাশাপাশি তাঁর 'স্ত্রী হারামে'র ফতোয়াও দেওয়া হয়।[১৯৫] মৌলবী নৈমুদ্দীন রচনা করেন প্রতিবাদ-পুস্তিকা 'গো-কাণ্ড' (সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। রেয়াজউদ্দীন আল্ মাশহাদীর 'অগ্নিকুক্কুট'ও (ফাল্গুন ১২৯৬) এই প্রতিক্রিয়ারই ফসল।

আক্রান্ত মশাররফ অবশেষে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ 'আখবারে এসলামীয়া'-সম্পাদক মৌলবী নৈমুদ্দীনের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির নালিশ করেন। এই মামলা লড়তে গিয়ে নৈমুদ্দীন মুসলমানসমাজের ব্যাপক নৈতিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ-পরিচালিত 'সুধাকর' পত্রিকা এই বিতর্কে মৌলবী নৈমুদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করে।

'আখবারে এসলামীয়া'য় মৌলবী নৈমুদ্দীনের সমর্থনে যে-সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় তাতে 'গো-জীবন' ও তার লেখক সম্পর্কে যথেষ্ট কটূক্তি ও বিষোদ্গার করা হয়। ভাদ্র ১২৯৬ সংখ্যায় এক পত্রে বলা হয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা বলি মীর সাহেব! এসলামী ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে একটুকু দৃষ্টি করুন। খোদাকে ভয় করুন, মরণ অতি নিকটে, পরকালে খোদাতালার স্থানে যাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন সেকালের দিকে এটুকু দৃষ্টি রাখিবেন।[১৯৬]

'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থ-প্রণেতা শেখ আবদোস সোবহান 'আর নীরব থাকা গেলনা' শিরোনামে এক নিবন্ধে ('আখবারে এসলামীয়া', পৌষ ১২৯৬) বলেন ঃ

> ... কয়েকদিন হইল বটতলার গোজীবনের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়াছিলাম। বেশী পড়িতে রুচি না হওয়ায় ফেলিয়া দি। গোজীবন মুসলমান ধর্ম্মকে ও মুসলমানদিগকে যত ঠাট্টা চাতুরী বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত আছেই, কিন্তু স্থানে স্থানে... ছন্দঃ-পতন, কর্কশ ইত্যাদি দোষে পূর্ণ রহিয়াছে।[১৯৭]

'সুধাকরে' 'গো-জীবন' প্রসঙ্গে মশাররফের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিষোদ্‌গার প্রকাশ করা হয়। ৯ চৈত্র ১২৯৬ সংখ্যায় মশাররফকে লক্ষ করে মন্তব্য করা হয় ঃ

> তাঁহাকে শেষ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার গো জীবনের পক্ষপাতী কজন আত্মীয়বন্ধু ভাই-ভাগিনেয় আছেন তাহাদের নামের লিষ্ট বাহির করিতে পারেন কি? আমরা ত প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে, তাঁহার মাথা তোলা আত্মীয়স্বজন কেহই তাঁহার এই জঘন্য অভিনয়ের পক্ষপাতী নহেন। মীর সাহেব কি বলেন।[১৯৮]

'গো-জীবন' রচনার কারণে মশাররফ হোসেন মুসলমানসমাজের নিকট থেকে সামাজিক প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হন। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যপদের জন্য 'আহমদী' পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেন, আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী প্রমুখের নাম বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু 'গো-জীবন'- বিতর্কের সূত্র ধরে 'আখবারে এসলামীয়া' (জৈষ্ঠ ১২৯৬) এ-বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে মন্তব্য করে ঃ

> বিষাদসিন্ধু প্রণেতা— মাননীয় মীর মোশাররফ হোসেন সাহেবের প্রতি মুসলমান গণ্যে দৃষ্টি করিলে আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, চলা, ফিরা এবং বাহ্যিক পোষাকাদিতে তিনি যে কি প্রকারের সং সাজিয়া রহিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই, তাঁহাকে কেহ একদৃষ্টে মুসলমান বলিয়া চিনিতে পারেন কিনা সন্দেহ। মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অন্য জাতিভুক্ত হইতে পারেন না। দায় ঠেকিয়া মুসলমানী নাম বজায় রাখিয়াছেন। এসলামী

Dhaka University Institutional Repository

> ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক মুসলমানী নামের প্রতিও তাঁহার ঘৃণা। এমন কি শুনিতে পাই তাহার পুত্রের নাম 'স্বত্ববান' [সত্যবান] কন্যার নাম 'সাবিত্রী', বাসার নাম সান্তিকুঞ্জ [শান্তিকুঞ্জ] রাখিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় এমত ব্যক্তি উক্ত পদ পাওয়ার অনুপযুক্ত।[১৯৯]

১২৯৭ সালে (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯০) মানহানির মামলা আপোষ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে 'গো-জীবন'-বিতর্কের অবসান হয়। মামলার বাদী মশাররফ হোসেন 'ছোলেনামা'য় উল্লেখ করেন ঃ

> গো জীবন পুস্তকে আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে আমি আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কথা লিখি নাই, আমার অজ্ঞতাবশতঃ ঐ লিখায় আমার ধর্ম্মের প্রতি যদি কোন আঘাত লাগিয়া থাকে তজ্জন্য খোদাতালার নিকট শত সহস্রবার 'তওবা' করিতেছি ও মাফ চাহিতেছি। আমি আমার গো জীবন পুস্তক আর প্রকাশ করিব না।[২০০]

অপরপক্ষে বিবাদী মৌলবী নৈমুদ্দীনও বাদীর "মনে যদি কোনরূপ কষ্ট হইয়া থাকে তজ্জন্য ... দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা" করেন এবং তাঁর 'গো-কাণ্ড' পুস্তক আর প্রকাশ করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন।[২০১]

গো-হত্যার মতো স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে 'গো-জীবন' রচিত। 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রায় সমসময়ে রচিত হলেও প্রধানত বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে 'গো-জীবনে' সেই ভাষার প্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। 'গো-জীবনে' মীরের গদ্য স্ব-মত প্রতিষ্ঠার আয়ুধ। যুক্তি, তর্ক ও আবেগ এই গদ্যকে অবলম্বন করেছে। এইধরনের বক্তব্য যে অনেকাংশেই নিরস ও উদ্দেশ্যবাহী হয়ে থাকে তার ব্যতিক্রম এখানেও নেই ঃ

> গরু কোরবাণী না হইয়া ছাগলও কোরবাণী হইতে পারে। ...... কোরবাণীর গরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রকার একটী গরুর মূল্যে ২৫টি ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। ... এক যাত্রায় তিন লাভ—ধর্ম্মরক্ষা, অর্থরক্ষা, উদররক্ষা।
>
> [প্রথম প্রস্তাব]

কেবল তথ্য পরিবেশন ব্যতীত এই নিরাভরণ গদ্য এখানে কোনো ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি।

'গো-জীবনে'র মতো উদ্দেশ্য-আশ্রিত রচনায় অবকাশ না থাকলেও মাঝে-মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুক, শ্লেষ-বিদ্রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মীরের স্বভাব-সুলভ ব্যঙ্গ-ভঙ্গি নিরস যুক্তিতর্কের মধ্যেও কখনো

Dhaka University Institutional Repository

কখনো সরস আবহ সঞ্চার করেছে ঃ

> খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি,—খাইনা। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলিনা। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি— বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটেও যাইনা। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষিনা, যে ছাগিতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই "আল্লাহ আকবর" শুনাই। ... উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইতনা। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়।
>
> [প্রথম প্রস্তাব]

'গো-জীবনে'র ভাষা সাধুরীতির হলেও এতে কথ্য বাক্-ভঙ্গির প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু পুনরুক্তি, বাক্-বাহুল্য ও সুলভ আবেগ প্রকাশের প্রবণতা এখানেও অতিক্রম করতে পারেননি লেখক। তবে বিতর্কমূলক রচনা হলেও 'গো-জীবনে' লেখক সংযম-রক্ষায় যথেষ্ট সচেতন থেকেছেন।

'গো-জীবন' গ্রন্থের প্রধান গৌরব এর শিল্পমূল্যে নয়, সমাজ-মানসের প্রতিফলনেই এর প্রকৃত গুরুত্ব। সম্প্রদায়-সম্প্রীতির প্রয়াসে নিবেদিত একজন সমাজমনস্ক, যুক্তিবাদী, মুক্তমন, নির্ভীক, বিবেকী শিল্পীর আন্তরিক পরিচয় এখানে উন্মোচিত।

এসলামের জয়

ধর্মীয় উপকরণনির্ভর 'এসলামের জয়' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৮ খৃস্টাব্দ। গ্রন্থটি সমাদৃত হয় এবং এর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয় কলিকাতা থেকে। মশাররফের ইসলামী গ্রন্থমালার শেষ নিদর্শন এই গ্রন্থটি।

'এসলামের জয়' একটি মিশ্রজাতের রচনা। ইসলামের ইতিবৃত্ত-নির্ভর হলেও গ্রন্থটিকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এই গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ

> ইতিহাসের ঘটনা-অবলম্বনে রচিত হলেও 'এসলামের জয়' (১৯০৮) গ্রন্থে কল্পনার স্থান অনেকখানি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে বর্ণাঢ্য বর্ণনা, কাল্পনিক সংলাপ ও চরিত্র-চিত্রণের প্রচেষ্টা এতে দেখা যায়—প্রসঙ্গতঃ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এবং বর্ণনাধীন বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাসময় আত্মগত উক্তি সংকলন করেছেন।[২০২]

'এসলামের জয়' গ্রন্থের কাহিনী দুইভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগ 'শাখা' এবং তার অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদগুলো

Dhaka University Institutional Repository

'মুকুল' নামে নির্দেশিত। প্রথম 'শাখা'য় দশটি এবং দ্বিতীয় 'শাখা'য় আছে তেরোটি 'মুকুল'। প্রথম 'শাখা'য় বর্ণিত হয়েছে মদিনাধিপতি হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর রাষ্ট্রনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ। দ্বিতীয় 'শাখা'য় আছে মক্কা-বিজয়, কোরেশ-গোত্রের ইসলামগ্রহণ ও পৌত্তলিকতামুক্ত পবিত্র কাবাগৃহে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে 'এসলামের জয়' ইসলামধর্মের প্রসার ও হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনের আবেগঘন কাহিনী।

ইতোপূর্বে মশাররফ পদ্যে ইসলাম-কাহিনী রচনা করেছেন। 'এসলামের জয়' গদ্যে রচিত তাঁর একমাত্র ধর্মবিষয়ক রচনা। এই গ্রন্থের কেন্দ্রবিন্দুতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর অবস্থান। মহানবীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারা সম্পর্কে লেখকের বিবরণ আন্তরিক, হৃদয়স্পর্শী ও শ্রদ্ধা-উদ্রেককারী। রসুলের মহত্ত্ব, উদারতা ও বিবেচনা-বোধের পরিচয় দিয়ে লেখক ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যেমন, কোরেশদের সঙ্গে বৈরীভাব প্রশমনে তাঁর চেষ্টার বর্ণনা ঃ

> রজনী প্রভাত হইল, হাজরাত মোহাম্মদ মদিনা যাত্রা না করিয়া, কোরেশগণের আহারের যোগাড় করিতে মনোনিবেশ করিলেন।... একত্র আহারবিহারে শত্রুতাভাব অনেক পরিমাণ হ্রাস হইয়া—একটু ভালবাসা ভাব যে না জন্মে তাহা নহে। পরস্পর একত্র আহার— সৌহৃদ্যভাবের প্রধান লক্ষণ। অদ্যকার দিনটা থাকিয়া কোরেশদিগকে পরিতোষরূপে আহার করাইব।
>
> [প্রথম শাখা, চতুর্থ মুকুল]

হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর চরিত্র-মাধুর্য্যের আর-একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে মক্কাবিজয়ের ঘটনায়। মহানবীর মহত্ব, বিবেচনা, প্রজ্ঞার পরিচয় আছে তাঁর সিদ্ধান্তে ঃ

> আপনাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা,— সাবধানে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। আপনাদের পদসঞ্চালনের ভাব দেখিয়া কাহার মনে একথা উদয় না হয় যে, ইহারা জেতা।... অহঙ্কারের আভাস মাত্র থাকিবে না। ইহাই হইল মূল ভাব। ... জয়ধ্বনি জয়োল্লাস, চীৎকার হর্ষধ্বনি করা হইবে না। ... অস্ত্র সকল কোষবদ্ধ থাকিবে।... নগরবাসীর প্রতি কোনপ্রকার অমর্য্যাদাসূচক বাক্য, কোনরূপ কটূক্তি দ্বারা কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া হইবে না। ... আমাদের নিরীহ ভদ্র ব্যবহার সত্বেও যদি কেহ আক্রমণ করে, অস্ত্র ব্যবহারে উদ্যত হয়, মাথা পাতিয়া সে আঘাত সহ্য করিতে হইবে।
>
> [দ্বিতীয় শাখা, ত্রয়োদশ মুকুল]

Dhaka University Institutional Repository

'এসলামের জয়' ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত ইতিহাস ও উপাখ্যানের একটি মিশ্ররূপ। এই গ্রন্থের লেখক যে-একজন বিশিষ্ট ভাষাশিল্পী তার স্বাক্ষর এখানে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এর কাহিনী-পরিকল্পনা, ভাষা ও আবেগ অনেকক্ষেত্রে 'বিষাদ-সিন্ধু'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অলঙ্কার-অনুভবে এই গদ্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র যোগ্য সতীর্থ ঃ

> দয়াময় এলাহি কৃপায় হাজরাতের মানসউদ্যানের চির আশাকুসুম সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণই যেন চতুর্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পৌত্তলিক কন্টকাকীর্ণ কুসংস্কার কঙ্করাবৃত আরবক্ষেত্রে এইক্ষণে এসলাম ধর্ম্মতরু বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমেই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে।

'এসলামের জয়ে' লেখকের বড়ো সাফল্য এই যে, এখানে ভাষা তার ভাব ও আবহের সার্থক অনুগামী হতে পেরেছে। আবেগের স্পন্দন এই গদ্যকে গতিশীল ও সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। মহাবীর খালেদের যুদ্ধ-পরিচালনার এক মনোগ্রাহী চিত্র এখানে পাওয়া যায় ঃ

> খালেদ অশ্ব ছুটাইলেন। অশ্বদাপটে প্রস্তর ঘর্ষণে অশ্বের পদতল হইতে আগুনের কণা ছুটিতে লাগিল। ইসাইগণ চক্ষে যেন দেখিতে লাগিল, দেখাইতে লাগিল,— তাহাদের অগ্রপশ্চাতে এস্‌লাম-বিজয়পতাকা আর মোহাম্মদ খালেদের অশ্বখুর উৎপন্ন অগ্নিকণা, খালেদকে কেহই স্থিরচক্ষে দেখিতে সক্ষম হইতেছে না। তৃতীয় চক্ষের পরেই রোমীয় সৈন্য কাতারে কাতারে রক্তমাখা হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু কেহই পথ ছাড়িলনা। পলাইল না, রক্তবীজের বংশের ন্যায় একদলের রক্ত মৃত্তিকায় পতিত হইতে হইতে অন্য দল আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছে।

এই বিবরণের সঙ্গে কারবালার যুদ্ধ-বর্ণনার সাদৃশ্য দৃষ্টি এড়ায়না। এই ভাষাভঙ্গি যেনো যুদ্ধমগ্ন খালেদের ধাবমান অশ্বের মতোই গতিময়, তাঁর অসিনিক্ষেপের মতোই ক্ষিপ্রগতি ও অব্যর্থ, তাঁর আক্রমণের মতোই ছন্দময়, তাঁর বীরত্বের মতোই শাণিত ও নিটোল।

'এসলামের জয়' গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই একে 'গদ্যকাব্যেতিহাস' এবং মশাররফের 'সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অবিসংবাদিতভাবেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা' বলে অভিহিত করেছেন।[২০৩] 'এসলামের জয়' গ্রন্থে লেখকের উদ্দাম কল্পনা, তীব্র আবেগ ও পল্লবিত কাহিনী বর্ণনার ঝোঁকে তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচলিত ও বিচ্যুত হয়েছে। আর এ-সূত্র ধরেই অর্জিত হয়েছে এই রচনার আংশিক শিল্প-সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনী-আত্মজীবনী

আমার জীবনী

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯), 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১০) ও 'বিবি কুলসুম' (১৯১০)—এই চারটি গ্রন্থ মশাররফের আত্মজীবনীমূলক রচনা হিসেবে চিহ্নিত। প্রথম গ্রন্থ দুটিতে মশাররফ প্রচ্ছন্ন এবং শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে উপস্থিত।

'আমার জীবনী' মোট বারো খণ্ডে[২০৪] প্রকাশিত অসমাপ্ত রচনা। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১ আশ্বিন ১৩১৫ (১৯০৮)। শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩১৬ (১৯১০)। প্রথম খণ্ডে 'আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি কথা' শিরোনামে লেখক জানিয়েছেন ঃ

> প্রতি খণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্মা 'আমার জীবনী' থাকিবে। অপর ফর্মায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। 'আমার জীবনী'র সহিত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশে বিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া জীবনীর সঙ্গেই প্রকাশ হইবে।[২০৫]

একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত রচনার পরিকল্পনা নিয়েই মশাররফ 'আমার জীবনী' রচনায় হাত দেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

> জীবনের আদি অন্ত ঘটনা শুনাইব। কম নহে,—বাল্যজীবন হইতে গত ৬৫ বৎসরের ঘটনা শুনাইব। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাও, সময় সময় প্রকাশ করিব। হয়ত যেদিন আমার জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন হইবে, জীবনীর ইতিও সেইদিন হইবে।[২০৬]

'আমার জীবনী'র একাদশ ও দ্বাদশ যৌথ খণ্ডে (১৯১০) পত্নীশোককাতর লেখক 'বিদায়' শিরোনামে বলেছেন ঃ

> চির বিদায় নহে। কিছুদিনের জন্য বিদায়। ... এই ১২ সংখ্যা জীবনীতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক জীবনের প্রথম হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের চারি ভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল। অদ্য পর্য্যন্ত (১৩১৬ সালের ভাদ্র মাস) ৪৩ বৎসরের ঘটনা প্রকাশে বাকি রহিল। যদি জীবনে কুলায় দয়াময় এলাহির কৃপা হয় তবে ঐ অংশ অবশ্যই প্রকাশ করিব।[২০৭]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরের বছর মশাররফ পৃথিবী থেকে 'চির বিদায়' গ্রহণ করেন। ফলে 'আমার জীবনী'র অবশিষ্টাংশ অপ্রকাশিতই থেকে যায়।[২০৮]

'আমার জীবনী'র অধ্যায়-বিন্যাস সুপরিকল্পিত নয়। লেখক প্রদত্ত অধ্যায়ের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ ১. 'আমার আত্মকথা — প্রার্থনা', ২. 'উপক্রমণিকা — আমি কে?', ৩. 'জন্মবিবরণ', ৪. 'বিদ্যাশিক্ষা', ৫. 'যৌবন জোয়ারারম্ভ', ৬. 'বংশনুরাণ'। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ের শিরোনাম নির্দেশিত হয়নি। 'বংশপুরাণে'র পর কিছু অংশে বিদ্যাচর্চা এবং প্রধান অংশ জুড়ে আছে মশাররফের প্রণয় ও পরিণয়-প্রতারণার বিবরণ। 'আমার জীবনী'তে মূলত মশাররফের পারিবারিক ইতিবৃত্ত, তাঁর শিক্ষাজীবন ও প্রথম বিবাহের ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে।

মশাররফের আত্মচরিত স্মৃতি ও শ্রুতির সমন্বিত রূপ। বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকাশভঙ্গিতে এই আত্মজীবনী বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর পূর্বপুরুষের ঘটনা, বিশেষ করে পিতামহের জীবনেতিহাস, কৌতূহলোদ্দীপক। মশাররফের বিদ্যাচর্চার বিবরণও কম আকর্ষণীয় নয়। তবে সবচেয়ে মর্মস্পর্শ করে মশাররফের বিবাহ-সম্পর্কিত কাহিনী। ঘটনাপ্রবাহের এই ত্রিধারায় যুক্ত হয়েছে অনেক চমকপ্রদ প্রসঙ্গ, যা সমাজ-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কালের দলিল হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম।

এই আত্মচরিতের অনন্য বৈশিষ্ট্য লেখকের সরল সত্যভাষণ ও অকপটতায়। নিজের কিংবা পিতার চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনায় তিনি কোনো আবরণ রাখেননি। পিতার ঢাকায় গিয়ে অর্থ কর্জ করে অজ্ঞাত রমণীর জন্য অলঙ্কার ক্রয়ের বিষয়ে মশাররফ বলেছেন ঃ

> অলংকার আবশ্যক কাহার? স্ত্রীর জন্য অথবা কন্যার? স্ত্রীও নাই, কন্যাও নাই। অলংকার পরিবার লোক কেহই নাই, তবে অলংকার জন্য এত ব্যস্ত কেন?
>
> [যৌবন জোয়ারারম্ভ]

স্খলিত-চরিত্র পিতার অবিবেচনাই যে জননীর অকালমৃত্যুর কারণ সে-কথা জানাতেও দ্বিধা করেননি তিনি। নিজের চরিত্রদোষ সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন ঃ

> দাসী বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্ক-রেখায় কলুষিত হয়।
>
> [বিদ্যাশিক্ষা]

প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা-বিরোধী পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ঘটনার নগ্ন উন্মোচন ও অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর আত্মচরিতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর মনে একটি মহৎ উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্নও ছিলো। তাঁর আত্মচরিতের 'পাঠকগণ সমীপে' তিনি বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> আমার জীবনে শত শত ক্রটী, শত শত 'জাহেলী' (মূর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানবসন্তানও যদি সাবধানে সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব।[২০৯]

'আমার জীবনী'র ভাষারূপ সরল সাধুরীতির। বেশকিছু আরবী-ফারসী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। এই আত্মকথার ভাষা প্রসঙ্গে মশাররফ উল্লেখ করেছেন, " 'আমার জীবনী' অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে" এবং মুসলমানসমাজে প্রচলিত শব্দাবলী "যেমন প্রচলিত আছে সেই রূপই প্রকাশ করিব"।[২১০] অবশ্য ভাষাগত কিংবা শিল্পমূল্য অপেক্ষা এই গ্রন্থের সামাজিক মূল্য অধিক। সমাজের নানা চিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাণীরূপ পেয়েছে এখানে ; — ভাষা এখানে কখনো চিত্রধর্মী, কখনো হাল্‌কা চালে আটপৌরে, আবার কখনো বা আবেগের প্রতিনিধি।

'আমার জীবনী'র হাল্‌কা চালের গদ্য, সাধুরীতির হলেও, কথ্যভঙ্গির আমেজ-মাখা, —তার দৃষ্টান্ত ঃ

> ঘরের মধ্য হইয়া আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই একপ্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই অতি মোলায়েম সৌগন্ধিযুক্ত গণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটী কথা চুপি চুপি বলিলেন—এবং আমার হাতে কয়েকটা পানের খিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিওনা— মার খাইবে। বেত লাগাইব।
>
> [বংশ পুরাণ]

এর পাশাপাশি বেদনা-বিষাদের অনুভূতি প্রকাশেও এই গদ্য যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এখানে মৃত্যুশয্যায় মশাররফ-প্রিয়া লতিফনের অসফল প্রণয়ের বেদনা-বিহ্বল আর্তির কথা সহজেই স্মরণে আসে। গীতলতা ও প্রবহমান আবেগের সঙ্গে নাটকীয় গুণ ও কাব্যময়তা মিশ্রিত হয়ে ভাষা এখানে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে ঃ

> [লতিফন] আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সকলই তোমার।... দেহ ভিন্ন রহিয়াই গেল। মনে-মনে দুয়ে এক হইয়াছিলাম, দেহ এক হইলনা। সে আশা পূর্ণ হইলনা, না হউক, চাইনা—আমার যাহাতে গৌরব তাহা হইয়াছে, তুমি আমার জন্য কাঁদিয়াছ, সেই আমার সুখ, স্ত্রী-ভাগ্যে সেই মহামূল্য সুখ। এস—এগুয়ে এস সময় হইয়াছে, যাহা সাধ ছিল তাহা পূর্ণ করি—তোমার জানুর উপর মাথা রাখিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাই এই শেষ কথা। আমার সতীত্ব রত্ন তোমারই গৌরবের ধন, তাহা রক্ষা করিয়া জনমের মত বিদায় হইলাম।
>
> [বংশ পুরাণ]

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফের আত্মজীবনী সমালোচকের প্রশংসা ও পাঠকের সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে। একজন সমালোচক 'আমার জীবনী'কে 'চিত্তাকর্ষক রচনা' বলে মন্তব্য করেছেন।[২১১] আর-একজন বলেছেন, "... মীরের কৃতিত্ব এখানে যে মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের রূপটি এ বইয়ে বড় চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে"।[২১২]

তবে এই আত্মচরিতের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাও কম নয়। রক্ষণশীলতা, বিজ্ঞান-বিরোধিতা, প্রগল্ভতা, স্থূল রসিকতা, স্ববিরোধিতা, পুনরুক্তি দোষ, ভাষা ও ব্যাকরণ-দুষ্টি—সমালোচক এই গ্রন্থে এইসব ত্রুটি নির্দেশ করেছেন।[২১৩] কোনো কোনো ঘটনায়, যেমন তাঁর প্রাক্-বিবাহ প্রণয়ের ক্ষেত্রে, "যে নাটকীয়তা ও রোমান্স রস আরোপ করেছেন তা সর্বত্র পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করেনা"।[২১৪] অন্যত্রও পাঠকের বিশ্বাস বিচলিত হয়, যখন সর্বাঙ্গদোষমন্ডিতা প্রথম পত্নীর নামে বিরূপ মশাররফ সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রেরণা পান। কেননা বিষয়টি শেষপর্যন্ত ব্যাখ্যাহীনই থেকে যায়।

বাঙলা আত্মচরিতের প্রেক্ষাপটে মুনীর চৌধুরী মশাররফের 'আমার জীবনী'র যে-মূল্যায়ন করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য ঃ

> মীর মশাররফ হোসেন সমকালীন জীবনবোধের কোন প্রধান ধারাকে সূচিত বা নিয়ন্ত্রিত করবার অবকাশ পাননি। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনের যে নবীন উৎকণ্ঠা ভাবে ও কর্মে শিক্ষিত বাঙালীর নাগরিক জীবনকে চঞ্চল করে তুলেছিল তার সান্নিধ্য বর্জন করে মীর সাহেব আজীবন মফস্বলে কাটিয়েছেন। নতুন যুগের নির্মাণকারী সহযোগী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের কথা যতো অবলীলাক্রমে রাজনারায়ণ বসু কি শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের আত্মকথায় উল্লেখ করেছেন মীর সাহেবের তা সাধ্যাতীত ছিল। তাঁর 'আমার জীবনী'র কথ্যবস্তুর লৌকিক পরিমণ্ডলটি দেশের হিন্দু-মুসলিম মানসের বিবর্তন বৃত্তে কোন অসাধারণ গৌরবের দাবীদার নয়। 'আমার জীবনী'র শিল্প-মর্যাদা কোন অকল্পিত, সুপ্রচারিত কর্মরাশির পটভূমিতে বিকাশ লাভ করেনি। এ একপ্রকার নিরবলম্ব একক সত্তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার রোজনামচা মাত্র, বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্ডিত হতে পেরেছে ততটাই আমাদের চিত্তজয় করেছে।[২১৫]

অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর শিল্প-প্রতিভার অবক্ষয়কালের রচনা হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাভঙ্গি, আন্তরিক অকপটতা, জীবনধর্মিতা, সমাজদৃষ্টি ও বস্তুনিষ্ঠার জন্য মশাররফের আত্মচরিত 'আমার জীবনী' বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বিবি কুলসুম

মশাররফ হোসেনের সর্বশেষ গ্রন্থ 'বিবি কুলসুম' (১৯১০)। 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর জীবনচরিত। পত্নীপ্রয়াণে কাতর উদ্‌ভ্রান্ত মশাররফের শিল্প-শোকোচ্ছ্বাস এই 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ।

পত্নীবিয়োগজনিত শোককাব্য বাঙলা কবিতার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। এ-বিষয়ক কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্মরণ' (১৯০৩), মোহাম্মদ দাদ আলীর 'ভাঙ্গাপ্রাণ' (১৯০৫), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' (১৯০৭), অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' (১৯১২) এই পর্যায়ভুক্ত বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। পত্নীশোককাতর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) বিচ্ছেদ-বিষাদের 'গদ্যকাব্য'। শোকশিল্পের এই ধারায় মশাররপের 'বিবি কুলসুম' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'বিবি কুলসুম' পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায় এখানে 'কথা' নামে চিহ্নিত। প্রথম অধ্যায়টি শিরোনামহীন। পরবর্তী অধ্যায়-সমূহের শিরোনাম যথাক্রমে 'বাল্য-জীবন', 'ভয়ানক ষড়যন্ত্র মুক্তী ও উন্নতী' এবং 'আমার কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার কথা ও কার্য্যবিবরণ'। পঞ্চম অধ্যায়টি দুইভাগে বিভক্ত, প্রথমাংশের শিরোনাম 'শেষ কথার প্রথমাভাষ' ও শেষাংশ 'কথা নাই—শেষ বিবরণ' নামে চিহ্নিত। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'লেখকের কথা' ও 'সুচনা' নামে উপক্রমণিকা এবং উপসংহারে 'সমাধি' নামে কুলসুম-স্মরণে রচিত একটি চতুর্দশপদী।

পাঠক সমীপে 'লেখকের মনের কথা'য় মশাররফ 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> অনেকেই স্ত্রীবিয়োগে, নানাবিধ রঙ্গবিরঙ্গের পদ্য, পয়ার ত্রিপদী চতুস্পদী অমিত্রাক্ষর লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। আমার সে সকল শক্তি এইক্ষণে নাই। ... কান্দিতে কান্দিতে মনের আবেগে যাহা ধারণা হইয়াছিল, কানেও শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই করিলাম। "কুলসুম জীবনী" লিখিলাম। এতকাল যে সকল কথা গুপ্ত ছিল তাহা প্রকাশ হইল। বার বৎসর পূর্ব্বে গাজি মিয়াঁ আপন বস্তানিতে কুলসুম বিবির অনেক কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"বউ" আখ্যা দিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথাও ইহাতে সংযোগ করিলাম।[২১৬]

'বিবি কুলসুম' মশাররফের দাম্পত্যজীবনের রমণীয় আলেখ্য। যে-রমণীকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন সুখ, সাফল্য ও কৃতি-তে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এ তারই অনবদ্য স্মৃতিচিত্র। মশাররফের পরিণয়-বিভ্রাটের কারণে তাঁর প্রথম দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। প্রথম পত্নীর প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সংসারে অশান্তি ও নৈরাজ্য হয়েছিল স্থায়ী। ফলে মশাররফ সংসারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁর নৈতিক অধঃপতন গভীর হয়। এই প্রেক্ষাপটেই বিবি কুলসুমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরিণয় এবং স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়।

১২৮১ সালের পৌষ মাসে কুষ্টিয়ার বারখাদা গ্রামের দরিদ্র কৃষক সদরুদ্দীন ও লালন বিবির কন্যা বিবি কুলসুমের সঙ্গে মশাররফের বিবাহ হয়।[২১৭] কুলসুমের পূর্বনাম 'কালী'। বিনোদিয়ার পীরসাহেব তাঁর নতুন নামকরণ করেন। মশাররফের দ্বিতীয় বিবাহ আত্মীয়স্বজন ও প্রথমা পত্নী অনুমোদন করতে পারেননি। ফলে মশাররফ নিন্দা-সমালোচনা-দুর্ব্যবহার-বিদ্রূপের সম্মুখীন হন। ঐসব কারণে সাময়িকভাবে তাঁকে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান করতে হয়। কিছুদিন পর তাঁরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে সপত্নী-বিবাদ এতোই প্রবল হয়ে ওঠে যে আজীজন্‌নেসা কুলসুমকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেন। কিন্তু সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিবাহ মশাররফের জীবনকে শান্তি, সুখ ও সাফল্যে পরিপূর্ণ করেছিল। মশাররফ বলেছেন ঃ

> কুলসুমকে নেকাহ করার পূর্ব্বে আমি মানবসমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত ছিলাম না।... ছ'মাসে ন'মাসে ১২ মাস তাঁহার [আজীজন্‌নেসা] সহিত আমার দেখা হইত কি না সন্দেহ। সংসারে টান ছিলনা। সংসার থাক্ বা অধঃপাতে যাক্—সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা। পাঁচ এয়ার লইয়া পঞ্চ মকারের সেবা করিতে পারিলেই হইল। পঞ্চ মকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পাঁচ এয়ারের মন যোগাইতে পারিলেই জীবন জুড়াইল।[২১৮]

কুলসুমকে তাঁর 'উন্নতির দৈব কারণ' হিসেবে উল্লেখ করে মশাররফ জানিয়েছেন, "আমি আমার জীবনে সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুম জন্য বিশেষরূপে ভোগ করিয়াছি।"[২১৯]

বিবি কুলসুম মশাররফের প্রযত্নে ও আপন চেষ্টায় নিজেকে স্বামীর যোগ্য করে তুলেছিলেন। নিরক্ষর কুলসুম স্বামীর প্রেরণায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কে অনুরাগ জন্মেছিল। রাজনীতি সম্পর্কেও মতামত-দানের মতো ধারণা অর্জিত হয়েছিল তাঁর। মশাররফের অনেক লেখার প্রেরণাও তিনি। অনেকক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন মশাররফ-রচনার প্রথম পাঠিকা বা শ্রোত্রী। নিয়মিত ডাইরী লিখতেন। তাঁর দিনপঞ্জিতে গার্হস্থ্যজীবনের ঘরোয়া কথার পাশাপাশি সামাজিক বা সাহিত্য-বিষয়ক টুকরো-প্রসঙ্গও পাওয়া যায়।[২২০]

পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে কুলসুম ছয় কন্যা ও পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। বহু সন্তানবতী হলেও কুলসুম পুত্র-কন্যাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। সাংসারিক কর্মে নিপুণা এই রমণী স্বামীসেবায়

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন নিবেদিতপ্রাণা। 'সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চা, আণ্ডা, আলুসিদ্ধ' স্বামীর জন্য প্রস্তুত থকতো।[২২১] জীবনের শেষ পর্বে কুলসুম স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "ধর্ম্মতঃ তোমার গা স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, পূর্ব্ব হইতে— আমার যৌবনকাল হইতে এখন তোমাকে চতুর্গুণ ভালবাসি।"[২২২] কুলসুম যথার্থ অর্থেই মশাররফের প্রিয় সহচরী ও ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন।

মশাররফ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কয়েকটি ত্রুটির কথাও নির্দেশ করেছেন। কুলসুম অতিমাত্রায় সন্দেহপরায়ণ ছিলেন, কান-কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিতেন। আর তার ক্রোধ ও উত্তেজনা ছিলো মাত্রাছাড়া। এ-সব কারণে মশাররফকে অনেকসময়ই তিরস্কার-ভর্ৎসনা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। এইধরনের দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখও করেছেন তিনি। পত্নীর প্রতি তাঁর প্রেম-প্রীতির সঙ্গে অনেকখানি সমীহও মিশ্রিত থাকতো।

স্বল্প রোগভোগের পর ১৩১৬ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ পদমদীতে বিবি কুলসুমের মৃত্যু হয়। পদমদীতেই শ্বশুর মোয়াজ্জম হোসেনের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবরগাত্রে স্থাপনের জন্য মশাররফ একটি চতুর্দশপদী সমাধিলিপি রচনা করেন। কুলসুমের মৃত্যু মশাররফকে সর্বস্বহারার মতো বিপর্যস্ত করে তোলে। শোকবিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত মশাররফ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন ঃ

> আমার দুইটী উপযুক্ত সন্তান ... এবং ... ছয়টি কন্যার বিয়োগে এত উতলা, এত জ্ঞানহারা এত পাগল হই নাই হৃদয়ে এত আঘাত লাগে নাই। ... একি হইল! হায়! হায়! আমার এ দশা কেন হইল? সময় সময় মনে হয়, আমার স্বর্ব্বস্ব গিয়াছে, সংসার গিয়াছে, ঘরকন্না গিয়াছে, একের অভাবে সমুদায় ধ্বংস হইয়াছে। আমার আর কিছু নাই।[২২৩]

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরী সঙ্গতভাবেই বলেছেন ঃ

> এই বইয়ের অনেক গুণ। রচনা আন্তরিকতাপূর্ণ, তথ্যের উল্লেখ সত্যাশ্রয়ী। চরিত্রসৃষ্টির কৌশল লেখকের আয়ত্তাধীন ছিল বলে তিনি মৃত ব্যক্তিকে নবজন্ম-দান করতে পেরেছিলেন। একটি বিশেষ কালের একজন কৃতী পুরুষের দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী রচনা করতে বসে মীর সাহেব একটা মৃত যুগকে চিরকালের জন্য জীবন্তরূপে তুলে ধরেছেন।[২২৪]

সত্যাশ্রয়ী লেখকের অকপটতা এই গ্রন্থকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। মশাররফের দাসী-সংসর্গের মিথ্যা সন্দেহে কুলসুমের উত্তেজিত হওয়া কিংবা ইঙ্গ-বঙ্গ বারাঙ্গনার গর্ভে মশাররফের ঔরসে সন্তান-জন্মের ঘটনা—কোনো কিছুই লেখক গোপন রাখেননি।[২২৫] অন্তরঙ্গ ঘরোয়া কথা পরিবেশনের সূত্র ধরে সামাজিক রীতি-নীতির অনেক প্রসঙ্গও এখানে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থের প্রধান গুণ ও ত্রুটি এর অনিয়ন্ত্রিত আবেগোচ্ছ্বাস। পল্লবিত ভাষার মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। এতে মীরের অকৃত্রিম পত্নীপ্রেম প্রতিষ্ঠিত হলেও শিল্পগুণ কখনো কখনো ক্ষুণ্ণ হয়েছে ঃ

> বিবি কুলসুম আমার জীবনীর জীবনী, জীবনের জীবনী নয়ন মনরঞ্জিনী, চিত্তহারিণী, চিত্তাকর্ষিণী, আমার কানে মধুরভাষিণী, সুহাসিনী, আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী, সমভাবে সুখদুঃখভোগিনী, মম চক্ষে কমলসদৃশ কমলা, সরলা, সতীসাধ্বী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, দয়াবতী, সর্ব্বকার্য্যে সুমতি, স্নেহবতী, সত্যপ্রিয়া, সত্যবাদিনী, সেবিকা, দাসী, পরিচারিকা, পাচিকা, ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী, পতিগতপ্রাণা, স্বামীসোহাগিনী, প্রণয়িনী, স্বামীপ্রেমে আত্মহারা ...।[২২৬]

শোক-জাগানিয়া স্মৃতি আবেগমথিত ব্যঞ্জনাময় ভাষার কারুকাজে কথাশিল্পের আভাসে কখনো প্রকাশিত। সান্ত্বনাহীন অনন্ত বেদনার উপলব্ধি মীরকে বিহ্বল ও দিশাহীন করে তোলে। কুলসুম-স্মৃতিতে আবিষ্ট শূন্যতার হাহাকারে পীড়িত মীরের চিত্তদোলার দৃষ্টান্ত ঃ

> আমি যে ঘ্রাণে আত্মহারা, মাতওয়ারা—যে ঘ্রাণে প্রাণমন শীতল করিত, তাহা আর এখন পাইনা।... আমার চক্ষু যে মুখখানি দেখিতে সর্ব্বদা ভালবাসে তাহা দেখিতে পায়না। .... কোথায় গেল? ঘরময় খুঁজি—পাইনা! —কোথায় গেল!—আমার এত সাধের,—আমার মন মত রূপের প্রীতিকর লাবণ্য জ্যোতিমাখা রূপরাশি জড়িত সে দেহলতা কোথায় গেল?—কোন্ নিয়তি বৃক্ষের আড়ালে লুকাইল? —কেন পাইনা?[২২৭]

এই আবেগ যে কতো তীব্র ও গভীর তা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়না যখন লেখক গ্রন্থের মূল্য প্রসঙ্গে বলেন, "এ জীবনীর মূল্য নাই, অমূল্য...।"[২২৮]

'জীবনীকারের নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী'র অভাবহেতু আবেগনির্ভর 'বিবি কুলসুম'কে কেউ কেউ 'Biography' বা 'জীবনী' না বলে 'Personal essay' জাতীয় 'মন্ময়ভাব প্রধান রচনা' হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন।[২২৯] বিষয়-বিশেষত্ব ও লেখক-মানসের উচ্ছ্বাস-আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনায় অসংলগ্নতা, অতিশয়োক্তি, প্রগল্‌ভতা ও পুনরুক্তি- দোষ যুক্ত হয়েছে।

পত্নী-বিয়োগে শোককাতর স্মৃতিতাড়িত এক প্রেমিক পুরুষের আত্মবেদনার করুণ কাহিনী এই গ্রন্থটি। হৃদয়ের অবিরল রক্তক্ষরণে রঞ্জিত এই রচনা তাই সর্বত্র শিল্পের শাসন মানেনি। তবুও এ-কথা স্বীকার্য যে, "মীর-মানসের অবক্ষয়ের কালে 'বিবি কুলসুম'ই একমাত্র রচনা, যার মধ্যে গ্রন্থকারের পরিণত শিল্পচেতনার সকল চিহ্ন অবলুপ্ত নয়।"[২৩০]

Dhaka University Institutional Repository

বিবিধ

মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা

মশাররফ হোসেনের লেখনী ছিলো বিচিত্রগামী। সৃষ্টি ও মননধর্মী সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি তিনি পাঠ্যপুস্তক বা ধর্মের ব্যবহারিক দিক নিয়েও পুস্তক রচনায় উদ্যোগী হন। 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' তাঁর পাঠ্যপুস্তকজাতীয় রচনা।[২৩১] এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে। এর প্রথম ভাগের প্রথম অংশ প্রকাশ পায় ১৩১৩ সালে। দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশকাল ১৩১৪ সাল।

বাঙলা শিশুশিক্ষার প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা পথিকৃতের। তাঁদের অসামান্য সিদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মুসলমানসমাজে এমন কোনো যোগ্য উদাহরণ নেই। তবে এ-ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, মীর মশাররফ হোসেন ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো।

মুসলমান বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' পুস্তক লিখিত। প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' মশাররফ এই জাতীয় পুস্তক রচনার বিশেষ কারণ আছে বলে স্বীকার করলেও তা ব্যক্ত করেননি। প্রথম ভাগের ছয়টি অধ্যায় বা 'পাঠ' নিম্নরূপ ঃ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার মাহাত্ম্য ও গুণাবলী, 'পয়গম্বরের কথা,' 'খোদাতালার কেরামত', 'উপদেশ', 'উত্তম বালক', 'প্রশ্ন-উত্তর'।

প্রথম ভাগ সমাদৃত হয় এবং "সকল স্থান হইতেই ইহার বর্ণ-পরিচয় বানান ইত্যাদির সর্ব্বপ্রথম অংশ"-এর চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় প্রথম ভাগের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়। মোট দশটি পাঠে এই প্রথম অংশ বিভক্ত। এতে আছে বর্ণপরিচয়, বানান, গণনা ও অংকনশিক্ষা।

প্রথম ভাগের প্রথম অংশের সমাপ্তি পাদটীকা থেকে জানা যায়, "দ্বিতীয় ভাগ মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষায় নব প্রচলিত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়মাদি চিত্রসমূহ সন্নিবেশিত" থাকবে।

সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তা, সৃজনশীলতা হ্রাস ও মূলত ব্যবসায়িক কারণেই মশাররফ 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা'র মতো পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দেন। পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা জরুরী হলেও তা মশাররফের ছিলোনা। ফলে সাময়িক সমাদর পেলেও স্থায়ী জনপ্রিয়তা তাঁর পাঠ্যপুস্তকের ভাগ্যে জোটেনি। এই প্রয়াস তাঁর সাহিত্যধারারও অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তাঁর সার্থকতা এখানেই যে, তাঁকে অনুসরণ করে বাঙালী মুসলমানসমাজে আরো অনেকে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক

Dhaka University Institutional Repository

রচনায় আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত হন। এই অকিঞ্চিৎকর পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব আর-একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাই মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন প্রসঙ্গ, কাহিনী ও শব্দাবলীর বহুল ব্যবহার তাঁর এই পুস্তকে পাওয়া যায়। ধর্মীয় সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর শিক্ষাচিন্তাকেও কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার স্বাক্ষর এই 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা'।

ঈদের খোতবা

ধর্মীয় উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে 'ঈদের খোতবা' পুস্তকটি ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি আরবী খোতবার 'উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ'। 'বাঙ্গালার মোসলমান ভ্রাতৃগণ সমীপে বিনীত নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকায় মশাররফ হোসেন খোতবার তর্জমা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> এক হাজার বৎসর যাহা হয় নাই, এত দীর্ঘ সময় মধ্যে যে দিকে কাহারও চক্ষু পড়ে নাই, ... আজ তাহাই সুসম্পন্ন হইয়া বঙ্গবাসী মোস্‌লেম ভ্রাতাগণের এক অভাব বিদূরিত করিল। দুই ঈদে বৎসরে দুইবার খোতবা পাঠ হয়...। মোসলেম-হৃদয় এতই সরল, এতই প্রশস্ত, ধর্ম্মকথায় এতই অনুরক্ত যে, খোতবার মর্ম্ম না বুঝিয়াই পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া— একাগ্রচিত্তে মনসংযোগে শুনিতে থাকেন। মাতৃভাষায় খোতবার ভাব, প্রকৃত অর্থ, উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পারিলে— মনের মলিনতা দূর হইয়া আরও আনন্দিত হইবেন। ধর্ম্মভাবে দ্বিগুণতর ভক্তি বৃদ্ধির সহিত শক্তি জন্মিবে। এইসকল ভাবিয়াই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলাম।... সমাজের উপকার সাধন জন্যই যথাসাধ্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ঈদের খোতবা বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

এখানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা এবং দুই ঈদের ছানী খোতবার বঙ্গানুবাদ সংকলিত হয়েছে। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীতে এই পদ্যানুবাদ সম্পন্ন। বিষয়গত সীমাবদ্ধতার জন্য শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর সঙ্গতকারণেই এখানে অনুপস্থিত। পুস্তকের শেষে লেখক 'নিবেদন' করেছেন ঃ

> খোত্‌বার কথা সব সহজে বুঝিতে,
> অনুবাদ করিলাম যথাসাধ্য মতে।
> ভুলচুক দোষত্রুটী অজ্ঞতাজনিত।
> হইয়াছে যাহা তাহা করি সংশোধিত,
> — পাঠ করিবেন। ......

Dhaka University Institutional Repository

লেখনীশক্তিকে অর্থোপার্জনের সহজ পথে পরিচালনার উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন নেই। ধর্মীয় প্রসঙ্গে আত্মমগ্ন ক্রম-বিবর্তিত মীর-মানসের পরিচয়ও এখানে প্রতিফলিত।

উপদেশ

'উপদেশ' একটি ক্ষুদ্রকায় পদ্য-পুস্তিকা। পুস্তিকাটি 'হজরত লোকমান তদীয় পুত্রকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ'। পুস্তিকাটি 'হজরত বেলালের জীবনী' কাব্যের শেষাংশে সংযোজিত।[২৩২] তাই এটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় কিনা সে-সম্পর্কে সংশয় আছে। তবে কাজী আবদুল মান্নান এই পুস্তিকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় এবং এটি কলিকাতা থেকে আশ্বিন ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয় বলে মত প্রকাশ করেন।[২৩৩] পুস্তিকার শেষে অনুবাদকের নাম, ঠিকানা ও সালের উল্লেখ আছে। 'লাহিনীপাড়া—কুষ্টিয়া, ১৩০৯ সাল'—সম্ভবত রচনার স্থান ও কাল-নির্দেশক তথ্য।

'উপদেশ' ত্রিপদী ও পয়ারে রচিত। অকাব্যিক নির্ধারিত বিষয় বলে এখানেও শিল্পগুণ অন্বেষণ নিরর্থক। উদাহরণ হিসেবে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করা যায় ঃ

অসভ্যের মত কথা চেঁচিয়ে ব'ল না।
কার মন্দ জন্য পরামর্শ করিওনা।।
খালি গায়ে ঘোড়া পিঠে কখনই উঠনা।
পাগল মাতাল সনে কথাটিও ক'রো না।।[২৩৫]

স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি মনোযোগী ও নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই ব্যক্তি ও সমাজশিক্ষার প্রয়োজনে মশাররফ মহাজ্ঞানী হজরত লোকমানের সদুপদেশ অনুবাদ করেন। এখানে তাঁর কোনো শিল্পগত অভিপ্রায় ক্রিয়াশীল ছিলোনা, সমাজহিতৈষণা ও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যই এখানে মুখ্য।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

বাঙালী মুসলমানের সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়। সাহিত্যচর্চার মতো সাংবাদিকতার বিষয়েও প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা- সম্পাদক কুমারখালীর কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও কলিকাতার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে। এই দুই প্রাজ্ঞ সাময়িকপত্র-পরিচালকের প্রেরণা ও তত্ত্বাবধানেই মশাররফের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি।[২৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সম্পাদনায় দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঃ 'আজীজন নেহার' ও 'হিতকরী'।

আজীজন নেহার

সাময়িকপত্র-প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'আজীজন নেহার' মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রয়াস। এই 'মাসিক' পত্রটি 'হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের উদ্যোগে' চুঁচুড়া থেকে মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[২৩৭] মীরের প্রথম পত্নী আজীজন্নেসার নামে এই পত্রিকার নামকরণ। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় 'আজীজন নেহারে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় 'নূতন পুস্তক ও পত্রিকা' শীর্ষক স্তম্ভে 'আজীজন নেহার' সম্পর্কে বলা হয় ঃ

> "আজীজন নেহার" মুসলমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা। আমরা ক্রমান্বয়ে ইহার ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখকগণ আমাদিগের পরিচিত, এই ইহাদের নবোদ্যম নহে, তবে সাহস করিয়া পত্রিকা প্রচার করা নূতন বটে।... ইহাতে যে কএকটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।... ভাষা অতি মনোরম। মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয়না, এমন কি অনেক আধুনিক হিন্দু লেখকের লিপিচাতুর্য্যকে ইহার নিকট বলিদান দিতে পরামর্শ দি।...[২৩৮]

'এডুকেশন গেজেটে' (১ মে ১৮৭৪/১৯ বৈশাখ ১২৮১; পৃঃ৪৪) 'শ্রী পূ—' ছদ্মনামে প্রকাশিত এক পত্রে এই 'মাসিক সংবাদপত্র' সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করা হয়, "দেখুন... মহম্মদীয়গণ মধুময় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ স্বাদগ্রহণে কেমন সমর্থ হইয়াছেন।"[২৩৯] পরের সপ্তাহে 'আজীজন নেহার' পত্রিকার আলোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেটে' বলা হয় ঃ

> আমরা সম্প্রতি দুইখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানির নাম ন্যাশনেল বাজট ... অপরখানির নাম আজীজন নেহার। হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবক ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মূল্যের ও প্রচারের সময়েরও এখন নিরূপণ হয় নাই। প্রচারকগণ লিখিয়াছেন 'এবারে মূল্যের কিছুই নির্ণয় করা গেলনা। পাঠকগণের উৎসাহসূচক পত্রিকা ও গ্রাহকগণের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলেই আগামী মাস হইতে পাক্ষিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।' এই পত্রিকাখানির বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই, এখানি মুসলমানের লিখিত, অথচ ইহাতে মুসলমানি বাঙ্গালার নামগন্ধ নাই, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার রীতিতে লিখিত। লেখকেরা উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা উভয় পত্রিকারই মঙ্গল কামনা করি।[২৪০]

Dhaka University Institutional Repository

চুঁচুড়ার 'সাধারণী' পত্রিকায় 'নূতন পত্রিকা' শিরোনামে 'আজীজন নেহারে'র প্রকাশকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করা হয় ঃ

> আজিজন নেহার, বঙ্গীয় মুসলমানগণের মুখস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, বড় আহ্লাদের বিষয়। সকল সম্প্রদায়েরই পৃথক্ পৃথক্ পত্রিকা থাকা উচিত। বিশেষত বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বড় অল্প নহে। নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু ১, ৮১, ০০৪৩৮ জন, মুসলমান ১,৭৬,০৯১৩৫ জন, সুতরাং নিজ বাঙ্গালায় হিন্দুমুসলমান প্রায় সমানই। অথচ মুসলমানদের হইয়া প্রায় কেহই কোন কথা কহেননা, এটি ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।..... আজিজন নেহার আমাদের একরূপ প্রতিবাসী। এরূপ উদারচেতা প্রতিবাসীর মঙ্গল হউক।[২৪১]

কিন্তু এই শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনের অব্যবহিত পরেই 'সাধারণী' 'আজীজন নেহার' পত্রিকার বিরুদ্ধে রুচিবিকারের অভিযোগ উত্থাপন করে একটি ব্যঙ্গাত্মক বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করে ঃ

> আজিজন নেহার। এই অভিনব পত্রের আমরা যথাযর্থই শুভানুধ্যায়ী। নহিলে সম্বাদপত্রের দ্বিতীয়বার সমালোচন সাধারণীতে সম্ভবে না। আজিজন নেহার ক্রমে একটি পক্ষীর দল হইয়া উঠিয়াছে। পত্র এই চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইতিমধ্যে ইহাতে কাকাতুয়া, বুলবুলি, টুনটুনি, দাঁড়কাক, ফিঙ্গে, ও তোতা দেখা দিয়াছে ; শুদ্ধ চিড়িয়াখানা প্রদর্লন [প্রদর্শন] করিয়াই আজিজন ক্ষান্ত নহেন, লক্ষ্মৌয়ের নবাব কৃত্রিম পাহাড়ে যোড়া সাপ দেখান ; ইহারা ইতিমধ্যে কেঁচো লাহির [বাহির] করিয়াছেন, বোধহয় ক্রমে সাপ বাহির করিবেন।
>
> বিদ্রূপ ত্যাগ করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করি, অভিনব পত্র সম্পাদকের এরূপ রুচি কেন? এ রুচি বিকৃতা।[২৪২]

এ-পর্যন্ত মূলত 'এডুকেশন গেজেট' ও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'ই ছিলো 'আজীজন নেহার' পত্রিকা সম্পর্কে ধারণার মূল উৎস। তবে কিছুকাল পুর্বে প্রাপ্ত মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, স্বরচিত জীবনবৃত্ত ও দিনপঞ্জিকায় 'আজীজন নেহার' সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[২৪৩] এর ভিত্তিতে এই পত্রিকার নামকরণ, প্রকাশের উদ্দেশ্য, প্রকাশকাল, প্রকাশ-ব্যবধান, স্থায়িত্ব, প্রকাশ-বন্ধের কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা যায়। ফলে 'আজীজন নেহার' পত্রিকা সম্পর্কে পূর্বসূরীদের অনেক অভিমত-অনুমান-সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের সুযোগ মিলেছে।

পত্নী আজীজন্নেসার প্রতি মশাররফের বিরূপ মনোভাব কখনো প্রচ্ছন্ন ছিলোনা। এই প্রথম পত্নী যে তাঁর জীবন বিষময় করে তুলেছিলেন সে-কথা জানাতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। তবুও এই

Dhaka University Institutional Repository

পত্নীর নামেই পত্রিকার নামকরণের বিষয়টি রহস্যজনক ও বিস্ময়কর। তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে জানা যায় ঃ

> প্রথম স্ত্রী আজিজননেসা।... এই স্ত্রীর নামেই 'আজিজন নাহার' পত্রিকা প্রকাশ করা।[২৪৪]

নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে আভাস দিয়ে বলেছেন ঃ

> পত্রিকার নাম আজিজন নাহার হইবার কারণ কি? আজ পর্য্যন্ত নামকরণ কেহই জ্ঞাত নহেন। এখন সময় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলাম। 'আজিজন নাহার'— 'প্রিয়দিন' এই অর্থের ভাব লইয়া পত্রিকার শিরোদেশে লিখিত ছিল ঃ
>
> 'দিনপ্রিয় উপহার দিলাম যতনে
> দীনপ্রিয় হের সদা সদয় নয়নে।"[২৪৫]

'আজীজন নেহার' পত্রিকার প্রকাশ-ব্যবধান নিয়ে মতভেদ আছে। অবশ্য এই বিভ্রান্তির জন্য মীরের বক্তব্যও অনেকাংশে দায়ী। তিনি কখনো এই পত্রিকাকে 'পাক্ষিক'[২৪৬] আবার কখনো বা 'মাসিক'[২৪৭] বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে একে 'মাসিক' বলে উল্লেখ করলেও আবদুল গোফুর [গফুর] সিদ্দিকী 'সাপ্তাহিক'[২৪৮] ও আলী আহমদ 'গ্রামবার্ত্তা'কে অনুসরণ করে 'পাক্ষিক'[২৪৯] বলে অভিহিত করেছেন।

'আজীজন নেহার' পত্রিকা প্রকাশের ফলে বাঙালীসমাজে, বিশেষ করে মুসলমানসমাজে বিশেষ আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ-সম্পর্কে মশাররফ তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন ঃ

> মাতামহীর স্বর্গারোহণের পর ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ 'আজিজন নাহার' নামে বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম। মুসলমানসমাজে এই বাঙ্গলা পত্রিকা বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালী মুসলমানসমাজ জানিত না বুঝিত না যে সংবাদপত্র কি? প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পরের ঘরে এরূপ খবরের কাগজ পাঠাইলে লাভ কি? সকল কথাই কি সত্য লিখা হয়? এত খবর পায় কোথা? যাহা হউক যিনি যাহা বলিতে লাগিলেন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম। বিচলিত হইবনা। যাহা সংকল্প তাহাই স্থির। প্রথম খণ্ডে "সুচনা" "কি লিখি" এই দুই প্রবন্ধ প্রকাশ হইল।[২৫০]

প্রচলিত ধারণা, মশাররফের হুগ্‌লী-অবস্থানকালে 'আজীজন নেহার' পত্রিকা চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে জানা যায় লাহিনীপাড়া থেকেই তিনি পত্রিকা পরিচালনা করতেন ঃ

> দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতা কি কৃষ্ণনগর যাই নাই। বাড়িতে বসিয়াই 'আজিজন নাহার' পত্রিকা পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি।......[২৫১]

পত্রিকা মোটামুটি দু'বছর চলেছিল বলে খবর পাওয়া যায়। অনুমান করা চলে, পত্রিকাটি চুঁচুড়া থেকে প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে মশাররফ সেখানে ছিলেন, তারপর লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন এবং এখান থেকেই পত্রিকা-সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পাদন করতেন।

মূলত সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরেও পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু অর্থাভাবে তা ব্যর্থ হয়। তিনি বলেছেন ঃ

> পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে। যে প্রেসে ছাপাইতাম তাহাদের অনেক টাকা বাকি পড়ায়—হুগলী বোধোদয় যন্ত্রে ছাপাইতে দিলাম। টাকা অভাবে ছাপান কাগজগুলি সেই প্রেসেই রহিয়া গেল।[২৫২]

'আজীজন নেহার' পত্রিকা কতোদিন চলেছিল সে-সম্পর্কে 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিতকরীর আত্মকথা' নিবন্ধ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ

> কুষ্টিয়া সবডিভিসন সৃষ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত এই হিতকরী লইয়া তিনখানি পত্রিকা প্রকাশ হইল। প্রথম গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, তাহার পর আজীজান্নাহার। আজীজান্নাহার দুই বৎসরকাল চলিয়াছিল....... ।[২৫৩]

প্রকাশকালের দিক থেকে নয়, জনপ্রিয়তা ও মানগত বিষয় বিবেচনায় এনে সাধারণভাবে 'আজীজন নেহার'কেই মুসলিম বাঙলা সাময়িকপত্র-সাধনায় প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করা চলে। 'হিতকরী' পত্রিকায় বলা হয়, "... মুসলমান লিখিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকা"র মধ্যে 'আজীজন্নাহার' পত্রিকাই প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৫৪] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও মন্তব্য করেছেন, 'আজীজন নেহার'ই "মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে... সর্ব্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত"।[২৫৫]

স্বল্পজীবী হলেও 'আজীজন নেহার' সমকালে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। সমাজ-হিতৈষণার আদর্শ নিয়েই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্য যে এই পত্রিকার ছিলো তা 'গ্রামবার্ত্তা'র (জুন ১৮৭৪) আলোচনা-সূত্রে জানা যায়। 'আজীজন

Dhaka University Institutional Repository

নেহার' সম্পাদনার অভিজ্ঞতা মশাররফের পরবর্তীকালের সাময়িকপত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

হিতকরী

'হিতকরী' মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত দ্বিতীয় পত্রিকা। 'হিতকরী'র উদ্বোধনী সংখ্যায় (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা) পত্রিকার প্রকাশনা-বিষয়ক নানা তথ্য পাওয়া যায়। এইসূত্রে 'হিতকরী'র প্রকাশকাল সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণালাভের সুযোগ মিলেছে। বলা হয়েছে ঃ

> হে। অনন্তশক্তি সম্পন্ন করুণাময়, কৃপাময়, কৃপাসিন্ধু ভববন্ধু ভগবান! তোমারই অনন্তগুণ আশ্রয় ও সহায় করিয়া হিতকরী ১২৯৭ সনের ১৫ই বৈশাখ প্রকাশ হইল। তুমিই রক্ষক, তুমিই প্রতিপালক। জীবনমরণ সকলই তোমার হস্তে। যাহা তোমার ইচ্ছা।[২৫৬]

এই সংখ্যায় প্রকাশিত নিবেদন থেকে 'হিতকরী' পত্রিকা সম্পর্কে আরো জানা যায় ঃ

> হিতকরী একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্রিকা। কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য মায় ডাকমাশুল বার্ষিক ২ টাকা। প্রতিমাসের ১৫ই আর সংক্রান্তির দিনে প্রকাশ হয়।... এজেন্টগণ নিকট ও হিতকরী আপীষ ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলেই হিতকরী পাওয়া যায়।[২৫৭]

'হিতকরী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ঃ

> সকলের হিতকথা, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হিতের আশা থাকে, সেই সকল কথাই হিতকরীতে প্রকাশ হয়। জাতিগত, কি ধর্ম্মগত কোন পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কিছু প্রকাশ হয়না।[২৫৮]

'হিতকরী' পত্রিকা কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হতে প্রকাশিত হতো। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন যথাক্রমে রজনীকান্ত ঘোষ ও দেবনাথ বিশ্বাস। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিলো দুই পাই। সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপা হতোনা। তবে মীরের অপ্রকাশিত স্বরচিত জীবনবৃত্ত থেকে যায় যে, তিনি "১২৯৭ সালে ১৫ই বৈশাখ হিতকরী নামক পত্রিকার সম্পাদক হয়েন।"[২৫৯] পত্রিকার অভ্যন্তরীণ প্রমাণও এই বক্তব্য সমর্থন করে।

টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' পত্রিকার ১২৯৯ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার একটি বিজ্ঞাপনে মশাররফ হোসেনকে 'সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[২৬০]

'হিতকরী' পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও দ্বিতীয় বর্ষে 'দাশাহিক' বা 'দাশহিক' হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থাৎ দশদিন পরপর) প্রকাশিত হতে থাকে।[২৬১] এই পরিবর্তন ব্যতীত পত্রিকার মূল্য, মুদ্রাকর, প্রকাশক, মুদ্রণালয়, এজেন্ট বা অন্য কোনো নীতি–বক্তব্যের রদবদল হয়নি।

প্রজাহিতসাধনের লক্ষে সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ নিয়ে 'হিতকরী'র আত্মপ্রকাশ। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে ঃ

> দুই দশ টাকা লাভের জন্য হিতকরী প্রকাশ হয় নাই। জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন উপায় না পাইয়া এই কুটিল ও জটিলপথ আশ্রয় করা হয় নাই। ন্যায্য বলিব, সত্য প্রকাশ করিব, সত্যাশ্রয়ে থাকিব, সাধারণের হিতকরকার্য্যে অবশ্যই যোগ দিব। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, আমরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমরা সকলের। একচখো দৃষ্টি আমাদের নাই। যেখানে অন্যায়, সেইখানেই আমরা, যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার সেইখানেই আমাদের কথা। আমরা প্রশংসার প্রত্যাশী নহি। আর্থিক সাহায্যের আশাও রাখিনা। সুতরাং আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। প্রথম সূচনায় বলিয়াছি, আমাদের প্রথম পূজনীয় ঈশ্বর, তৎপরেই রাজা ; গ্রাহকমাত্র না থাকুক, সাধারণে হিতকরী পাঠ না করুন, ক্ষতি নাই। যাঁহার নিকট জানাইলে দেশের উপকার হইবে, অত্যাচর অবিচার কমিবে, অন্যায়ের সুবিচার হইবে, কেবল তাঁহাকেই জানাইব। আর দেশের মান্যগণ্য লোক যাঁহাদের হৃদয় আছে, তাঁহাদের নিকট উপহারস্বরূপ উপস্থিত হইব। আর ভয় কি, কিসের আশঙ্কা?[২৬২]

এখানে লক্ষণীয় যে, রাজভক্তি ও রাজানুগত্যের প্রশ্নে 'হিতকরী' তার যুগকে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারেনি। তাই রাজদ্বারে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণের প্রয়াসই অবলম্বন করেছিল 'হিতকরী'।

'হিতকরী'র চলার পথ সুগম ছিলোনা। অনেক বিরুদ্ধতা ও বিরূপ সমালোচনা সহ্য করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। এই সমালোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈরিতার রূপ নিয়ে শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

অবশ্য নিন্দা-সমালোচনার পাশাপাশি 'হিতকরী'র প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের সন্ধানও মেলে। রায়ত-প্রজার অভাব-অভিযোগ এবং প্রশাসনিক ক্রটি-বিচ্যুতি-অব্যবস্থার কথা নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে 'হিতকরী' যথার্থ সামাজিক কর্তব্য পালন করে চলছে—'জনৈক গ্রাহকে'র পত্রে এই সপ্রশংস স্বীকৃতি-বাণী উচ্চারিত ঃ

> ইতিপূর্ব্বেও কয়েক সংখ্যাতে হিতকরীর প্রতি সাধারণের বিদ্বেষভাবের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

> হিতকরী কেন যে লোকের বিষ নয়নে পড়িতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।... হিতকরী ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিয়া লোকসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী, অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের সমর্থন, স্বদেশবাসীর মঙ্গলচিন্তা, এইসকল বিষয়ই তো হিতকরীতে দেখিতে পাই।... কুষ্টিয়ার বড়ই সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, হিতকরীর মত একখানি উচ্চ ও উদার মতের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া দেশের দুঃখকষ্টের কথা সাধারণ ও কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট জানাইতেছেন।[২৬৩]

'হিতকরী'র বিরুদ্ধে 'কোন ২ প্রস্তাবে প্রেরিত পত্রে সংবাদে মুসলমানি কথা থাকা' বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল।[২৬৪] এর যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়ে 'হিতকরী' মন্তব্য করে, ".. মাতৃভাষার সহিত ভ্রাতৃভাষার যোগ করিতেছি।.... ভাষার মিলনে ভালবাসার বৃদ্ধি। ইহাও আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে"।[২৬৫]

"দ্বিতীয় বর্ষে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে স্থানন্তরিত হয়"[২৬৬],— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশিত এই তথ্য সঠিক নয়। দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত 'হিতকরী' লাহিনীপাড়া থেকেই প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'নানা কারণে' তৃতীয় বর্ষে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়। এই পর্যায়ের সুচনাতেও মশাররফ যে 'হিতকরী'র সম্পাদক তা বেশ বোঝা যায়।[২৬৭] টাঙ্গাইলে 'হিতকরী' মুদ্রিত হতো আহমদী প্রেসে। টাঙ্গাইল-অবস্থানকালে মশাররফ এই ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী হন। মীরের অপ্রকাশিত দিনলিপি থেকে জানা যায়, 'চাকরি নাই কেবল প্রেস লইয়া হিতকরী কাগজ লইয়া আছি।'[২৬৮]

আশরাফ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, ১২৯৯ সালের ১০ই ভাদ্র সংখ্যা 'হিতকরী'তে সম্পাদক হিসেবে মোসলেমউদ্দীন খাঁ ও মুদ্রাকর হিসেবে সাধু সরকারের নাম ছাপা হয়।[২৬৯] উক্ত সংখ্যায় সহকারী সম্পাদক ও এজেন্ট হিসেবে কুষ্টিয়ার রাইচরণ দাসের নাম পাওয়া যায়। সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত না হলেও মশাররফ হোসেনই যে পত্রিকার নেপথ্য পরিচালক ছিলেন তার প্রমাণ পত্রিকা-অভ্যন্তরেই মেলে। পত্রিকায় দেলদুয়ার জমিদারবাড়ীর কলহ-বিবাদের অনেক ঘরোয়া খবর প্রকাশিত হয়। মীর তখন দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার। এ-ছাড়া টাঙ্গাইলের কোনো কোনো সরকারী কর্মকর্তাও মীরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এ-সব কারণে তাই স্বনামে পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিলোনা বলেই তাঁর বিশ্বস্ত মোসলেমউদ্দীন খাঁ-কে সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন ; — আশারাফ সিদ্দিকীর এই ধারণা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।[২৭০] এই পর্যায়ে 'হিতকরী' কতদিন চলেছিল তার সঠিক খবর জানা যায়না। তবে অনুমান করা চলে, মীরের টাঙ্গাইল-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীসময়ে মোসলেমউদ্দীন খাঁর সম্পাদনায় 'হিতকরী' পত্রিকা নবরূপে 'টাঙ্গাইল হিতকরী' নামে প্রকাশিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[২৭১] অবশ্য এই অনুমান সংশয়ের উর্ধে নয়। তবে

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে মিরজা আ. মু. আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় 'টাঙ্গাইল মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রের মুখপত্র' হিসেবে 'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা (১৬ অক্টোবর ১৯৬২) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পত্রিকাটি মাসিকে রূপান্তরিত হয় এবং এই পর্যায়ে পত্রিকা-পরিচিতিতে মুদ্রিত থাকতো— ' মাসিক হিতকরী (স্থাপিত ১৮৯২ — মীর মোশাররফ হোসেন)'।[২৭২]

টাঙ্গাইল-ত্যাগের সাত বছর পর মশাররফ পুনরায় 'কোহিনুর'-সম্পাদক এস. কে. এম. মহম্মদ রওসন আলীর [রওশন আলী চৌধুরী] (১৮৭৪—১৯৩৩) সহযোগে 'হিতকরী' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'কোহিনূর' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৬) শুরুর পূর্বে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন-পুস্তিকার শেষভাগে 'হিতকরী'র পুনর্প্রকাশ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, চতুর্থ বর্ষে " 'হিতকরী' ১৩০৬ সালের শুভ বৈশাখ হইতে নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানীভাবে বাহির হইবে।"[২৭৩]

৪র্থ বর্ষে নব কলেবরে প্রকাশিত হওয়ার উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন থেকে ধারণা করা যায় ৩য় বর্ষে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে মোটামুটি প্রায় একবছর চলেছিল। অবশ্য টাঙ্গাইলে 'হিতকরী' প্রকাশের সাত বছর পর পাংশা থেকে নবপর্যায়ে 'হিতকরী' পত্রিকা 'নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানীভাবে' প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তার সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে 'হিতকরী' পত্রিকা ১৮৯৯ সালে যে হিন্দু-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়।

১৮৯৯ সালে (বাঙলা ১৩০৬) ৪র্থ বর্ষের 'হিতকরী' পত্রিকা পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায়।[২৭৪] 'হিতকরী' এই পর্যায়ে কাঙাল হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত কুমারখালীর মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হতো। মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাকর কুঞ্জলাল দাস 'Inspector General of Registration, Bengal'-কে প্রেরিত প্রতিবেদন-পত্রে ১৮৯৯ সালে মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, 'fortnightly newspaper "Hitakari" 11 issues'.[২৭৫] এই একই সালে ৪ খণ্ড (4 Parts) 'কোহিনুর' পত্রিকাও মুদ্রিত হয়েছে এই প্রেস থেকে। এই পর্যায়ের 'হিতকরী' মশাররফ হোসেন ও রওশন আলী চৌধুরীর যৌথ উদ্যোগের ফসল কিনা তা জানা যায়না। তবে মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের ১৩০৭ সালের 'চিঠির নকল পুস্তক' থেকে 'হিতকরী' পত্রিকা সম্পর্কে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাঙলা ১৩০৭ সালে (১৯০০ খৃঃ) ৫ম বর্ষের 'হিতকরী'ও যে মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রেই মুদ্রিত হয়, এই 'চিঠির নকল পুস্তক' থেকে তার প্রমাণ মেলে। ৫ম বর্ষের 'হিতকরী' ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাস থেকে প্রাকাশিত হয়। কুমারখালীর বিশিষ্ট চিকিৎসক, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও 'চন্দন'-এর কবি নবদ্বীপচন্দ্র পাল

Dhaka University Institutional Repository

'হিতকরী'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁকে লিখিত মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাকর কুঞ্জলাল দাসের পত্র থেকে নবপর্যায়ে ৫ম বর্ষের "হিতকরী'র প্রকাশনা-প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যায় ঃ

> হিতকরীর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের সহিযুক্ত আদেশপত্র না পাইলে আমার মুদ্রাযন্ত্র হইতে হিতকরী ছাপাইতে গেলে আমাকে 'প্রেস এক্ট' অনুসারে দায়ী হইতে হইবে। অতএব নিবেদন অতঃপর হিতকরীর কাপি দিতে হইলে বা সংশোধন করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর আবশ্যক। শ্রীযুক্ত জ্যোতিবাবু [জ্যোতিপ্রসাদ সান্যাল] সম্পাদক বা স্বত্বাকিরী বলিয়া পরিচিত নহেন। অতএব তাঁহার দস্তখত আইনসঙ্গত নহে। যদি আমাকে তাঁহার দস্তখত গ্রহণ করিতে হয় তবে তাঁহাকে ঐরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা এ প্রকার দায়ীত্বহীন [দায়িত্বহীন] পত্র ছাপাইয়া আমি বিপদগ্রস্ত হইব। এই ভয়ে আপনাকে সমস্ত জানাইলাম। সত্বরে বিহিত বিধান করিয়া বাধিত করিবেন।[২৭৬]

এই পত্র থেকে বেশ বোঝা যায়, নবদ্বীপচন্দ্র পাল বা জ্যোতিপ্রসাদ সান্যাল নন, তৃতীয় একজন 'হিতকরী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং তিনি যে মীর মশাররফ হোসেন, সেই ধারণা অসঙ্গত নয়।

১৩০৭ সালের ৩০ বৈশাখের এক পত্রে জ্যোতিপ্রসাদ সান্যালকে 'হিতকরী'র সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মনে হয়, ইতোমধ্যে তিনি 'হিতকরী'র স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে নিয়মমাফিক সম্পাদকের দায়িত্বভার লাভ করেছেন।

এই পর্যায়ে, প্রকাশনার পঞ্চম বর্ষে, 'হিতকরী' ১৩০৭ সালের শেষভাগ পর্যন্ত যে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে এই 'চিঠির নকল পুস্তকে'। এই খাতার কীটদষ্ট শেষ পত্রটিও (ফাল্গুন) 'হিতকরী'-সম্পর্কিত। এখানে জ্যোতিপ্রসাদ সান্যালের উল্লেখ মেলে 'হিতকরী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে। একাধিক পত্রে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক যে ভিন্ন ব্যক্তি সেই উল্লেখ আছে।

পূর্ববর্তী সময়ে 'হিতকরী' মুদ্রণের জন্য মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের অর্থ-পাওনা ছিলো মশাররফ হোসেনের নিকটে। 'কোহিনুর'-সম্পাদক এস. কে. এম. রওশন আলীর বকেয়া আদায়ের জন্য বারবার প্রেস থেকে যে তাগাদা-পত্র প্রদান করা হয়, তারই একটিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অসহিষ্ণু প্রেস-মালিক কড়া ভাষায় উল্লেখ করেন ঃ

> ২৭/২৮ বৎসর প্রেসের কাজ হইতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত লোকের নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে হয় নাই। এক মীর মশাররফের সঙ্গে আর আপনার সঙ্গে করিতে হইতেছে, সে বোধহয় এক জাতীয়তার স্বভাব।[২৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৩০৭ সালের পর 'হিতকরী' আর প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়না। 'হিতকরী' মোটামুটি পাঁচ বছর চলেছিল, তবে তা বিরতিহীনভাবে নয়। ১২৯৭, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩০৬ ও ১৩০৭— এই পাঁচ বছর 'হিতকরী' প্রকাশিত হয়। তবে ১৩০০ থেকে ১৩০৫— এই ছয় বছর 'হিতকরী'র প্রকাশ পুরোপুরি বন্ধ ছিলো কিনা সে তথ্য অজ্ঞাত। এ-ছাড়া এ-রহস্যেরও সমাধান হয়নি, 'হিতকরী' পূর্ব-ঘোষিত যৌথ সম্পাদনায় 'খাঁটি নিখুঁত মুসলমানিভাবে' না বেরিয়ে হিন্দু সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে কেন প্রকাশিত হয়েছিল। যা-হোক, 'হিতকরী'র অন্তিম-পর্বে পত্রিকা বিষয়ে মশাররফের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিলোনা, যদিও তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী।

তথ্য-নির্দেশ

১. মুনীর চৌধুরী, *মীর-মানস,* (ঢাকা, ১৩৭৫, দ্বি-মু), পৃঃ ২৩

২. রূপাঙ্গিকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসের কারণে 'হজরত বেলালের জীবনী'-কে জীবনী-পর্যায়ভুক্ত না করে পদ্য-কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বিষয়-বিচারে ইতিহাসশ্রেণীতে পড়তে পারে, কিন্তু শ্রেণীকরণের নীতিতে এর স্থান হয়েছে উপন্যাস-উপাখ্যান পর্যায়ে। পদ্যাকারে লিখিত ইতিকাহিনী 'মদিনার গৌরব' কিংবা 'মোস্লেম-বীরত্ব' সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। এখানে উপকরণভিত্তিক বিষয় নয়, রূপাঙ্গিককেই শ্রেণীকরণের মাপকাঠি ধরা হয়েছে।

৩. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, ৫নং পাণ্ডুলিপি,* পৃঃ ১২৮

৪. *কাঙ্গাল হরিনাথ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৪১

৫. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৩-৭৪

৬. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'মীর মশররফ হোসেন', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৩৩

৭. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৩৫

৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৬২, তৃ-স), পৃঃ ২০৬

৯. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ৭৩

১০. *বাঙলা একাডেমী-পত্রিকা,* পৌষ, ১৩৬৩, পৃঃ ১৯

১১. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ১৪৫

১২. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২২২

১৩. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ৩২

১৪. *মীর-মানস,* পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

১৫. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য-সমীক্ষা,* (ঢাকা, ১৯৭৬), পৃঃ ৬১

১৬. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২২২

১৭. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ১৪৫

১৮. তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত, *কাদম্বরী,* (কলিকাতা, ১৯৬৮, দ্বি-স), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৮

১৯. আবুল আহসান চৌধুরী, *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার,* (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃঃ ৩৫

২০. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ১১৩

২১. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৩-৩৪

২২. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ৩৭

২৩. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ১৪৫

২৪. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৩৩ (পাদটীকা)

২৫. এ-বিষয়ে মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে শেখ ফয়জুল্লার 'জয়নাবের চৌতিশা', দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'ইমাম বিজয়', মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন', হায়াৎ মামুদের 'জঙ্গনামা', ফকীর গরীবুল্লার 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি কাব্য। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গোলাম সাকলায়েনের *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৯, দ্বি-স, পৃঃ ১৬১-২৩২) এবং আহমদ শরীফের *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা, ১৩৯০, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৫-৯২)।

২৬. বাঙলাসাহিত্যের আধুনিক পর্বে, মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র পাশাপাশি, গদ্যে-পদ্যে কারবালাকেন্দ্রিক রচনার সংখ্যা কম নয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য আবুল মা' আলী মুহম্মদ হামিদ আলীর (১৮৬৫-১৯৫৩) 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৫) ও 'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৯০৭), কায়কোবাদের 'মহরম শরীফ' (১৯৩৩) এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'মহাশিক্ষা কাব্য'। এ-ছাড়া আছে মতীয়ুর রহমান খানের (১৮৭২-১৯৩৭) 'এজিদবধ কাব্য' (১৮৯১), আবদুল বারীর (১৮৭২-১৯৪৪) 'কারবালা' (১৯১২), ফজলুর রহমান চৌধুরীর 'মহরমচিত্র' (১৯১৭), আবদুল মুনায়েমের (১৮৮৭-১৯৪০) 'পঞ্চশহীদ কাব্য' (১৯১৯), মৌলবী মোহাম্মদ রশীদের 'কারবালা' (১৯৩৬)।

২৭. মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, "We have just got over the noise of a Mohurrum I tell you what :— If a great poet were to rise among the Musulmans of India, he could write a magnificient Epic on the death of Hossen and his brother. We could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject."— দ্র. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি,* (কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৬১৯)।

২৮. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ দুই-তিন ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

২৯. *মীর-মানস,* পৃঃ ৪৫-৪৭

৩০. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য,* (ঢাকা, ১৯৬৯, দ্বি- স), পৃঃ ৪০৮-০৯

৩১. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৩২. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা, ১৩৭৬, দ্বি-স), পৃঃ ৬৬

৩৩. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ বাইশ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

৩৪. *মীর মশাররফ হোসেন,* (সিলেট, ১৯৫২), পৃঃ ১২

৩৫. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ৬৮

৩৬. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* পৃঃ ৬৮

৩৭. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৩৫

৩৮. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ৭৪

৩৯. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৩৫

৪০. *মীর-মানস,* পৃঃ ৪৭

৪১. ঐ, পৃঃ ৪৭-৪৮

৪২. মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে মশাররফের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই কাব্যগ্রন্থের যে কপিটি পাওয়া গেছে তার প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার মার্জিনেই অপ্রচলিত ও দুরূহ তৎসম শব্দের অর্থ তিনি স্বহস্তে লিখে রেখেছেন। মশাররফ-ব্যবহৃত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এই জীর্ণ কপিটি বর্তমান অভিসন্দর্ভকারের নিজস্ব সংগ্রহে আছে।

৪৩. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ,* (কলিকাতা, ১৯৫১), পৃঃ ১২৫

৪৪. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা,* (ঢাকা, ১৯৮১), পৃঃ ৫০

৪৫. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা,* (ঢাকা, ১৩৮৭), পৃঃ ৪৮

৪৬. *কথা ও কবিতা,* পৃঃ ৪৯

৪৭. *মীর-মানস,* পৃঃ ৫০

৪৮. *কথা ও কবিতা,* পৃঃ ৫১

৪৯. *শাশ্বত বঙ্গ,* পৃঃ ১২৫

৫০. ঐ, পৃঃ ১২৫

৫১. *মীর-মানস,* পৃঃ ৫০

৫২. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৩৭

৫৩. *মীর-মানস,* পৃঃ ৫০

৫৪. *শাশ্বত বঙ্গ,* পৃঃ ১২৫-২৬

৫৫. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৪৭

৫৬. ঐ, পৃঃ ১৫০

৫৭. ঐ, পৃঃ ১৪৯

৫৮. ঐ, পৃঃ ১৪৯

৫৯. ঐ, পৃঃ ১৪৮

৬০. *কথা ও কবিতা,* পৃঃ ৫৪

৬১. মশাররফ যে বঙ্কিম-রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ মেলে *উদাসীন পথিকের মনের*

Dhaka University Institutional Repository

কথা- য় । এখানে মশাররফ প্রসঙ্গত বলেছেন "... কবিবর বঙ্কীম যে চক্ষে আয়সার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে 'পজিসনে' তিলত্তমার 'ফটো' তুলিয়াছেন, যে তুলীতে কুন্দনন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন, ... পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলী, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতন্‌নেসার রূপগুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম" (ষড়বিংশ তরঙ্গ)। ভিন্ন সূত্রেও বঙ্কিম সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের ও যোগাযোগের বিষয়ে জানা যায়। *বঙ্গদর্শনে* মশাররফের দুটি গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে (*৫নং পাণ্ডুলিপি)* মীর লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকেই তিনি সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রেরণা লাভ করেন। তাই বলা যায়, বঙ্কিমের দ্বারা মশাররফ নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৬২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বিষাদ-সিন্ধুর গদ্যরীতি', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক-চৈত্র ১৩৯৩, পৃঃ ২৩

৬৩. *কথা ও কবিতা,* পৃঃ ৫২-৫৪

৬৪. *শাশ্বত বঙ্গ,* পৃঃ ১২৫

৬৫. *কথা ও কবিতা,* পৃঃ ৫২-৫৩

৬৬. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৩৪-৩৫

৬৭. কাজী মোতাহার হোসেন, 'মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা', *বাংলাসাহিত্যের সম্পদ,* (ঢাকা, ১৯৫৬), পৃঃ ৩৩-৩৪

৬৮. *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* পৃঃ ৬০৭

৬৯. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৪৭

৭০. ঐ, পৃঃ ১৪৭-৪৮

৭১. ঐ, পৃঃ ১৪৮-৪৯

৭২. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৪

৭৩. *শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯

৭৪. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ৬৫

৭৫. কায়কোবাদ, *মহরম শরিফ,* (ঢাকা, ১৩৭৭, নূ-স), পৃঃ ১০-১১('কৈফিয়ৎ')

৭৬. ঐ, পৃঃ ১১, ১৫ ('কৈফিয়ৎ')

৭৭. ঐ, পৃঃ ৩০ ('কৈফিয়ৎ')

৭৮. *কথা ও কবিতা,* পৃঃ ৪৯

৭৯. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৫

৮০. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ৭৫

৮১. ঐ, পৃঃ ১৫৮

৮২. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৩৮

৮৩. *মীর-মানস,* পৃঃ ৫৪

৮৪. *মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ,* ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৮৫), বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, পৃঃ চব্বিশ ('ভূমিকা')

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৩৮–৪০

৮৬. *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ৯৮

৮৭. এ-বিষয়ে দ্রষ্টব্য ঃ রাইচরণ দাস, *মনের কথা অনেক কথা,* (কলিকাতা, ১৩৮৪, কুমারেশ ঘোষ সংকলিত-সম্পাদিত, পৃঃ ৫৪–৫৮, ৮৩–৮৫)। রাইচরণ 'কেনী কাহিনী' এবং 'আরও কেনী কাহিনী ও ষ্টিফেন কাহিনী' শীর্ষক দুটি রচনায় কেনীর প্রকৃতি ও অত্যাচার সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অত্যাচারী কেনী সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পত্রে। গণেন্দ্রনাথের এক পত্রোত্তরে (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩) দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, "তোমার ২৭ মাঘের পত্রে নূতন প্রস্তাব হঠাৎ শুনিলাম। কেনী সাহেব ২০০০০০ টাকা দিয়া ছয় বৎসরের নিমিত্ত বিরাহিমপুর ইজারা লইবেক। ... কেনী সাহেবের অধীনে অধুনা যে সকল প্রজা আছে তাহার মধ্যে অনেক প্রজা তাহার দৌরাত্ম্য জন্য তাহার এলাকা হইতে পালাইতেছে। বিরাহিমপুর তাহার হস্তগত হইলে এখানকারও অবস্থা তদ্রূপ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। ছয় বৎসর হস্তগত হইবার পরে এ জমিদারী প্রজাশূন্য দেখিতে হইবেক।"— অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,* (কলিকাতা, ১৩৭৭, জিজ্ঞাসা-সংস্করণ), পৃঃ ৩৫১

৮৮. *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ১১১–১৫

৮৯. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৫৮

৯০. *মীর-মানস,* পৃঃ ৫৪

৯১. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৩৩–৩৪

৯২. মীর মশাররফ হোসেন, *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* (ঢাকা, ১৩৭৭), এ. কে. এম. শামসুল ইসলাম সম্পাদিত, পৃঃ ষোল ('ভূমিকা')

৯৩. নীলবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে নীলকর কেনী সা গোলামের বিরুদ্ধে আদালতে যে মোকদ্দমা দায়ের করেন তাতে কেনীর পক্ষের সাক্ষী ছিলেন মীর মোয়াজ্জম হোসেন। ১৭ নভেম্বর ১৮৬০ তারিখে মোয়াজ্জম হোসেনের সওয়াল-জবাবের আদালতের নথিপত্র বর্তমান অভিসন্দর্ভকারের নিজস্ব সংগ্রহে আছে।

৯৪. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৫৮

৯৫. বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী ক্যাটালগের সূত্রে আলী আহমদ সংকলিত *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*-তে এই তারিখের উল্লেখ মেলে। 'বস্তানী'তে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই, গ্রন্থের ভূমিকায় তারিখ পাওয়া যায় ১৫ আশ্বিন ১৩০৬। *Calcutta Gazette* (31 October 1900) পত্রিকায় বইটির প্রকাশকালের উল্লেখ আছে ৪ এপ্রিল ১৯০০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশের তারিখ জানিয়েছেন ১৮৯৯ (*স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৩৯)। অবশ্য মশাররফ *আমার জীবনী* (১ম খণ্ড, ১৩১৫)-তে 'বস্তানী'র প্রকাশকাল ১৩০৫ বলে যে উল্লেখ করেন তা সঠিক নয়। হয়তো অসতর্কতা কিংবা স্মৃতিভ্রষ্টতাবশত তিনি এই তারিখ দিয়েছেন।

৯৬. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ৩১০–১৬

৯৭. *বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ২০

৯৮. *মীর-মানস,* পৃঃ ১১১

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪

১০০. মীর মশাররফ হোসেন, *গাজী মিয়ার বস্তানী,* (ঢাকা, ১৩৬৭, দ্বি-স), আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পৃঃ দ+১. F('ভূমিকা'-খ)

১০১. *মীর-মানস,* পৃঃ ১১০

১০২. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ৮২

১০৩. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৭১

১০৪. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩

১০৫. ঐ, পৃঃ ২৫-২৬

১০৬. *ঢাকা প্রকাশ* (৭ ফাল্গুন ১৩০০/১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪, পৃঃ ৮-১০) পত্রিকায় 'প্রেরিত পত্র' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

"দেলদুয়ারের অন্যতমঃ ভূম্যধিকারিণী করিমন্নেসা খানমের ম্যানেজার মীর মশারাফ্ হোসেন যখন স্বীয় অন্নদাত্রীর অর্থের অযথা ব্যবহার করিতেছিলেন (কয়েকদিন হইল খানম সাহেবা মীর সাহেবের উপর ৫৫০০ টাকা তায়দাদের নিকাশ ডিক্রী করিয়াছেন।) এইসময় মীর সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, খানম সাহেবার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ আবদুল করিম আবুগজনবী সাহেব লণ্ডন হইতে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইয়াছেন, তিনি বাড়ীতে পঁহুছিয়া, ষ্টেটের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিবেন। তখন মীর সাহেব তাড়াতাড়ি স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। পদত্যাগ করিয়াই যে নীরব রহিলেন, এমন নহে, তিনি নিজের সাফাই দেখাইবার জন্য খানম সাহেবার বিরুদ্ধে সুধাকরে অনবরত তীব্র প্রবন্ধ লিখিয়া, মহা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন খানম ... সাহেবার পক্ষে এমন কোন উপযুক্ত লোক ছিলেন না, যে মীর সাহেবের কার্য্যের প্রতিবিধান করিয়া খানম সাহেবার ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন।

এইসময় আবদুল হামিদ খাঁ সাহেব, স্বীয় পরলোকগত প্রভুর পত্নী তত্রত্য অন্যতমা ভূম্যধিকারিণী রাহাতন্নেসা খানমকে মন্ত্রণা দিয়া স্বামীর বাড়ী হইতে নিয়া পৃথক কাছারী করতঃ খানম সাহেবার নাবালক পুত্র সুধীর ও মহা দয়াবান, মৌলবী আবদুর রহমান খাঁয়ের সঙ্গে মাতাপুত্রকে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন। এই সুযোগে মীর সাহেব রাহাতন্নেসা খানমের পক্ষে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া তাঁহার এই শান্ত সচ্চরিত্র পুত্রকে উচ্ছন্নে দেওয়ার মানসে নানারূপ বিবাদের আশ্রয় গ্রহণে এই সম্পত্তিটী বিনাশের পথ প্রশস্তপূর্ব্বক সবডিবিসনের উপরেই আপন বাসাতে প্রজাদিগকে প্রত্যহ তলব দিয়া আনিয়া ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করেন। এইসময় বাবু শিবচন্দ্র নাগ টাঙ্গাইলের সবডিবিসিন্যাল অফিসার; — তিনি নীরবে চাহিয়া দেখিতেছিলেন — যে তাঁহার শাসনাধীন স্থানে, তাঁহার চক্ষের উপরে দুইটী লোক অন্যায় পথ অবলম্বন করতঃ দুইটী প্রাচীনা অবলা ভূম্যধিকারিণীকে তাঁহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসহ উচ্ছন্নে দেওয়ার পথ করিয়াছেন।

এইসময় প্রজাকে অন্যায়রূপে কয়েদ রাখার অভিযোগে মীর সাহেবের উপর এবং অন্য অভিযোগে আবদুল হামিদ খাঁয়ের উপর কয়েকটি মোকদ্দমাই ফৌজদারীতে রুজু হয়। শিববাবুর বিচারে মীর সাহেবের এক বৎসর কারাদণ্ড হইল। শিববাবু এখানে ভ্রমে পতিত হইয়া, মীর সাহেবের অধিক দণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, এবং এই ভ্রম দোষেই মীর সাহেব আপীলে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। আর ইহা

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়া, আবদুল হামিদ খাঁ আপন মোকদ্দমা উঠাইয়া নিয়া সেরাজগঞ্জের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন করিয়াছিলেন। এখানে কেবল মশাররফ্ হোসেনকে অপেক্ষাকৃত অধিক দণ্ড দেওয়াই শিববাবুর একমাত্র দোষ। এছাড়া তাঁহার শাসনাধীন স্থানের দুইটী স্ত্রী ভূম্যধিকারিণীর ও তাঁহাদের নাবালক সন্তানদের সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার উপায় অবলম্বন করা তাঁহার যেমন কর্ত্তব্য ছিল, শিববাবু সেই কর্ত্তব্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত লোক দুইটীকে দুর্ব্বল করাতেই সম্পত্তি দুইটী (ঋণী হইয়াও) রক্ষা হইয়াছে।"

'বস্তানী'র 'ভোলানাথ' (শিবচন্দ্র নাগ), 'পয়জারন্নেসা' (করিমন্নেসা খানম), 'সোনা বিবি' (রাহাতন্নেসা খানম), জয়ঢাক (আবদুর রহমান খাঁ), 'দাগাদারী' (আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী), 'ভেড়াকান্ত' (মীর মশাররফ হোসেন) চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব ব্যক্তিকে মিলিয়ে এই বিবরণটুকু পড়লে মূল ঘটনার সূত্র উন্মোচিত হয়।

১০৭. *প্রদীপ,* পৌষ ১৩০৮, পৃঃ ৩৯

১০৮. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ৮৩

১০৯. *মীর-মানস,* পৃঃ ৬৮

১১০. *মীর মশাররফ হোসেন,* (সিলেট, ১৯৫২), পৃঃ ২১

১১১. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ১০২

১১২. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৪০

১১৩. *গাজী মিঁয়ার বস্তানী,* পৃঃ ১/ ('ভূমিকা')

১১৪. *মীর-মানস,* পৃঃ ১১১

১১৫. *প্রদীপ,* পৌষ ১৩০৮, পৃঃ ৪০

১১৬. *মীর-মানস,* পৃঃ ১০৯-১০

১১৭. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ৮৭-৮৯

১১৮. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ১৪০

১১৯. *মীর-মানস,* পৃঃ ৯৯

১২০. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ৮৩

১২১. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪১

১২২. *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* পৃঃ ৬০৬

১২৩. *বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ২০

১২৪. *প্রেম-পারিজাত* ও *হজরত ইউসোফ*-এর মূল পাণ্ডুলিপির খণ্ডাংশ মশাররফের পৌত্র সৈয়দ সাদুল্লা সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১২৫. *তহমিনা* উপন্যাসের ১৬৬ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্ম অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাকারে রক্ষিত আছে। — দ্র. *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* পৃঃ ৬০৭

১২৬. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮-৫৯

১২৭. *মশাররফ রচনা-সম্ভার* ২য় খণ্ডে *হাফেজ* পত্রিকায় প্রকাশিত তহমিনা উপন্যাসের প্রথম তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদই কেবল সংকলিত হয়েছে।

১২৮. *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ৮৮

১২৯. *হাফেজ* পত্রিকার চার কিস্তি বাদে মশাররফ-পৌত্র সৈয়দ সাদুল্লা সাহেবের সৌজন্যে তহমিনা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির কিছু খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে। *হাফেজ* পত্রিকায় প্রকাশিত অংশের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপির যথেষ্ট পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়।

১৩০. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ত্রিশ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

১৩১. ঐ, পৃঃ তেত্রিশ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

১৩২. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

১৩৩. *মীর মশাররফ হোসেন,* (সিলেট, ১৯৫২), পৃঃ ৬

১৩৪. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

১৩৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৭৪, তৃ-স), পৃঃ ৪১০

১৩৬. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২২৪

১৩৭. *মীর-মানস,* পৃঃ ৩৬

১৩৮. ঐ, পৃঃ ৩৬

১৩৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ ১৪৮-৪৯

১৪০. *মীর-মানস,* পৃঃ ৩৯

১৪১. *সোমপ্রকাশ* (৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০/১৯ মে ১৮৯৩, পৃঃ ৪২৩-২৪) পত্রিকায় বলা হয়, "যাঁহারা কলিকাতা অথবা তাহার সন্নিকটে বাস করেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন গল্পটি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। কিন্তু আমরা তাহা মনে করিনা, আমরা দূর মফস্বলস্থ কোন কোন জমীদারের চরিত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি, তাহাতে কোন রূপেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে গল্পটাতে অত্যুক্তি দোষের গল্প আছে। গ্রন্থকার ... দূর মফস্বলে বাস করিয়া থাকেন, অতএব মফস্বলের জমীদারেরা যে সকল কাণ্ড করেন তাহা তাঁহার অবিদিত নয়, হয়ত এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাঁহার অন্যতম জাতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, গল্পটীর সামান্যভাবই তাঁহার রূঢ় বর্ণনায় যথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, গ্রন্থকারের যদি কিছু মিথ্যা যোগ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তিনি নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়া গল্পটীকে সুশোভিত করিয়া তুলিতেন।"

১৪২. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, ৫নং পাণ্ডুলিপি,* পৃঃ ১২৭-২৮

১৪৩. *মীর-মানস,* পৃঃ ৪০

১৪৪. *বঙ্গদর্শন,* ভাদ্র ১২৮০

১৪৫. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* (কলিকাতা, ১৯৭৬, ষ-স),পৃঃ ১৪৮-৪৯

১৪৬. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৮

১৪৭. *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* পৃঃ ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৮

১৪৯. *সোমপ্রকাশ,* ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০/১৯ মে ১৮৭৩, পৃঃ ৪২৪

১৫০. গীতা মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা,* (কলিকাতা, ১৯৮১), পৃঃ ৭১

১৫১. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৩নং খাতা।*

১৫২. মীর মশাররফ হোসেন, *এর উপায় কি?,* (চট্টগ্রাম, ১৩৮১), আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, পৃঃ ৩-৫

১৫৩. ঐ, পৃঃ ৮

১৫৪. ঐ, আনিসুজ্জামানের ভূমিকা, পৃঃ ৬

১৫৫. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৯

১৫৬. সৈয়দ মূর্তাজা আলী (*প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ৯০) ও কাজী আবদুল মান্নান (*মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ 'ভূমিকা'-দশ) উভয়েই টালা-অভিনয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১৫৭. টালা-হাঙ্গামা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ঃ

ক. *Calcutta Review,* October 1897, PP. 391-94

খ. C.E. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors,* (Calcutta, 1902, 2nd ed.), PP. 1004-05

গ. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ৩য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৮১, দ্বি-স), পৃঃ ৭৭-৭৮

ঘ. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1884-1912),* (Dacca, 1974), PP. 201-02

১৫৮. *হাফেজ,* মে-জুন ১৮৯৭, পৃঃ ২০১

১৫৯. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *টালা-অভিনয়* প্রহসনের (কুষ্টিয়া, ১৯৭৯) ভূমিকাংশ (পৃঃ নয়-তেইশ)।

১৬০. *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* (ঢাকা, ১৯৬৬, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স)। আবদুল কাদিরের প্রবন্ধ 'কোহিনুর'-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৯।

১৬১. *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ৮৯

১৬২. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭

১৬৩. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৫

১৬৪. ঐ, পৃঃ ১৩৫

১৬৫. *মীর মশাররফ হোসেনের রচনাসংগ্রহ,* ১ম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'ভূমিকা', পৃঃ পনর-ষোল

১৬৬. বর্তমান আলোচনায় পরিচয়-জ্ঞাপনের সুবিধার্থ *সঙ্গীত লহরী*-কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদ্যগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৩১-৩২, ১২২, ১২৯

১৬৮. আবুল আহসান চৌধুরী, *কুষ্টিয়ার বাউলসাধক,* (কুষ্টিয়া, ১৯৭৪) পৃঃ ৩৩৭-৪৬

১৬৯. *কাঙ্গাল হরিনাথ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯-৪০

১৭০. দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চা', *সাহিত্য,* আষাঢ় ১৩২০, পৃঃ ১৯৫

১৭১. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ৬৮

১৭২. ঐ, পৃঃ ৬৯

১৭৩. ঐ, পৃঃ ৬৯

১৭৪. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *সঙ্গীত লহরী* (কুষ্টিয়া, ১৯৭৬) গ্রন্থের ভূমিকাংশ (পৃঃ নয়-ছাব্বিশ)।

১৭৫. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ বিশ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

১৭৬. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন, *আসল বাঙ্গালা গজল,* (নদীয়া, ১৩৩৭, চতুর্দশ সংস্করণ), পৃঃ ৩ ('বিজ্ঞাপন')

১৭৭. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৬৬

১৭৮. ঐ, পৃঃ ১৬৭

১৭৯. ঐ, পৃঃ ২৭৮

১৮০. ঐ, পৃঃ ২০৪

১৮১. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ তেতাল্লিশ ('গ্রন্থ-প্রসঙ্গ')

১৮২. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ২০৪

১৮৩. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, 'বাজীমাত', *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫, পৃঃ ১০৭-৩১

১৮৪. ঐ, পৃঃ ১০৭

১৮৫. ঐ, পৃঃ ১০৭

১৮৬. ঐ, পৃঃ ১০৭

১৮৭. ঐ, পৃঃ ১৩১

১৮৮. ঐ, পৃঃ ১২৭

১৮৯. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৫০

১৯০. ঐ, পৃঃ ২৫০

১৯১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'মীর মশাররফ হোসেনের গো-জীবন', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫, পৃঃ ৩

১৯২. গো-হত্যা বিষয়ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. ওয়াকিল আহমদের গ্রন্থ *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০-৫১)।

১৯৩. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৫৩

১৯৪. ঐ, পৃঃ ১৫৪

১৯৫. ঐ, পৃঃ ৭১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ,* (ঢাকা, ১৩৯৭), পৃঃ ১৫২

১৯৭. ঐ, পৃঃ ১৫৬

১৯৮. ঐ, পৃঃ ১৭২-৭৩

১৯৯. আবদুল গফুর, ' 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রণেতা মীর মোশাররফ হোসেনের জীবনে বিষাদ', *মূল্যবোধ,* দ্বিতীয় পত্র/জুলাই ১৯৮৩, পৃঃ ২৫

২০০. *সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ,* পৃঃ ১৭০

২০১. ঐ, পৃঃ ১৭১

২০২. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৪৯

২০৩. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ১০২

২০৪. একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে *আমার জীবনী-* র খণ্ড সংখ্যা দাঁড়ায় এগারো।

২০৫. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩

২০৬. ঐ, পৃঃ ৯

২০৭. *আমার জীবনী,* দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ চোদ্দ ('ভূমিকা')

২০৮. মশাররফ *বিবি কুলসুম* গ্রন্থে (পৃঃ ১) অপ্রকাশিত আত্মচরিত প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার জীবনের সুখ-দুঃখময় কর্ম্মফল কার্য্যফলসহ ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত লিখিত হইয়া ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে। তৎপরে বিশ বৎসরের ঘটনা অতি আশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত হইয়া কাপী আকারে পড়িয়া আছে। বর্ত্তমান ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত পঁচিশ বৎসর কয়েক মাসের ঘটনা লিখাই হয় নাই। তাহা লেখকের মাথায় হৃদয়ে কত ডায়েরিতে লিখা আছে।"

২০৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ এগার ('ভূমিকা')

২১০. ঐ, পৃঃ এগার ('ভূমিকা')

২১১. ঐ, পৃঃ চোদ্দ ('ভূমিকা')

২১২ শামসুজ্জামান খান, *নানা প্রসঙ্গ,* (ঢাকা, ১৩৯০), পৃঃ ১২

২১৩. ঐ, পৃঃ ১৮

২১৪. *মীর-মানস,* পৃঃ ১৮৩

২১৫. ঐ, পৃঃ ১৮১-৮২

২১৬. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ।/—। /

২১৭. কিন্তু কুলসুমের দেনমোহরের অংশ পরিশোধের জন্য মশাররফ ১৯০৩ সালের ২১ জানুয়ারী (৭ মাঘ ১৩০৯) পত্নী-বরাবর যে 'জমি বাটী বাগান' বিক্রয় খোষ কবালা, (দলিল নং ঃ ২৬৯/ ১৯০৩ সাল ; কুমারখালী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস) করে দেন, সেখানে মশাররফ-কুলসুমের বিবাহের তারিখ উল্লেখ করা হয় ৭ মাঘ ১২৮০।— দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃঃ ২৭।

২১৮. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

২১৯. ঐ, পৃঃ ১১১, ১২৫

২২০. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ২৯–৩০

২২১. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ২১৫

২২২. ঐ, পৃঃ ১২৮

২২৩. ঐ, পৃঃ ৫–৬

২২৪. *মীর–মানস,* পৃঃ ১৯৬

২২৫. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ১২৬, ১১৪

২২৬. ঐ, পৃঃ ৭

২২৭. ঐ, পৃঃ ৩

২২৮. ঐ, পৃঃ । /

২২৯. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* আধুনিক যুগ, পৃঃ ১০৩

২৩০. *মীর–মানস,* পৃঃ ১৮৯

২৩১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী, 'মীর মশাররফ হোসেনের 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' ', *লোকসাহিত্য পত্রিকা,* জানুয়ারী–ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃঃ ৮১–১৪৩।

২৩২. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, 'হজরত বেলালের জীবনী', *বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ১৩৬৭, পৃঃ ১৬

২৩৩. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ চল্লিশ ('গ্রন্থ–প্রসঙ্গ')

২৩৪. ঐ, পৃঃ ৭১৩

২৩৫. ঐ, পৃঃ ৭১৭

২৩৬. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২৩৬–৩৭

২৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক–পত্র,* ২য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৫৯, দ্বি–স), পৃঃ ১৪

২৩৮. *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* (মাসিক), আষাঢ় ১২৮১/জুন ১৮৭৪, পৃঃ ৭৭

২৩৯. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৬

২৪০. *এডুকেশন গেজেট,* ৮ মে ১৮৭৪

২৪১. *সাধারণী,* ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১/৮ জুন ১৮৭৪, পৃঃ ৯১–৯২

২৪২. ঐ, ২৯ আষাঢ় ১২৮১/১২ জুলাই ১৮৭৪, পৃঃ ১৫২

২৪৩. মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর সাহায্যে 'আজীজন নেহার' পত্রিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন শামসুজ্জামান খান। এ–প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য *সচিত্র সন্ধানী*–তে (সাহিত্য সংখ্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯; পৃঃ ১২–১৪) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম—আজিজাননাহার'।

২৪৪. ঐ, পৃঃ ১৩

২৪৫. ঐ, পৃঃ ১৩

২৪৬. অপ্রকাশিত স্বরচিত জীবনবৃত্তে মশাররফ উল্লেখ করেছেন, "১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ আজিজন্নাহার একখানি বাঙ্গলা পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করেন।" (*মশাররফের অপ্রকাশিত ২নং খাতা*)।

Dhaka University Institutional Repository

২৪৭. অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে মশাররফ লিখেছেন,"মাতামহীর স্বর্গারোহণের পর ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ 'আজিজন্নাহার' নামে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম।" (*সচিত্র সন্ধানী,* পূর্বোক্ত)।

২৪৮. *সাপ্তাহিক মোসলেম হিতৈষী* পত্রিকায় (মে ১৯১৭। আলোচ্য সংখ্যার নামপত্র ছিন্ন হওয়ায় প্রকাশের সঠিক তারিখ নির্ণয় সম্ভব হয়নি। তবে সংখ্যাটি যে ২১ থেকে ২৯ মে-র মধ্যে প্রকাশিত তার অভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে।) প্রকাশিত হয় আবদুল গোফুর [গফুর] সিদ্দিকীর প্রবন্ধ 'মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস'। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে 'আজীজন নেহার' পত্রিকা সম্পর্কে সিদ্দিকী বলেছেন, মশাররফ এর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং "সাধুভাষা বাঙ্গালায় আজিজোন্ নেহার লিখিত হইত"। কিন্তু তিনি এই পত্রিকার প্রকাশস্থান, স্থায়িত্ব বা প্রথম প্রকাশের তারিখ সংগ্রহ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন।

২৪৯. আলী আহমদ, 'মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'আজীজন নেহার' পত্রিকা', *লোকসাহিত্য পত্রিকা,* জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ২৭

২৫০. *সচিত্র সন্ধানী,* পৃঃ ১৪। 'সূচনা' ও 'কি লিখি' সম্পর্কে মশাররফের মন্তব্য, "এই দুইটি প্রবন্ধই মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে প্রথম প্রবন্ধ"। (*মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ২নং খাতা*)।

২৫১. *সচিত্র সন্ধানী,* পৃঃ ১৩

২৫২. ঐ, পৃঃ ১৪

২৫৩. *হিতকরী* (দাশাহিক), ২২ এপ্রিল ১৮৯১

২৫৪. ঐ, ৩০ আশ্বিন ১২৯৮

২৫৫. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'গাজি মিয়ার বস্তানি', *প্রদীপ,* পৌষ ১৩০৮, পৃঃ ৪০

২৫৬. *হিতকরী,* ১৫ বৈশাখ ১২৯৭

২৫৭. ঐ

২৫৮. ঐ

২৫৯. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ২নং খাতা।*

২৬০. আশরাফ সিদ্দিকীর প্রবন্ধ 'হিতকরী'। *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃঃ ২৯

২৬১. *হিতকরী,* ১০ বৈখাশ ১২৯৮

২৬২. ঐ

২৬৩. ঐ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮

২৬৪. ঐ, ২০ আষাঢ় ১২৯৮

২৬৫. ঐ

২৬৬. *বাংলা সাময়িক-পত্র,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯

২৬৭. *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* পৃঃ ২৯

২৬৮. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ১নং খাতা।*

২৬৯. *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* পৃঃ ৩০

২৭০. ঐ, পৃঃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

২৭১. ঐ, পৃঃ ৩৩

২৭২. *হিতকরী* (মাসিক), ১ এপ্রিল ১৯৬৮

২৭৩. আবদুল কাদির, 'কোহিনুর', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* পৃঃ ১১১

২৭৪. কুমারখালীর মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের ১৩০৭ সালের *চিঠির নকল পুস্তক*। আলোচ্য পত্র-নকল খাতার সাহায্যে লিখিত আবুল আহসান চৌধুরীর 'পুরনো দিনের চিঠিপত্র ঃ তার গবেষণামূল্য' (*সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ২২ শ্রাবণ ১৩৮৩) প্রবন্ধে 'হিতকরী'-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক পত্রগুলো সংকলিত হয়েছে।

২৭৫. *চিঠির নকল পুস্তক* (১৩০৭), ২১নং পত্র, ৫ মে ১৯০০

২৭৬. ঐ, ১০নং পত্র, ৮ বৈশাখ, ১৩০৭

২৭৭. ঐ, ৬৪নং পত্র, ২২ আষাঢ় ১৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজচিন্তার স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজচিন্তার স্বরূপ

ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব যেহেতু সমাজসত্তার গভীরে প্রোথিত, তাই তার চিন্তা-চেতনা কখনো দেশ-কাল-সমাজনিরপেক্ষ হতে পারেনা। স্বদেশ, স্বকাল ও সমাজ—সঙ্গত-কারণেই যে-কোনো মহৎ শিল্পীরই অন্বিষ্ট বিষয়। একদিকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অভিজ্ঞতা-বীক্ষণ, অপরদিকে বহিরঙ্গের দ্বন্দ্ব-সংঘাত—এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে একজন সৃষ্টিধর্মী মানুষের শৈল্পিক মনোজগৎ। মীর মশাররফ হোসেনের মনন-মানস এই সূত্রেই বিচার্য।

মশাররফ হোসেনের জীবৎকাল বঙ্গদেশের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও ঘটনাবলীকে স্পর্শ করেছে। উনিশ শতকের নবচেতনার কল্লোলমুখর কালে তাঁর জন্ম। সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, ওহাবী-ফারায়জী আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, মুসলিম মধ্যশ্রেণীর উন্মেষ ও বিকাশ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক-সূত্রে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যা—এ-সবই তাঁর কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে একজন সচেতন সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব।

মশাররফের রচনা বিশ্লেষণ করলে তাঁর সমাজচেতনার এবং প্রখর সমাজদৃষ্টির পরিচয় মেলে। সমাজ-সমস্যাকে চিহ্নিত এবং তা নিরাকরণের তাগিদ তাঁর অনেক রচনাতেই অনুভব করেছেন। তাঁর রচনার এক উল্লেখযোগ্য অংশ গভীরভাবে সমাজ-সম্পৃক্ত কিংবা ইতিহাস-সংলগ্ন। তাঁর এই পর্যায়ভুক্ত রচনার মধ্যে 'জমীদার দর্পণ', 'এর উপায় কি?', 'গো-জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া তাঁর কিছু কিছু অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রচনার কথা উল্লেখ করতে হয় যার মূল উপজীব্য সমকালীন সামাজিক-রাজনীতিক সমস্যা, যেমন—'টালা-অভিনয়', 'রাজিয়া খাতুন', 'নিয়তি কি অবনতি', 'সৎ-প্রসঙ্গ'। মীর-পরিচালিত পত্র-পত্রিকা 'আজীজন নেহার' ও 'হিতকরী'তে অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়তে তাঁর সমাজবোধের ও সমাজচিন্তার গভীর পরিচয় প্রতিফলিত।

এখানে মশাররফের রচনাবলী ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার আলোকে তাঁর সমাজচিন্তার পরিচয় বিষয়-অনুসারে ছয়টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে ঃ ১. সমাজ, ২. রাজনীতি, ৩. শিক্ষা, ৪. ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ৫. ধর্ম, ৬. অর্থনীতি। এই ছয়টি মূল বিষয়কে আবার বিভিন্ন উপ-শিরোনামে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ

সমাজ-বিষয়ক ভাবনা-চিত্র নিম্নোক্ত উপ-শিরোনামে উপস্থাপিত ঃ ক. কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাস, খ. সমাজদৃষ্টি ও নারী, গ. গার্হস্থ্যজীবন, ঘ. হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঃ মিলন-বিরোধের ধারা, ঙ. জমিদার ও অভিজাত শ্রেণী, চ. কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণী, ছ. নীলচাষ ও নীলকর-প্রসঙ্গ, জ. সামাজিক অবক্ষয়-অবনতি ও সমাজ-উন্নয়ন চিন্তা।

কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাস

বাঙালীর সমাজজীবন ছিলো লোকবিশ্বাস ও সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কার, অলৌকিকত্ব ও অতিপ্রাকৃতে আস্থা, বিজ্ঞান-বিরোধিতা মুসলিম-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমন কি মশাররফ হোসেন নিজেও এর ঊর্ধে ছিলেননা। মশাররফের রচনায় সেকালের লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জন্মকালের বিবরণ দিতে গিয়ে সবিস্তারে এই বিশ্বাস-সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

> আমার যে সময় জন্ম হয় সে সময় আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। ভূতও একশ্রেণীর ছিলনা। ভূত, প্রেত, দানো, গোদান—গরু মরিয়া ভূত হইলে তাহাকে গোদান কহে।.... ব্রাহ্মণ মরিয়া ভূত হইলে ব্রহ্মদত্তি হয়।... দুষ্ট ভূত চণ্ডাল যোগী, তাঁতী ধীবর (জেলে) চোরডাকাত। স্ত্রীলোক মরিয়া ভূত হইলেই প্রেতেনী বা পেতনী পরিচিতা হয়। নামে মাত্র মুসলমান অথচ মুসলমানিত্ব তাহাতে কিছুই নাই।... এই শ্রেণীর লোক মরিয়া ভূতযোনী প্রাপ্ত হইলে তাহারাই মামদো—লাল্লু—কাল্লু—লেলুয়া—ভুলুয়া ভূত হয়। তাহার পর শাকচুন্নি--পেঁচ-পাঁচি। ডাইন জীবন্ত স্ত্রীলোকই হইয়া থাকে। ডাইনে শিশুসন্তানের দেহের রক্ত চুষিয়া চুষিয়া খায়। ইহার পরও জেন্, পরি, দেও, দানব, দৈত্য নানা শ্রেণীর অপজীব সে সময়ে আমাদের দেশে চলাফেরা করিত।.... শিশু সন্তানদিগের জন্য পেঁচাপেঁচি নির্ধারিত ভূত। জাত-ঘরে তাহাদেরই অধিকার আধিপত্য।[১]

প্রসঙ্গত 'জাত-ঘরে'র যে-বর্ণনা দিয়েছেন মশাররফ তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। বহুকাল-প্রচলিত গ্রামীণসমাজের বিচিত্র বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র এখানে প্রতিফলিত। 'জাত-ঘরের বারান্দায় দিবারাত্র সমভাবে আগুন জ্বলিত'। নবজাতকের জন্মের পর আজান দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো, কেননা 'প্রত্যেকের মনে বিশ্বাস যে, আজানের আওয়াজ যতদূর বাতাসে লইয়া যায়,.... ততদূর ভূতপ্রেত দেও-দৈত্য দানো জেন্‌পরি—অধিকন্তু শয়তান থাকিতে পারেনা'। অশুভ শক্তির হাত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নবজাতককে রক্ষার জন্য 'জাত-ঘরের দরজার একপার্শ্বে গরুর মাথা, গো-হাড়, কাটা কুমড়ার ডাঁটাসহ পাতা কপাটে গায়ে চৌকাটের সঙ্গে' বেঁধে দেওয়া হতো। 'পেঁচ-পাঁচি'র অনিষ্ট-রোধের জন্য প্রহরার ব্যবস্থাও থাকতো। ষষ্ঠী বা 'ছয়কুলার রাতে'র গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কেননা এই রাতেই 'বিধাতাপুরুষ জাত-ঘরে এসে শিশুর কপালে তার সারাজীবনের কর্মফল লিখে রেখে যান। 'সকল বিদ্যায় শিশু পারদর্শিতা লাভ করিবে' এই আশায় 'ভাল কলম দোত কালি সাদা কাগজ, একখানা কলমকাটা ছুরি' কোনো উচ্চস্থানে এবং 'ঢোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠি সড়কি তরবার ইত্যাদি' তার শিয়রে রাখা হতো।[২] মশাররফের জাতক্রিয়াও 'সমাজে প্রচলিত' এই 'শাস্ত্রসঙ্গত' রীতি অনুসারেই সম্পন্ন হয়।[৩]

যাদু-টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁকে আস্থা-বিশ্বাস ছিলো প্রায় সর্বজনীন। এ-সব বিষয়ে মশাররফের নিজেরও বিশেষ বিশ্বাস, আগ্রহ ও অধিকার ছিলো।[৪] পীড়িতা লতিফনের রোগ-নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, "উপরিভাব অর্থাৎ ভূতপ্রেত জেনপরী শাকচুন্নীর কু-দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।"[৫] তাই অভিজ্ঞ ভূতের 'রোজা' আনিয়ে তাঁর রোগমুক্তির চেষ্টা চলে ঃ

> সে কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ করে, ধূপধুনা দিয়া মড়ার মাথা, চাঁড়ালের হাড় পূজা করে ভূত আনলে।.... প্রথম লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপির পর গালাগালি.............। উপদেবতা শান্ত হয়ে বোধহয় পিঁড়ির উপর বসলেন।.... শেষে অনেক কথার পর উপদেবতা বললেন, 'ও রোগ আর সারবে না। সারবার উপায় নাই'। এই কথা বলে উপদেবতা চলে গেলেন। ঘরখানা মড়্‌মড়্‌ করে উঠলো।[৬]

লতিফনের আরোগ্য-চেষ্টায় অন্যান্য 'রোজা'র কর্মকাণ্ডেরও আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছেন মশাররফ। অবশ্য এই 'রোজা'দের বুজরুকির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মশাররফ নিজেও তেলপড়া প্রয়োগে লতিফনের রোগমুক্তির প্রয়াস পান।[৭]

শিরনী ও মানত লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত ছিলো। 'জমীদার দর্পণে'র জীতু মোল্লার অন্যতম কাজ ছিলো 'মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা' প্রদান।[৮] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় সা গোলাম বিপদভঞ্জনের জন্য—"মনে মনে কত পীর, কত ফকির দোরবেশদিগের দরগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মাণিকপীরের খাজা, বড়পীরের মলিদা, মুস্কিল আসানের রোজা, কত কি মানত করিলেন।"[৯] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে সোনা বিবিকে বৈরী পুত্র জয়ঢাককে ফিরে পাওয়ার জন্য গুরুজী ও বেদেনীর অলৌকিক শক্তির উপর ভরসা করতে দেখা যায়।[১০] হাঁচি-টিকটিকির সংস্কারের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়।[১১] জন্ম-পত্রিকায় বর্ণিত ভাগ্যফলে আস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলেও মশাররফ অবশ্য তাতে বিশ্বাসী ছিলেন না।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

অলৌকিক ঘটনাসম্বলিত কাহিনী–কিংবদন্তীর পরিচয়ও মশাররফের রচনায় পাওয়া যায়। গৌরীনদীর উৎপত্তি কাহিনী[১৩] কিংবা তাপসপ্রবর সৈয়দ সাদুল্লার কবরের দিক–পরিবর্তন অলৌকিক ঘটনার চূড়ান্ত নিদর্শন।[১৪] আলোচ্য দৃষ্টান্ত স্মরণে রাখলে 'বিষাদ-সিন্ধু'তে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংযোজন মশাররফ–মানসের সঙ্গে যথেষ্টই সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হবে।

সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অধিবাসী হিসেবে মশাররফের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠতে পারেনি। তাই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের অযৌক্তিক বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন ঃ

> .... ডারউইন মহোদয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, এতকাল পরে তাঁহাকেই কি, সেই বিপিন–বিহারী মহোদয়কে কি—সেই আদিস্থানে বসাইব ?... সেই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জাতির কথায় কি শাখামৃগ বাহাদুরকে আদি জন্মদাতা স্বীকারে মর্কটদলের সহিত সম্বন্ধ পাতাইব ? ... মানুষ হইয়া বানরের বংশধর স্বীকারে জ্ঞান–বিজ্ঞান রাজ্যের অধিকারী হইব। "নাউজ বিল্লাহ"।[১৫]

মানব–জন্মরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মশাররফ অনুমোদন করতে পারেননি।[১৬]

সমাজদৃষ্টি ও নারী

বঙ্গীয় সমাজে চিরকালই নারীর মূল্য ও মর্যাদা ছিলো অস্বীকৃত। নারী মূলত সন্তানের জন্মদাত্রী, গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ডের পরিচালিকা ও ভোগের সামগ্রী হিসেবেই বিবেচিত হতো। পর্দাপ্রথা, অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহজনিত সপত্নী-জ্বালায় অবরোধবাসিনী নারীর জীবন ছিলো দুর্বিসহ। অন্তঃপুরের নারীর বেদনা মশাররফ পারিবারিক সূত্রেই জেনেছিলেন। পিতার পরনারীতে আসক্তি তাঁর অবহেলিতা জননীর অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছিল। সপত্নী–বিবাদে পারিবারিক জীবন যে কতো অসহনীয় হয়ে ওঠে, সে–অভিজ্ঞতা মশাররফের নিজের জীবনেই অর্জিত হয়েছে। নারীর দুঃখ–বেদনা–অবমাননা মশাররফ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা তাঁকে স্পর্শও করেছে। নারীর শিক্ষা ও স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত অনেকাংশে অনুকূল ছিলো। তাঁর প্রযত্ন ও প্রেরণায় পত্নী বিবি কুলসুম লেখাপড়া শিখেছিলেন, সাহিত্য কিংবা রাজনীতি সম্পর্কে মতামত-দানের মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। 'মোসলমান সমাজে পর্দার প্রথা সে সময় খুব প্রবল'[১৭] থাকলেও পর্দা মান্য করেই মশাররফ পত্নী কুলসুমকে নিয়ে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে থিয়েটার–বায়োস্কোপ দেখতে ও ঘুরে বেড়াতে দ্বিধা করেননি।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

তবে তিনি নারীর অবাধ মেলামেশা ও স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনকে সমর্থন করেননি। এর কুফল সম্পর্কে ধারণা দিয়ে স্খলিত চরিত্র অভিজাত রমণীকুলকে ধিক্কার দিয়েছেন 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে। নারী-প্রগতি ও নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মশাররফ ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের মতোই রক্ষণশীল ও দ্বিধান্বিত। শ্বেতাঙ্গ নরনারীর সংকোচহীন অবাধ মেলামেশার পরিপ্রেক্ষিতে মশাররফ মন্তব্য করেছেন ঃ

এ দেখে এদেশে নারী-স্বাধীনতা কাজে
মত দিতে বিধি মতে হৃদে শেল বাজে।

[গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু]

বাঙালীসমাজে নারী একসময়ে আক্ষরিক অর্থেই পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। উনিশ শতকেও যে দাসী-বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় হতো সে-খবর মশাররফের বক্তব্যে জানা যায় ঃ

> মাতামহ রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে টাকা দিয়া দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইতেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে সে সময় পিতা কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে যথেষ্ট টাকা পাইলে, অথবা দীনদুঃখী লোক কন্যা ভগ্নী স্ত্রী বিক্রয় করিত। আমাদের বাটীতে ৩০/৩২ জন দাসী ছিল।[১৯]

এরা বংশানুক্রমে দাসীবৃত্তি করতো এবং প্রায়ক্ষেত্রেই গৃহস্বামীর ইন্দ্রিয়সুখের উপকরণ হতো।

সমাজে নারীর অবস্থা ছিলো করুণ ও শোচনীয়। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় মিসেস্ কেনীর গভীর পর্যবেক্ষণে এদেশের নারীসমাজের আটপৌরে জীবনযাপন পদ্ধতি ও নিরতিশয় দুরবস্থার চালচিত্র ধরা পড়েছে ঃ

> আহা সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগে। তাহারা যে বন্দিনী। চিরবন্দিনী। ঘাটে মাঠে বাহির হয়না। সর্ব্বদা মাথা মুখ ঢাকিয়া থাকে। অপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা কহা দূরে থাক্ হঠাৎ নজর পড়িলেই ঘরের মধ্যে লুকায়। একটু বেশী বয়স হইলে জন্মদাতা পিতার সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধ করে।.... স্বামীসহ সর্ব্বদা একত্র উঠাবসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয়না।.... পুরুষেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা পুরুষেরাই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। স্বামীমুখে কত কথা শুনিতেছে, কত বকুনী খাইতেছে সময় সময় অনেকে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতেছে, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। নালিশ নাই, ফরিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে। স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ্য করে।[২০]

'পতিই সতীর সর্বস্ব ধন' এই আপ্তবাক্যই নারীর দাম্পত্যজীবনের বীজমন্ত্র, তাই "স্বামী পদসেবা করাই কুলস্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম"।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর স্বাধীনতা বা বক্তব্য প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিলোনা। বিশেষ করে বিবাহ-বিষয়ে নারীর মতামতের কোনো মূল্যই ছিলোনা। মশাররফ উল্লেখ করেছেন ঃ

> .... আমাদের সমাজের গতি চমৎকার, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।.... পিতা মাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাঁহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন, যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না, এই যে এক ভয়ানক প্রথা, ইহারই জন্য আমার প্রাণ সর্বদা কান্দে।[২২]

শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিতা মুসলিম নারীর ছকে বাঁধা জীবন ও তার বিড়ম্বনার বিবরণ 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে মেলে ঃ

> মুসলমান রমণী মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিখবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবার বুদ্ধি নাই, বিঘোর দুনিয়ার মারপেঁচ চক্র বুঝিয়া হস্ত পরিমিত স্থান অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই, কপট কৃত্রিম বাছিয়া পরিত্যাগ করার ক্ষমতা নাই, শত্রু-মিত্র চিনিবার চক্ষু নাই। সাত-পাঁচ কত হয়—গণিয়া বলিবার বিদ্যা নাই, সৎ-অসৎ বিচার করিয়া কার্য্য করিবার মাথা নাই।[২৩]

শাস্ত্রাচারনিয়ন্ত্রিত পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অমর্যাদা, নিগ্রহ, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাবিকাশের অন্তরায় অত্যন্ত স্বাভাবিক। নারীর প্রতি সমাজে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মশাররফের রচনায় প্রতিফলিত।

গার্হস্থ্যজীবন

মশাররফের পর্যবেক্ষণশক্তি ছিলো প্রখর। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবন ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় খুঁটিনাটি প্রসঙ্গও উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা পড়েছে। সমাজচিত্র হিসেবে এ-সব বর্ণনা-বিবরণের মূল্য অপরিসীম। তাঁর আত্মচরিত, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রামীণসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের চালচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি, আবরণ-আভরণ, জীবনচর্যার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। আত্মচরিতে মশাররফ লিখেছেন ঃ

> সে সময় সধবা স্ত্রীলোকের নাকে কানে হস্তে কোন না কোন অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার থাকিত। সাধারণ কৃষক, কারিগর শ্রেণীর হাতে পায়ে কাঁসার অলঙ্কার, জোলাহাদিগের হাতে পায়ে দস্তার অলঙ্কার শোভা করিত। অবস্থা ভাল হইলে কানে সাধারণ চাঁদীর ঝুমকা ব্যবহার হইত। ..... যাহাদের বাড়ীর নিকটে নদী, গরীব ভদ্রঘরের মেয়ে হইলেও সে সময়ে নদীতে নামিয়া স্নান করিত। এইক্ষণে অনেকস্থানে পূর্বভাব নাই, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সভ্যতা

Dhaka University Institutional Repository

> প্রথা সাধারণ কৃষক গার্হস্থ্য সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। কাঁসার অলঙ্কার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, থালা বাটি গ্লাসেও কাঁসার ভাঁজ পাওয়া যায়না। ইনেমেল, চিনে কাঁচ, কাঁসার বাসনের স্থান অধিকার করিয়াছে। কাঁসা, দস্তার স্থানে অঙ্গে সোনা রূপা কাঁচ উঠিয়াছে। সেইসময় বিধবার অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার শোভা পাইত না। এখন আর সে কাল নাই। বিধবা সধবা চেনা ভার।[২৪]

এই প্রসঙ্গে গ্রাম্য রমণীর আটপৌরে পরিধেয় বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায় ঃ

> সে সময় চরখার হাতকাটা সূতায় গ্রাম্য জোলাহারা হাত-তাঁতে যে কাপড় বুনাইত, তাহাই সকলের ব্যবহার্য ছিল। সে কাপড় গৃহস্থ মেয়েদের বিশেষ উপযোগী। একখানা কাপড় হইলে এক বৎসর যাইত। সে কাপড় এত পুরু ঘন বুনানী যে জল বাঁধিয়া এক ক্রোশ পথ অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইত। ময়লা হইলে ক্ষারে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইলে ধবধবে সাদা হইত। অঙ্গাবরণের অধিক উপযোগী ছিল। ভিজিয়া গায়ে সাট হইয়া লাগিয়া গেলেও দেহের বর্ণ ফুটিয়া বাহির হইত না।[২৫]

গ্রামীণসমাজে অতিথির আদর-আপ্যায়নে যে আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে তার পরিচয় ঃ

> আগন্তুক বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত। জকী আদর করিয়া একখানি পিঁড়ী আনিয়া দিল, আগন্তুক ভ্রাতা ছাতিলাঠি সম্মুখে রাখিয়া পিঁড়ী পাতিয়া বসিল। তখনই তামাক, তখনই হাতপা ধুইবার জল, তখনই জলযোগের (নাস্তার) খই, বাতাসা ভাইয়ের সম্মুখে....।[২৬]

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঃ মিলন-বিরোধের ধারা

বাঙালীসমাজে হিন্দু ও মুসলমানের সংঘাত ও সম্প্রীতির দুটি ধারা বহুকাল ধরে সমান্তরাল প্রবহমান। মধ্যযুগ ও আধুনিককালের সাহিত্যে যেমন জাতিবৈর মনোভাব তেমনি সম্প্রদায়-সম্প্রীতির পরিচয়ও প্রতিফলিত। মশাররফের রচনাতেও হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন-বিরোধের ধারা অনুপস্থিত নয়। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ও বুদ্ধিজীবী। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতির শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন পারিবারিক সূত্রেই। মশাররফের পিতা মোয়াজ্জম হোসেন উদার মনের ও মতের মানুষ ছিলেন। হিন্দুর গৃহে আহার-বিহারে তাঁর কখনোই আপত্তি ছিলোনা। সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার গরজে দুর্গোৎসবে সমশ্রেণীর হিন্দু বিত্তবানের আমন্ত্রণরক্ষায় কখনো অনাগ্রহী হননি। মশাররফ-পিতার সম্প্রদায়-সম্প্রীতি কামনার পরিচয় মেলে নীচের উক্তিতে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠকালে গৃহ থেকে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য মশাররফের বন্ধুজনেরা নির্বিচারে সাগ্রহে গ্রহণ করতেন। এই খবর জেনে আনন্দিত মশাররফ-পিতা মন্তব্য করেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> হিন্দুমুসলমান এরূপ প্রণয়ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখ আর কোন সুখে নাই।[২৭]

অসম্প্রদায়িক চেতনার প্রাথমিক দীক্ষা মশাররফ পারিবারিকসূত্রেই লাভ করেছিলেন।

মশাররফের শিল্প-সাহিত্যে সম্প্রদায়-সম্প্রীতি ও উদার পরধর্ম-সহিষ্ণুতার বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রবল প্রেরণায় ও জাতিবৈর মনোভাব অপনোদনের লক্ষে তিনি 'গো-জীবন' (১২৯৫) রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'গো-জীবনে' হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঐক্য ও একাত্মতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারিনা। আপদেবিপদে, সুখেদুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই।
>
> [প্রথম প্রস্তাব]

হিন্দু-মুসলমানের এই সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলে বিবেচনা করেছেন মশাররফ। তাঁর স্পষ্ট ও দৃঢ় অভিমত ঃ

> কালে আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু-মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেনা। —জগত যতদিন--সম্বন্ধও ততদিন।
>
> [প্রথম প্রস্তাব]

'সঙ্গীত লহরী'র (১২৯৪) কয়েকটি গানেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। 'শ্রী শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জুবিলি উপলক্ষে' রচিত গানে 'ভিক্টোরিয়া গুণগান' কীর্তনের জন্য একত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

> এস হিন্দুমুসলমান, কেন আর অভিমান,
> জাতিহিংসা, ধর্ম্মদ্বেষ, ভুলি আজি সবেরে।।
>
> [৫০ সংখ্যক গান]

জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে বৃহত্তর প্রয়োজনে এই দুই সম্প্রদায় যে একাত্ম হতে পারে সে-কথাও মশাররফ উল্লেখ করেছেন 'সঙ্গীত লহরী'র শেষ গানে ঃ

> নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দুমুসলমান।
> ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণরে।।
>
> [৯১ সংখ্যক গান]

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফের অগ্রন্থিত 'টালা-অভিনয়' (১৮৯৭) প্রহসনে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। কলিকাতার টালা-অঞ্চলে একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে এই প্রহসনটি রচিত। টালা-হাঙ্গামায় মুসলমানদেরই দায়িত্ব ছিলো অধিক। ঘটনাপ্রবাহ এবং নেতৃবৃন্দের প্রচারপত্রও এই ধারণা সমর্থন করে। টালা-ঘটনায় মশাররফ বিশেষ বিচারবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। এই ঘটনায় স্বজাতি-স্বধর্মীদের প্রতি যুক্তিহীন আবেগবশত কোনো অন্যায় সমর্থন ও সহানুভূতি তিনি দেখাতে চাননি।[২৮]

মশাররফের সমাজচিন্তার মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে 'টালা-অভিনয়' রচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে কপট মৌলবী ও ফিকিরবাজ পুরোহিত—কারো প্রচেষ্টা বা ইচ্ছাই আন্তরিক ছিলোনা। প্রকৃতপক্ষে এদের চক্রান্ত ও উস্কানিই এই দাঙ্গার মূল কারণ, প্রহসনে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বিরোধ প্রসঙ্গে 'সৎ-প্রসঙ্গ' নামে মশাররফের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'কোহিনুর' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩০৫)। এই প্রবন্ধে মশাররফ আন্তরিক আবেগে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোনো গুরুতর সামাজিক বিবাদ-বিরোধ নেই এবং অভিন্ন শাসন ও অর্থনীতির অধীনে অবস্থান ও একই সমতলে বসবাসের কারণে এই ধরনের কলহ-বিদ্বেষ থাকা নিতান্তই অর্থহীন। বিশেষত বাঙালী হিন্দুসমাজের উপর মুসলমানসমাজের নির্ভরশীলতার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা অনুচিত ও তা নিশ্চিত ক্ষতির কারণ। মশাররফ তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ-বিষয়ে এই বলে সিদ্ধান্ত করেছেন ঃ

> তুমি কলাপাতার যেদিক পরিশুদ্ধ মনে করে আমি সে দিক ঘৃণা করি। আমি তোমার তক্তপোষের নিকট যেই গিয়াছি অমনি তোমার হুকার জল কি যেন হইয়াছে। সে জল তোমার পানীয় নহে, অথচ জল নষ্ট হইল বলিয়া হুকাটি আর মুখে ধরনা। আমার ঈশ্বরোপসনাকালীন সুমধুর, পবিত্র ঈশ্বরের নামসম্বলিত উপাসনা আহ্বানসূচক পবিত্র "আজান" ধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে বিষ ঢালিয়া দিল। তোমার উপাসনা সময়ের শঙ্খ, ঘন্টা কাঁসির বাদ্য, হর হর বোম ভোলানাথ শব্দ জয় সীতারাম বোল, আমার কর্ণে মহাশলাকা বিদ্ধ করিয়া বধির করিয়া তুলিল! ভায়া! এ মনোবাদ কয়দিনের? উভয়ের মনোভ্যন্তরস্থ দুর্ম্মতি শয়তান পরস্পরের মনোমন্দির হইতে ঈশ্বরানুগ্রহে দূরীভূত হইলেই আবার প্রেম, আবার প্রণয়, আবার সরলতা এবং শান্তি ; আবার তুমি আমার আমি তোমার। বাহ্যিক ধর্ম্মগত প্রাণ ভ্রাতাদ্বয় দ্বারাই সময় সময় ঐরূপ আন্দোলন আলোচনায় মতিভ্রম উপস্থিত হয়। খাঁটি নিখুঁত হিন্দুমুসলমান দ্বারা কখনই ধর্ম্ম সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে বা জাতি সম্বন্ধে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ এ দেশে হয়না, হইবেনা।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটকে'র (১৮৭৩) প্রস্তাবনা-অংশে নট-নটীর সংলাপের ভেতর দিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। নট 'বসন্তকুমারী নাটকে'র অভিনয়ের প্রস্তাব দিলে নটী নাটকটি মুসলমান-রচিত বলে তাচ্ছিল্য ও বিদ্বেষ পোষণ করেন। নটী স্পষ্টই বলতে চান, "…. এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক মুসলমান।" নটীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নটের জবাব, "অমন কথা মুখে অনিওনা। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।"

অভিন্ন শত্রুর মোকাবিলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রয়োজন সমধিক। নীলকর কেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নীলবিদ্রোহের নেত্রী প্যারীসুন্দরী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা বলেছেন ঃ

> …. হিন্দুসমাজকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গল জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।[৩০]

মশাররফ কেবল সম্প্রদায়-সম্প্রীতির জন্যই প্রয়াস চালিয়ে যাননি, ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর মতামত ছিলো যথেষ্ট উদার। মশাররফের প্রথম বিবাহকালে এক গ্রাম্য মওলানা তাঁর জাত ও ধর্মের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্ট জবাব দেন তিনি 'নরজাতি-'ভুক্ত ও তাঁর ধর্ম 'মানবধর্ম'।[৩১] এ-থেকে বেশ বোঝা যায়, জাত-ধর্মের উর্দ্ধে 'মানুষ' পরিচয়ই মশাররফের কাছে অধিক গুরুত্বলাভ করেছে। 'সঙ্গীত লহরী'র একটি গানে মশাররফ জাতবিচার আর বর্ণবিভেদকে নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ

> দেখ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ইসা,
> নানক, নিতাই জটাধারী।
> অরে ভাই অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা,
> মোহাম্মদ পয়দা তাঁরি।

[৮৫ সংখ্যক গান]

মশাররফের 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরীসেতু' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' (পৌষ ১২৮০) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় ঃ

> বাঙ্গালা, হিন্দুমসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দুমুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দুমুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয় বা বাঙ্গালা শিখিবেননা, কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবেনা। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বৈরিতার প্রেক্ষাপটে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মশাররফ হিন্দু-মুসলমানের মানসিক ব্যবধান হ্রাস ও সংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

অবশ্য মশাররফ হোসেনের সম্প্রদায়-সম্প্রীতির চিন্তা বা প্রয়াস পূর্বাপর এক তালে চলেনি, 'টালা-অভিনয়'র পরে, বিশেষ করে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯)- পর্বে তাঁর মানস-পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট। ইতোপূর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতার গ্রন্থি-মোচনে তিনি ছিলেন আন্তরিক। সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলী তখন তিনি একজন মিলনকামী সুহৃদের মতো উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করে মিলনের পন্থা নির্দেশ ও তার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উত্তরকালে মশাররফের মধ্যে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠায় তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তি-মানসে যে আক্রোশ, বিতৃষ্ণা ও বীতশ্রদ্ধা জন্ম নেয় তার প্রতিফলন ঘটে 'বস্তানী' থেকে শুরু করে 'বাজীমাত' (১৯০৮) পর্যন্ত। ব্যক্তির নীচতা-হীনতা-স্বার্থপরতাকে অন্ধ-আক্রোশে তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন।[৩৩] অবশ্য এর পশ্চাতে নব্য-উত্থিত মুসলিম মধ্যশ্রেণী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার প্রচ্ছন্ন প্রভাবও অগ্রাহ্য করা চলেনা। 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা'সহ তাঁর ধর্মাশ্রিত রচনার প্রেরণার পশ্চাতে যে কেবল ব্যবসায়িক বুদ্ধিই অন্তর্নির্হিত ছিলো তা নয়, এখানে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের বিবেচনাও সক্রিয় ছিলো।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে সম্প্রদায়-সম্প্রীতির প্রশ্নে বিচলিত মীর-মানসের পরিচয় স্পষ্ট। একদা হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াসী মশাররফ এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনুদার পরিবেশ রচনায় সচেষ্ট। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতা ও বীতশ্রদ্ধ মনোভাব এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। দুই সম্প্রদায়ের চরিত্রের মুখ দিয়েই তিনি পরস্পরকে লক্ষ্য করে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষমূলক উক্তি পেশ করিয়েছেন। যেমন ঃ

> ভায়া! নেড়ে জাত আমার চক্ষের শূল। আমার ক্ষমতা থাক্‌লে বাঙ্গালা দেশ থেকে সব মুসলমানগুলকে তাড়িয়ে দিতাম।
>
> [নবম নথি]

হিন্দু-চরিত্রের মুখ দিয়েই কৌশলে আবার তিনি বলিয়েছেন ঃ

> এ বিষয় চতুর বলি হিন্দু। কার্য্য উদ্ধারে ভারি মজবুত। ভারি পাকা। সত্য-মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি, তোষামোদ বরামোদ, জোড় হাত, পায় ধরা, বিনামা সোজা, গাড়ী টানা ময়লা ফেলা, যেন-তেন-প্রকারেণ কার্য্য উদ্ধার করে কিছু লাভ করবেই।
>
> [ত্রয়োদশ নথি]

এই বক্তব্যে মশাররফের মনোভাব ও মতামতই প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র চতুর্বিংশ নথির শেষ অংশ হিসেবে চিহ্নিত 'বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র' শীর্ষক কবিতায় ('হাফেজ', জানুয়ারী ১৮৯৭) বিত্তবান-সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের অবক্ষয় ও পতনের জন্য অসৎ ও সুযোগসন্ধানী হিন্দু আমলা-কর্মচারীদের দায়ী করা হয়েছে। প্রথমে হিন্দু সুঁচ হয়ে মুসলমান জমিদারগৃহে প্রবেশ করে, তারপর, 'ক্রমে চেপে বসে ঘাড়ে', শেষে ' 'ফাল' হয়ে ফাড়ে চেরে'। লেখক উদ্যমহীন অচৈতন্য স্বজাতিকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন ঃ

চিরকাল হিন্দুগণ
করিতেছে নির্যাতন
তবুও জ্ঞান হলনারে হায়।[৩৪]

'বাজীমাত' কাব্যগ্রন্থে হিন্দুবিদ্বেষ নগ্নভাবে প্রকাশিত। তীব্র জাতিবিদ্বেষের দৃষ্টান্ত মিলবে নীচের উদ্ধৃতিতে[৩৫] ঃ

বিশ্বাসঘাতক হিন্দু দুষ্ট প্রবঞ্চক,
যেই পাত খায় ফোঁড়ে এমনি পাতক।

আবার,

দেখ ধড়িবাজ হিন্দু কি খেলা খেলিছে।

কিংবা,

সাজাইতে মিথ্যা কথা হিন্দু বাহাদুর।

'মদিনার গৌরব' কাব্যগ্রন্থে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে হিন্দুসমাজের প্রতি শ্লেষোক্তি করা হয়েছে।[৩৬]

'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' নামীয় পাঠ্যপুস্তক মীরের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যচিন্তার আর-একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি পাঠে বর্ণিত হয়েছে ঃ

তুমি মুসলমান।
টুপী নাই কেন?
খালি মাথা ছি ছি-
চাদর আর ধুতি।
হরিবাবুর নাতি।
পায়জামা চাপ্‌কান
হয় সেখ নয় পাঠান।

পাঠ্যবিষয়ের মাধ্যমে শিশু-মনে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়াস এখানে লক্ষণীয়।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফের 'প্রথম জীবনের হিন্দু-মুসলমান মিলন-কামনা ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগে'র পশ্চাতে বয়োধর্মের প্রভাব কিংবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়াও গভীরতর সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিলো। উনিশ শতকে সৃষ্ট 'হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে আত্মপ্রকাশ' করার ফলে 'হিন্দু-মানসে মুসলিম-বিদ্বেষের সূচনা' হয়। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া জাগে মুসলিম-মানসে। এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 'স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি' যুক্ত হয়ে মুসলিম-মানসে জাতিবৈর চেতনার জন্ম দেয়। ফলে সাহিত্য ও সমাজজীবনে সম্প্রদায়-সম্প্রীতির আবহ বিনষ্ট হয়। মশাররফের মানস-পরিবর্তনের মূলে এই 'অনুদার পরিবেশ' নিঃসন্দেহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৩৮]

জমিদার ও অভিজাতশ্রেণী

উনিশ শতকে বাঙলার আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক জীবনে জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর প্রভাব ও গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জমিদারেরই ভূমিকা ছিলো দুই রকমের ঃ প্রথমত, প্রজাপীড়ক রাজস্ব সংগ্রহকারী ও ভোগলিপ্সু এবং দ্বিতীয়ত, জনকল্যাণব্রতী ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজশাসনের প্রতি, সরকারের অনুগত ও অনুগ্রহজীবী এই সামন্তশ্রেণীর ছিলো অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থা।

মুসলিম জমিদারশ্রেণীর প্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে শেখ আবদোস সোবহানের 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) ও নওশের আলী খান ইউসুফজয়ীর 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯০) গ্রন্থে বাস্তব বিবরণ সংযোজিত হয়েছে। সেকালের সাময়িকপত্রেও এ-বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জমিদারকে অবলম্বন করে বাঙালী মুসলমানসমাজে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-রচনার পথিকৃৎ মশাররফ হোসেন। তাঁর 'জমীদার দর্পণ' ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগলিপ্সু হৃদয়হীন জমিদারের জীবনযাপনের অনবদ্য চালচিত্র। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে অভিজাত জমিদারশ্রেণীর অন্তঃপুরের বিচিত্র সংবাদ ও স্খলন-পতনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'আমার জীবনী', 'নিয়তি কি অবনতি' ও বিচ্ছিন্ন কিছু রচনায় নানা সূত্রে জমিদার-প্রসঙ্গ এসেছে। এ-বিষয়ে তাঁর সম্পাদিত 'হিতকরী' পত্রিকার কথাও উল্লেখযোগ্য।

মশাররফ জমিদারী-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নিজে ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-পরিবারের সন্তান, তাঁর প্রধান আত্মীয়বর্গ প্রায় সকলেই জমিদার, জীবিকা-সূত্রে তিনি ছিলেন জমিদারী এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষ। এই প্রেক্ষাপটে শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণে জমিদারের সপক্ষে তাঁর ভূমিকা পালনই ছিলো প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। কিন্তু জমিদারী-প্রথার সঙ্গে মশাররফের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর প্রতি তিনি কোনো অন্যায় পক্ষপাত বা অস্বাভাবিক অনুরাগ প্রদর্শন করেননি। বরং এক নির্মোহ

Dhaka University Institutional Repository

শৈল্পিক দৃষ্টি ও প্রবল সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে তিনি জমিদারশ্রেণীর প্রকৃতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রজাস্বার্থের অনুকূলে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন।

জমিদারের অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারে বাঙলার কৃষক-প্রজা চিরকালই জর্জরিত হয়েছে। মশাররফ উল্লেখ করেছেন ঃ

> কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা দেশে দুর্দশার অবধি ছিলনা। জমিদারেরাই প্রজার হর্তা-কর্তা বিধাতা ছিলেন। জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসহ্য হওয়াতেই যেন তাঁহাদের আর্তনাদে পরম কারুণিক দয়াময় জগদীশ্বর ইংরেজ নীলকরদিগকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন।[৩৯]

জোতদার-জমিদারের অন্যায়-অত্যাচার ও প্রজা-পীড়নের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে মশাররফ তার প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। তাঁর জন্মগ্রাম লাহিনীপাড়ার সংলগ্ন সাঁওতার জমিদারদ্বয়ের জুলুমের কথা তিনি সাময়িকপত্রে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত পত্রে মশাররফ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে বলেছেন ঃ

> নিষ্ঠুর ক্ষুদ্র তালুকদারগণ টাকার লোভে গরিবের প্রতি সময়ে সময়ে যেরূপ অত্যাচার করে, তাহা মনে করিলে কার না অশ্রুপাত হয়? ঐ সকল দুর্জ্জনদিগকে দমন করিতে কি কেউ নাই?[৪০]

'জমীদার দর্পণে' এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-অবিচারের চিত্র উন্মোচিত। নাটকের সূত্রধার উল্লেখ করেছেন ঃ

> রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
> জমীদার। রাজরূপে পালক প্রজার
> সর্ব্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
> সেইহেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।[৪১]

কিন্তু জমিদার তার এই প্রত্যাশিত ভূমিকা বিস্মৃত হয়ে প্রজাপীড়নে মগ্ন। নিরীহ গৃহবধূর সতীত্ব বিসর্জন এবং ফরয়াদী প্রজাকে গৃহচ্যুত-গ্রামছাড়া হতে হয় অত্যাচারী লম্পট জমিদারের কারণে।

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের ঘটনা শুনে 'বিরক্ত' ও 'বিষাদযুক্ত' বঙ্কিমচন্দ্র 'জমীদার দর্পণ' নাটকের 'বিক্রয়' ও 'বিতরণ' স্থগিতের জন্য 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ প্রজা-অসন্তোষ বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা জন্মেছিল।[৪২] বঙ্কিমচন্দ্রের এই আশঙ্কা মিথ্যা হয়নি। কেননা, "গ্রাম-গ্রামান্তরে কৃষক অভিনেতাদের সাহায্যে অনুষ্ঠিত এই নাট্যাভিনয় বাংলার রায়তদের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের সহায়ক হয়েছিল"।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

অলস – অকর্মণ্য – তোষামোদপ্রিয় – বিলাসমগ্ন – ভোগলিপ্সু জমিদার ও উচ্চ অভিজাতশ্রেণীর পরিচয় মশাররফের রচনায় পাওয়া যায়। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে এদের 'জানওয়ার' বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে ঃ

> এ জান্‌ওয়ারদের চারখানা পা–ও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদীর আশেপাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে।... জান্‌ওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করেনা।... আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়।[৪৪]

অধিকাংশ জমিদারই যে ভোগ–বিলাসের গড্ডলিকা–প্রবাহে ভাসমান, 'বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র' শীর্ষক কবিতায় ('হাফেজ', জানুয়ারী ১৮৯৭) তার পরিচয় আছে ঃ

বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন,
একেবারে অর্বাচীন
    বাঙ্গালার প্রায় জমিদার ।।
অলসের দাস হয়ে
বিছানা বালিশ লয়ে
    গড়াগড়ি যান দিনরাত।
মুখে দিতে দুট ভাত
উঠেনা উপরে হাত,
    দিন দিন হয় কুপকাৎ।।[৪৫]

এই অলস অথচ ইন্দ্রিয়াসক্ত জমিদারগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে নিবিড় ঐক্য বিদ্যমান। 'ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়', 'সৎ কাজের বেলায় এক পয়সা মা বাপ', সাহেবদের কাছে খাতির পেয়ে তাদের 'ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে'। আসলে 'জমীদার হোলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো'।[৪৬]

জমিদারশ্রেণীর আর–এক বৈশিষ্ট্য ছিলো নাম–প্রচারের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দান। বিশেষত এ–সব বিষয়ে মুসলিম জমিদার–ভূস্বামীরা নিজের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি অমনোযোগী ও বিমুখ ছিলেন। মশাররফ উল্লেখ করেছেন ঃ

> জমিদারগুলিও এমন বেআক্কেল, ধর্ম্মের জন্য দান করেনা। কেবল নাম কিনবার দান।... টাকা অভাবে কত ভদ্রবংশের ছেলে কত প্রকার নীচ ব্যবসা অবলম্বন করেছে। কত পরিবার, হা অন্ন, হা অন্ন করে, ঘরে পড়ে মরছে।.... সেদিকে লক্ষ্য নাই।.... কেবল নাম ফুটাবার জন্য দান।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ-সম্পাদিত 'হিতকরী' পত্রিকায় জোতদার-জমিদার প্রসঙ্গে অনেক সংবাদ, নিবন্ধ ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। এ-সব রচনায় মশাররফের মতের প্রতিফলন আছে। ভাষাশৈলী ও বক্তব্যভঙ্গি বিচারে কোনো কোনো নিবন্ধ যে মশাররফের রচিত তা বেশ বোঝা যায়। এমন একটি অস্বাক্ষরিত রচনায় জমিদারের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অবক্ষয় সম্পর্কে ক্রমাগত আলোচনা-পর্যালোচনার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে ঃ

> ... জমিদারের বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করুন। কেন জমিদারের জমিদারী ধ্বংস হইতেছে, আত্মকলহ বাড়িতেছে, কেন তাঁহাদের ঋণের ভাগ বৃদ্ধি হইতেছে। কেন তাঁহারা মজিয়া ২ পচিয়া যাইতেছেন। কেন পূর্ব্বপুরুষের নাম ডুবাইতেছেন। ... তাহার অনুসন্ধান তাঁহাদের যথার্থ তত্ত্ব লইয়া সাধারণের গোচর করুন।[৪৮]

আলোচ্য নিবন্ধে আরো বলা হয়, 'জমিদারই প্রজার পূজনীয়' —তবে 'প্রজার পূজা লইতে হইলে' জমিদারকে 'পূজনীয়রূপ ধারণ' এবং নিজেকে 'পবিত্র করিতে হইবে'।[৪৯]

জমিদারের গর্হিত কর্ম কিংবা জমিদারবিশেষের প্রতি বিরূপতা থাকলেও জমিদারী-প্রথার প্রতি মশাররফের একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিলো। জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ তিনি চাননি, চেয়েছিলেন এর সংস্কার। জমিদারশ্রেণী কিংবা অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি তিনি কখনোই কামনা করেননি। জমিদার তাঁর অনৈতিক ও পীড়নমূলক আচার-আচরণ সংশোধনের মাধ্যমে প্রজাকল্যাণে মনোযোগী হবেন, এ-ই ছিলো তাঁর প্রত্যাশা। তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র প্রজাপীড়ক ও শোষক জমিদারকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। বরং জমিদারশ্রেণীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি অধিক ছিলো।

কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণী

কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মশাররফ ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। রায়ত-প্রজার দুর্দশা ও দুঃখ তাঁকে বিচলিত করেছে। নির্যাতিত নীলচাষীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কখনো প্রচ্ছন্ন ছিলোনা। তিনি জানতেন বৃহত্তর কৃষকশ্রেণীর সঙ্ঘশক্তির গুরুত্ব কতোখানি ঃ

> ভদ্রলোক জোট বান্দিলে কি হয়? জনসাধারণ কৃষকশ্রেণী পণ্ডিতমূর্খে এক জোট না হইলে কিছুই হয়না।[৫০]

'সাধারণ প্রজার মনে একতার ভাব উদয়' হলে তা যে ফলপ্রসূ হয় সে-সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ঃ

> প্রজা নীলকুঠির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জোটবদ্ধ হইল। শেষে কার্য্যও করিল সফলকামও হইল।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর একাত্মতা ও সহমর্মিতা বোধ করেছেন মশাররফ। তাঁর নানা রচনায়, বিশেষ করে 'টালা-অভিনয়' প্রহসনে, এর পরিচয় আছে। এই প্রহসনে দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষের দুঃখ-দৈন্য-মনোবেদনা, অন্নকষ্টের দুর্ভাগ্য, জীবনযাপনের দুর্দশা—এইসব প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। উচ্চবিত্তের মানুষ যে কিভাবে এদের বঞ্চনা করে, নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তা-ও মীরের চোখ এড়িয়ে যায়নি। প্রহসনে সভাপতি নারদ খুড়ো ও ইবলিশের আলাপচারিতায় এই দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। ইবলিশ নারদকে তার বাহন কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কিছুটা আফ্‌সোস করে নারদ জবাব দিয়েছে ঃ

> আর ভায়া বাহন! এবারকার আকালে আবার বাহন আছে? জরাজীর্ণ হয়েছে। টাঠা-পোকা, মাঝে মাঝে ঘূণ ধরে একেবারে জরজর করে ফেলেছিল, এইদিন উপবাস থেকে দশ পয়সায় আমার চির প্রিয় বাহনটা বিক্রয় করে এক সের চাল কিনেছিলাম।[৫২]

এই কথার পৃষ্ঠে ইবলিশ আফ্‌সোসের সুর আরেকটু চড়িয়ে বলেছে ঃ

> মেয়াভাই! ও কথা আর বলোনা। তুলোনা। সোণারূপার অলঙ্কার থালাঘটীবাটী বদনা, শেষে ইজারচাপকান বিছানাবালিস বেচে পেট রক্ষা কর্ত্তে হয়েছে। বাঙ্গালার মুসলমানের কি কিছু আছে। বিশেষ নিম্নশ্রেণীর লোকের পেটে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই। হা ভাত, হা ভাত করে লুটপুটী খাচ্ছে।...[৫৩]

বিত্তবান আর বিত্তহীনের ধন-বৈষম্যের, অবস্থার আকাশ-পাতাল ফারাকের ইঙ্গিতও আছে এখানে। প্রথম অঙ্কভুক্ত প্রথম গর্ভাঙ্কের 'কল্পনা-রাজ্যে' যে-কটি চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাদের দুরবস্থা যে কোন্ পর্যায়ে উপনীত তা তাদের বেশভূষার বর্ণনাতেই ধরা পড়ে ঃ

> কাহার ছেঁড়া তহবন পরিধেয় উলঙ্গ শরীর— কাহারও পরণে ছেঁড়া পাজামা মলিন পিরাহাণ, মাথায় ছেঁড়া টুপী। কাহারও অতি মলিন ছেঁড়া ধূতি—খালি পা, কেহ অর্দ্ধ উলঙ্গ... ।[৫৪]

এই জীর্ণ-ছিন্ন পরিচ্ছেদের অধিকারী নজু-ফজু-কালু কারোর জীবনই ছন্দময় নয়, নিরেট গদ্যে বাঁধা 'পদ-লালিত্যহীন' তাদের জীবন। দারিদ্র আর দুর্ভাগ্য, সংস্কার আর নির্বুদ্ধিতা এদের নিত্য সঙ্গী। নজুর কথায় ঃ

> আর সংসার চলেনা। এক মোটখাটা মুটের কাজ মাথায় মোট বয়ে কতই উপার্জন করবো। ছোট ছোট চারটী ছেলে তিনটি মেয়ে তারপর ঘরের গিন্নী, বিধবা বুন, চালাই কি করে? কিছুতেই পোষায় না।....[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

একই সমতলের বাসিন্দা ফজুরও অজানা নয় এইসব কথা। সে-ও বোঝে—"পেটে ভাত কাহারও নাই"। এই হা-অন্ন অবস্থার মূল্যায়নও সে সঙ্গে সঙ্গে করতে চায় নিজের মেক্‌দার অনুযায়ী ঃ

> উপার্জনের পথের ধারেও যাইতে চাহিনা, কেবল হা করে, হাতপা গোট করে, কপালের লিখা ভেবে, ভাবি। আর বসে বসে হুকোকলকে খরসান তামাকের ওকর্ম্ম করে, বসে বসে রাজা মারি বাদসা মারি। দুপয়সা উপার্জ্জনের পথ দেখিনা। কপালে নাই, কপালের দোষ, মুসলমান জাতির অদৃষ্টে নাই বলে, কেবলই চেল্লাচিল্লি আল্লাবিল্লা করি। হাতে দুট টাকা কি দশবার গণ্ডার পয়সা হলে, ইলিশ মাছ না হয় বকরির কলজে, দুধচিনি ক্ষিরবাতাসার আয়োজনে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করি। যেখানে দুপয়সা খরচ করিলে চলে, কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচে, তা করিনা। হাতেপাতে যা থাকে খরচ করে, পরদিন না খেয়ে উপোস যাই আর চাই কি?[৫৬]

এই দীর্ঘ সংলাপের ভেতর দিয়ে মুসলমানসমাজের আলস্য, বড়োমানুষী চাল, অবিমৃষ্যকারিতা, অদৃষ্টবাদিতা, শ্রম-বিমুখতা প্রভৃতি প্রবণতা সম্পর্কে যথার্থ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

নিজেদের এই দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় স্ব-সম্প্রদায়ের তোষামুদে-চাটুকার শিক্ষিত ধনিক শ্রেণীর ভূমিকাকেও দায়ী করা হয়েছে। এদের সরাসরি ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

> যারা লেখাপড়া শিখে, দিব্বি সাজগোজ করে ভদ্রলোক সেজে, হিন্দুজাতির সঙ্গে মিস দিয়ে বেড়াচ্ছে, দুহাতে সায়েব ফিরিঙ্গীকে সেলাম বাজায়ে দুটাকা রোজগার করে খাচ্ছে, তারা কি মানুষ।[৫৭]

শেষপর্যন্ত ছিন্নমূল, দারিদ্র-পীড়িত নজু-ফজু-কালুর দল সিদ্ধান্ত করেছে—"আমাদের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নেই", নেই যে তা তো এই চাটুকার-মোসাহেব-বড়ো-মানুষ, এদের জন্যই।

'টালা-অভিনয়', এই প্রহসনে, নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমান-গোষ্ঠীর প্রতি মশাররফ হোসেনের বিশেষ সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে উচ্চবিত্তের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন বিরূপতাও চোখ এড়ায়না। 'কারা খাটে, কারা খাটে শোয়'—এই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব অলভ্য হলেও, তবু তা উত্থাপিত হয়েছে। 'সভ্যতর পিলসুজ' এই ভদ্রেতর শ্রমজীবী মানুষ। একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে মশাররফ বেশ জোরালোভাবেই বলিয়েছেন ঃ

> ভদ্রলোক নিয়েই তোমার মরণ। আমরা খাটী, আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করি, ধান জন্মাই, সুযোগসুবিধা করে দেই। সাহেবরা বাড়ী বসে থেকেই, ছায়ায় বিছানা পেতেই ভদ্রলোক। আমরা জোগায়ে না দিলে, আমরা ছোটলোক বলে রাজী না হলে, তাঁরা ভদ্রলোক হবেন কোথা হতে? তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তো কে?[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

মীরের মানস-গঠন, কাল ও শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'টালা-অভিনয়' প্রহসনে দু-একটি ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতির যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার মূল্য কম নয়।

নীলচাষ ও নীলকর-প্রসঙ্গ

নীলচাষ ও সে-সম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নীলচাষ, নীলবিদ্রোহ ও নীলকর প্রসঙ্গে মীর-মানস নির্দ্বন্দ্ব ছিলোনা। এ-প্রসঙ্গে তিনি মিশ্র ধারণা পোষণ করতেন, যা কখনো কখনো স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। তাঁর পিতা ছিলেন নীলকর সাহেবের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও উপদেষ্টা, স্থানীয় নীলবিদ্রোহের নেতৃপুরুষ সা গোলাম ছিলেন তাঁদের পারিবারিক শত্রু। এ-সব কারণে নীলকরের প্রতি তাঁর কিছুটা অনুরাগ জন্মেছিল। পাশাপাশি নির্যাতিত নীলচাষীও তাঁর সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হয়নি।

মশাররফ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় কুষ্টিয়া অঞ্চলের নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত করেছেন। 'আমার জীবনী'তেও প্রসঙ্গত নীলকরের কথা এসেছে। 'হিতকরী' পত্রিকাতেও এ-সংক্রান্ত কিছু খবর পাওয়া যায়। নীল-সংক্রান্ত ঘটনা তাঁর শ্রুতি ও স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিলো। নীলবিদ্রোহের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও বয়সের কারণে তাঁর পক্ষে সেই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি তাঁর সাহিত্য-সতীর্থ জলধর সেনকে নীলবিদ্রোহের ইতিহাস রচনার জন্য 'নোট' প্রদানের কথা জানিয়েছিলেন।[৫৯]

নীলচাষের সঙ্গে রায়ত-প্রজার দুর্ভাগ্য-দুর্দশা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলো। 'বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবে' (উদাসীন পথিকের মনের কথা, তৃতীয় তরঙ্গ)—এ-ছিলো নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা। মশাররফ উল্লেখ করেছেন ঃ

> নিজের জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদের ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, রৌদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক "জো" সরিয়া যাউক, কার সাধ্য নীলজমি ফেলিয়া ধানের আবাদ করিতে পারে। আগে নীল, পাছে ধান। কৃষকের জীবন উপায় শস্য বপনোপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে বিঘ্ন, বুনীতে বাধা, কর দিতেও অক্ষম। কাজেই খাবার সংস্থান অনেকেরই নাই।[৬০]

এই নির্যাতিত নীলচাষীর গার্হস্থ্যজীবনের মর্মন্তুদ চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে মশাররফ এঁকেছেন ঃ

> বাড়ী আসিয়া কেহ আধপেটা আহার করিয়াই কুহকিনী নিশার কুহকে পড়িয়া মাতিয়াছে। কেহ অনাহারেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে।......... ছেলেমেয়ে দিনে খেতে পায় নাই।....

Dhaka University Institutional Repository

> মহাজনের বাড়ীতে গিয়া দ্বিগুণ তৃগুণ [ত্রিগুণ] লাভ স্বীকারে ধান কর্জ্জ করিয়া আনিবেন, তাহারও সময় নাই। রাত্র প্রভাত হইতে না হইতেই আমীন খালাসী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। নীল জমীর কারকিত, চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে।... পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে দুএক পয়সার জলপানই পূর্ণ আহার— পরিশ্রমের ইতি নাই....। .... হায়রে বঙ্গ। হায়রে নীলকর।। হায়রে স্বদেশীয়।।।[৬১]

নীলকরদের মধ্যে টি. আই. কেনী ছিলো সবচেয়ে কুখ্যাত। নীলকর কেনী, যার নামে 'পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়' (উদাসীন পথিকের মনের কথা, চতুর্থ তরঙ্গ), তার পীড়ন-নির্যাতনের ফলে উচ্চ-নীচ শ্রেণীনির্বিশেষে সব মানুষের জীবন দুর্বিসহ ও 'জাতি, ধন, মান, প্রাণ' বিপন্ন হয়ে উঠেছিল।

নীলকরের বিরুদ্ধে মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরীর সংগ্রামের কাহিনী মশাররফ আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। 'শ্বেত রাক্ষস' কেনীর হাত থেকে নিজের রায়ত-প্রজাকে রক্ষার জন্য প্যারীসুন্দরী স্মরণীয় হয়ে আছেন। নীলকর-সুহৃদ মশাররফ-পিতাও সহানুভূতিশীল ছিলেন এই নির্ভীক প্রজাদরদী সামন্ত-নারীর প্রতি। তিনি প্যারীসুন্দরীর প্রজাদের দুরবস্থার কথা শুনে ব্যথিত হয়েছেন, আবার তার প্রতিরোধ-আক্রমণে কেনী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে তিনি সোৎসাহে মন্তব্য করেন ঃ

> ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস। সাহেবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন সকলকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়।[৬২]

তবে অন্তরে ক্ষোভ বা সহানুভূতি থাকলেও মশাররফের পিতা মূলত নীলকরের পক্ষেই ভূমিকা পালন করেন। নীলকর কেনীর সঙ্গে তাঁর 'গাঢ়রূপে প্রণয় ছিল' এবং অন্যান্য নীলকর কুঠিয়ালদেরও তিনি ছিলেন 'বিশেষ হিতৈষী বন্ধু'।[৬৩] নীলবিদ্রোহের সময়ে 'মীর সাহেব নীলকরের পক্ষ, সাগোলাম প্রজার পক্ষ'।[৬৪] অঞ্চলের সব মানুষ নীলকর কেনীর পক্ষ ত্যাগ করলেও মশাররফ-পিতা গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। নীলবিদ্রোহের নেতা সা গোলামের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় তিনি ছিলেন কেনীর পক্ষের সাক্ষী।[৬৫]

মশাররফ নিজেও নীলকর প্রসঙ্গে কখনো কখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে 'নীলদর্পণ'-রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও মন্তব্য উদার ছিলোনা। তিনি বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণে' নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।... দীনবন্ধুবাবু ইংরেজের ত্রুটি, ইংরেজের কুৎসাই গাহিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে দেব ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়ামমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নেমকরুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, ... সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দু'শ বাহ্বা গ্রহণ করিয়াছেন।.. ইহারই নাম "পাতফোঁড়"—যে পাতে খান, সেই পাতেই ছিদ্র করেন।[৬৬]

অবশ্য অন্যত্র তিনি দীনবন্ধুকে 'দীনবন্ধু' এবং 'নীলদর্পণ'কে 'মহামূল্য দর্পণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৬৭]

তবে মশাররফ নীলচাষীদের বিক্ষোভ ও নীলবিদ্রোহের ঘটনা যেভাবে বিবৃত করেছেন তাতে তাঁর মনোভাব যে পুরোপুরি নীলকরের অনুকূলে ছিলোনা তা বেশ বোঝা যায়। পাবনায় 'বঙ্গেশ্বরে'র দরবারে নির্যাতিত প্রজাসাধারণের নীলচাষ সম্পর্কে পেশকৃত বক্তব্য মশাররফ আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ঃ

> ধর্ম্মাবতার ! আমরা মজুরী চাইনা। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবু নীলের বীজ আর হাতে করিবনা।... আমরা কিছুতেই আর নীল বুনিবনা।[৬৮]

কিংবা সাহসী রায়ত-প্রজার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ঃ

> আর কার সাধ্য আমাদের জমিতে জবরাণে নীল বোনে। সকলে এক যোট থাক্‌লে ভয় কি ভায়া? যে ব্যাটা আমাদের জমীতে নীল বুনতে কি চাষ দিতে আস্‌বে ; সে ব্যাটার মাথা আগে ভাঙ্গবো। প্রাণ দিব তবু নীল বুনিবনা। নীল বুনিতে জমিও দিবনা।[৬৯]

'বাঙ্গালায় নীলকরের অধঃপতনে' 'প্রজার আনন্দের সীমা নাই'। মশাররফ সবিস্তারে নীলচাষীদের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এবং নিজে মন্তব্য করেছেন, 'দেশের লোক যেন মহাকালের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল'।[৭০] নীলকর-প্রসঙ্গে মশাররফ-মানসে একটি দ্বন্দ্ব জাগ্রত থাকলেও নীলকরের দৌরাত্ম্য-নিবারণ ও নীলচাষ-বিলুপ্তিতে তাঁর সায় ছিলো এবং নির্যাতিত নীলচাষীর জন্য তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিলো গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ।

সামাজিক অবক্ষয়-অবনতি ও সমাজ-উন্নয়ন চিন্তা

সমাজের অবক্ষয় ও অবনতি মশাররফকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সমাজের নানা সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। লেখক হিসেবে তিনি যে সমাজসচেতন ও সমাজমনস্ক ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

তার নিদর্শন তাঁর অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়।। তাঁর দৃষ্টি মূলত স্ব-সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে নিবদ্ধ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃহত্তর বাঙালীসমাজও তাঁর বিবেচনায় এসেছে।

সুরাসক্তি, রক্ষিতা-পোষণ ও বারবণিতা-গমন উনিশ শতকে প্রবল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। এরফলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। মশাররফ এই সমস্যাকে রূপায়িত করেছেন তাঁর 'এর উপায় কি?' প্রহসনে। মধুময় দাম্পত্যজীবন রচনা ও রক্ষাই ছিলো এই শিল্প-প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য।

অপরপক্ষে জোতদার-জমিদারদের ভোগবিলাস, অমিতাচার, আলস্য ও কর্মবিমুখতা সামাজিক ও নৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। এই সামাজিক অবক্ষয় মুসলিমসমাজকে তুলনামূলকভাবে অধিক আক্রান্ত করেছিল। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, অশিক্ষা ও আদর্শহীনতা। এইসব সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও লেখকবর্গ উদ্যোগী হন। মশাররফের চিন্তা-চেতনাও এই খাতে প্রবাহিত হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজিক অবস্থার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে মশাররফ বলেছেন ঃ

> ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।... সে সময়ে বঙ্গে মুসলমান সমাজের দুর্দশার কারণই ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৈথিল্য। জাতীয়ভাব রক্ষায় অমনোযোগী এ সকল ঘটিবার কারণ। বিধর্ম্মীদের প্রবল পরাক্রম ; ধনগৌরব, শাসন, বিচার, রাজ্য বিভাগ, সমগ্র বিভাগেই মুসলমানশূন্য।[৭১]

পাশাপাশি 'হাফেজ' পত্রিকায় (জানুয়ারী ১৮৯৭) প্রকাশিত 'বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র' নামে এক দীর্ঘ পদ্যে মশাররফ মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনতি ও অবক্ষয়ের বিবরণ দিয়েছেন।[৭২] এ-সব বিবরণে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট, তবে 'সঙ্গীত লহরী'র ৯১ সংখ্যক গানে পদকর্তা সমাজের যে অবনতি-চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথাই বিবৃত হয়েছে।

মশাররফ 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুসলমান সমাজের উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সামাজিক উন্নতির উপায় ও তার অন্তরায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমাজ-উন্নয়নের জন্য তিনি বিদ্যাচর্চা ও পাশাপাশি ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সভা-সমিতির ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন। সমাজ-উন্নতিচেষ্টায় জমিদারশ্রেণীর উদ্যোগহীনতাকে তিনি সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> জমিদারশ্রেণীর মুসলমান সাহেবগণের দৃষ্টি এদিকে তত নাই। তবে যে দুই একজনার নাম দেখা যায়, সে কেবল নাম কিনিতে। হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে কোন জমিদার শ্রেণী, সামাজিক উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বঙ্গীয় মুসলমানের উন্নতিকল্পে আজ পর্য্যন্ত যোগদান করেন নাই। তাঁহাদের যোগদান করাও স্বভাবের বিপরীত।[৭৩]

এ-ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভরসা ছিলো মধ্যশ্রেণীর প্রতি। মশাররফ মনে করতেন, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে "আমাদের বল, আমাদের সাহস, আমাদের ভরসা, মধ্যবর্ত্তি মধ্যশ্রেণীর মুসলমান" (ঐ)। তাঁর ধারণা ছিলো একটি শক্তিশালী মধ্যশ্রেণীই কেবল সমাজের সার্বিক উন্নতি ও পরিবর্তন আনতে পারে।

সমাজ-উন্নতির জন্য মশাররফ হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তা অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন।। সর্বোপরি বলেছেন ঃ

> এইক্ষণ সমাজের নিকট—মুসলমানসমাজের নিকট বিনীত ভাবে, প্রার্থনা এই যে, যেখানেই যেভাবে সভাসমিতি স্থাপিত করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহ করুন, কি স্থায়ীরূপে কোনরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, আমাদের এই প্রস্তাবটি মন সংযোগে পাঠ করিয়া যদি ইহার কোন অংশও গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলেই আমরা আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য কথঞ্চিৎ করিলাম ভাবিয়া সৌভাগ্যজ্ঞানে সমাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ লাভ করিব ; এইমাত্র আশা।[৭৪]

মশাররফ বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমেও সমাজ-উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তিনি নদীয়ার 'আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলাম' (১৩১১), 'স্টুডেন্টস্ মাজকারাতুল ইসলাম-ই কুষ্টিয়া', টাঙ্গাইলের 'আঞ্জমানে মাইনল এসলাম' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' ও তার প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতীফের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগসূত্র ছিলো। নবাব আবদুল লতীফকে তিনি তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটক' উৎসর্গ করেন। 'হিতকরী' পত্রিকা-সূত্রে বিভিন্ন সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের খবর পাওয়া যায়। এই পত্রিকায় 'মুসলমান সভা' শিরোনামে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় ঃ

> .. বিগত ২৬শে ভাদ্র [১২৯৮] শুক্রবার সন্ধ্যার পর, টাঙ্গাইল টাউনের মুসলমানগণ, মীর মশাররফ হোসেনের বাসাবাড়ী "শান্তিকুঠীরে" এক সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। টাউনের গণ্যমান্য মুসলমান দোকানদার, প্রতিবাসী কৃষক শ্রেণী, নানা শ্রেণীর মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। ... প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যাঁহারা এই সভার অভিভাবকরূপে মুসলমান সমাজের কল্যাণহেতু দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভরসা আছে, আশা আছে যে, তাঁহারা মনঃসংযোগে চেষ্টা করিলে, সমাজের কোন না কোনরূপ উপকার অবশ্যই করিতে পারেন।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের অবনতি ও অবক্ষয়ে মশাররফ ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি মুসলমানসমাজের পশ্চাদপদতার কারণ উদ্‌ঘাটন করে তা নিরাকরণের পথনির্দেশও করেছিলেন। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক নেতৃত্ব মধ্যশ্রেণীর হাতে থাকুক, আন্তরিকভাবে তিনি তা কামনা করতেন। তাঁর সম্পাদিত 'আজীজন নেহার' ও 'হিতকরী' পত্রিকা প্রকাশের পশ্চাতেও সমাজহিতৈষণার মনোভাব সক্রিয় ছিলো।[৭৬]

রাজনীতি

মশাররফের রাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা-চেতনার শ্রেণীকরণ এইভাবে করা যায় ঃ ক. রাজপ্রীতি ও রাজানুগত্য, খ. স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধ, গ. বৃটিশ শাসনের স্বরূপ ।

রাজপ্রীতি ও রাজানুগত্য

মশাররফের বৃটিশ শাসনের প্রতি অবিচল আস্থা, অকৃত্রিম রাজপ্রীতি ও অকুণ্ঠ রাজানুগত্য তাঁর কালের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিলোনা। তাঁর এই রাজভক্তির দীক্ষা পারিবারিক সূত্রেই হয়েছিল। মশাররফের পিতা নীলবিদ্রোহের কালে স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন, "নীলকাজ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এ দেশে থাকিবে।"[৭৭] ইংরেজের মহানুভবতা, প্রজাবাৎসল্য ও 'দেবভাবে' মুগ্ধ মশাররফ এই রাজভক্তির চেতনাতেই অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

রাজভক্তিতে অবিচল মশাররফ কোনো প্রকার রাজনীতি বা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা। মীর-পত্নী বিবি কুলসুমও এ-বিষয়ে বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। মশাররফ জানিয়েছেন, কুলসুম স্বদেশী আন্দোলন বরদাস্ত করেননি। 'অদ্বিতীয় রাজশক্তিসম্পন্ন ব্রিটিশজাতি'র বিরুদ্ধাচরণে 'এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ — বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে'— এই প্রশ্ন বিবি কুলসুম পেশ করেছেন নিত্য অন্নচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত আন্দোলনকারীদের নিকটে। এইসব কারণে তিনি মশাররফকে কোনো 'স্বদেশী' সভা-সমিতিতে যোগ দিতে দেননি। পত্নীর এই বক্তব্যে মশাররফেরও বিশেষ সায় ও সমর্থন ছিলো ঃ

> সেই হইতে আমি কোন সভাসমিতিতে যাই নাই। ... যাহাদের ঘরে তণ্ডুল নাই তাহাদের আবার সভাসমিতি কি? ... যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। দুবেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিতসাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভাসমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্তই নই।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র মশাররফ স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ-চিন্তাকে বিদ্রূপ করেছেন। বৃটিশ-বিরোধিতার প্রশ্নে তিনি যে-কতোখানি বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তা 'টালা-অভিনয়ে'র ১ম চেলার বক্তব্যে বেশ বোঝা যায় ঃ

> দেখলে তো হে! ভাবটা ত বুঝলে। কেমন কলজেপুর। এখনও ভূতপ্রেতে সয়তানে ভয়? প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। এরাই আবার সখের সৈন্য হতে চান। লড়াই মারবেন। জঙ্গ-ফতে করবেন। রাজ্যশাসন কর্ব্বেন, স্বায়ত্তশাসনদণ্ড হাতে নিবেন। ঘৃণা। ঘৃণা।। [৭৯]

মশাররফের রাজনীতি না থাকলেও রাজপ্রীতি ছিলো। ইংরেজজাতি ও বৃটিশরাজের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি-আস্থা-অনুরাগ আমৃত্যু বিদ্যমান ছিলো। তাঁর কণ্ঠে রাজ-প্রশস্তি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর রাজভক্তিতে কোনো খাদ ছিলোনা। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন তাঁর যুগ ও শ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি।

বল-বীর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন মশাররফ। এ-বিষয়ে তাঁর ধারণা ঃ

> [বৃটিশ] আজ হাত গুটালে কাল আমরা ন্যাংটা, সাজ-পোষাক বাবুগিরী দিকে তাকাও দেখি, বিলাতী চালান বন্দ কল্লে কি হয়? বাবুগিরী সভ্যতা ভব্যতা কোথায় থাকে! এত সুখসুবিধা কোথায় যায়?[৮০]

মীরের ইংরেজী-তোষণ মানসিকতার আরো পরিচয় আছে। 'টালা-অভিনয়ে'র একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

> শিক্ষাই শান্তির আকর, উন্নতির সোপান। শিক্ষাতেই ভক্তি। শিক্ষাতেই পরিচয়।

কিন্তু এই 'শিক্ষা'র উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ, জ্ঞানান্বেষণ, জাতীয় উন্নতি কিংবা আত্মোন্নয়ন নয়, এর একমাত্র লক্ষ যথার্থ 'রাজভক্ত' হয়ে ওঠা।[৮১]

'ভারতেশ্বরীর জুবিলি উপলক্ষে' রচিত একটি গানে (৫০ সংখ্যক) সম্রাজ্ঞীর জয়কীর্তনে মুখর হতে দেখা যায় মশাররফকে ঃ

> জয় মা ভারতেশ্বরী, জয় মা তোমারই রে।
> তব রাজ্যমাঝে সূর্য্য, কভু অস্ত নাহিরে।।
> সোণার ভারতবর্ষ, স্বাধীন শতার্দ্ধ বর্ষ।
> তাই মা আজ এত হর্ষ, মনে উপজিলরে।।
> গাওরে ভারতীগণ, হয়ে একতান মন,
> ভিক্টোরিয়া গুণগান, মনপ্রাণ হ'তেরে। [৮২]

Dhaka University Institutional Repository

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে রাজ-প্রশস্তির সুর আরো একটু চড়িয়ে মশাররফ বলেছেন ঃ

> ... ইংরেজ আমাদের ভক্তির ভাজন, ... ইংরেজ আমাদের মাথার মণি, ... ইংরেজ আমাদের হর্তা-কর্তা বিধাতা। তাই ইংরেজ দেবতা; অসীম ক্ষমতা। ...... ইংরেজচক্ষে অবিচার -অত্যাচার স্থান পায়না। ..... তাই ইংরেজকে হৃদয়ের সহিত নমস্কার। ইংরাজরাজ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করুন, জগৎ শাসন করুন, সমগ্র ধরার আধিপত্য লাভ করুন, কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি। [৮৩]

স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধ

মশাররফের রচনায় স্বদেশ, স্বাধীনতা, স্বরাজ — এই বিষয়গুলো নানা অনুষঙ্গে কখনো কখনো উত্থাপিত হয়েছে। ভিন্ন আবহ ও প্রসঙ্গে এই বক্তব্য বিবৃত হলেও অবচেতন কিংবা পরোক্ষভাবে এতে মশাররফের মানসিক যোগ ছিলো এমন অনুমান করা চলে।

এ-প্রসঙ্গে জন্মভূমি সম্পর্কে মশাররফের উক্তি স্মরণযোগ্য ঃ

> জন্মভূমি কাহার না আদরের? .... জন্মভূমির জন্য কে না লালায়িত? বহুদিন পরে প্রবাসী দেশে আসিলে তার মনে কতই সুখ। আনন্দ! [৮৪]

অন্যত্র একই আবেগানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ

> জন্মভূমি কাহার না আদরের? মানুষের ত কথাই নাই, — পশুপক্ষী কীটপতঙ্গগণও জন্মস্থানের মায়ামমতা বোঝে, —– আদর ও যত্ন করে। কোন শাস্ত্রে বলিতেছে জন্মভূমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী।...
>
> হায়রে জন্মভূমি। জন্মভূমির দৃশ্য নয়ন-মনঃপ্রীতিকর। বসবাসে আনন্দে সুখোচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের শান্তি। যাহার প্রীতিপদ স্থান, মহা পবিত্র পুণ্য-ক্ষেত্র, ধূলিময়লা আবর্জ্জনা —প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণরজত অপেক্ষাও মূল্যবান। ... মাতৃদ্রোহী সন্তানের পক্ষে নহে, স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের পক্ষে নহে, জন্মভূমিবৈরী নিষ্ঠুর পামরের পক্ষে নহে।[৮৫]

জন্মভূমির প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রীতি ও আকর্ষণের পরিচয় আছে নীচের উদ্ধৃতিতে ঃ

> "হোম" যে কি জিনিষ, "হোম" কথাটী যে কত মিষ্টি তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোম্‌কে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানিনা। এই হোমেই যে, স্বর্গসুখ

Dhaka University Institutional Repository

> ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করিনা। এই ঝাড়, জঙ্গল, জলে ডোবা, সেঁতসেঁতে, কুঁড়েঘর শোভিত হোমই যে, পবিত্র স্বর্গ হইতে গরীয়সী, তাহাই বা কয়জনে মনে করি। সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও "হোম" মায়া আছে। ... আমরা নিমকহারাম, আমরা কৃতঘ্ন, তাহাতেই এই দশা। .
>
> ... আমি উদাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি। — এ জগতে আমার কেহই নাই ...। ধরিবার লক্ষ্য নাই, পা রাখিবার স্থান নাই। ... এ অবস্থাতেও পাঠক ! হোমের জন্য পথিকের প্রাণ কাঁদে। [৮৬]

বাঙালী মুসলমানের মাতৃভূমি-চেতনার সংকট ও সংশয় মশাররফের এই বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন আছে বলে আনিসুজ্জামান যে মন্তব্য করেছেন তা অযৌক্তিক নয়।[৮৭]

স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্পর্কে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও, মশাররফ যে উক্তি-মন্তব্য করেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। পরাধীনতার গ্লানি যে কতো তীব্র ও বেদনাবহ তার পরিচয় মেলে মশাররফের এই উক্তিতে ঃ

> স্বরাজই যদি পররাজ হইল, তবে গোলামী করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয় ঃ। ... নিজ জীবন রক্ষা করিতে স্বদেশের স্বাধীনতারত্ন যাহারা পরহস্তে তুলিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার দেশবৈরী আর কে আছে? পবিত্র জন্মভূমি অপরের পাদুকাতলে দলিত হইবে, স্বাধীন জীবন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে, গলায় রজ্জু দিয়া বাঁদর নাচন নাচাইয়া লইয়া বেড়াইবে, ইহা কোন প্রাণে সহ্য হইবে? [৮৮]

'বিষাদ-সিন্ধু'তেও স্বাধীনতার প্রগাঢ় উপলব্ধি প্রকাশিত। কারাগারে বন্দী রাজমন্ত্রী হামানের কণ্ঠে স্বাধীনতার মূল্য-মর্যাদা সম্পর্কে যে বক্তব্য উচ্চারিত তার তাৎপর্য অপরিসীম ঃ

> রাজার অভাব হইলে রাজ্য পাওয়া যায়, রাজ্য-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই তাহার নির্ব্বাপণ হয় ...। ... কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায়না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয়না। স্বাধীনতাসূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

তবে হৃত 'স্বাধীনতা' পুনরুদ্ধারের গভীর আশাবাদও ব্যক্ত হয়েছে এখানে ঃ

> .... যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণ জ্ঞান থাকে, একতাবন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বৈরীভাব না থাকে, জাতিভেদে হিংসা, ঈর্ষা এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যে বিরোধী যদি কেহ থাকে, বিদ্যার চর্চ্চা থাকে, আর সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে যুগ-যুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতে হউক, কোন কালে হউক, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতাগগনে স্বাধীনতা-সূর্য্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে।[৯০]

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ...' —রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র এই পংক্তিমালা মশাররফ-পত্নী বিবি কুলসুমের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো।[৯১] জাতীয়তাবোধ-উদ্বোধক এই উদ্দীপনামূলক 'পদ্যপদ' নিঃসন্দেহে মশাররফের সূত্রেই কুলসুমের অধিগত হয়েছিল।

একদা সমৃদ্ধ স্বদেশের হীনাবস্থা দর্শনে ব্যথিত মশাররফের মনোবেদনা প্রকাশিত হয়েছে কোনো কোনো রচনায়। উত্থানরহিত প্রিয় স্বদেশের দুর্দশা-চিত্র ফুটে উঠেছে এই গানে ঃ

> ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল।
> ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্ব্বনাশ হইল।।
> (তোমার) টাকাকড়ি হিরামতি যা যেখানে ছিল।
> যে পেল সে লুটেপুটে আপন ঘর ভরিল রে।।
> যাদের নামে কাঁপিয়াছে বাসুকি পাতালে।
> এখন তাদের বুকে মারছে লাথি বানরের দলেরে।[৯২]

কিংবা শোষণ-বঞ্চনা-পীড়নে জর্জরিত দেশের অবনতি ও অবক্ষয়-চিহ্নিত এই পংক্তিমালা ঃ

> এদেশের সব ধানচাল রাক্ষসেতে খায়।
> ছোলা গমে নীল রেসমে পাটে না কুলায় রে।।
> সোণারূপা মণিমুক্তা নাইরে এদেশে
> কাগজ দিয়ে ভুলায়ে নিল এমন সর্ব্বনেশে।। ...
> যাত্ রাখেনা মান্ রাখেনা ধন রাখেনা হায়।
> (আবার) ঘুষানাথির চোটে কতশত প্রাণ যায়রে।। [৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিণতির জন্য পরোক্ষে মশাররফ দায়ী করেছেন শ্বেতাঙ্গ শাসনকেই ঃ

যা দেখেছ আগে এখন তার ত কিছু নাই।
সুখের দফা শেষ করেছে বিড়াল চোখ ভাইরে।।[৯৪]

পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ, স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন বাসনা, জন্মভূমির মহিমাকীর্তন, দেশের অবক্ষয়-দুর্দশার জন্য বেদনাভূতি — রাজভক্ত, ইংরেজ-স্তুতিকার, রাজনীতি ও আন্দোলনবিমুখ মশাররফ হোসেনের মানস-ভাবনার বিপরীত ও ব্যতিক্রমী চিত্র। সীমাবদ্ধ ও স্ববিরোধী মশাররফের সমাজ ও রাজনীতি-ভাবনার একটি ভিন্ন পরিচয় এখানে উন্মোচিত।

বৃটিশ শাসনের স্বরূপ

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ মশাররফের নিকটে অজ্ঞাত ছিলোনা। তিনি অত্যন্ত নিকট থেকে বৃটিশ শাসনের ক্রটি-বিচ্যুতি ও বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা তাঁর অনেক রচনাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। বৃটিশের প্রশাসনযন্ত্র কিভাবে জনগণের দুর্ভাগ্য-দুরবস্থার কারণ হয়েছে মশাররফ অকুণ্ঠচিত্তে সেই চিত্র তুলে ধরেছেন।

বৃটিশ শাসনের ফলাফল দেশবাসীর জন্য কেমন হয়েছিল তার আভাস মেলে এই পংক্তি ক'টিতে ঃ

কোথা হইতে কোথা এসে ।
করিছে বাদসাই ভাইরে।
ঘুরাচ্ছে জমেরই দণ্ড। ...
সহেনা সহেনা প্রাণে।
জ্বলে পুড়ে খাক্ হল।
মাথা গুণে নেয় খাজনা।
আমার ডিঙ্গা আমার বাড়ী।
তাতেও কিছু দিতে হবে।
পড়েছি কাফেরের হাতে।
উড়ে পুড়ে চলে যাক।[৯৫]

ভারতে বৃটিশ-বিচারব্যবস্থা যে বৈষম্যমূলক ও পক্ষপাতপূর্ণ ছিলো তার পরিচয় আছে 'জমীদার দর্পণে'। বিচারকের নিরপেক্ষতার অভাব, মিথ্যা সাক্ষ্য, অর্থের প্রভাবে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি — এই চিত্র ছিলো প্রায় সর্বজনীন এবং তা নিশ্চিতভাবেই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। ইংরেজ বিচারক, ইংরেজ

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার ও ইংরেজ ব্যারিস্টারের যোগসাজশে পুরো বিচার-অনুষ্ঠানটিই হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হয় 'জমীদার দর্পণ' নাটকে। আদালতে অনুপস্থিত জুরির আসনে নিরক্ষর গ্রাম্য ব্যাপারীকে জোরপূর্বক বসানো এবং জজসাহেবের 'উচ্চহাস্য', 'ইংরেজী গান' পরিবেশন, 'শিশ দিয়া তুড়ি' ও 'ভঙ্গি করিয়া নৃত্য'-এর মাধ্যমে পবিত্র ন্যায়ালয়কে প্রমোদকক্ষে পরিণত করা হয়েছে। জমিদারের লালসার শিকার নূরুন্নেহারের অধোদেশ থেকে রক্ত নির্গত হলেও ডাক্তার অনায়াসে 'ব্রেন ডিজিজে' তার মৃত্যু হয় বলে সাক্ষ্য দেয়। বাদী পক্ষের উকিল এই বক্তব্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে জজসাহেব জবাব দেয়, 'হাঁ কেন না হোবে? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন, হোবে হোবে' (তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)। বিচার-ব্যবস্থার এই অপ্রত্যাশিত নৈরাজ্য মশাররফ যথেষ্ট সাহস ও সততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

বৃটিশ বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তাই 'জমীদার দর্পণ' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে মন্তব্য করেছেন, "সেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে"।[৯৬] এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা মন্তব্য করে, "গ্রন্থখানির জমিদার দর্পণ নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদিগের দায়রার বিচার ও জুরি প্রণালী প্রভৃতির শোচনীয় দৃশ্য দর্শনের দর্শনভূত হইয়াছে। যেমন আদালত দরিদ্রেরই যম, কিন্তু যাহার অর্থবল আছে তাহার কল্পতরু।"[৯৭]

বিচার-ব্যবস্থার মতো সাধারণ প্রশাসনও পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলো। জেলা বা মহকুমার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নীলকর কিংবা ভিন্ন পেশার স্বদেশীদের প্রতি প্রায়শই অন্যায় আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন। মশাররফের আত্মচরিত-সূত্রে জানা যায় ঃ

> সে সময় ব্যারিস্টার সাহেবগণ প্রায়ই নীলকরদিগের কুঠীতে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। নীলকর ভিন্ন তাঁহাদের উঠিবার বসিবার আমোদ-আহ্লাদ করিবার স্থান মফঃস্বলে আর কোন স্থানেই ছিলনা। নীলকর ভিন্ন তাহাদের স্বদেশী লোক গ্রামে মহকুমায় জেলাতেও অধিক ছিলনা। সে সময় বাঙ্গালী জাতি মনে মনে ভাবিত, সাহেবে সাহেবে প্রণয়, সাহেবে সাহেবে ভালবাসা। তাহাদের বিরুদ্ধে কার সাধ্য কেহ কোন কথা বলে? নালিশ করে — থানায় জানায়? অধীনস্থ প্রজাদেরও সাধ্যও নাই যে, কুঠীর সাহেবের নামে থানায় এজাহার দেয়, মকদ্দমা চালায়। কাজেই অত্যাচার জুলুমের কথা মুখে আনিবার সাধ্য নাই।[৯৮]

ম্যাজিস্ট্রেটের নীলকরের কুঠিতে রাত্রিযাপন ও নীলকর-পত্নীর উদার আপ্যায়নের কথা 'উদাসীন পথিকের মনের কথায় (অষ্টম তরঙ্গ) পাওয়া যায়। আবার অত্যাচারী নীলকরের 'অনারারী মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা' থাকায় রক্ষক হয়ে উঠতো ভক্ষক (ঐ, চতুর্থ তরঙ্গ)। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তেও হাকিম-আমলা প্রমুখ প্রশাসনিক কর্মকর্তার দুর্নীতি-পক্ষপাতিত্ব-নৈতিক স্খলনের পরিচয় মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

থানা-পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ-দুর্নীতি-পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সেকালেও ছিলো। ভীতি ও প্রলোভন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো। মশাররফের আত্মচরিতে উল্লেখ মেলে ঃ

> সাধ্য কি দারগা জমাদার বরকন্দাজ নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে মকদ্দমা স্থাপন করে! ... থানার দারগা নীলকর সাহেবদিগের মন জোগাইয়া না চলিলে পথেঘাটে লাঠিপেটা হইতে হয়। শেষ ফল চাকুরীও থাকেনা।[৯৯]

'লাভের প্রত্যাশা' না থাকলে থানার দারোগা দরিদ্র-নিঃস্ব ব্যক্তির অভিযোগ-এজাহার প্রায়ক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করতো (উদাসীন পথিকের মনের কথা, অষ্টম তরঙ্গ)। গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত চৌকিদারের প্রায় বিনা বেতনের চাকুরী ছিলো 'বড়ই জঘন্য'। ফলে ঃ

> চৌকিদারের পাহারাও সেই প্রকার — যেমন দান, তেমন দক্ষিণা— যেমন বেতন তেমন কাজ।[১০০]

বৃটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার রীতি-বৈশিষ্ট্য এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন ছিলো মশাররফের রচনায় তার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

শিক্ষা

পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মশাররফ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। কুষ্টিয়া হাইস্কুল কিংবা কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের মতো প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনে পড়াশুনা করলেও তা তাঁর মনন-মানসে ইতিবাচক কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। নিজের ব্যর্থ শিক্ষাজীবনের কথা স্মরণ করে উত্তরকালে এ-জন্য তাঁর মনে গভীর অনুশোচনা জেগেছিল।[১০১] হয়তো এই গ্লানিবোধ থেকেই তাঁর মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "শিক্ষার প্রতি যাহাতে আস্থা জন্মে, তাহার উপায় বিশেষভাবে করিতে হইবে।"[১০২] সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই এই সত্যটি, বিলম্বে হলেও, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মুসলিমসমাজের অবনতি- অনগ্রসরতার জন্য শিক্ষাহীনতাই প্রধানত দায়ী বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি নিজের উদ্যোগে স্বগ্রামে একটি 'বাঙ্গালা পাঠশালা' স্থাপন করেছিলেন।[১০৩]

জমিদার ও বিত্তবান শ্রেণীর শিক্ষা-বিষয়ে অনীহার মানসিকতাকে মশাররফ তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> অনেক জমিদার নিজেই শিক্ষার বিরোধী, প্রজাগণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নারাজ। ..... বর্ত্তমান অবস্থায় জমিদারদিগের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইক্ষণ শিক্ষাই তাঁহাদের মূল কার্য্য। যতদিন জমিদারশ্রেণী সমুচিতরূপ শিক্ষালাভ না করিবেন, শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মন না বসিবে, ততদিন দেশের মঙ্গল নাই।[১০৪]

তাঁর আত্মচরিত ও অন্যত্র শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা শিক্ষাপ্রসার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অবশ্য তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা–ভাবনা প্রগতি–পন্থা অপেক্ষা ঐতিহ্যিক ধ্যান–ধারণাকেই অনুসরণ করেছে এবং তাঁর মানসদ্বন্দ্বের নিরসন এখানেও হয়নি।

মশাররফের শিক্ষাচিন্তা বিশ্লেষণের জন্য কয়েকটি বিষয়গত ভাগ প্রয়োজনীয় ঃ ক. শিক্ষা–ব্যবস্থার চালচিত্র, খ. ইংরেজী শিক্ষা, গ. স্বাতন্ত্র্য–চিন্তা ও ধর্মীয় শিক্ষা, ঘ. নারীশিক্ষা।

শিক্ষা–ব্যবস্থার চালচিত্র

মশাররফ তাঁর আত্মচরিতে সেকালের শিক্ষা–ব্যবস্থার আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ছাত্র–শিক্ষক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেছেন। সেকালের নিয়মানুসারে শৈশবেই অর্থাৎ চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে শিশুদের বিদ্যাশিক্ষার 'তাক্তি' বা 'হাতেঘড়ি' হতো। গ্রামে বিদ্যাচর্চার পদ্ধতি ও পরিবেশ কেমন ছিলো তার নিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায় মশাররফের আত্মচরিতে ঃ

> গ্রাম্য শিক্ষক মুন্সী ভিন্ন পাশ করা মৌলবী আমাদের দেশে কেহ ছিলনা। বিশেষ বিদ্যার চর্চা ও অঞ্চলেই ছিলনা। তবে কোন কোন গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তাব মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী, আরবি কেহ পড়িত না। .... বাঙ্গলাবিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল... । ..... কাগজে পত্র তেরীজ জমা ওয়াশীল বাকী — চিঠে পাঠে খতিয়ান লেখা হইলেই পাঠশালার বিদ্যা শেষ, পাকা মুহুরী উপাধি।[১০৫]

গ্রামের মুসলমানসমাজে বাঙলা বিদ্যাচর্চার প্রচলন ছিলোনা বললেই চলে। গ্রামের মৌলবী–মুন্‌শী সাহেবরা 'বাঙ্গালার কিছুই জানিতেন না' এবং জমিদারী সেরেস্তায় কর্মরত গোমস্তা–পাটওয়ারীর যে স্বল্প বাঙলাবিদ্যা অধিগত ছিলো, তাঁরা 'ঐ পরিমাণ বাঙ্গলা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন'। মশাররফের পিতা 'বাঙ্গলার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না'।[১০৬]

মুন্‌শীজী কিংবা গুরু মহাশয় শিক্ষার্থীর নিকটে বিশেষ ভীতির কারণ ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার ছিলো নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> ... পাঠশালার ছুটির পূর্বে আমরা সকলে কলম কপালের নিচে রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িতাম .....। মাথা খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম, যেন কলমটি কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাঁধিয়া উঠে, বাঁধিয়া উঠিলেই মহাপণ্ডিত হইব, না বাঁধিলে গণ্ডমূর্খ হইতে হইবে। কপালে লাগিয়া পড়িয়া গেলে লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও দুঃখ পাইতে হইবে।[১০৭]

বিদ্যাচর্চায় সাফল্যের জন্য সরস্বতী-বন্দনা, অর্থ না বুঝে কোরআন শরীফ- পন্দেনামা বা গোলেস্তাঁর পাঠ মুখস্থ করা, মৌলবী-মুন্শীর বাঙলা বা ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব — মশাররফের আত্মকথায় তাঁর বিদ্যাচর্চার অন্তরঙ্গ বর্ণনার পাশাপাশি সেকালের গ্রামীণ শিক্ষা-ব্যবস্থার এইসব নিপুণ চিত্রও ফুটে উঠেছে। একইভাবে শহরের ইংরেজী স্কুলের প্রহার-শাসনের ভয়াবহতা, শিক্ষাদান-প্রণালীর ত্রুটি, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গও বর্ণিত হয়েছে।[১০৮]

ইংরেজী শিক্ষা

ইংরেজীশিক্ষা সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি যুগ-জীবনের চলমান ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলোনা। ইংরেজী ও আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলিম-মানসের দ্বিধা দীর্ঘকাল বজায় ছিলো। ক্রমশ বাস্তবতার গরজে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্নে মশাররফের পরিবার ও তাঁর নিজের মতামত ও ভূমিকা ছিলো স্ববিরোধী।

আধুনিক ও ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ থাকলেও মশাররফ নানা কারণে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা-বিষয়ে উনিশ শতকে সাধারণভাবে যে তীব্র আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, মশাররফের মন-মানসিকতা পুরোপুরি সেই চেতনায় সমর্পিত হতে পারেনি। তাঁর অর্জিত শিক্ষার মধ্যে তাই একধরনের অসম্পূর্ণতাজনিত স্ববিরেধিতার আভাস পাওয়া যায়। ধর্মীয় শিক্ষা যেমন, তেমনি ইংরেজীশিক্ষাও তাঁর আয়ত্তে আসেনি, — একটি মিশ্র চিন্তার দায় তিনি তাই বরাবর বহন করেছেন।

মশাররফের পারিবারিক আবহে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব ছিলো। মশাররফের আত্মীয়স্বজন ও মাতামহীর ইংরেজীশিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ছিলো সমাজের সনাতন বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঃ

> ... ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই, আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ-রসুলের নাম মুখে আসিবে না। ... ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়। ... হালাল-হারামে প্রভেদ নাই। ... সাহেবি পোশাক

Dhaka University Institutional Repository

> পরে। ... নামাজ রোজায় ভক্তি করেনা। আদব- তমিজের ধার ধারেনা। .....মাতামহীর ধারণা ছেলে খৃষ্টান হইয়া মেম বিয়ে করিবে। মরিবার সময় ইংরেজী কথা বলিয়া মরিবে। খোদারসুলের নাম করিবেনা। মোসলমান ধর্ম্মপ্রতি বিশ্বাস থাকিবেনা। [১০৯]

এই গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল মাতামহীর কারণেই মশাররফের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলাতে যাওয়ার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

অবশ্য এ-সম্পর্কে মশাররফের পিতার ধারণা ছিলো ভিন্ন। প্রথম পর্যায়ে মশাররফ-পিতার ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যে অনীহা ও বিদ্বেষ ছিলো তা ইংরেজীনবিশ আত্মীয়স্বজনের সংস্পর্শে এসে অনেকাংশে দূর হয় এবং পুত্রদের ইংরেজীশিক্ষার জন্য 'মনে মনে বড়ই ব্যস্ত' হয়ে পড়েন। মশাররফ জানিয়েছেন ঃ

> বিদেশে পাঠাইতে তাঁর [পিতার] কোন আপত্তি নাই। রাজসাহী-ঢাকা নিতান্তপক্ষে পাবনায় রাখিয়া ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষা দেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।[১১০]

ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্নে মশাররফ-মানস দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। তাই কখনো সমর্থনে আবার কখনো প্রচ্ছন্নভাবে এর বিপক্ষে তাঁর মত পোষণ করেছেন। মশাররফ ইংরেজী শিক্ষাকে জীবিকার প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ইংরেজী বিদ্যার অভাবে বাঙালী মুসলমান সবরকমের চাকুরীর সুযোগ থেকেই যে বঞ্চিত মশাররফ সে-বিষয়টিও বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাই স্পষ্টই তিনি বলেছেন ঃ

> বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা না করিলে রাজদ্বারে কোনরূপ প্রত্যাশা নাই, জীবনোপায়ই কঠিন, ভার মহাভার বলিয়া বোধ হইবে, কাযেই ইংরাজী শিখিতেই হইবে।[১১১]

কিন্তু মশাররফ বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার আধুনিক শিক্ষার জন্য নিজের মনকে পুরোপুরি তৈরী করতে পারেননি। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যকেই তিনি কেবল গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মীয় ও ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে পারিবারিক সংস্কার ও সমকালীন রক্ষণশীল ধারণার অভ্যন্তরেই যে তাঁর চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয়েছে তার প্রমাণ মিলবে তাঁর নিজের জবানীতেই ঃ

> আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, ইংরেজী আর বাঙ্গলা পড়িতে হয়।...... এতদিন পড়িলাম—আল্লারসুলের নাম কোন স্থানে পাইলাম না। কাহারও মুখে শুনিলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরেজী কেতাবমধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম।... পাকসাফ্ পবিত্রতার নামগন্ধ পাইলামনা।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "উর্দ্দু ফারসী শিক্ষা অবহেলা করিয়া শুধু ইংরাজী কি কেবলই বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে, সমাজে মুখ পাইবার উপায় নাই"।[১১৩]

মশাররফ-মানসে আধুনিক ইংরেজীশিক্ষা ও ঐতিহ্যিক শাস্ত্রীয় শিক্ষার প্রশ্নে দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। তাই শিক্ষাবিষয়ে তাঁর উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অভাব চোখ এড়িয়ে যায়না।

স্বাতন্ত্র্য-চিন্তা ও ধর্মীয় শিক্ষা

আত্মচরিতে মশাররফ তাঁর বাল্যকালে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা কেমন ছিলো সে-সম্পর্কে জানিয়েছেন ঃ

> মক্তাব মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী আরবি কেহ পড়িত না।.... পুণ্য জন্য আরবি শিক্ষা।... অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরাণ শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবি কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। এখন পর্য্যন্ত মোল্লার দল যাহারা কোরাণ শরীফ পড়িয়া পয়সা উপার্জন করে, তাহারা ত জানেই না।... বিদ্যা বঙ্গবাসী মুসলমানের পক্ষে বড়ই কঠিন।[১১৪]

ধর্মকেন্দ্রিক শাস্ত্রীয় শিক্ষার গুরুত্বের কথা মশাররফের নানা রচনায় বর্ণিত হয়েছে।

জাতিগত স্বাতন্ত্র্যচিন্তা মশাররফের সাহিত্যের মতো শিক্ষাচিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। তিনি আরবী-ফারসী শিক্ষার প্রসার, মক্তব-মাদ্রাসার অস্তিত্ব রক্ষা এবং মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কুষ্টিয়া হাইস্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠকালে পাঠ্যগ্রন্থে ও পরিবেশে মশাররফ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বা প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হয়েছিলেন।

নিজে ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া করলেও মশাররফ মাদ্রাসা শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি নবাব আবদুল লতীফের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে মশাররফ বলেছেন ঃ

> যেরূপ মাদ্রাসা হুগলি, ঢাকা, রাজসাহী, পাটনা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান, ঐরূপ মাদ্রাসার সংখ্যা যতদূর বৃদ্ধি সম্ভব তাহা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মতে প্রতি মহকুমায়, এমন কি প্রতি বহুসংখ্যক মুসলমান অধিবাসী ভদ্রপল্লিতে শাখা মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রনিবাস থাকা প্রয়োজন। ...... সমিতির অবস্থা ভাল হইলে, অর্থভাণ্ডারে অর্থের সচ্ছলতা জন্মিলে, ছাত্রনিবাসের ছাত্রগণের আহারের ব্যয় একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাদ্রাসার বেতন সম্বন্ধেও ঐরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে' সৈয়দ আমীর আলী মাদ্রাসাশিক্ষার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে এই শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করেন। আমীর আলীর 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিপক্ষ সংগঠন 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' এক জরুরী সভায় (৯ জুন ১৯০০) এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাঁদের সপক্ষে জনমত সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মশাররফ হোসেন তাঁর লিখিত অভিমতে জানান ঃ

> The Present system of Education is highly beneficial to the Musalman students in Bengal and I see no reason why a change should be introduced. A system which time and experience have proved conducive to progress and improvement, should not, in my opinion be interfered with.[১১৬]

এই বক্তব্যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মশাররফের দৃঢ় সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মীয় চেতনা ও আবহ-সম্বলিত পাঠ্য-পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন। এই চিন্তা থেকেই তিনি রচনা করেন 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' নামীয় পাঠ্যপুস্তক,, যা 'গ্রাম্য মক্তব, মাদ্রাসায় আদরের সহিৎ গৃহীত' হয়।[১১৭]

সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র শিক্ষার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি স্পষ্টই বলেছেন ঃ

> বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী বঙ্গবাসী হিন্দুর উপকার হইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে মুসলমানের কোনরূপ উপকার নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই বঙ্গীয় মুসলমানের আজ এই দুর্দ্দশা।[১১৮]

'সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন' , তাই ঃ

> সুধু ইংরাজী শিখিলে আমাদের কোন লাভ নাই। ইংরাজীর সঙ্গে সমাজ আদৃত, সমাজ প্রচলিত, উর্দ্দু ফারসী শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়।[১১৯]

মশাররফ মনে করতেন, "ধর্ম্মজীবন রক্ষাহেতু আরবী, [শিক্ষাদীক্ষা] হেতু ফারসী উর্দ্দু, সংসার চালাইতে হইলে বাঙ্গালা, উদরান্নের সংস্থা করিতে হইলে ইংরাজী" শিক্ষার প্রয়োজন।[১২০] তাঁর শিক্ষাচিন্তার মৌলিক রূপটি এই বক্তব্যে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

নারীশিক্ষা

উনিশ শতকে 'অবরোধবাসিনী' বাঙালী মুসলমান নারীর অবস্থা ছিলো শোচনীয়। সীমিত পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সুযোগ ছিলোনা বললেই চলে। মশাররফ মন্তব্য করেছেন ঃ

> মুসলমান রমণীমধ্যে বিদ্যাচর্চা ও শিখিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই ; ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই ; সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবার বুদ্ধি নাই... ।[১২১]

আলোচ্য প্রেক্ষাপটে মশাররফের নারীশিক্ষা সম্পর্কে মনোভাব যথেষ্ট উদার ছিলো। তাঁর একান্ত উৎসাহে পত্নী বিবি কুলসুম বিবাহের স্বল্পকাল পরে গৃহেই লেখাপড়া শিখেছিলেন ঃ

> এই সময় মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় চিঠিপত্র লিখা পুস্তকাদি পড়া বিশেষ যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন।[১২২]

কুলসুম নিয়মিত ডাইরী লিখতেন এবং সাহিত্য সম্পর্কে মতামত-দানের মতো প্রজ্ঞা তাঁর জন্মেছিল।

তবে মশাররফ নারীশিক্ষা সমর্থন করলেও এই শিক্ষার সূত্রে নারীর স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ মেলামেশাকে অনুমোদন করেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অধঃপতনের জন্য তিনি শিক্ষাকেই দায়ী করেছেন।[১২৩]

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে মশাররফের বক্তব্যকে চারশ্রেণীতে বিন্যস্ত করে এখানে পরিবেশিত হলো ঃ ক. মাতৃভাষা, খ. ইসলামী সাহিত্য, গ. গ্রামীণ সংস্কৃতি, ঘ. সঙ্গীত-থিয়েটার।

মাতৃভাষা

মশাররফ বিশুদ্ধ বাঙলাভাষায় সাহিত্যচর্চা করে সমকালে অতুলনীয় স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন। তাঁর মতো প্রাঞ্জল, সুললিত ও বিশুদ্ধ বাঙলা অনেক বাঙালী হিন্দুও লিখতে পারেন না কিংবা তাঁর মতো বাঙলা কোনো হিন্দু লিখতে পারলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন— সমালোচকদের এই ধরনের উক্তি-মন্তব্য নিঃসন্দেহে মশাররফের ভাষা-সাফল্যের পরিচায়ক। অবশ্য এই মাতৃভাষা-প্রীতির জন্য মশাররফকে স্বসমাজের নিকট থেকে যথেষ্ট নিন্দা-সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষা সম্পর্কে মশাররফের চিন্তা-চেতনার পরিচয় মেলে 'আমাদের শিক্ষা' নামীয় এক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন ঃ

> বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা "বাঙ্গালা"। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজকর্ম্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার। মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য ২ ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এমন কি প্রাণের প্রাণ যে স্ত্রী, তাহার নিকটেও আদর নাই। অসুবিধাও বিস্তর। ইস্তক ঘরকন্নার কার্য্য নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন।[১২৪]

মশাররফ প্রথম জীবনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষা-ব্যবহারে তিনি যে উদার ও মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন তা যথার্থই যুগদুর্লভ। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে আরবী-ফারসী শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করে সংস্কৃতজ বাঙলা শব্দ ব্যবহার করার ফলে তিনি নিন্দিত-সমালোচিত হন। তিনি জানিয়েছেন, "পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন" করার কারণে "স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন"। মশাররফ ব্যথিত চিত্তে আক্ষেপ করে বলেছেন, "শাস্ত্রের খাতিরে", "সমাজের কঠিন বন্ধন" ও "দৃঢ় শাসনে" নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে "কল্পনা কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না"।[১২৫]

মশাররফের মাতৃভাষা-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুত্র-কন্যাদের বাঙলায় নামকরণ। এই নামকরণ সম্পর্কে সেকালে তাঁর গ্রামে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়। তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি-নিন্দা প্রচারিত হয়। প্রথম পুত্রের নামকরণ-সম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিবরণ মেলে মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে ঃ

> .... আকিকা হইল—নাম রাখিবার সময় উপস্থিৎ। নাম রাখা হইল মফাজ্জল হোসেন। ...... পারস্যভাষায় নাম রাখা হইল। আমি সদা সর্ব্বদা ডাকার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় নাম রাখিব। ... দুই একজন বলিলেন বাঙ্গলা নাম রাখিবেন রাখুন, তাই বলিয়া রাম, কৃষ্ণ, শিবদুর্গা, কালী নাম রাখা ভাল নয়। আমি বলিলাম—তাহাতে দোষ কি?.... আপনারা এক চক্ষে দেখিবেন। কাযেই বাঙ্গলা ভাষাটা আপনাদের চক্ষেই ধরেনা। অথচ বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার শস্য, বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার সকলই আপনার বলিতেছেন, ভাষাটার প্রতি এত ঘৃণার কারণ কি?.... বাঙ্গলার মাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম ডাক "মা" বলিয়া ডাকিতেছেন। কথা ফুটীয়ে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেছেন, অথচ বাঙ্গলা হিন্দুর ভাষা কাফেরের ভাষা শিখিলে পড়িলেই মহাপাপ। তাহা যাহাই হউক আমার পুত্রের নাম আমি "শরৎ" রাখিলাম।[১২৬]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্রও তিনি বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষা ব্যবহারের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন ঃ

> ... সাবেক এস্‌লামি ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিসুদ্ধ [বিশুদ্ধ] বাঙ্গালাভাষার সেবা মুসলমান সমাজে আমিই প্রথম করিলাম।.... আমার মুখেই প্রথম "ঈশ্বর" শব্দ বাহির হইয়াছে।— এই প্রকার অনেক কথা—আমারই মুখে অগ্রে বাহির হইয়াছে, লিখা হইয়াছে—ছাপার অক্ষরে কেতাবে উঠিয়াছে। খোদা, এলাহি স্থানে জগদীশ—পরমেশ্বর, পানি স্থানে জল, নমাজ স্থানে উপাসনা,—এইরূপ শব্দ বাহির হওয়ায় মুসলমান [সমাজে] আমার নিন্দার চর্চ্চ্যা [চর্চা] হইতে লাগিল।[১২৭]

বাঙালী মুসলমানসমাজে প্রচলিত ভাষা-সম্পর্কিত মনোভাবের প্রেক্ষাপটে মশাররফের এই মাতৃভাষা-চেতনা ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার প্রশ্নে মশাররফ এখানে উদারপন্থী, মুক্তমন ও নির্দ্বন্দ্ব।

ইসলামী সাহিত্য

মশাররফের সাহিত্যবোধ, রুচি ও চিন্তা পূর্বাপর একই বিন্দুতে অবস্থান করেনি, তা তাঁর মনন ও কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যে-অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল মানস নিয়ে তাঁর শিল্পচর্চা শুরু, উত্তরকালে সেই চেতনার পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর শিল্পী-মানস ধর্মাশ্রিত রক্ষণশীল ভাবধারা অনুসরণ করতে থাকে।

মশাররফের বিবেচনায় ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের যোগ অতি নিবিড় এবং এর প্রতি অবহেলা আকাঙ্ক্ষিত নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন ঃ

> A thorough religious education is indispensible for youths receiving education in Schools and Colleges. If the cultivation of our religious literature and inculcation of the principle of our faith be neglected, very deplorable consequences will be the result.[১২৮]

লেখকজীবনের উত্তরপর্বে মশাররফ ধর্মীয় প্রেরণার বশে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। শিল্পগুণ নয়, স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের ধর্মভাব জাগ্রত ও ধর্মীয় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রয়োজনেই রস ও রুচিতে পুঁথিসাহিত্যের প্রায় সমধর্মী এই গ্রন্থগুলো রচিত হয়। 'বিবি খোদেজার বিবাহ' পুস্তকে তিনি 'মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত' পুস্তকের অনুরাগী পাঠকের জন্য গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। নিজে 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে সিদ্ধহস্ত' হলেও মশাররফ এই পর্যায়ে সমাজের গরিষ্ঠ মানুষের রুচি ও শিক্ষামাফিক সহজভাবের ধর্মাশ্রিত গ্রন্থ রচনা না করার জন্য তাঁর সাহিত্যসতীর্থদের অভিযুক্ত করে বলেছেন ঃ

> ইহারা আবর্জ্জনা ছাড়াইয়া মুসলমানসমাজে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রচলনে বিশেষ যত্নবান। কিন্তু সমাজের চৌদ্দ আনা লোককে ফেলিয়া দুই আনা লোক লইয়া সাহিত্য সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, করুন। কিন্তু দুইচারজন লিখক চৌদ্দ আনা দলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ক্রমশ দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হইলে কি ভাল হয়না?[১২৯]

শিক্ষার আলোক–বঞ্চিত সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিল্পতৃষ্ণা নিবৃত্তি ও লোকশিক্ষার স্বার্থে মশাররফ ইসলামী চেতনা ও আবহযুক্ত ধর্মীয় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তাঁর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্টই প্রতিফলিত।

গ্রামীণ সংস্কৃতি

মশাররফ হোসেনের সঙ্গে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ছিলো অতি নিবিড়। লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে তাঁর জন্ম। তাই লৌকিক সংস্কৃতির পরিচয় ও প্রভাব তাঁর মনন–মানসে স্পষ্ট। তাঁর আকিকা অনুষ্ঠানে প্রচলিত লৌকিক নিয়মানুসারে গাজীর গান পরিবেশিত হয়েছিল। শৈশবে দুরন্ত শিশু মশাররফকে বশে এনে দুধ খাওয়ানোর জন্য দাসী–বাঁদীকে নাচ–গান করতে হতো। 'খেউরি'র দিন তাঁকে 'শান্ত ধীর স্থির' রাখার একমাত্র উপায় ছিলো 'গান বাজনা আর নাচ'। তাঁর নিজের ভাষায়, "কেহ ঢোল বাজাইত, নাচিত, গান করিত, আমি স্থির হইয়া বসিতাম"।[১৩০]

কৈশোরে হেঁয়ালী রচনা ও 'বয়েত–বাহাসে' মশাররফ যথেষ্ট পটু হয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশব–কৈশোরের শিল্পভুবন ছিলো দোভাষী পুঁথির জগৎ। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত মনসার ভাসান গান থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর 'বেহুলা গীতাভিনয়' পালা। লোকজীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিলো ব্যাপক। তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে গ্রামীণ দরিদ্র–নিরক্ষর মানুষ আর তাদের বিশ্বাস–সংস্কার প্রতিফলিত হয়েছে। লোকভাষা ও লোক–প্রবচনের বহুল ব্যবহার আছে তাঁর রচনায়। লোকজ প্রেরণায় তিনি রচনা করেছেন বাউলগীতি। লোক–সংস্কৃতির নানা উপকরণ মশাররফের সাহিত্যে উদারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত-থিয়েটার

সেকালে সঙ্গীত-থিয়েটার সম্পর্কে মুসলমানসমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি উদার ছিলোনা। একধরনের সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এসব শিল্পের চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মশাররফ বলেছেন ঃ

> আমাদের সমাজে গানের নামেই চটা,—গানের নামেই ছি ছি।। শত শত ঘৃণা। উচ্চ দরের মুসলমান, শিক্ষিত মুসলমান-সমাজে সঙ্গীত ঘৃণার্হ, কাটমোল্লার দলেই বেশী নিন্দনীয়।... এই গান আরবদেশে, মক্কা শরীফে হইতেছে, মদীনা শরীফে হইতেছে। তুরস্ক সুলতান, যিনি জগতের মুসলমানের ধর্ম্মগুরু, তাঁহার রাজ্যেও গান-বাজনার আদর আছে...। বোগদাদ, মেসের, পারস্য, তাহার পর বাড়ীর নিকটে আফগান রাজ্যে গানের চর্চা আছে।.... যত দোষ বঙ্গে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের কতকাংশে।[১৩১]

ধর্মীয় বিধি-মতে সমাজে সঙ্গীত অসিদ্ধ। তাই 'বেদাত-বেশরা' বিবেচনায় মুসলিম-বিবাহেও "বাদ্য-বাজনা, রঙ্গ-তামাসা কিছু নাই..."।[১৩২]

সমাজ বা ধর্মের অনুমোদন না থাকলেও সঙ্গীত ও থিয়েটারে মশাররফের অনুরাগ ও অধিকার ছিলো। নিজে সঙ্গীতচর্চা করতেন, বলেছেন, "গান করা আমার অভ্যাস আছে"।[১৩৩] সঙ্গীতের সমঝদার মশাররফ লিখেছেন ঃ

> গানবাজনা শুনিতে আমার স্বভাবজাত বাসনা। গানবাজনার আওয়াজ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। সে স্থানে উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। যৌবনের অঙ্কুরে, বয়সদোষে নূপুর অথবা জোড়ামলের ঝন্ঝনী, মতিচুরের কন্কনি শূনিলেই দুই কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। সে আওয়াজ আমার কানে যেন মধুমিষ্টি সহিত মিশ্রীর শিরে ঢালিয়া দেয়।[১৩৪]

মশাররফের পরিবারেও সঙ্গীতের চর্চা ছিলো। তাঁর সঙ্গীতপ্রিয় পিতা একজন বিশিষ্ট বাজনদার ছিলেন। পত্নী কুলসুমেরও সঙ্গীতে অনুরাগ ছিলো। মশাররফ-রচিত গানের সংকলনও প্রকাশিত হয় 'সঙ্গীত লহরী' নামে।

নানা সুত্রে মশাররফের নাট্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কেবল নাট্যকার ছিলেননা, নাট্য-নির্দেশক হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'বসন্তকুমারী' ও 'জমীদার দর্পণ' নাটক স্বগ্রাম লাহিনীপাড়ায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। থিয়েটারকে তিনি চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি লোকশিক্ষা ও জনমত-গঠনের মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করতেন। লাহিনীপাড়ায় 'জমীদার দর্পণ' নাটক

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয়কালে তিনি যাকে অবলম্বন করে অত্যাচারিত আবু মোল্লার চরিত্র অঙ্কন করেন সেই বাস্তব ব্যক্তিকে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করেন।[১৩৫] বাঙলা থিয়েটারের উন্মেষ-পর্বে তিনি দূর-মফস্বলে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ- সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

> যে সময় আমি নাটক অভিনয় করিয়াছি, গ্রাম দূরে থাকুক সে সময় মহানগরী কলিকাতায় ব্যবসাদার নাট্যকারগণ রঙ্গমঞ্চে কেহ্ই দেখা দেন নাই। কয়েক বৎসর পর নেসানাল থিয়েটার নামে এক নাট্যমন্দীর স্থাপিত হয়। তাহার পরেই বেঙ্গল থিয়েটার আসরে অবতীর্ণ হন।[১৩৬]

এ-থেকে মশাররফের সংস্কৃতি-চেতনার স্তরটি ধরা পড়ে।

ধর্ম

মশাররফের ধর্মবোধ থাকলেও তিনি আচারনিষ্ঠ ধার্মিক ছিলেন এমন প্রমাণ মেলেনি। প্রথম জীবনে ধর্ম সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট উদার থাকলেও মধ্যজীবনে এসে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। সহিষ্ণু উদারপন্থী মশাররফ এ-সময়ে কিছুটা অনুদার ধর্মপ্রেমী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ধর্ম-ধারণা এবং পরধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী—তাঁর ধর্মচিন্তা এই দুইভাগে এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

ধর্ম-ধারণা

ধর্ম সম্পর্কে অনীহা-অনাগ্রহই সামাজিক অবনতি ও অবক্ষয়ের কারণ বলে মশাররফের ধারণা। তিনি উল্লেখ করেছেন, "বঙ্গে মুসলমান সমাজের দুর্দশার কারণই, ধর্মশাস্ত্র পাঠে অনিচ্ছা।"[১৩৭] লেখকজীবনের শেষপর্বে মশাররফ-মানস ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। এ-সময়ে তিনি ধর্মাশ্রিত গ্রন্থ-রচনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্তি, মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। 'ধর্ম্মপ্রাণ ভ্রাতাগণের' জন্য ধর্মের ব্যবহারিক সুবিধার্থে তিনি ঈদের খোতবার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। মশাররফের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থের এক সংস্করণে তাঁর ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে পুত্রকন্যারা বলেন ঃ

> খোদা ও রাসুলের প্রতি কেবলগাহ্ মরহুম পরম বিশ্বাসী, আর খোল্ফায়ে রাশেদীন ও আছহাব (রাঃ) মণ্ডলী এবং আহ্লে-বয়েতের প্রতি তিনি অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। কেবলাগাহ্ সাহেবের অধিকাংশ গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।[১৩৮]

শেষজীবনে তাঁর চিন্তা-চেতনা একান্তভাবেই ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

পরধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

মশাররফের জীবনের প্রথম পর্বে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই হিন্দু বিদ্যাতীর্থ নবদ্বীপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ঃ

> জগতবিখ্যাত পবিত্র নাম নবদ্বীপ। সরস্বতীর কমলাসনে আজ পর্য্যন্ত নবদ্বীপ স্থাপিত রহিয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় জগৎ নিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত নবদ্বীপের মহাপবিত্র গৌরব প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত রহিবে। বঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার আদিগুরু স্থান নবদ্বীপ।[১৩৯]

বৈষ্ণব মহাগুরু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তিনি যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর এই বর্ণনায় ঃ

> এই নবদ্বীপে মহা-মাননীয় হিন্দুধর্ম সংস্কারক সর্বজীবে সম দয়া, দয়ার অবতার, সর্বজীবে সমস্নেহ, জাতিভেদে বৈরক্তি, প্রেমের উৎস প্রেমের প্রস্রবণ, সত্য সৎ প্রেমবশে দুষ্কৃতিদলন, নিবারণ প্রেমরসে দুশ্চরিত্র নির্দয় পাষাণহৃদয় মানবগণের চরিত্র সংশোধক শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গপ্রভু মহোদয়ের জন্মস্থান লীলাস্থান।[১৪০]

শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা পরধর্মসহিষ্ণু এক উদারহৃদয় মানুষের পরিচয় তুলে ধরে।

অর্থনীতি

সমাজচিন্তক মশাররফের অর্থনীতি-ভাবনার পরিচয় তাঁর রচনায় খুব একটা প্রতিফলিত হয়নি। তবে খুব গভীরভাবে না হলেও মশাররফ একথা জানতেন যে, অর্থই মানুষের সব কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তিনি আবেগাত্মক ভাষায় 'টাকা'কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

> রে টাকা। তোর জন্যই কেনী, বিলাত পরিত্যাগ। তোর জন্যই নীলের ব্যবসা। জমিদারের পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার... ।[১৪১]

নীলচাষ যে দেশীয় কৃষি-ব্যবস্থার মূলে আঘাত হেনেছে তার প্রচ্ছন্ন আভাস আছে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়। গো-হত্যা নিবারণের জন্য তিনি যে আবেদন জানিয়েছিলেন তার পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-চেতনা প্রধানত কাজ করলেও গো-সম্পদ রক্ষার জন্য অর্থনৈতিক চিন্তাও জাগ্রত ছিলো। মশাররফ বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> ....এদেশে গোজাতীর সাহায্য ব্যতীত বলুন ত কোন্‌রূপ খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে? কখনি না। ....এদেশে অন্য কোন পশুর দ্বারা ভূমি কর্ষণের প্রথা প্রচলিত নাই। কাজেই বলদের দরকার। প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক? এহেন গোরঅকে মারিয়া কাটিয়া গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে অন্য খাদ্যের আশা আর থাকে কোথা?[১৪২]

মশাররফ–সম্পাদিত 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রতিফলিত আর্থনীতিক চিন্তা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়, অবনতি, রায়ত–প্রজার দুর্দশা–দুঃখের প্রসঙ্গ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

দেশীয় শিল্প–বাণিজ্য প্রসারের জন্য 'হিতকরী'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামে পণ্যবাহী বৃহৎ জাহাজ নির্মিত হওয়ার খবরে এই পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "এদেশের দুঃখ দূর করিতে হইলে এইরূপ আরও অনেক কাজ করিতে হইবে"।[১৪৩] দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য 'কলের চিনি' ব্যবহার না করে 'দেশীয় চিনি' ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়েছে।[১৪৪] ভারতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক লবণশিল্পের উপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার না করায় পত্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, "ইহাকে স্বার্থরক্ষা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?"[১৪৫]

স্বদেশী আন্দোলনের পুর্বেই দেশীয় পণ্য ব্যবহার ও 'বিলাতী দ্রব্য–পরিহার' সম্পর্কে 'হিতকরী' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদেশী পণ্য–প্রীতিকে ধিক্কার দিয়ে 'হিতকরী' পত্রিকায় বলা হয়ঃ

> ... দেশের ছেলে দেশের জিনিশে আদর না করিলে, দেশের জিনিশ ভাল না বাসিলে তাহাকে নিমকহারাম ভিন্ন কি বলা যায়? আমরা বিলাতীনামে পাগল। বিলাতী ইঁদুর ভালবাসি, বিলাতী কুকুর পর্য্যন্ত কোলে করিয়া, তাহার মুখে চুমা দেই। যতদিন আমরা আপন মর্য্যাদা না বুঝিব, আপন দেশকে আপন বলিয়া না ভাবিব, ততদিন আমাদের ভাল নাই।[১৪৬]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে চাকুরীর পরিবর্তে স্বাধীন ব্যবসায় ও বৃত্তি গ্রহণের পরামর্শ দান করা হয়েছে 'হিতকরী'তে। কৃষি–নির্ভর সমাজে কৃষিকর্মের উৎকর্ষ–সাধনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, 'নূতন যন্ত্রাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ' করলে 'প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে ও দেশের কষ্ট দূর হইতে পারে'। স্বাধীন পেশার মাধ্যমে আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাবলম্বী ও আর্থিক সচ্ছলতালাভের প্রেরণা যেমন এই বক্তব্যে রয়েছে, তেমনি কর্ম–বিমুখতা ও দাস–মনোবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়ে এখানে বলা হয়েছে, "সকল বিষয়েই গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সে জাতির কখনই উন্নতি হইবেনা"।[১৪৭]

'হিতকরী' পত্রিকার এইসব অস্বাক্ষরিত নিবন্ধের বক্তব্যে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও নিবন্ধকার মশাররফ হোসেনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭২–৭৩

২. ঐ, পৃঃ ৭৩–৭৪

৩. ঐ, পৃঃ ৭৪

৪. ঐ, পৃঃ ২৭২–৭৫

৫. ঐ, পৃঃ ২৭৬

৬. ঐ, পৃঃ ২৭৬

৭. ঐ, পৃঃ ২৮২–৮৩

৮. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯

৯. ঐ, পৃঃ ৪৩১

১০. *মীর মশাররফের গদ্যরচনা,* পৃঃ ১৪৪

১১. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮

১২. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭০

১৩. ঐ, পৃঃ ৫৯–৬২

১৪. ঐ, পৃঃ ৭–৮

১৫. ঐ, পৃঃ ৬৫

১৬. ঐ, পৃঃ ৬৯

১৭. ঐ, পৃঃ ১০৪

১৮. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৩৬–৩৭

১৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৫

২০. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭–৮৮

২১. ঐ, পৃঃ ৫০১

২২. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২৩৮

২৩. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০

২৪. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৪৫–৪৬

২৫. ঐ, পৃঃ ৪৫

২৬. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৩

২৭. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২১১

২৮. *টালা–অভিনয়,* আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, পৃঃ নয়-চব্বিশ ('ভূমিকা')

Dhaka University Institutional Repository

২৯. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৬

৩০. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪

৩১. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২৫৬

৩২. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৫

৩৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,* (ঢাকা, ১৩৭৭), পৃঃ ৩৬৩

৩৪. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* পৃঃ ৪১৬ ('পরিশিষ্ট')

৩৫. *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫, পৃঃ ১৩১

৩৬. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৪৭-৪৮

৩৭. *লোকসাহিত্য পত্রিকা,* জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃঃ ১০০

৩৮. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৫২

৩৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৯৪

৪০. *মধ্যস্থ,* ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃঃ ১৯৬

৪১. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩

৪২. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৮

৪৩. *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* পৃঃ ৪৮২

৪৪. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫

৪৫. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* পৃঃ ৪১২ ('পরিশিষ্ট')

৪৬. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬-১৭

৪৭. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* পঞ্চদশ নথি, পৃঃ ২৬০-৬১

৪৮. *হিতকরী* (পাক্ষিক), ১৫ কার্তিক ১২৯৭, পৃঃ ১০০

৪৯. ঐ, পৃঃ ১০১

৫০. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৯৪

৫১. ঐ, পৃঃ ১০১

৫২. *টালা-অভিনয়,* পৃঃ ১০

৫৩. ঐ, পৃঃ ১০

৫৪. ঐ, পৃঃ ১১

৫৫. ঐ, পৃঃ ১১

৫৬. ঐ, পৃঃ ১২

৫৭. ঐ, পৃঃ ১২

৫৮. ঐ, পৃঃ ১৫

৫৯. *কাঙ্গাল হরিনাথ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৬০. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃঃ ৫৬

৬১. ঐ, পৃঃ ৫৬–৫৭

৬২. ঐ, একাদশ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭

৬৩. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৮৩

৬৪. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* অষ্টত্রিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৭৫

৬৫. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ১৪

৬৬. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৯১

৬৭. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৪৩

৬৮. ঐ, চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৫৪

৬৯. ঐ, পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৫৮

৭০. ঐ, দ্বিচত্বারিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৯৭

৭১. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭১

৭২. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* পৃঃ ৪০৯–১৬ ('পরিশিষ্ট')

৭৩. হিতকরী (দাশাহিক), ২০ শ্রাবণ ১২৯৮, পৃঃ ৮৫

৭৪. ঐ, ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮, পৃঃ ৯৫

৭৫. ঐ, ৩০ ভাদ্র ১২৯৮, পৃঃ ১২০

৭৬. 'আজীজন নেহার' পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় (আষাঢ় ১২৮১) বলা হয়, "ইহারা যে গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহা সংসিদ্ধ হইবার যদিও অন্তরায় লক্ষিত হয়, তথাপি আজীজন নেহার দ্বারা তাহার কিছু না কিছু নিরাকৃত হইবে এরূপ আশা বিড়ম্বনার বিষয় নহে। ইহাতে যে কএকটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।" 'হিতকরী' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় (১৫ বৈশাখ ১২৯৭) ঃ "সকলের হিতকথা, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হিতের আশা থাকে, সেই সকল কথাই হিতকরীতে প্রকাশ হয়।" —আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৭৪–৭৫,৮১।

৭৭. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৯২

৭৮. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ১২৩

৭৯. *টালা–অভিনয়,* পৃঃ ৪

৮০. ঐ, পৃঃ ৯

৮১. ঐ, পৃঃ ৫

৮২. *সঙ্গীত লহরী,* পৃঃ ২৮

৮৩. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* অষ্টম নথি, পৃঃ ৮৫

৮৪. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* অষ্টাদশ তরঙ্গ, পৃঃ ৯১

৮৫. *এস্‌লামের জয়,* (কলিকাতা, তারিখবিহীন, দ্বি–স), প্রথম শাখা, তৃতীয় মুকুল, পৃঃ ১৮–১৯

Dhaka University Institutional Repository

৮৬. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* চতুর্দশ তরঙ্গ, পৃঃ ৭১

৮৭. *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য,* পৃঃ ২৩৩

৮৮. *এস্লামের জয়,* প্রথম শাখা, অষ্টম মুকুল, পৃঃ ৭১

৮৯. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ২য় খণ্ড, এজিদ-বধ পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ, পৃঃ ৪৬৬-৬৭

৯০. ঐ, পৃঃ ৪৬৭-৬৮

৯১. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৪১

৯২. *সঙ্গীত লহরী,* পৃঃ ৫৮-৫৯

৯৩. মীর মশাররফ হোসেন, *বেহুলা গীতাভিনয়,* (টাঙ্গাইল, ১২৯৬), পৃঃ ১২-১৩

৯৪. *সঙ্গীত লহরী,* পৃঃ ৫৯

৯৫. *বেহুলা গীতাভিনয়,* পৃঃ ১১

৯৬. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে,* পৃঃ ১৩৯

৯৭. *সোমপ্রকাশ,* ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০/১৯ মে ১৮৭৩, পৃঃ ৪২৩

৯৮. *আমার জীবনী,* পৃঃ ১০০-০১

৯৯. ঐ, পৃঃ ১০০

১০০. *উদাসীন পথিকের মনের কথা,* সপ্তম তরঙ্গ, পৃঃ ৩২

১০১. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২০২

১০২. *হিতকরী* (দাশাহিক), ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮, পৃঃ ৯৪

১০৩. শ্রীযুক্ত মীর মশারেফ হোসেন সাহেব নিজ গ্রাম রাইনীতে একটি বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ছাত্রসংখ্যা ২১/২২টি হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া পাঠশালার ব্যবহারোপযোগী গৃহ ও বেঞ্চ ইত্যাদি অন্য ২ দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা মনোযোগ বিধান করিলে পাঠশালাটি চিরস্থায়ী হইতে পারে।"— *রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ,* ১৫ শ্রাবণ ১২৭৬।

১০৪. *হিতকরী* (পাক্ষিক), ১৫ কার্তিক ১২৯৭, পৃঃ ১০১

১০৫. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৮

১০৬. ঐ. পৃঃ ৭৯

১০৭. ঐ. পৃঃ ৮১

১০৮. ঐ. পৃঃ ১৭৮-৮১

১০৯. ঐ. পৃঃ ১২১-২২

১১০. ঐ. পৃঃ ১২২

১১১. *হিতকরী* (দাশাহিক), ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮, পৃঃ ৯৪

১১২. *আমার জীবনী,* পৃঃ ১৭৮-৮০

১১৩. *হিতকরী* (পাক্ষিক), ১৫ পৌষ ১২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১১৪. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৮

১১৫. *হিতকরী* (দাশাহিক), ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮, পৃঃ ৯৪

১১৬. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

১১৭. *লোকসাহিত্য পত্রিকা,* জানুয়ারী–ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃঃ ৯৮

১১৮. *হিতকরী* (পাক্ষিক), ১৫ পৌষ ১২৯৭

১১৯. ঐ

১২০. ঐ

১২১. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* একাদশ নথি, পৃঃ ১৪০

১২২. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ৬৫

১২৩. *গাজী মিয়াঁর বস্তানী,* তৃতীয় নথি, পৃঃ ৩৪–৩৬

১২৪. *হিতকরী* (পাক্ষিক), ১৫ পৌষ ১২৯৭

১২৫. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪

১২৬. আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৪৭

১২৭. ঐ, পৃঃ ১১৪

১২৮. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

১২৯. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪

১৩০. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭৪–৭৫

১৩১. ঐ, পৃঃ ২২৩

১৩২. ঐ, পৃঃ ২৪৩

১৩৩. ঐ, পৃঃ ২২৩

১৩৪. ঐ, পৃঃ ১৮৯

১৩৫. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী* , *৫নং পাণ্ডুলিপি,* পৃঃ ১২৭–২৮

১৩৬. ঐ, পৃঃ ১২৮

১৩৭. *আমার জীবনী,* পৃঃ ৭১

১৩৮. মীর মশাররফ হোসেন, *মৌলুদ শরীফ,* (কলিকাতা, ১৩১৯, চ–স), পৃঃ √

১৩৯. *আমার জীবনী,* পৃঃ ২০০

১৪০. ঐ, পৃঃ ২০০–০১

১৪১. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮

১৪২. ঐ, পৃঃ ৩১৮

১৪৩. *হিতকরী* (পাক্ষিক), ১৫ কার্তিক ১২৯৭

১৪৪. *হিতকরী* (দাশাহিক), ৩০ বৈশাখ ১২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫. ঐ, ১০ শ্রাবণ ১২৯৮

১৪৬. ঐ, ৩০ বৈশাখ ১২৯৮

১৪৭. ঐ, ২০ বৈশাখ ১২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বাঙালী মুসলমানসমাজের এক যুগসন্ধিক্ষণে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব। আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম সফল সাহিত্যশিল্পী। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক চেতনা, জীবন-ভাবনা ও সমাজ-সমকালের গভীর পরিচয় প্রতিফলিত।

বৃটিশদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে বঙ্গদেশের সমাজব্যবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন সমাজবিন্যাসে বিত্তের পাশাপাশি বিদ্যার প্রভাবও প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে। এইসূত্রে আত্মপ্রকাশ করে নতুন মধ্যশ্রেণী। এরফলে বাঙলাসাহিত্যের রূপ-রীতি-চেতনা-রুচিগত রূপান্তর ঘটে। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর পনুর্গঠনের সামর্থ্য ও সুযোগ বেশী থাকায় আর্থ-সামাজিক জীবনে যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও তেমনি তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাঙালী মুসলমান পিছিয়ে পড়ে এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাদের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়।

উনিশ শতকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী হিন্দুর প্রয়াস-প্রযত্নে যে সৃজন ও মননসাহিত্য গড়ে ওঠে তাতে ঐ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম লেখকের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিলেনা। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার এই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্নতার পশ্চাতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ নিহিত ছিলো। উচ্চবিত্তের মুসলমানের শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চা অব্যাহত ছিলো আরবী-ফারসী-উর্দুভাষার মাধ্যমে, স্বভাবতই সেখানে বাঙলাভাষার কোনো স্থান ছিলোনা। নিম্নকোটির নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সীমাবদ্ধ ছিলো লৌকিক সাহিত্য ও জীবন-বিচ্ছিন্ন দোভাষী পুঁথির জগতে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় মুসলিম মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে নব্য-উত্থিত শিক্ষিত মুসলিম মধ্যশ্রেণীই আত্মপ্রকাশের গরজে ও অগ্রসর হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রেরণায় সাহিত্যচর্চায় উদ্যোগী হয়। সূচনাপর্বের এই প্রয়াসে মশাররফের ভূমিকা ছিলো পথিকৃতের।

এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারে মশাররফের জন্ম। নিস্তরঙ্গ অনুদার গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে। শ্রেয়োবোধ ও উদার জীবনভাবনার চর্চা সেখানে অনুপস্থিত ছিলো। পারিবারিকভাবে তিনি আভিজাত্যের অহঙ্কার ও নৈতিক অনাচারের উত্তরাধিকার অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সীমাবদ্ধ শিক্ষা ও সামন্ত-রুচির প্রভাব তাঁর মনন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। জন্মসূত্রে লাহিনীপাড়া এবং কর্মসূত্রে পদমদী-দেলদুয়ারের মতো মফস্বল ও পল্লীগ্রামে তাঁর জীবনের বৃহৎ সময় কেটেছে। সাহিত্যচর্চার পরিপূর্ণ সুযোগ ও আবহ সেখানে ছিলোনা। একমাত্র কাঙাল হরিনাথ ব্যতিরেকে মফস্বলে কোনো বড়ো মাপের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য-সাহচর্যের সুযোগও তিনি পাননি।

উনিশ শতকের প্রায় অধিকাংশ মনীষী-লেখক-বুদ্ধিজীবীই গ্রাম বা মফস্বল থেকে কলিকাতা মহানগরীতে গিয়ে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটান। নাগরিক সমাজ ও চলমান ঘটনায় তাঁরা বিশেষভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। কিন্তু মশাররফের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। তিনি কর্মোপলক্ষে মফস্বলেই অবস্থান করেন। নাগরিকজীবনের বৈদগ্ধ্য ও মহৎ জীবনাদর্শের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। মশাররফ নগরজীবনের সঙ্গে যতোটুকু পরিচিত ছিলেন তাতে সেই জীবনের ক্লেদ-গ্লানিই তাঁকে স্পর্শ করেছে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের মতো পরিশীলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাব তাঁর উপর পড়েনি। মূলত এই সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁর মধ্যে একজন মহৎ শিল্পীর যে সম্ভাবনা ছিলো তা পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি।

বাঙালী মুসলমানসমাজে বাঙলা গদ্যের ও আধুনিক সাহিত্যের চর্চা ছিলোনা। তাই মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) যখন প্রকাশ হয়, তখন 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (ওল. ৫-৯৯, ১৮৭০) সন্দেহ প্রকাশ করা হয় বইটি মুসলমানের ছদ্মনামে ভিন্ন কোনো লেখকের রচিত। 'দোভাষী পুঁথি'র উদ্ভট কাহিনী ব্যতীত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে বিশুদ্ধ বাঙলাভাষায় সাহিত্যরচনা ছিলো অবিশ্বাস্য ঘটনা। 'রত্নবতী' সম্পর্কে 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় (১৮৭০, পর্ব ৫/৫৪ খণ্ড) রাজেন্দ্রলাল মিত্রও মন্তব্য করেন, দোভাষী পুঁথির নিতান্ত গতানুগতিক পদ্যচর্চা ব্যতীত বাঙালী মুসলমান 'বাঙ্গালা লিখিতে পারেনা' বলে যে ধারণা প্রচলিত মশাররফ হোসেন 'সেই বোধের একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন'। সমালোচক এই গ্রন্থের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে, লেখকের নামের উল্লেখ না থাকলে 'গ্রন্থখানি সুশিক্ষিত বাঙালী হিন্দু দ্বারা বিরচিত' বলে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যেতো। হিন্দু-পরিচালিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও মশাররফের ভাষাশৈলীর এই সমধর্মী মূল্যায়ন করা হয়। গ্রন্থ-পর্যালোচনায় লেখকের শিল্পবোধ, প্রসঙ্গ কিংবা প্রকরণ নয়, ভাষাই অধিক প্রাধান্য ও বিবেচনা লাভ করেছে। গদ্যশিল্পী হিসেবে মশাররফের যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি তা তাঁর প্রথম গ্রন্থেই অর্জিত হয়।

মশাররফের সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বলা যায় যে, তাঁর রচিত সাহিত্যের শিল্প-সাফল্য কম নয়। তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে লিখেছেন। সাহিত্যের প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

সব শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। গদ্যে-পদ্যে তাঁর ছিলো সমান অধিকার। 'রত্নবতী' ও 'বসন্তকুমারী'-- কল্পিত বিষয়াশ্রয়ী এই গ্রন্থ দুটি ব্যতীত তিনি মূলত ইতিহাস, পুরাণ ও সমকালীন ঘটনা থেকেই তাঁর শিল্পকর্মের বিষয় নির্বাচন করেছেন। বাঙলাসাহিত্যের ধ্রুপদী রচনা-ধারায় তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' অন্তর্ভুক্ত। এর বিষয়বস্তুতে ধর্মীয় চেতনার যোগ থাকলেও মূলত মানবীয় প্রণয়-কাহিনী রচনাই তাঁর অভিপ্রেত ছিলো। নীতি ও ধর্ম প্রবল জীবনাগ্রহ-সমন্বিত শিল্পচেতনার কাছে পরাজিত হয়েছে। মানবিক ধারায় স্নাত শিল্পী রূপজমোহে আচ্ছন্ন নিয়তি-লাঞ্ছিত এক অসহায় মানবের কাহিনীই এখানে পরিবেশন করেছেন। শিল্পবোধের স্বাক্ষর হিসেবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'বসন্তকুমারী', 'জমীদার দর্পণ' কিংবা 'এসলামের জয়'- এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। অসমাপ্ত শিল্পকর্ম হলেও অকপট সত্যভাষণ, গভীর জীবনবোধ ও অনবদ্য সমাজচিত্র অঙ্কন তাঁর আত্মচরিতকে একটি ভিন্ন মর্যাদা দিয়েছে। নক্শাধর্মী রম্যসাহিত্যের ধারায় তাঁর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্যপ্রীতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রখর সমাজদৃষ্টি ও প্রবল হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্পভুবন। বিষয়-নির্বাচন ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও মশাররফ বাঙলাসাহিত্যে জীবনধর্মী ও সৃজনপ্রয়াসী বিশিষ্ট সাহিত্যশিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত।

অবশ্য মশাররফের শিল্পকর্মের ধারা পূর্বাপর একই খাতে প্রবাহিত হয়নি। তাঁর মানস-রূপান্তরের পরিচয় মেলে উত্তরজীবনের ব্যবসা-বুদ্ধিপ্রণোদিত ধর্মাশ্রিত গ্রন্থ রচনার উদ্যোগে। যৌবনে প্রবল মানবিক-বোধে উদ্বুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত মশাররফ যখন পঞ্চাশোর্ধ বয়সে প্রায় 'বটতলার পুঁথি'র সঙ্গে তুলনীয় শিল্পগুণহীন পদ্যে ধর্মকাহিনীর চর্চায় আত্মনিবেদিত, তখন তাঁর শিল্প-সামর্থ্যের অবসান ঘটেছে। তাঁর শিল্প-প্রতিভার অবক্ষয়ের চিহ্ন এই পর্যায়ের রচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। মশাররফের মনোজগতের এরূপ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা সমকালীন সামাজিক-রাজনীতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একদিকে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ও সাহিত্যে জাতিবৈর মনোভাব, অপরদিক জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের আলোকে মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণের চেষ্টা ও ধর্মীয় উজ্জীবনের প্রয়াস মশাররফকে প্রভাবিত করে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও জীবনের শেষপ্রান্তে এই ধর্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

নিজস্ব উদ্ভাবিত কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর ব্যবহার মশাররফের রচনায় অত্যন্ত স্বল্প। মূলত ইতিহাস, পুরাণ, সাময়িক ঘটনা বা সামাজিক সমস্যা তাঁর সাহিত্যরচনার প্রেরণা হয়েছে বলে তাঁর রচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবৃতিধর্মী, প্রতিবেদনমূলক ও উদ্দেশ্যপন্থী হয়ে উঠেছে। জীবনের ক্লেদাক্ত দিক উন্মোচন করতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও রুচিবিকার ঘটিয়েছেন ('এর উপায় কি?')। নিতান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষয়কেও সাহিত্যের উপজীব্য করায় তাঁর রচনা শিল্পের স্বভাবধর্ম বিচ্যুত হয়েছে ('গাজী মিয়াঁর বস্তানী')।

মশাররফ ছিলেন সমাজমনস্ক একজন শিল্পী। তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়-নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। তাঁর চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রভূমিতে ছিলো সমাজের অবস্থান। তাঁর সমাজ-সম্পৃক্ত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে ঐতিহ্যপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক অনাচার-কুপ্রথা, অত্যাচারী ও ভোগবিলাসমত্ত জমিদারের স্বরূপ, বিচারক-আমলা-কর্মচারীদের দুর্নীতি-স্খলন, মুসলিমসমাজের অবক্ষয়-অবনতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এই সূত্রে তাঁর সম্পাদিত 'আজীজন নেহার' (১৮৭৪) ও 'হিতকরী' (১৮৯০) পত্রিকার ভূমিকাও স্মরণীয়। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে সাহস ও নির্ভীকতার সঙ্গে তিনি লেখনীর মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'গো-জীবন' (১৮৮৯) ও জমিদারের অত্যাচার-অনাচার বিষয়ে 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) রচনা করে তিনি নিন্দিত ও বিপন্ন হন। তাঁর সমাজসম্পৃক্ত রচনার জন্য সমকালীন প্রতিক্রিয়া যথেষ্টই তীব্র হয়েছিল। তাঁর সৃজনশীল ও মননধর্মী উভয় ধারার রচনাতেই সমাজসচেতন লেখকের পরিচয় প্রতিফলিত।

তবে সবক্ষেত্রেই তাঁর সমাজচিন্তা যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল ছিলোনা। বিশেষ করে উত্তরকালে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যিক কাঠামো বজায় রাখা, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি স্ববিরোধী মনোভাব, রাজনীতি ও আন্দোলন সম্পর্কে অনীহা পোষণ— তাঁর সমাজচিন্তার সীমাবদ্ধতাকে সূচিত করে। তাঁর মধ্যে একদিকে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম এবং অপরদিকে রাজভক্তি ও রাজানুগত্যের বিপরীতধর্মী মনোভাবও প্রকাশিত। একটি দোলাচল মনোবৃত্তি তাঁর সমাজচিন্তাকে দ্বিধান্বিত করেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—১৯৭৬) পূর্বে মশাররফই প্রথম মুসলিম সাহিত্যশিল্পী যিনি বাঙালীসমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন এবং আপন প্রতিভার গুণে বাঙলাসাহিত্যে একটি সম্মানজনক আসন লাভ করেন। তাঁর শৈল্পিক ত্রুটি ও চিন্তা-চেতনাগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভাষাশিল্পী হিসেবে, সমাজমনস্ক ভাবুক হিসেবে, জীবনবাদী ও বৈচিত্র্যপ্রয়াসী লেখক হিসেবে, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যিক হিসেবে মীর মশাররফ হোসেন বাঙলাসাহিত্যে একজন স্বতন্ত্র শিল্পী-ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মশাররফের গ্রন্থ্ ও রচনাপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মশাররফের গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী

মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁর সব বইয়ের সন্ধানও পাওয়া যায়না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাররফের পঁচিশটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১] আবদুল লতিফ চৌধুরী পঁয়ত্রিশখানা বইয়ের তালিকা দিয়েছেন।[২] আশরাফ সিদ্দিকী সবমিলিয়ে প্রস্তুত করেছেন সাঁইত্রিশখানা বইয়ের তালিকা।[৩] কাজী আবদুল মান্নান 'ব্যাপক ও সুদীর্ঘ সন্ধানের পর' মীরের প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা পঁচিশ বলে নির্ধারণ করেছেন।[৪]

ব্রজেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত বইয়ের নাম যাঁরা দিয়েছেন সেই তালিকা মশাররফের গ্রন্থে প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন থেকেই মূলত গৃহীত। বিজ্ঞাপিত সব বই-ই যে প্রকাশিত হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। মশাররফ অনেকসময় যন্ত্রস্থ কিংবা প্রকাশিতব্য, এমন কী পরিকল্পিত বইয়ের নামও বিজ্ঞাপনে দিতেন। এ-সম্পর্কে বিবি কুলসুম মশাররফকে মাঝে-মধ্যেই তাগাদা দিয়ে বলতেন ঃ

> "ঐ বিষয়টা লিখিতে চাহিয়াছিলে, কৈ লিখিলে না।" ঐ প্রবন্ধটার এক পাত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন?" * * * "নাম রাখিলে বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই।" পদ্যটার আধাআধি লিখিয়া আর লিখিলেনা?"[৫]

এ-থেকে বেশ বোঝা যায়, বিজ্ঞাপনে নাম থাকলেও সব বই-ই প্রকাশিত হয়নি।

মশাররফের বংশধরদের কাছে রক্ষিত তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অথচ আংশিক মুদ্রিত অসমাপ্ত গ্রন্থের ফর্মা ও প্রুফকপি আমি দেখেছি। কোনো কোনো গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা হয়তো তাঁর ছিলো, বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর লেখা হয়ে ওঠেনি। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে এ-কথাও বলা হয়েছে যে, 'কোন কোন পুস্তক এ পর্যন্ত ছাপা শেষ হয় নাই। পত্র লিখিলে মূল্য ও বিবরণ জানিতে পারিবেন।' আত্মজীবনীর অপ্রকাশিত খস্‌ড়ায় মশাররফ তাঁর যন্ত্রস্থ ও অপ্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> রাজিয়া খাতুন, টালা অভিনয়, আমার জীবনী, তহ্‌মিনা, নিয়তি কি অবনতী, ভাই ভাই এই ত চাই—এইসকল পুস্তকের কতক প্রেসে ছাপাইতেছে আর কতক পুস্তকের কাপি বাড়ীতে আছে।[৬]

প্রকাশিত হওয়ার সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণসাপেক্ষে এখানে মশাররফ হোসেনের গ্রন্থাবলী কালানুক্রমিক বিবরণ প্রদত্ত হলো। তাঁর বিজ্ঞাপিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অগ্রন্থিত রচনার একটি তালিকাও এইসঙ্গে সংযোজিত হলো।[৭]

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. রত্নবতী। উপন্যাস। মুদ্রাকর ঃ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, ১৪৯ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ৩০ শ্রাবণ ১২৭৬ (২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)। পৃষ্ঠা –সংখ্যা ঃ ৬১।[৮]

২ গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী–সেতু। পদ্য। প্রকাশক ঃ আজিজন্দীন মহম্মদ পারনন্দ আলী, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৫ পৌষ ১২৮০ (২০ জানুয়ারী ১৮৭৩) পৃষ্ঠা–সংখ্যা ঃ ১৮।

৩. বসন্তকুমারী নাটক। নাটক। প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার। মুদ্রাকর ঃ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, ১৪৯ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৫ মাঘ ১২৭৯ (২ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩)। পৃষ্ঠা–সংখ্যা ঃ ১২৭। মূল্য ঃ বারো আনা। উৎসর্গ ঃ 'পরম শ্রদ্ধাস্পদ/শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর/শ্রদ্ধাভাজনেষু।'

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ময়মনসিংহ, ১২৯৪। প্রকাশক ঃ আইনদ্দীন বিশ্বাস। মুদ্রাকর ঃ উমাকান্ত রক্ষিত, চারুযন্ত্র, ময়মনসিংহ। পৃষ্ঠা–সংখ্যা ঃ ১২৭। মূল্য ঃ আট আনা।[৯]

৪. জমীদার দর্পণ। নাটক। প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার। মুদ্রাকর ঃ রামসর্বস্ব চক্রবর্তী, মধ্যস্থ–যন্ত্র, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ চৈত্র ১২৭৯ (১ মে ১৮৭৩)। পৃষ্ঠা–সংখ্যা ঃ ৭২। মূল্য ঃ আট আনা। উৎসর্গ ঃ 'পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব,/পূজ্যপাদেষু।'

৫. এর উপায় কি? । প্রহসন। প্রকাশকাল ঃ ১৮৭৫।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ টাঙ্গাইল, ১ কার্তিক ১২৯৯ (৩০ জানুয়ারী ১৮৯২)। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ সাধু সরকার, টাঙ্গাইল। পৃষ্ঠা–সংখ্যা ঃ ৯০। মূল্য ঃ চার আনা।[১০]

৬. বিষাদ–সিন্ধু। ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস।

Dhaka University Institutional Repository

মহরম পর্ব্ব। প্রকাশক ঃ আইনউদ্দীন বিশ্বাস, ৮৫ ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ ডি. সি. দাস এণ্ড কোং, কোরিন্থিয়ান প্রেস, ৩৩ নিউ চায়না বাজার, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ (১ মে ১৮৮৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২০৪। মূল্য ঃ এক টাকা। উৎসর্গ ঃ 'পূজনীয়া/শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন/সমীপে।-'

উদ্ধার পর্ব্ব। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ উমাকান্ত রক্ষিত, চারু প্রেস, ময়মনসিংহ। প্রকাশকাল ঃ ১ শ্রাবণ ১২৯৪ (১৪ আগস্ট ১৮৮৭)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১৯১। মূল্য ঃ এক টাকা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক।

এজিদবধ পর্ব্ব। প্রকাশকঃ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া। মুদ্রাকর ঃ সান্যাল এণ্ড কোং, ৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১২৯৭ (১০ মার্চ ১৮৯১)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪৩। মূল্য ঃ আট আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক।

৬খ. বিষাদ-সিন্ধু। [হিন্দী সংস্করণ]। অনুবাদক ঃ কবীন্দ্র বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী "মঞ্জুল" ('কান্যকুব্জ' পত্রিকার সম্পাদক)। প্রকাশক ঃ নিরঞ্জনলাল ভার্গাও, এলাহাবাদ। প্রকাশকাল ঃ ১৯৩০। গ্রন্থস্বত্ব ঃ মীর এবরাহিম হোসেন।

৭. সঙ্গীত লহরী। ১ম খণ্ড। সঙ্গীত-সংকলন। প্রকাশক ঃ আইনদ্দিন বিশ্বাস, লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া। মুদ্রাকর ঃ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, ভারতমিহির যন্ত্র, ৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১২৯৪ (৪ আগস্ট ১৮৮৭)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৬৮ + ২। মূল্য ঃ চার আনা। গীত-সংখ্যা ঃ ৯১। মুদ্রণ-সংখ্যা ঃ ১০০০। গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক।

৮. গো-জীবন। প্রবন্ধ। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ চন্দ্রকুমার সরকার, আহ্‌মদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল। প্রকাশকাল ঃ ২৫ ফাল্গুন ১২৯৫ (৮ মার্চ ১৮৮৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৬৬। মূল্য ঃ আট আনা। 'দুই হাজার কাপী বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।' উৎসর্গ ঃ 'পঞ্চবিংশতি কোটী/ভারতসন্তান করে/গো-জীবন/ সমর্পণ করিলাম।' মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ২০০০। গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক।

৯. বেহুলা গীতাভিনয়। নাটক। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ সাধু সরকার, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল। প্রকাশকাল ঃ ৭ আশ্বিন ১২৯৬ (২৩ জুন ১৮৮৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১৩৮। মূল্য ঃ বারো আনা।

১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা। ইতিহাসাশ্রয়ী উপাখ্যান। প্রকাশক ঃ মীর মহতাব আলি, লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া। মুদ্রাকর ঃ সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ভারতমিহির যন্ত্র, ৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১২৯৭ (২৯ আগস্ট ১৮৯০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১৯৮। মূল্য ঃ একটাকা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

১১. **মৌলুদ শরীফ**। গদ্য-পদ্যে রচিত ধর্মপুস্তক। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ মনীরুদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইল। প্রকাশকাল ঃ ২ নভেম্বর ১৮৯৪। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৬০। মূল্য ঃ আট আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক।

চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৩১৯। প্রকাশক ঃ মীর আশরাফ হোসেন, ২৫ ডাক্তার করম হোসেন লেন, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য ঃ এক টাকা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ বিবি রওশন আরা ও মীর এব্রাহিম হোসেন এণ্ড ব্রাদার্স।

১২ **গাজী মিয়াঁর বস্তানী**। ১ম অংশ। নক্‌শাধর্মী উপাখ্যান। প্রকাশক ঃ এম. ইউ. আহমদ। মুদ্রাকর ঃ অমৃতলাল ঘোষ, দাস যন্ত্র, ৪ নং ভবন উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৫ আশ্বিন ১৩০৬ (১৮৯৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৮ + ৪০০। মূল্য ঃ এক টাকা আট আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ 'উদাসীন পথিক'।

১৩. **মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা**। শিশুশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক।

প্রথম ভাগ। প্রকাশক ঃ মীর এব্রাহিম হোসেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ভারতমিহির যন্ত্র, ২৫ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১০ (১ অক্টোবর ১৯০৩)। পৃষ্ঠা-সংখ্যাঃ ল. + ২৯। মূল্য ঃ এক আনা।

প্রথম ভাগের প্রথম অংশ। প্রকাশক ঃ এম. এব্রাহিম এণ্ড কোম্পানী, ১৬ ওয়েলেস্‌লী স্কোয়ার, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ হরিচরণ মান্না, দিনময়ী প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১৩। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ~ + ১৮ + ২। মূল্য ঃ পনেরো পাই।

দ্বিতীয় ভাগ। প্রকাশক ঃ মীর আশরাফ হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১৪ (১৫ মে ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২ + ৫৩। মূল্য ঃ ছয় পাই। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার।

১৪. **উপদেশ**। হজরত লোকমানের উপদেশের পদ্যানুবাদ। প্রকাশক ঃ মীর এব্রাহিম হোসেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১০৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। রচনাকাল ঃ ১৩০৯। প্রকাশকাল ঃ আশ্বিন ১৩২২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ দশ। অবশ্য মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 'উপদেশ' স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। 'হজরত বেলালের জীবনী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই ক্ষুদ্র কাব্যানুবাদটি সংযোজিত।[১২]

১৫. **বিবি খোদেজার বিবাহ**। কবিতা। প্রকাশকঃ মীর এব্রাহিম হোসেন, ৪৮ সার্কুলার রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ভারতমিহির যন্ত্র, ২৫ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১২ (২৫ মে ১৯০৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪ + ১২৭। মূল্য ঃ আট আনা/ বাঁধাই-বারো আনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ। কবিতা। প্রকাশক ঃ মীর এব্রাহিম হোসেন, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১ শ্রাবণ ১৩১২ (১১ আগস্ট ১৯০৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪২। মূল্য ঃ চার আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ৪৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৭. হজরত বেলালের জীবনী। কবিতা। প্রকাশক ঃ মীর এব্রাহিম হোসেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪২। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

১৮. হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ। কবিতা। প্রকাশক ঃ মীর এব্রাহিম হোসেন, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ কার্তিক ১৩১২ (১০ নভেম্বর ১৯০৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২২। মূল্য ঃ চার আনা।

১৯. মদিনার গৌরব। কবিতা। প্রকাশকাল ঃ ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১২০।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩২০ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। প্রকাশক ঃ মীর আশরাফ হোসেন ব্রাদার্স, ১৫/১, ডাঃ করম হোসেন লেন, কড়েয়া, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১২০। মূল্য ঃ চার আনা।

২০. মোস্লেম-বীরত্ব। কবিতা। প্রকাশক ঃ এম. এব্রাহিম এণ্ড কোং, ১৬ ওয়েলেসলী স্কোয়ার, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ২০ জুলাই ১৯০৭। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২ + ১৯৬। মূল্য ঃ ছয় আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা।

২১. এসলামের জয়। ইতিবৃত্ত। প্রকাশক ঃ মীর আশরাফ হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১৫ (৪ আগস্ট ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১ + ৩০৭। মূল্য ঃ এক টাকা বারো আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা।

২২. আমার জীবনী। আত্মচরিত।

প্রথম খণ্ড। প্রকাশক ঃ মুন্শী সাদেক আলী, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১ আশ্বিন ১৩১৫ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪ + ২৫। মূল্য ঃ দুই আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড । প্রকাশকাল ঃ ১ কার্তিক ১৩১৫ (১৭ অক্টোবর ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২৮। মূল্য ঃ দুই আনা।

তৃতীয় খণ্ড। প্রকাশক ঃ মুন্‌শী সাদেক আলী, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১৫ (২২ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪ + ২৮।

চতুর্থ খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১৫ (২৭ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৩০। মূল্য ঃ দুই আনা।

পঞ্চম খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৩১৫ (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২৮। মূল্য ঃ দুই আনা।

ষষ্ঠ খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন ১৩১৫ (৩০ মার্চ ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৩২।

সপ্তম খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ চৈত্র ১৩১৫ (১২ মে ১৯০৯)।

অষ্টম খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ ১৩১৬ (২৭ মে ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৩২।

নবম খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, ইন্টালী, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ (১০ জুলাই ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৩২। মূল্য ঃ দুই আনা।

দশম খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৩১৬ (৯ ডিসেম্বর ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৩২। মূল্য ঃ দুই আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড। প্রকাশক ঃ মীর মাহবুব হোসেন, ১ আহিরপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ এস. সি. চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন ১৩১৬ (২ মার্চ ১৯১০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ২ + ১১১। মূল্য ঃ চার আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার।

২৩. বাজীমাৎ। কবিতা। প্রকাশক ঃ মীর আশরাফ হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ বলাইচন্দ্র বণিক, ইউনিয়ন প্রেস, ২৫ হুক লেন, ইন্টালী, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ ১৫ কার্তিক ১৩১৫ (ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১৩১। মূল্য ঃ চার আনা।

২৪. ঈদের খোতবা। আরবী খোতবার বাঙলা ও উর্দুভাষায় পদ্যানুবাদ। প্রকাশক ঃ মীর আশরাফ হোসেন, ৩৬ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৩১৬ (১২ জুলাই ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ৪ + ১১৪। মূল্য ঃ দুই আনা।

২৫. বিবি কুলসুম। জীবনী। প্রকাশক ঃ মীর এবরাহিম হোসেন, আহিরপুকুর ১নং ফার্স্ট লেন, কলিকাতা। মুদ্রাকর ঃ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, কালিকা যন্ত্র, নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল ঃ চৈত্র ১৩১৬ (৯ মে ১৯১০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ঃ ১৬৭। মূল্য ঃ 'অমূল্য'।

বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ

১. প্রেম-পারিজাত/হজরত ইউসোফ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সূত্রে জানা যায়, 'আমার জীবনী'র প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩১৫) এই বইটি ('হজরত ইউসোফ') 'যন্ত্রস্থ' বলে বিজ্ঞাপিত। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'হজরত ইউসোফ'কে 'প্রবন্ধ গ্রন্থ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৩] কাজী আবদুল মান্নান 'গদ্যে রচিত গল্প (?)' বলে চিহ্নিত করে এই বইয়ের প্রকাশকাল নির্ধারণ করেছেন 'আনুমানিক ১৯০৮ খ্রীঃ'।[১৪] আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, "মীর মশাররফ হোসেনের সর্বশেষ রচনা 'ইউসুফ জুলেখা' এখন অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁর সন্তানদের নিকট রক্ষিত।"[১৫] এই একই প্রবন্ধে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "প্রেম পারিজাত রচনাটিরই অপর নাম 'ইউসুফ জুলেখা', ইহা ১৩২১ সনে প্রকাশিত 'মুসলিম বীরত্বে'র প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে ও মীর সাহেবের সন্তানদের নিকট জানা যায়।"[১৬]

মশাররফের উত্তরপুরুষদের কাছে রক্ষিত এই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি যথার্থই 'ইউসুফ জুলেখা' ও 'প্রেম-পারিজাত' অভিন্ন রচনা। 'এর উপায় কি?' (দ্বি-স ঃ ১ কার্তিক ১২৯৯) প্রহসনের ভূমিকা ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে (১৩০৬/১৮৯৯) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে 'প্রেম-পারিজাতে'র উল্লেখ আছে। 'আমার জীবনী'র প্রথম খণ্ডের (১৩১৫/১৯০৮) বিজ্ঞাপনে 'হজরত ইউসোফে'র নাম পাওয়া যায়। আমাদের অনুমান, মশাররফই 'প্রেম-পারিজাত' এই নাম পরিবর্তন করে বইয়ের নাম দেন 'হজরত

Dhaka University Institutional Repository

ইউসোফ'। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র পর মীরের প্রায় সব রচনাই ধর্মাশ্রিত, তাঁর মানস-রূপান্তরও ঘটেছে এইসময়ে। ধারণা করা যায় একজন নবীর জীবনালেখ্য 'প্রেম-পারিজাত' নামে প্রকাশ তিনি সমীচীন মনে করেননি, তাই হয়তো 'হজরত ইউসোফ' নামকরণ করেন। তাঁর জীবৎকালে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ সফল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর যখন বইটি প্রকাশের চেষ্টা হয় তখন পাঠক-আকৃষ্ট করার জন্যই বোধহয় 'ইউসুফ জুলেখা' নামকরণ করা হয়, যাতে একটি ধ্রুপদী প্রেমকাহিনী হিসেবে বইটি সহজেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এই বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠার ছাপা গ্যালি প্রুফসহ ৩৭৩ পৃষ্ঠার একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে।[১৭]

২. ভাই ভাই এই ত চাই।[১৮] প্রহসন।

৩. ফাঁস কাগজ। প্রহসন।

৪. এ কি? । প্রহসন।

৫. টালা-অভিনয়। প্রহসন। 'হাফেজ' পত্রিকার ১৮৯৭ সালের মার্চ-এপ্রিল এবং মে-জুন যুক্ত সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মন্তব্য, "টালা অভিনয় বোধহয় ছাপা হয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় নাই।"[১৯] 'মশাররফ রচনা-সম্ভারে' এই প্রহসনের শেষাংশ সংকলিত হয়নি।

৬. পঞ্চনারী পদ্য। কবিতা।

৭. রাজিয়া খাতুন। উপন্যাস। 'হিতকরী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত (১৬ অক্টোবর ১৮৯১/৩০ আশ্বিন ১২৯৮ ঃ২ ভাগ ১৮ সংখ্যা থেকে)। 'মশাররফ রচনা-সম্ভারে' অন্তর্ভু[illegible]।

৮. তহমিনা। উপন্যাস। 'হাফেজ' পত্রিকার চার সংখ্যায় (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ-এপ্রিল, ও মে-জুন ১৮৯৭) ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার পর অসমাপ্ত অবস্থায় প্রকাশ বন্ধ হয়। সৈয়দ মুর্তাজা আলী মীরের এই রচনাকে 'রোমান্টিক প্রেম-উপাখ্যান' বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, "খুব সম্ভব 'তহমিনা' গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে নাই।"[২০] 'তহমিনা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির ১৬৬ পৃষ্ঠার সন্ধান পাওয়া গেছে।[২১]

৯. বাঁধা খাতা। উপন্যাস। এর পাণ্ডুলিপির খণ্ডাংশ অভিসন্দর্ভকারের নিজস্ব সংগ্রহে আছে।

১০. নিয়তি কি অবনতি। "সম্পূর্ণ সত্য ঘটনামূলক জীবন্ত উপন্যাস" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে 'কোহিনুর' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ঃ ডিসেম্বর ১৮৯৮/ অগ্রহায়ণ ১৩০৫ ও ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ঃ জুন ১৮৯৯/জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) প্রকাশিত হয়। কাজী আবদুল মান্নানের মন্তব্য, "নাটকটি সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা বা গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল কিনা সে খবর আমাদের জানা নেই।"[২২]

Dhaka University Institutional Repository

১১. গাজী মিয়াঁর গুলি। রম্যরচনা। 'নবনূর' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ঃ আষাঢ় ১৩১২) নতুন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'যন্ত্রস্থ' হিসেবে একটাকা মূল্যের এই গ্রন্থটির উল্লেখ আছে।[২৩]

১২. বৃহৎ হীরকখনি।[২৪] শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক। মূল্য ঃ দুই আনা। 'বইটি ২৩-৮-২২ ইং কলিকাতা গেজেটে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক শিশুপাঠ্য ও প্রাইজের জন্য অনুমোদিত'। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের সূত্রে জানা যায় এই 'বৃহৎ হীরকখনি' বইয়ের (প্রকাশকাল ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯১৪, পৃঃ ২১ ; মূল্য ঃ দুই আনা) 'সঙ্কলক' মশাররফ-পুত্র মীর এব্রাহিম হোসেন।[২৫]

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

পত্র-পত্রিকায় মশাররফ হোসেনের অনেক রচনাই প্রকাশিত হয়েছে। এইসব রচনার পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন আজ প্রায় অসম্ভব ও দুরূহ। বর্তমানে প্রায় সব পত্রিকাই অতি-দুষ্প্রাপ্য। এছাড়া অনেক পত্রিকাতেই প্রকাশিত রচনায় লেখকের নাম থাকতোনা। তাই এইসব অস্বাক্ষরিত রচনা থেকে মশাররফের রচনা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করাও প্রায়-অসম্ভব। দু-একটি ক্ষেত্রে বিষয় ও ভাষাভঙ্গির বিচারে কিছু রচনা হয়তো চিহ্নিত করা সম্ভব। মশাররফ 'সংবাদ প্রভাকর', 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', 'আজীজন নেহার', 'হিতকরী', 'কোহিনুর', 'মিহির', 'হাফেজ', 'আহমদী', 'নবরত্ন', 'এডুকেশন গেজেট', 'ভারতমহিলা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। এখানে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মীরের রচনার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা হলো।

১. মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি (প্রবন্ধ)। 'সংবাদ প্রভাকর' ঃ মে ১৮৬৫।

২. গোলাপ (কবিতা)। 'সংবাদ প্রভাকর' ঃ ২৮ চৈত্র ১২৭২।

৩. সুসমাচার (প্রবন্ধ)। 'নবরত্ন' ঃ ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬।

৪. গো-কুল নিম্মূল আশঙ্কা (প্রবন্ধ)। 'আহমদী' ঃ ১৫ শ্রাবণ ১২৯৫

৫. গোজীবন সম্বন্ধে শেষ কথা (আলোচনা)। 'আখবারে এসলামীয়া' ঃ মাঘ ১২৯৬।

৬. আমাদের শিক্ষা (প্রবন্ধ)। 'হিতকরী' ঃ ১ পৌষ ও ১৫ পৌষ ১২৯৭।

৭. মুসলমান সমাজের উন্নতি (প্রবন্ধ)। 'হিতকরী' ঃ ২০ শ্রাবণ ও ৩০ শ্রাবণ ১২৯৮/৪ আগস্ট ও ১৪ আগস্ট ১৮৯১।

৮. রাজিয়া খাতুন (ধারাবাহিক উপন্যাস)। 'হিতকরী' ঃ ১৬ অক্টোবর ১৮৯১/৩০ আশ্বিন ১২৯৮ (প্রথম কিস্তি)। ১৩ জানুয়ারী ১৮৯২/ ৩০ পৌষ ১২৯৮ সংখ্যায় এই অসমাপ্ত রচনার শেষ কিস্তি ছাপা হয়।

৯. বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র (কবিতা)। 'হাফেজ' ঃ জানুয়ারী ১৮৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০. সৎ-প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)। 'কোহিনুর' ঃ ভাদ্র ১৩০৫।

১১. তহমিনা (ধারাবাহিক উপন্যাস)। 'হাফেজ' ঃ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ-এপ্রিল ও মে-জুন ১৮৯৭।

১২. টালা-অভিনয় (প্রহসন)। 'হাফেজ' ঃ মার্চ-এপ্রিল ও মে-জুন ১৮৯৭।

১৩. নিয়তি কি অবনতি (ধারাবাহিক নক্শা)। 'কোহিনুর' ঃ ডিসেম্বর ১৮৯৮, জুন ১৮৯৯ (অসমাপ্ত)।

১৪. [বাল্য-রচনা সম্পর্কিত প্রবন্ধ]। 'কোহিনুর' ঃ ২য় কল্প, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩১০।

১৫. প্যারীসুন্দরী (জীবনী প্রবন্ধ)। 'ভারতমহিলা' ঃ বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩১৪।

অপ্রকাশিত রচনা

মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও কম নয়। তাঁর বংশধরদের কাছে এইসব রচনার কিছু পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই অপ্রকাশিত রচনার কোনো তালিকা প্রণীত হয়নি। অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে কিছু অপ্রকাশিত রচনার পরিচয় পাওয়া গেছে।[২৬]

১. আমার জীবনী। আত্মচরিতের খণ্ডাংশ।

২ দিনলিপি। ডাইরী।

৩. চোরের উপর বাটপাড়ি। কাহিনীধর্মী রচনা।

৫. ওফাতে রসুল। পদ্যরচনা।

৬. শবে মেরাজ। পদ্যরচনা।

৭. আব্বাসের বিবরণ। পদ্যরচনা।

তথ্য-নির্দেশ

১. *স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন,* পৃঃ ৩৫-৪২
২ *মীর মশাররফ হোসেন,* (সিলেট, ১৯৫২), পৃঃ ৬-৩৮
৩. *বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ১৯-২০
৪. *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ বার ('ভূমিকা')
৫. *বিবি কুলসুম,* পৃঃ ১১১
৬. *মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ২নং খাতা।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. মশাররফের গ্রন্থ ও রচনাবলীর বিবরণ গৃহীত হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (*স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন*), আবদুল লতিফ চৌধুরী (*মীর মশাররফ হোসেন*), আশরাফ সিদ্দিকী (*বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩), মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (*বাঙলাসাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন*), আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *মীর মশাররফ হোসেন স্মারকপত্র* (কুষ্টিয়া, ১৯৭৭), কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত *মশাররফ রচনা-সম্ভার* (১-৫ খণ্ড) ও আলী আহমদের (*বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*) গ্রন্থ থেকে। মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, দিনপঞ্জি, পারিবারিক কাগজপত্র ও হিসাব-বিবরণও (*অপ্রকাশিত ১-৫ নং খাতা*) এ-বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

৮. অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে মশাররফ লিখেছেন, "এইসময়ে 'রত্নবতী' নামে একখানা পুস্তক লিখিলাম। ছাপাইতে একবার অগ্রসর হই, আবার সাহস হয়না। শেষে আর থাকিতে পারিলামনা—কোন প্রেসে ছাপাইয়াছিলাম—এখন তাহার কিছুই মনে নাই।...... রত্নবতী প্রকাশ হয় বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে ৩০শে অগ্রহায়ণ।" (*মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ৫নং খাতা,* পৃঃ ১২০)।

এই অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর অন্যত্র মশাররফ জানিয়েছেন, "যে সময় রত্নবতী লিখিয়াছিলাম, সে সময় বিবিধার্থ সংগ্রহ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রত্নবতীর সমালোচনা করিয়া আমার উৎসাহ জন্য আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'মুসলমান হাতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পুস্তক এই প্রথম বাহির হইতে দেখিলাম। বিশুদ্ধ ভাষা, কিন্তু গল্পটী খুড়িমার গল্প।'

মনে ২ খুব খুশী হইলাম। উৎসাহ বাড়িল। সাবধান হইলাম। খুড়িমার গল্প আর লিখিবনা।" (ঐ, পৃঃ ১২৩-২৪)।

স্মৃতিবিভ্রমের কারণে মশাররফ *রত্নবতী*র সমালোচনা *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে গ্রন্থ-পরিচিতিটি প্রকাশিত হয় *রহস্য সন্দর্ভ* পত্রিকায়। উভয় পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আর মশাররফ স্মৃতি থেকে পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচকের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তা অবিকৃত নয়, যদিও মূল বক্তব্য-বিষয়ের সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে।

৯. *বসন্তকুমারী নাটক* মুদ্রণের ব্যয় পরিশোধ ও গ্রন্থ সরবরাহ নিয়ে লেখক ও প্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ঘটনাটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মশাররফ হোসেন *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় (১০ আষাঢ় ১২৮০/২৩ জুন ১৮৭৩, পৃঃ ৪৯৭) এক 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশ করে জানান, "কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না। কাগজের মূল্য এবং ছাপা খরচ সমেত বাইণ্ডীঙ মোট ১১০ দশ টাকা পাওনা। কাপী পাঠান সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ভুবনবাবুর মাঃ বিশ, খোদ পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার পাওনা।..... যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেল গার্ড নিকট না দেন তবে নয়শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইবে।"

প্রেস কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবী আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে ডিক্রি লাভ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের প্রিন্টার সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় (১৪ পৌষ ১২৮১/২৮ ডিসেম্বর ১৮৭৪, পৃঃ ৯৭-৯৮) এক 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশ করে বলেন, "কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া-

Dhaka University Institutional Repository

নিবাসী শ্রী মীর মোশারফ হোসেন নামক একজন মুসলমান গত সনের ১০ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে এইভাবে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ.... মহাশয়কে জানাইতেছি যে, বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না ইত্যাদি। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁহার নিকট বসন্তকুমারী নাটক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি বাবত ৮৪ ৶১০ বাকী ছিল, তাহা না পাওয়াতে যন্ত্রালয়ের রীত্যনুসারে সমস্ত পুস্তক ওয়াপোস দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞাপন প্রকাশকের প্রার্থনামত সময়ে সময়ে প্রায় একশত পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল। মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে দেখিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া পাওনা টাকার দাবীতে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিস করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট সোমবার উক্ত আদালতের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায়বাহাদুরের এজলাসে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মেকোবেলার [মোকাবেলায়] আসল ৮৪ ৶১০ ও খরচার ডিক্রী হইয়াছে। সোমপ্রকাশের উক্ত বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কিছুই পাওয়ানা নাই, কিন্তু বিচারপতির সম্মুখে প্রতিবাদী হলফ করিয়া স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, ২০/২৫ টাকা পাওনা হইবে। কিন্তু আদালতের সূক্ষ্মবিচারের উচিত মত উপযুক্ত দাবীই ডিক্রী হইয়াছে। তথাপি তিনি এ পর্যন্ত ডিক্রীর টাকা ও মকদ্দমার খরচা জমা দেন নাই। আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা প্রদান না করিলে তাঁহার নামে 'বডি ওয়ারেন্ট' বাহির হইবে। আর প্রকাশ্য পত্রে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া টাকা পাইয়াও পুস্তক ছাড়িয়া না দিবার যে অপবাদ দিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তজ্জন্যও যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় শীঘ্রই সম্ভ্রমের ক্ষতি পূরণার্থ স্বতন্ত্র অভিযোগ উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইবেন।"

১০. মশাররফের নামে *গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়* (২৪ ফাল্গুন ১২৮০/ ৭ মার্চ ১৮৭৪) *এর উপায় কি* প্রহসনের এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ঃ "এর উপায় কি এই নামে একখানি প্রহসন লিখিয়াছি অতি সত্বরে প্রকাশ হইবে। মূল্য ।√. আনা গ্রাহকগণ একমাসমধ্যে ।· আনা পাঠাইলে বিনা ডাকমাসূলে প্রেরিত মূল্যে 'এর উপায় কি?' প্রাপ্ত হইবেন।" মীরের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর খসড়ায় (*৩নং খাতা*) এই প্রহসনটির প্রকাশকালের উল্লেখ আছে বৈশাখ ১২৮২।

১১. *উদাসীন পথিকের মনের কথা* গ্রন্থ প্রসঙ্গে মশাররফকে লিখিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের একটি পত্র *হিতকরী* পত্রিকায় (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৭/৩০ নভেম্বর ১৮৯০) ছাপা হয় ঃ

কুমারখালী । ১২৯৭ সাল ।

২২শে কার্ত্তিক।

সুহৃদ্বরেষু। আজ আপনি মহাশয় বলিয়া কিছু লিখিব না। ভাই *** তোমার মনের কথা পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞানলাভের সহিত সন্তুষ্ট হইলাম। এইরূপ পুস্তক সম্বাদপত্র, পাঞ্চ ও বক্তৃতা অপেক্ষা আমি অধিক মূল্যবান মনে করি। ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা, সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ু হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণ-সাধন ও সত্যের প্রকাশ করিতে নিরাপদ হও; এইরূপে যতই সত্যের প্রকাশ হইবে, অসত্য আলোকপ্রকাশে অন্ধকারের ন্যায় ক্রমে অন্তর্হিত হইবে, তাহার পরেই সত্যকালের আগমন। ইতি

অনুগত দাদা

শ্রী হরিনাথ মজুমদারের

নিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

১২. *উত্তরাধিকার,* মাঘ–চৈত্র ১৩৯৩, পৃঃ ২০৩–০৪

১৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *বাংলাসাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* (ঢাকা, ১৯৮১, তৃ–স), পৃঃ ৬৩ (দ্বিতীয় খণ্ড)

১৪. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, (ঢাকা, ১৩৮৩), পৃঃ এগার ('ভূমিকা')

১৫. *বাঙ্‌লা–একাডেমী পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ২০

১৬. ঐ, পৃঃ ১২৭

১৭. *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* পৃঃ ৬০৬

১৮. ২ থেকে ১০ সংখ্যক গ্রন্থের নাম *গাজী মিয়াঁর বস্তানী* –তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়।

১৯. *প্রবন্ধ–বিচিত্রা,* পৃঃ ৯০

২০. ঐ, পৃঃ ৮৮

২১. *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* পৃঃ ৬০৭

২২. *মশাররফ রচনা–সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ দশ ('ভূমিকা')

২৩. *বাঙ্‌লা–একাডেমী পত্রিকা,* পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ২০

২৪. ঐ, ২০

২৫. *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* পৃঃ ২৮৩

২৬. ঐ, পৃঃ ৬০৬–০৭। ১ থেকে ৪ সংখ্যক রচনার মতো ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক রচনাও অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্ম আকারে রক্ষিত। রচনার নামকরণ তাঁর।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

মৌলিক গ্রন্থ

কায়কোবাদ	মহরম শরিফ, (ঢাকা, ১৩৭৭, নূ–স)।
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচার নক্শা, (ঢাকা, তারিখবিহীন, ঝিনুক পুস্তিকা সংস্করণ)।
বাণভট্ট	কাদম্বরী, তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৯৬৮, দ্বি–স)।
মীর মশাররফ হোসেন	আমার জীবনী, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৮৪)।
	উদাসীন পথিকের মনের কথা, এ. কে. এম. শামসুল ইসলাম সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৩৭৭)।
	এর উপায় কি?, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, (চট্টগ্রাম, ১৩৮১)।
	এসলামের জয়, (কলিকাতা, তারিখবিহীন, দ্বি–স)।
	গাজী মিয়াঁর বস্তানী, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৩৬৭, দ্বি–স)।
	টালা-অভিনয়, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৯)।
	বিবি কুলসুম, (কলিকাতা, ১৩১৭)।
	বেহুলা গীতাভিনয়, (টাঙ্গাইল, ১২৯৬)।
	মৌলুদ শরীফ, (কলিকাতা, ১৩১৯, চ –স)।
	রত্নবতী, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, (চট্টগ্রাম, ১৯৬৯)।
	সঙ্গীত লহরী, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৬)।
	মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ম, ২য়, ৫ম খণ্ড, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৩৮৩, ১৩৮৬, ১৩৯২)।
	মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৮৫)।
শেখ আবদুর রহিম	শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৩৭৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

অতুল সুর	বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, (কলিকাতা, ১৯৭৯, দ্বি-স)।
অজিতকুমার ঘোষ	বাংলা নাটকের ইতিহাস, (কলিকাতা, ১৯৭৬, ষ-স)।
অজিতকুমার চক্রবর্তী	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (কলিকাতা, ১৩৭৭, জিজ্ঞাসা-সংস্করণ)।
অমলেন্দু দে	বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, (কলিকাতা, ১৯৭৪)।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা-সাহিত্য, (কলিকাতা, ১৯৫৯)।
আজহার ইসলাম	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, আধুনিক যুগ, (ঢাকা, ১৩৭৬)।
আজিজুর রহমান মল্লিক	বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, দিলওয়ার হোসেন অনূদিত, (ঢাকা, ১৯৮২)।
আনিসুজ্জামান	মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য, (ঢাকা, ১৯৬৪)।
আবদুল লতিফ চৌধুরী	মীর মশাররফ হোসেন, (সিলেট, ১৯৫২/ঢাকা, ১৯৮০)।
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ	সমাজ , সংস্কৃতি ও ইতিহাস, (ঢাকা, ১৯৭৪)।
আবু হেনা মোস্তফা কামাল	কথা ও কবিতা, (ঢাকা, ১৯৮১)।
	শিল্পীর রূপান্তর, (ঢাকা, ১৯৭৫)।
আবুল আহসান চৌধুরী	কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, (ঢাকা, ১৯৮৮)।
	কুষ্টিয়ার বাউলসাধক, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৪)।
	মীর মশাররফ হোসেন, (ঢাকা, ১৯৯৩)।
আলী আহমদ	বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, (ঢাকা, ১৩৯২)।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,১ম খণ্ড,(কলিকাতা,১৩৭৪,তৃ-স)।
আহমদ শরীফ	বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য, ২য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৩৯০)।
	বিচিত চিন্তা, (ঢাকা, ১৯৬৮)।
উইলিয়াম হান্টার	দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, আবদুল মওদুদ অনূদিত, (ঢাকা, ১৯৭৪), তৃ-স)।
ওয়াকিল আহমদ	উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম ও ২য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৮৩)।
	বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, (ঢাকা, ১৯৮৫)।
কাজী আবদুল ওদুদ	বাংলার জাগরণ, (কলিকাতা, ১৩৬৩)।
	শাশ্বত বঙ্গ, (কলিকাতা, ১৯৫১)।
কাজী আবদুল মান্নান	আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, (ঢাকা,১৯৬৯,দ্বি-স)।

Dhaka University Institutional Repository

কার্ল মার্কস ও
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস — উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, (মস্কো, ১৯৭১)।

প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, (মস্কো, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই)।

কুমুদনাথ মল্লিক — নদীয়া কাহিনী, মোহিত রায় সম্পাদিত,(কলিকাতা,১৩৯৩,তৃ-স)।

কোকা আন্তোনভা,
গ্রিগোরি বোনগার্দ-লেভিন,
গ্রিগোরি কতোভ্স্কি — ভারতবর্ষের ইতিহাস, (মস্কো, ১৯৮২)।

গীতা মুখোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা, (কলিকাতা, ১৯৮১)।

গোলাম সাকলায়েন — বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য, (ঢাকা, ১৯৬৯, দ্বি-স)।

জওহরলাল নেহরু — বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ, (কলিকাতা, ১৯৬৫, তৃ-স, বঙ্গানুবাদ)।

জলধর সেন — কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩২০)।

নওয়াব আবদুল লতীফ — মুসলিম বাঙ্গালা ঃ আমার যুগে, আবু জাফর শামসুদ্দীন অনূদিত, (ঢাকা, ১৯৬৮)।

নগেন্দ্রনাথ সোম — মধুস্মৃতি, (কলিকাতা, ১৩৬১)।

নরহরি কবিরাজ — স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, (কলিকাতা, ১৯৫৭)।

বদরুদ্দীন উমর — ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, (কলিকাতা, ১৯৮৪)।

বিনয় ঘোষ — বাংলার বিদ্বৎসমাজ, (কলিকাতা, ১৩৮৪, দ্বি-স)।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, (কলিকাতা, ১৯৬৮)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — পরিষৎ-পরিচয়, (কলিকাতা, ১৩৫৬ ?)।

বাংলা সাময়িকপত্র, ২য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৫৯)।

স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ২৮-২৯ সংখ্যক পুস্তিকা, (কলিকাতা,১৩৬১, প-স)।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত — বাঙ্গলার ইতিহাস, (কলিকাতা, ১৩৮৩, দ্বি-স)।

মুনীর চৌধুরী — মীর-মানস, (ঢাকা, ১৩৭৫, দ্বি-মু)।

মুরারি ঘোষ — প্রাক্-আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতি, (কলিকাতা, ১৯৮৩)।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম — মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা, ১৩৭৬, দ্বি-স)।

সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, (ঢাকা, ১৩৮৩)।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও
সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ, (ঢাকা, ১৯৫৬)।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ — স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, (ঢাকা, ১৯৮২)।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ এনামুল হক — পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইসলাম, (ঢাকা, ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ)।

বঙ্গে স্বূফী প্রভাব, (কলিকাতা, ১৯৩৫)।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন — বাংলাসাহিত্যে মুসলিম সাধনা, (ঢাকা, ১৯৮১, অখণ্ড, তৃ-স)।

মোহাম্মদ আজিজুল হক — বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, (ঢাকা, ১৯৬৯)।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল — বাঙলাসাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, (ঢাকা, ১৩৮৬)।

ভাষাশিল্পী মশাররফ, (ঢাকা, ১৯৬৯)।

মীর মশাররফের গদ্যরচনা, (ঢাকা, ১৩৮২)।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম — রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা--সমকালের দর্পণে, (ঢাকা, ১৩৯৮)।

সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ, (ঢাকা, ১৩৯৭)।

মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী — মুসলমানের জাতিভেদ, (হুগলী, ১৩৩৪)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, (ঢাকা, ১৩৭৭)।

মোহিত রায় — নদীয়া উনিশ শতক, (কলিকাতা, ১৩৯৫)।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল — মুক্তির সন্ধানে ভারত, (কলিকাতা, ১৩৭৯)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৮১, দ্বি-স)।

রাইচরণ দাস — মনের কথা অনেক কথা, কুমারেশ ঘোষ সংকলিত-সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৮৫)।

শামসুজ্জামান খান — নানা প্রসঙ্গ, (ঢাকা, ১৩৯০)।

শিবনাথ শাস্ত্রী — রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (কলিকাতা, ১৯৫৭, দ্বি-নিউ এজ সংস্করণ)।

শেখ জমিরুদ্দীন — আসল বাঙ্গালা গজল, (নদীয়া, ১৩৩৭, চতুর্দশ-স)।

সিরাজুল ইসলাম — বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক কাঠামো, (ঢাকা, ১৯৮৪)।

বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা, (ঢাকা, ১৯৮১, দ্বি-স)।

সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,(কলিকাতা,১৩৬২,তৃ-স)।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় — সাহিত্য-সমীক্ষা, (ঢাকা, ১৯৭৬)।

সুপ্রকাশ রায় — ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৬৬)।

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৭০)।

সুশীলকুমার গুপ্ত — উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ, (কলিকাতা, ১৩৮৩, দ্বি-স)।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মুর্তাজা আলী — **প্রবন্ধ-বিচিত্রা**, (ঢাকা, ১৩৭৪)।

স্বপন বসু — **বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস**, (কলিকাতা, ১৯৮৫, দ্বি-স)।

A. K. Nazmul Karim — **The Dynamics of Bangladesh Society**,(Delhi, 1980).

Brijen K. Gupta — **Sirajuddaullah and the East India Company 1756-1757**, (Leiden, 1966).

C. E. Buckland — **Bengal Under the Lieutenant Governors**, Vol. II, (Calcutta, 1902, 2nd ed.).

Muhammad Abdul Awal — **The Prose Works of Mir Massarraf Hosen**, (Chittagong, 1975).

Muhammed Mohar Ali — **The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities**, (Chittagong, 1965).

Sufia Ahmed — **Muslim Community in Bengal**, 1884-1912, (Dacca, 1974).

স্মারকপত্র, সংকলন, কার্যবিবরণী, পরিষৎ-পঞ্জিকা

বাংলাসাহিত্যের সম্পদ (পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৬)।

মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, (পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৬)।

মীর মশাররফ হোসেন স্মারকপত্র, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৭)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনের (১৩১৮, চুঁচুড়া) কার্য্য-বিবরণ, (আখ্যাপত্র ছিন্ন)।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, (কলিকাতা, ১৩১৩)।

সহায়ক প্রবন্ধ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — 'গাজি মিয়াঁর বস্তানি', **প্রদীপ**, পৌষ ১৩০৮।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — 'বিষাদ-সিন্ধুর গদ্যরীতি', **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, কার্তিক-চৈত্র ১৩৯৩।

আবদুল গফুর — ' 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রণেতা মীর মোশাররফ হোসেনের জীবনে বিষাদ', **মূল্যবোধ**, দ্বিতীয় পত্র/জুলাই ১৯৮৩।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী — 'ঐতিহাসিক ক'নে বদল', **মাহেনও**, আগস্ট ১৯৫২।

'মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস', **সাপ্তাহিক মোসলেম হিতৈষী**, [?] মে ১৯১৭।

আবু-নুর — 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক', **ইসলাম-দর্শন**, পৌষ ১৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩২।

আবুল আহসান চৌধুরী — 'পুরনো দিনের চিঠিপত্র ঃ তার গবেষণামূল্য', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ শ্রাবণ ১৩৮৩।

'মীর মশাররফ হোসেনের 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' ', লোকসাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮১।

আলী আহমদ — 'মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'আজীজন নেহার' পত্রিকা', লোকসাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮৪।

আশরাফ সিদ্দিকী — 'মীর মশাররফ হোসেন', বাঙ্‌লা একাডেমী-পত্রিকা, পৌষ ১৩৬৩।

'হিতকরী', মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৬।

কাজী মোতাহার হোসেন — 'মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' ', বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, ঢাকা, ১৯৫৬।

ক্ষেত্র গুপ্ত — 'মীর মশররফ হোসেন', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৭।

দীনেন্দ্রকুমার রায় — 'কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চা', সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম — 'মীর মশাররফ হোসেনের গো-জীবন', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল — 'বিষাদ-সিন্ধু', পাণ্ডুলিপি, ২য় সংকলন ১৩৭৮।

মোহাম্মদ ইদরিস আলী — 'বাজীমাত', বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র, ১৩৬৫।

'হজরত বেলালের জীবনী', বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৭।

শামসুজ্জামান খান — 'মীর মশাররফ হোসেন : জীবনকথা — কিছু নতুন তথ্য', দৈনিক সংবাদ, ১০ পৌষ ১৩৯৯।

'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম — আজিজাননাহার', সচিত্র সন্ধানী, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯।

পত্র-পত্রিকা

ইসলাম-দর্শন (কলিকাতা) ঃ ১৩৩২

উত্তরাধিকার (ঢাকা) ঃ ১৩৯৩

উপাসনা (কাশিমবাজার) ঃ ১৩১৮

এডুকেশন গেজেট (চুঁচুড়া) ঃ ১৮৭৪

কোহিনুর (পাংশা) ঃ ১৩১৮

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (কুমারখালী, সাপ্তাহিক) ঃ ১২৮০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (কুমারখালী, মাসিক) ঃ ১২৭১

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (কুমারখালী, মাসিক) ঃ ১২৮১

ঢাকা প্রকাশ (ঢাকা) ঃ ১৩০০

দৈনিক সংবাদ (ঢাকা) ঃ ১৩৯৯

পাণ্ডুলিপি (চট্টগ্রাম) ঃ ১৩৭৮

প্রদীপ (কলিকাতা) ঃ ১৩০৮

বঙ্গদর্শন (কলিকাতা) ঃ ১২৮০

বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (রাজশাহী) ঃ ১৩৬৭

বাঙলা [বাংলা] একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা) ঃ ১৩৬৩, ১৩৬৫, ১৩৭৫, ১৩৯৫

মধ্যস্থ (কলিকাতা) ঃ ১২৮০

মাহেনও (ঢাকা) ঃ ১৯৫২

মূল্যবোধ (ঢাকা) ঃ ১৯৮৩

মোসলেম হিতৈষী (কলিকাতা, সাপ্তাহিক)ঃ ১৯১৭

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ (রংপুর)ঃ ১২৭৬

লোকসাহিত্য পত্রিকা (কুষ্টিয়া) ঃ ১৯৮১, ১৯৮৪

সচিত্র সন্ধানী (ঢাকা) ঃ ১৯৭৯

সাধারণী (চুঁচুড়া) ঃ ১২৮১

সাপ্তাহিক বিচিত্রা (ঢাকা) ঃ ১৩৮৩

সাহিত্য (কলিকাতা) ঃ ১৩২০

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কলিকাতা) ঃ ১৩৯৭

সোমপ্রকাশ (কলিকাতা) ঃ ১২৮০-৮১

হাফেজ (কলিকাতা) ঃ ১৮৯৭

হিতকরী (লাহিনীপাড়া, দাশাহিক) ঃ ১২৯৮

হিতকরী (লাহিনীপাড়া, পাক্ষিক) ঃ ১২৯৭

হিতকরী (টাঙ্গাইল, মাসিক) ঃ ১৯৬৮

Calcutta Review (Calcutta) : 1897

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও দলিলপত্র

মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী ও ডাইরী।

মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রচনার পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

মীর মশাররফ হোসেনের নানা-বিষয়ক রাফ্‌খাতা ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র।

মীর মশাররফ হোসেনের পারিবারিক জমি-জমার দলিলপত্র।

'গো-জীবন' গ্রন্থ-সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র।

বিবি কুলসুমের অপ্রকাশিত ডাইরী।

নীলকর টি. আই. কেনীর মোকদ্দমার নথিপত্র।

শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের অপ্রকাশিত ডাইরী।

কাঙাল হরিনাথ-প্রতিষ্ঠিত কুমারখালী মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের 'চিঠির নকল পুস্তক' (১৩০৭)।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রাবলী ও দলিল-প্রতিচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

১৩০৫ সালের ১০ আষাঢ় গৃহীত মীর মশাররফ হোসেনের ফটো এবং তাঁর স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

'প্রদীপ' পত্রিকায় (পৌষ ১৩০৮) প্রকাশিত মশাররফের প্রতিকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

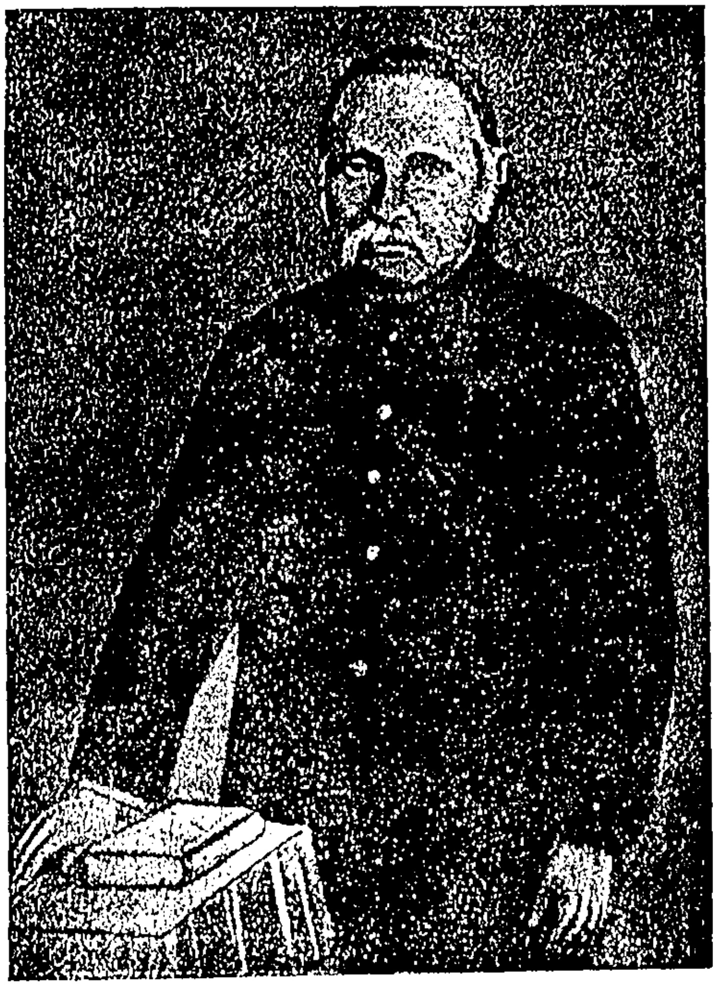

মশাররফ হোসেনের প্রতিকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

মশাররফ-পত্নী বিবি কুলসুমের প্রতিকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

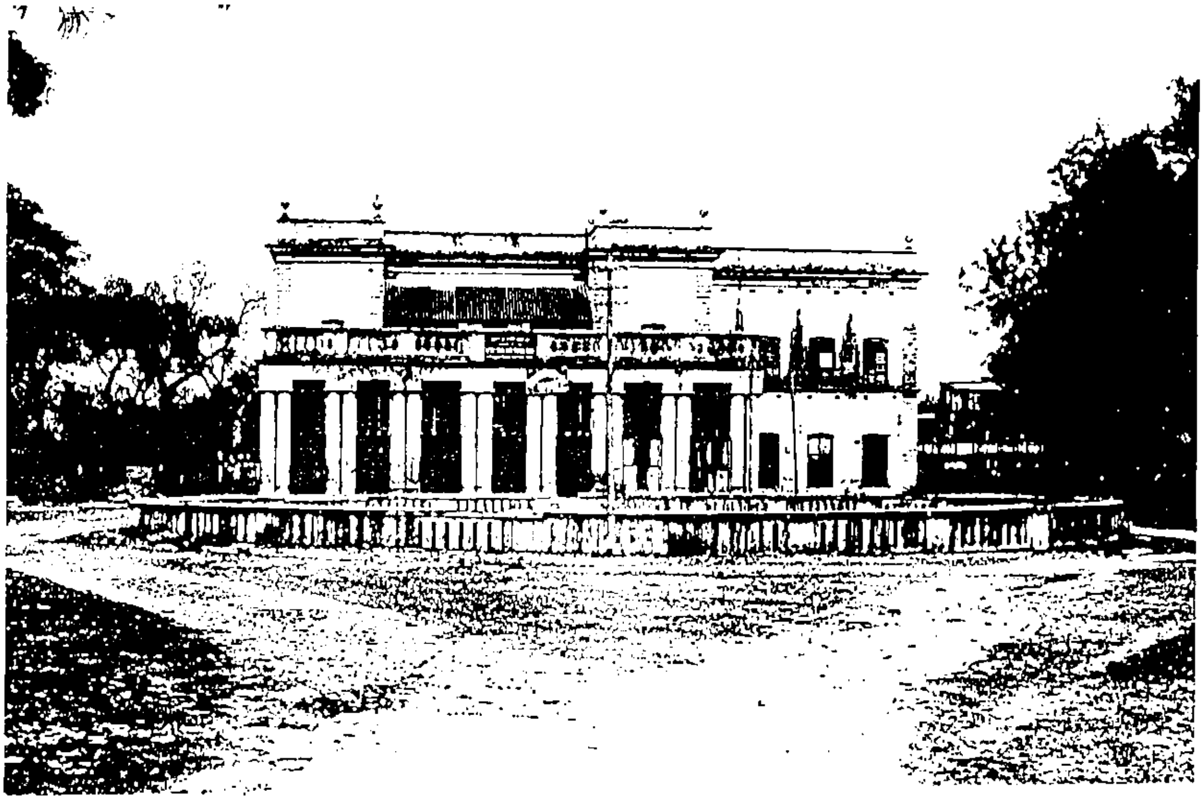

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল : মশাররফের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান

কুষ্টিয়া হাইস্কুল : মশাররফের কৈশোরের বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

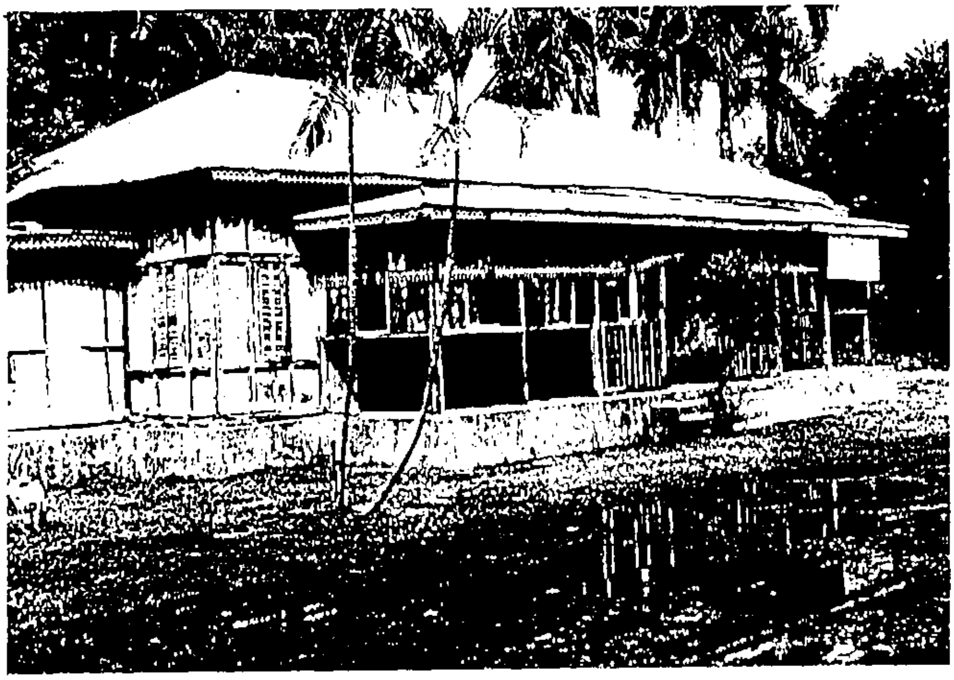

মশাররফের স্মৃতিবিজড়িত টাঙ্গাইলের 'শান্তিকুঞ্জ' কাছারি

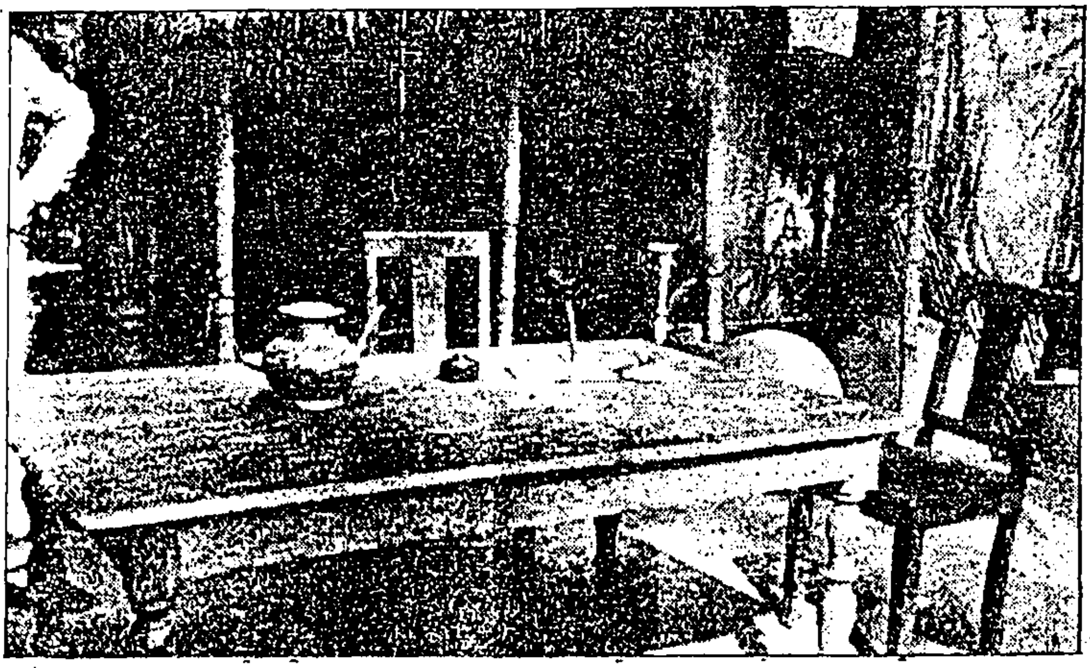

মশাররফ–কন্যা রওশন আরার পৌত্র মীর আবদুল হাইয়ের লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে রক্ষিত মশাররফের ব্যবহৃত টেবিল, কলমদান, কালির দোয়াত ও বাতিদান এবং পত্নী আজীজন্নেসা ব্যবহৃত তামার বদনা

Dhaka University Institutional Repository

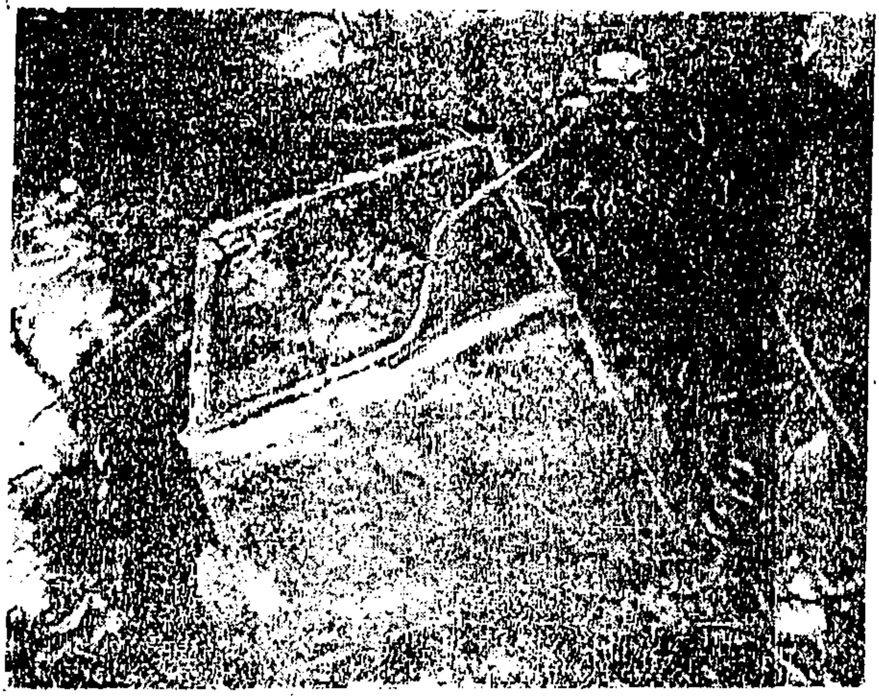

পদমদী গ্রামে অবস্থিত মশাররফের কবর

লাহিনীপাড়ায় মশাররফের প্রথমা পত্নী আজীজন্নেসার কবর

Dhaka University Institutional Repository

রত্নবতী।

কৌতুকাবহ উপন্যাস।

শ্রীমীর মসারফ হোসেন

প্রণীত।

গাঁথিয়া কল্পনাসূত্রে, নব-গল্প হার।
সঁপিলাম বন্ধুগণে, নব-উপহার।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।
সং ১৯২৬।

'রত্নবতী'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

বসন্তকুমারী নাটক

—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।"—

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন

প্রণীত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—মানিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

সম্বৎ ১৯২৯।

'বসন্তকুমারী নাটক' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

জমীদার দর্পণ

নাটক।

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

সিমুলীয়া ২০১ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট

মধ্যস্থ-যন্ত্রে

শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১২৭৯ বঙ্গাব্দা।

মূল্য ॥০ আনা। *Price eight Annas.*

'জমীদার দর্পণ' নাটকের আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

বিষাদ-সিন্ধু!!!

মহরম পর্ব্ব।

BISHAD-SINDHU!!!

THE

HISTORY OF THE MOHARAM.

মীর মশার্‌রফ হোসেন প্রণীত,

ও

আইন্‌উদ্দীন বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY D. C. DASS AND CO., AT THE "CORINTHIAN" PRESS,

33, NEW CHINA BAZAR,

1885.

'বিষাদ-সিন্ধু'র আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত লহরী।

প্রথম খণ্ড।

মীর মশাররফ হোসেন

প্রণীত।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হইতে
আইনদ্দিন বিশ্বাস দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা
ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীযাদবচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক
মুদ্রিত।
৬৩নং পঞ্চাননতলা লেন।

১২৯৪ সন।

মূল্য।• আনা।

'সঙ্গীত লহরী'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

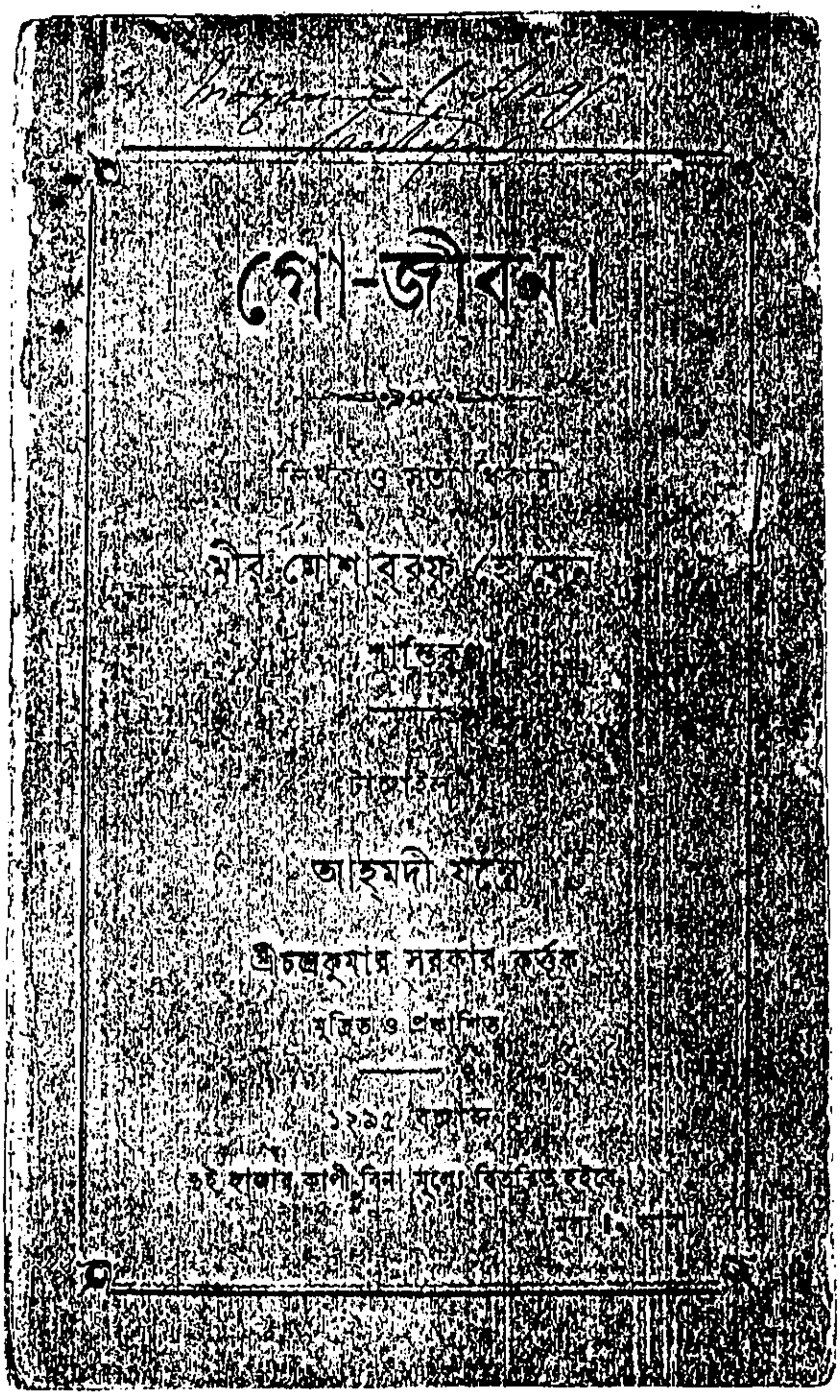
গো-জীবন।

মীর মোশাররফ হোসেন

আহ্‌মদী যন্ত্রে

শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১২৯৫ বঙ্গাব্দ

দুই হাজার কাপী বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে।

'গো-জীবন' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

বেহুলা গীতাভিনয়।

মীর মশার্‌রফ হোসেন।
প্রণীত।

টাঙ্গাইল।

আহ্‌মদী যন্ত্রে।

শ্রীসাধু সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৬ শাল্‌ ৭ই আশ্বিন।

মূল্য ৮০ আনা।

'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

উদাসীন পথিকের মনের কথা।

স্বত্বাধিকারী

মীর মশাররফ্ হোসেন।

সাস্তিকুঞ্জ—টাঙ্গাইল।

কুষ্টিয়া,—লাহিনীপাড়া হইতে

মীর মহতাব আলি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪৬ নং পঞ্চাননতলা লেন ভারত মিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা। Price Re. 1.

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

গাজীমিয়াঁর বস্তানী।

প্রথম অংশ।

সৰ্বাধিকারী
উদাসীন পথিক।

প্রকাশক
M. U. AHMUD.

কলিকাতা,
উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, ৪ নং ভবনস্থ
দাস যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৸০, ডাক মাশুল ৵০।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীমীর মশাররফ হোসেন
প্রণীত।

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্‌ ভারতমিহির যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩১০।

মূল্য /০ আনা।

'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

বিবি
খোদেজার বিবাহ।

শ্রীমীর মোশাররফ হোসেন

প্রণীত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

৪৮নং সার্কুলার রোড, টালীগঞ্জ হইতে

মীর এব্রাহিম হোসেন দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩১২

মূল্য ॥৽ আনা, বাঁধাই ৸৽ আনা।

'বিবি খোদেজার বিবাহ' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

৩৬৯

আমার জীবনী।

প্রথম খণ্ড।

স্বত্বাধিকারী—
শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা,
৩৬ নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালী—
মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত।

১৩১৫ সাল।

১লা আশ্বিন।

'আমার জীবনী'র আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

ইদের খোত্‌বা।

(উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ সহ।)

বাঙ্গালা অনুবাদক ও স্বত্বাধিকারী—
শ্রীমীর মশাররফ হোসেন।

প্রকাশক—
শ্রীমীর আশরাফ হোসেন।
৩৬ নং গোরাচাঁদ রোড্—কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল; আষাঢ়।

মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

'ঈদের খোতবা'র আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

আমার জীবনীর জীবনী

কুলসুম-জীবনী।

লেখক—

শ্রীমীর মশাররাফ হোসেন।

প্রকাশক—

শ্রীমীর এবরাহিম হোসেন।

১নং ফাষ্ট লেন, আহীর পুকোর।

কলিকাতা,

১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৭

অমূল্য—

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

विषाद-सिन्धु

मूल लेखक

स्वर्गीय मीर मशार्रफ़ हुसेन ।

अनुवादक

मनोरमा, गृहलक्ष्मी आदि सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं

के भूतपूर्व सहायक सम्पादक तथा

"कान्यकुब्ज" पत्र के सम्पादक

कवीन्द्र बेनीप्रसाद वाजपेयी "मंजुल"

स्वत्वाधिकारी

मीर एब्राहिम हुसेन

प्रकाशक

श्री निरंजनलाल जी भार्गव

इलाहाबाद ।

१६३०

प्रथम संस्करण] १६३० [मूल्य

'বিষাদ-সিন্ধু'র হিন্দী সংস্করণের আখ্যাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হইতে প্রকাশিত।

হিতকরী।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৲ টাকা।
নগদ মূল্য ৴০ দুই পাই।

পাক্ষিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। | সন ১২৯৭ সাল। ৩০শে আষাঢ়। ২য় পক্ষ। ইং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। ১৩ই জুলাই। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মাননীয় সহযোগী ভ্রাতৃগণ হিতকরীর সহিত পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিলে, হিতকরীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ দাস, উকীল মুন্সেফী আদালত কুষ্টিয়া এই ঠিকানায় কাগজ পাঠাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী।

——ঃঃঃ——

বিজ্ঞাপন।

বিষাদ-সিন্ধু!!

মহরম পর্ব্ব।

ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, নূতন অক্ষরে পুনঃ মুদ্রিত হইয়া, বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। অর্ডার পাইলে ভিঃ পিঃ পার্শেলে পাঠান যায়। মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাশুল এক আনা।

মীরমশাররফ হোসেন
শান্তিকুঞ্জ — টাঙ্গাইল

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সহযোগী সুধাকর গত তারিখে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইলে এবং তদানুসারে নির্ব্বাচন হইলে হিন্দুরাই মনোনীত হইবেন। ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি, তাঁহারা মুসলমানদিগের প্রতি ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিবেন না ও করিতে পারেন না ইহাই সুধাকরের মুখ্য বিবাদ। কোন ও যুক্তিটী মন্দ নহে। তদানুসারে নির্ব্বাচন প্রথা সভ্য ও সর্ব্বমতে অনুমোদনীয়, সুধাকর কেন ইহার বিরোধী? সুধাকর যদি আপনি আপনি বিরোধী হয়েন, তাহাতে বেশী কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাস্তবিক যদি ভারতের অধিকাংশ মুসলমানেরই এই মত হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন প্রথা কথাটা লইয়া সুধাকর এত আন্দোলন করিতেছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেন্ট কি অন্য ব্যাপারে এই নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বন করেন না? শুধু ব্যবস্থাপক সভা কেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে এই নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। হিন্দুরা বহু পরিমাণে নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া আপত্তি করা কি যুক্তিযুক্ত? হিন্দুরা রাজক্ষমতা পাইলে অবিচার করিবেন না বলিলেও তাহা লইয়া কার্য্য করিতে গেলে গবর্ণমেন্টের রাজ্যে একটী বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। দেশীয় হিন্দু হাকিমগণকে তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে অবসৃত করিতে হয়। যে সকল কাযে হিন্দুরা আছেন, তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া না হয় মুসলমান লওয়া হইল, কিন্তু যে সকল বিভাগে যে সকল পদে এখন মুসলমান ভ্রাতাদিগকে উপযুক্ত সংখ্যায় দেখা যাইতেছে না যে, ঐ সকল পদ ও কার্য্য কি আপাততঃ ভবিষ্যত মুসলমানদিগের জন্য বন্ধ রাখা হইবে? আমরা বলি, ইংরাজ আমাদের রাজা। আমরা হিন্দু হই মুসলমান হই সকলেই প্রজা, আমরা একত্রিত হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট কাঁদাকাটি করিয়া কোন একটী ফল চাহিয়া লইব, তাহা না করিয়া কি না আমরাই ঘরে ঘরে বৃথা বিবাদ করিতেছি। সহযোগী ভ্রাতার প্রতি রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিতেছি না। বাস্তবিকই নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে যদি তাঁহার ভাল কিছু যুক্তি থাকে, তিনি প্রকাশ করুন, আমরা তাঁহার যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিতে বিলক্ষণ ইচ্ছুক আছি।

———

মশাররফ-সম্পাদিত 'হিতকরী' (পাক্ষিক) পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।

১২৮০ সাল ১৬ই চৈত্র

বিজ্ঞাপন।

আজীজন্ নেহার।

আমরা এই নামে একখানি মাসিক বাঙ্গলা পত্রিকা আগামী বৈশাখ হইতে প্রকাশ মানস করিয়াছি। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেই যথা সময়ে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

কএকজন মুসলমান্।
হুগলী কলেজ।

মশাররফ-সম্পাদিত 'আজীজন্‌নেহার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন

Dhaka University Institutional Repository

(১২১)

ষষ্ঠ — অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(চাঁদ বণিকের বাটীর দ্বার দেশ। চাঁদ বণিক অর্ধোন্মাদ চিত্তে (সম্মুখে ধূত দেবমূর্ত্তি) বেহুলা মলিন বেশে উপবিষ্টা — এবং গুণগান দণ্ডায়মান।)

বেহুলা। (করযোড়ে) —

পতি প্রাণ, পতি ধ্যান — পতি মান পতিপ্রাণ

দুর্দিনে পতি পদ, পরকালে হয় গো না

ঐশ্বর্য্য সুখ আদি, সকলই পতি কাছে,

সেপদ পাইলে সতী, সাক্ষাৎ বিপদ।।

ইহকালে পরকালে, কোন কালে দুঃখ নাই।

পতিই — পতি, পতি, প্রকাশে তারে বোঝায়।।

সেই দুর্ভাগ্য — এ — পৃথিবীতে না জানি হয়।

তবে কিসে — দীর্ঘ আর — নাহি কোনই দিন

যে পদে নিয়েছে পতি সেই

যাব আমি সেই পদে

যা যাবে এখানে আমায় ফিরিতে কোথাও

যে পদে নিয়াছে পতি সেই পদে আমি যাব

পতি পদ — ধন, যাইলে অবশ্যই দেখা পাব।।

'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

(১)

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

অপ্রকাশিত 'বাঁধা খাতা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

২য় উদ্যম (১)

(১১৫)

প্রেম—পারিজাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

৩। সম্রাটের সন্ততি মধ্যে মাত্র একটি কন্যারত্ন। নাম জোলেখা। ~~[illegible]~~ – বালিকা কাল উত্তীর্ণ হইয়া নব যৌবনে আরম্ভ। রাজমহিষী [illegible]। একমাত্র কন্যারত্নই রাজপাটের অধিকারিণী তিনিই ভাবী রাজরাজেশ্বরী। রাজকুমারী অনুপম রূপগুণান্বিতা। তিনি বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী [illegible] কথা ~~[illegible]~~ আপাততঃ অন্তঃপুর সর্বত্র প্রকাশ যে — সেই তৈমুস রাজনন্দিনীর ন্যায় সুশ্রী বালিকা সেই সময় আরবদেশে আর কেহই ছিলনা। ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ বিবাহ বয়স হয় নাই। তথাচ যথা প্রবল প্রতাপান্বিত ~~[illegible]~~ রাজকুমারগণ বিবাহ প্রার্থনায় সদা সর্বদা দূত প্রেরণ করিতেছেন, কত স্থান হইতে প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

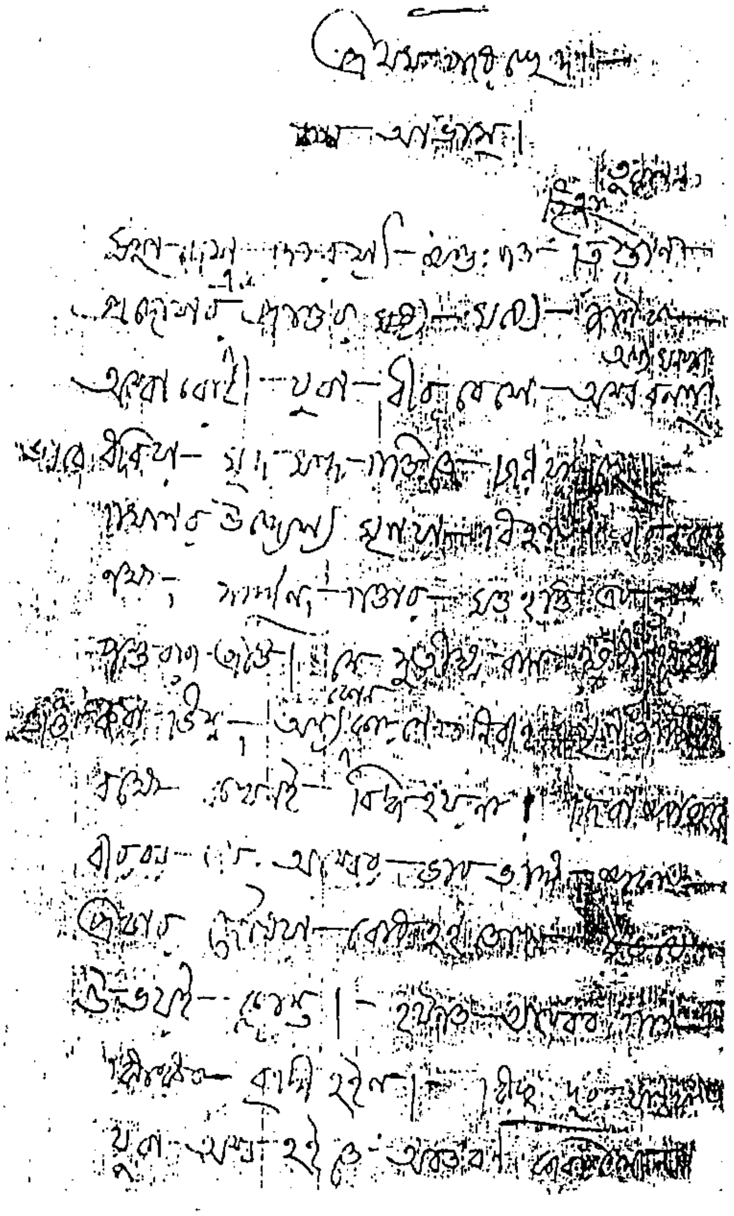

'তহমিনা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

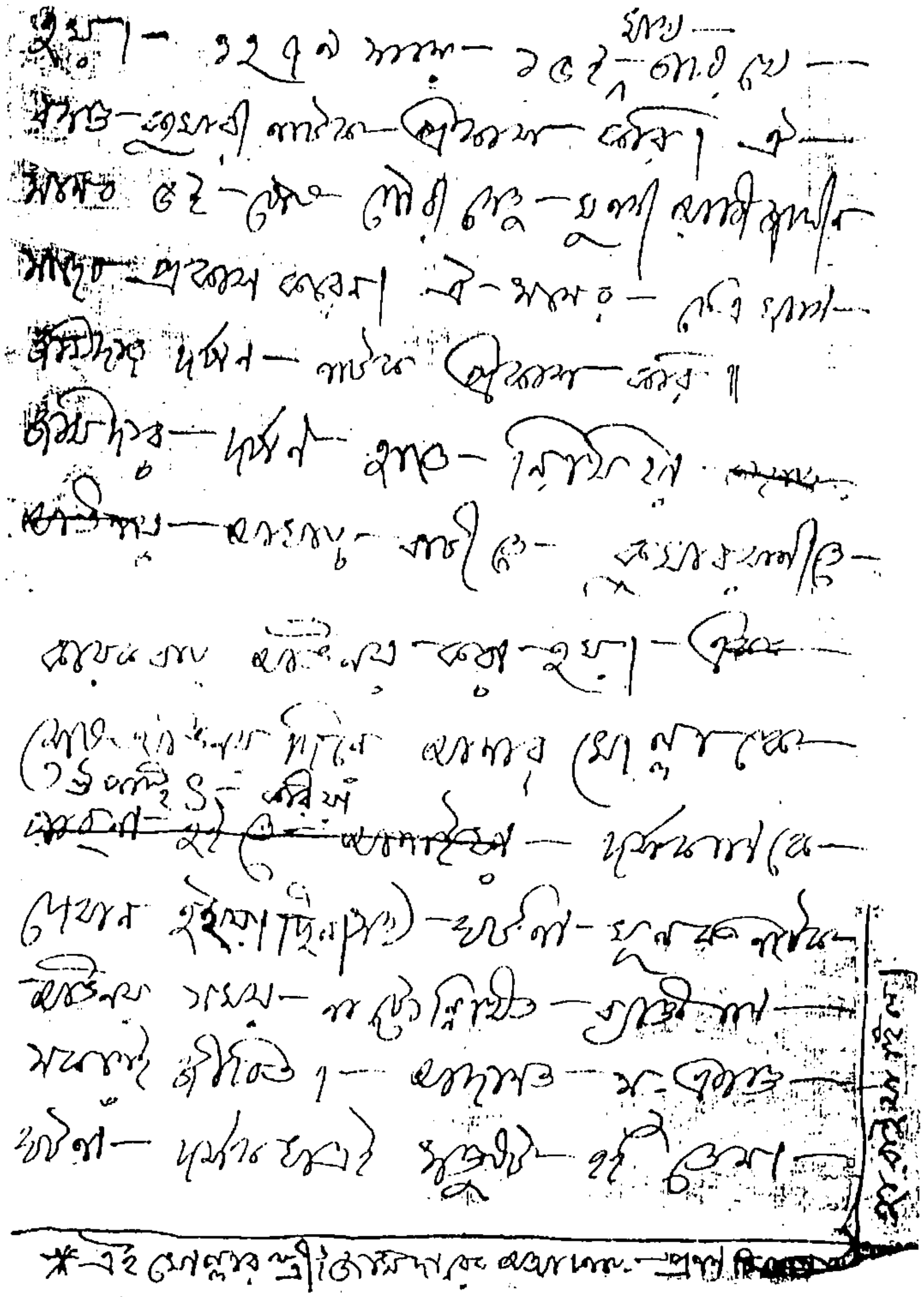

মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে 'জমীদার দর্পণ' নাটকের বাস্তবতা-সম্পর্কিত সাক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

১৩০৪ সাল ৭ই অগ্রহায়ণ

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ ২৬শে কার্ত্তিক
বুধবার

প্রাতে স্নান হইতে উঠিয়া নিয়মিত
কার্য্য সমাধা করিয়া দেখিলাম
যে [illegible] হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া
[illegible] হইতে [illegible] হইলেন [illegible]
কাছারিতে গেলেন। আমি মনে
বড় দুঃখ করিয়া বসিয়া থাকিলাম
একটুকু পরে শুইলাম। পরে এক
[illegible] খেয়াল হইল। উঠিয়া দেখি
সাহেব বাসায় আসিয়াছেন। তখন
আমার অবস্থা [illegible] [illegible] হইয়াছে
আমাকে বলিলেন যে আমার সময়
একটুকু [illegible] [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা [মাসিক] ।। শ্রাবণ ১২৭২/আগস্ট ১৮৬৫

গুলি টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, তজ্জন্য এবারে ইংলণ্ডীয় ব্যয়ের জন্য অধিক টাকা লওয়া হইবেনা। কুলি কন্ট্রাক্ট বিলে সম্প্রতি প্রধান সময়ে গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন দুই মাস বেতন না পাইলে কুলিগণ চুক্তি ভঙ্গের প্রার্থনা করিতে পারিবে বিলে প্রথম এই রূপ ছিল, তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া ছয় মাস করা ভাল হয় নাই।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

১। মীর মশারফ হোসেনের বরিশালস্থ পত্র প্রেরকের ভৎসনা পত্র খানি পরিত্যক্ত হইল।

২। রহস্য সন্দর্ভ হইতে কোন বন্ধু যাহা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন; অগত্যা পরিত্যাগ করা হইল।

৩। চন্দ্রনাথ শর্ম্মার পদ্যগুলি সুশ্রাব্য না হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনান্তর ভবদীয় পত্রিকৈক পার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

মহাশয়! বরিশালস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে গত পৌষ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পত্রিকায়, আমার নামে যে এক খানি পদ্য সন্দর্ভ লিখিত আছে তাহা নাকি ১২৬৭ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ৬ সংখ্যক রঙ্গপুর দিক প্রকাশে প্রকাশ আছে! থাকিতে পারে সন্দেহ নাই। কারণ ঐ প্রবন্ধটি আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত নাজমাল হাক সাহেব (কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্র) একদা সহাস্য বদনে প্রফুল্ল মনে মৃদুস্বরে ব্যক্ত করিলেন যে হে! বন্ধু আমি একটা পদ্য সন্দর্ভ রচনা করিয়াছি, আমার মন বাঞ্ছা এই যে তব নাম স্বাক্ষর করিয়া গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় প্রকাশ করি। তাহাতে উত্তর করিলাম যে আপনকার নাম প্রকাশ করিতে যদ্যপি সঙ্কোচ বোধ হয় তবে ক্ষতি কি আছে, প্রিয়তম! বন্ধু-বান্ধব মধ্যে এ প্রকার অনেক ঘটিয়া থাকে। পাঠক বৃন্দ, তাঁহার ঐ চাতুরি বুঝিতে না পারিয়া উক্ত পত্রে স্বহস্ত স্বনাম স্বাক্ষর করত গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকায় প্রকাশ করিয়াছি। ওগো বরিশালস্থ সংবাদ দাতা মহাশয়! আপনি এই গুপ্ত বিষয়টি ব্যক্ত করিয়া যে কি পর্য্যন্ত বাধিত করিলেন তাহা বচনাতীত। আমি চির দিনের নিমিত্ত আপনার কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, চতুর বন্ধু মহাশয় যে মনে মনে এরূপ চাতুরী করিয়া ছিলেন ইহা আমার মনের অগোচর ছিল। মহাশয়। আপনি এই অপ্রকাশ বিষয়টি প্রকাশ করিয়াছেন ইহা বন্ধুর কার্য্য বলিতে হইবেক। চতুর বন্ধুকে বিশ্বাস করাই আমার বিষম ভ্রম হইয়াছে।

বিশ্বাস করিয়া বন্ধু তোমার বচনে হে,
তোমার বচনে।
লিখিয়া ছিলাম নাম অতি যতনে হে,
অতি যতনে।
এত কি চাতুরী ছিল তোমার মনেতে হে,
তোমার মনেতে।
স্বপনেও এক দিন জানি না পূর্ব্বেতে হে,
জানি না পূর্ব্বেতে॥
এখন সে গুপ্ত কথা হইল প্রকাশ হে,
হইল প্রকাশ।
এই কি বন্ধুর ধর্ম্ম একি সর্ব্বনাশ হে,
একি সর্ব্ব নাশ॥
প্রিয়তম বরিশালস্থ সংবাদ দাতা হে,
সংবাদদাতা।
চিরদিন সুখে তাঁকে রাখেন বিধাতা হে,
রাখেন বিধাতা॥
তিনিই এ গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া হে,
প্রকাশ করিয়া।
এমত অজ্ঞানে দিলেন সতর্ক করিয়া হে,
সতর্ক করিয়া॥
অতএব দিব্য করি যাবত বাঁচিব হে,
যাবত বাঁচিব।
অবিশ্বাসী বন্ধুকে বিশ্বাস না করিব হে,
বিশ্বাস না করিব॥
হায় হায় হায় বন্ধু একি তব কাজ হে,
একি তব কাজ,
সজ্জন মধ্যে তুমি দিলে আমায় লাজ হে,
দিলে আমায় লাজ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি হে,
বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কেন তোমার হেন কর্ম্মে হয়ে ছিল মতি হে,
হয়ে ছিল মতি।

ওহে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, যশো ভূষিত, প্রিয়তম বন্ধু! আর তোমাকে বিশ্বাস করি না; আমাকে যে অপমান করিয়াছ তাহাতেই তোমার মান প্রকাশ পাইয়াছে এখন মানে মানে থাক, ভবিষ্যতে এরূপ অদ্ভুত বিদ্যা প্রকাশ করিবেন না (আপ্কা খোদা কাহাম)।

কুষ্টিয়া
১২৭১
২৫ চৈত্র

নিতান্তাস্বগত।
শ্রীমীরমশারফ হোসেন।
লাহিনীপাড়া।

মনোবর শ্রীযুক্ত বাবু গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, সুরচিত কতিপয় ভগ্ন্য পংক্তি ভবদীয় বিষয়াপিনী পত্রিকা পার্শ্বে স্থানদান পূর্ব্বক উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আজ্ঞা হইবেক।

গ্রীষ্মবর্ণন।

আইল নিদাঘ কাল গেলরে বসন্ত।
বিরহী জনের যেন ছাড়িল কৃতান্ত॥
প্রচণ্ড তপন তাপে তপ্ত ক্ষিতি জল।
পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রাণী হইল বিকল॥
জলচর রহে জলে নিমগ্ন হইয়া।
শূকর শূকরী রহে পঙ্কেতে পড়িয়া।

নকল লেখা প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত মশাররফের কৈফিয়ৎ

Dhaka University Institutional Repository

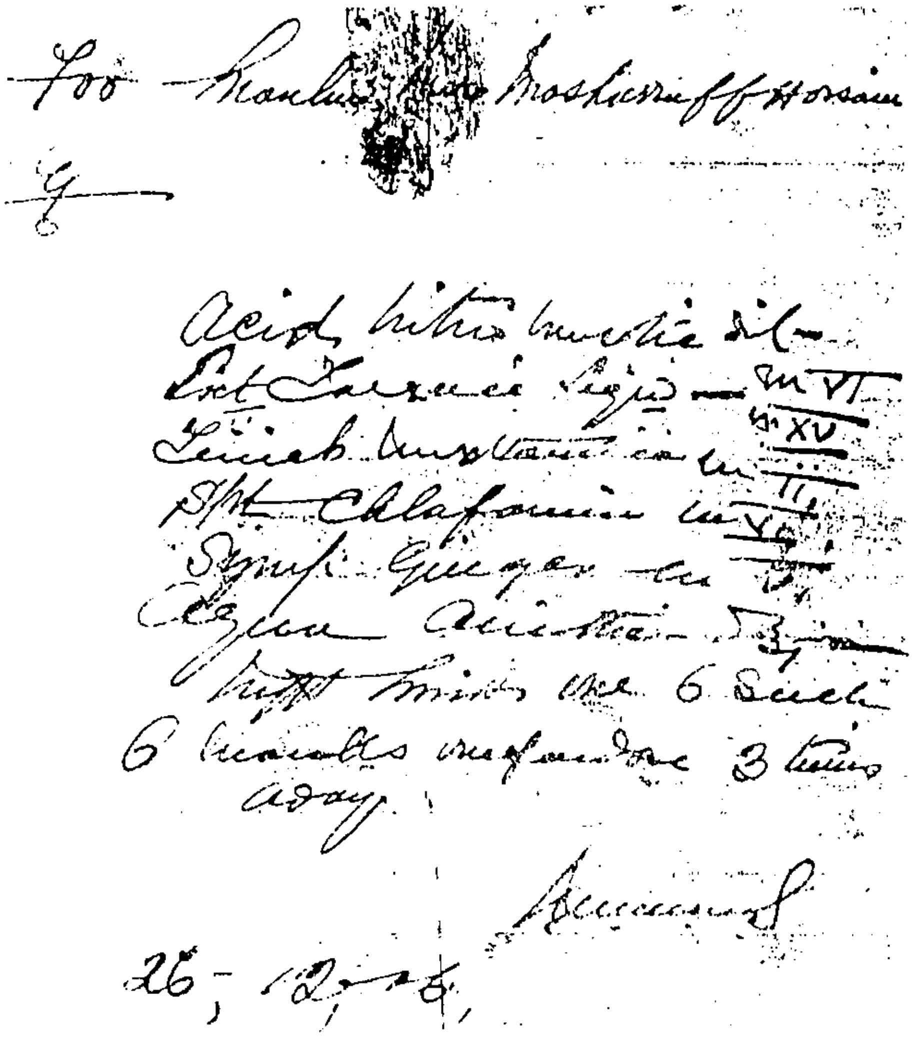
For Moulvi Mir Mosharruff Hossain

Acid Nitro Muriatic dil —
Ext Taraxaci liquid — m VI
Tinct Nux Vomica — m XV
Spt Chloroformi — m V
Syrup Zingiber — [illegible]
Aqua Anisi — [illegible]
Fiat mixtura. One 6 such
6 hourly [illegible] 3 times
a day.

[illegible]

26 - 12 - [illegible]

অসুস্থ মশাররফের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

FOUR ANNAS

[illegible]

The witness on being solemnly affirmed saying ... name Sayid ... Hossein, father's name ... Sayed Riazutullah, resident of Gohan pergunnah Dasuil via Jefferah, at present residing at no. 25 Ripon Street Calcutta aged about 28 years. I am a Vakil of the Calcutta High Court.

yes. I know ... [M]osharraf Hossein.

... plaintiff belongs to ... respectable family ...

'গো-জীবন' গ্রন্থ প্রকাশকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদের প্রেক্ষাপটে মশাররফ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার দলিল

Dhaka University Institutional Repository

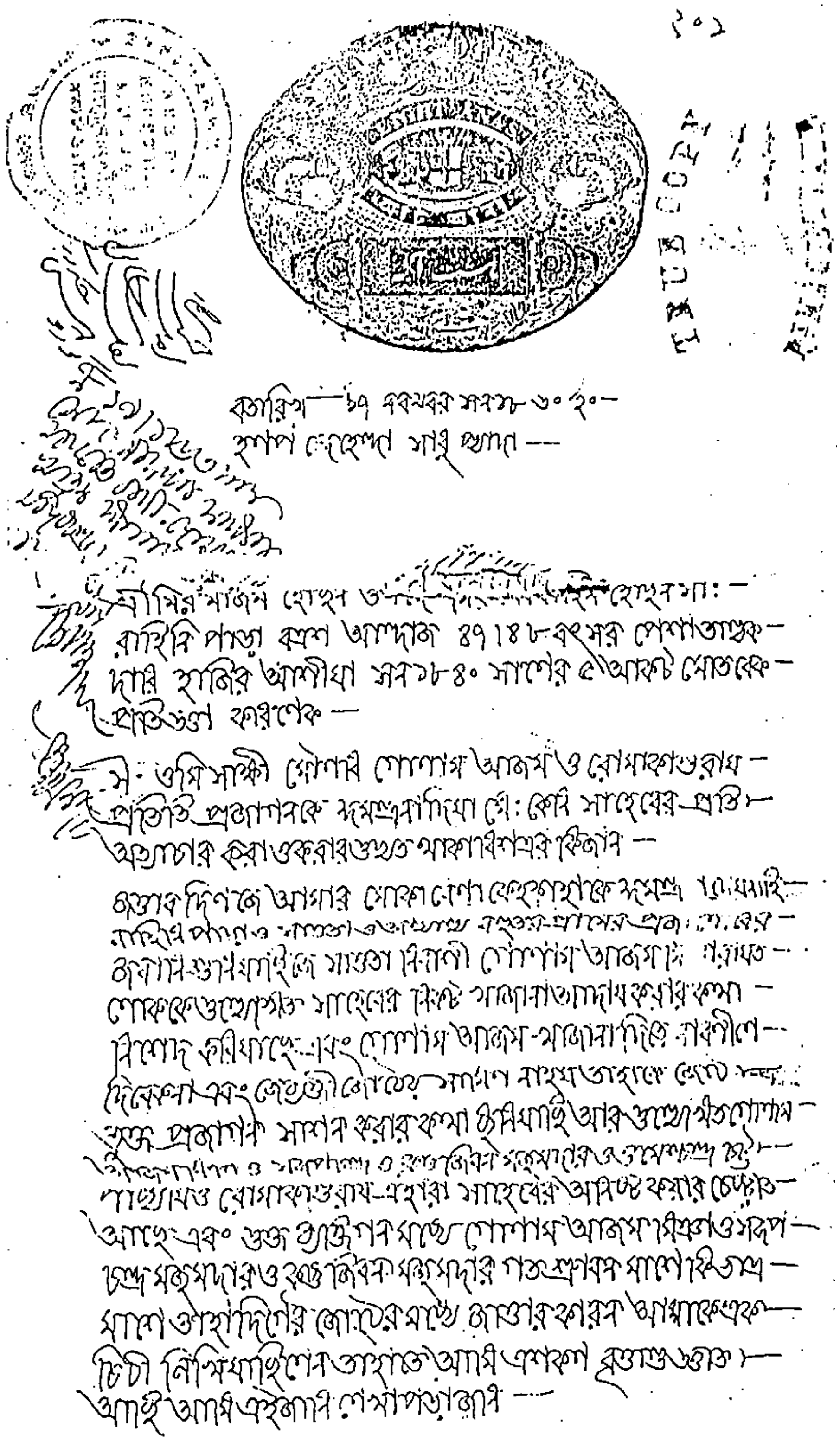
১০১

তারিখ — ১৭ নবেম্বর সন ১৮৬০ ইং —
[illegible] সাহু খান —

সাক্ষির [illegible] হোসেন সাঃ —
লাহিনি পাড়া বয়স আন্দাজ ৪৭।৪৮ বৎসর পেশা তালুক —
দারি হলফির আলোখা সন ১৮৪০ সালের ৫ আক্ট মোতাবেক —
প্রতিজ্ঞা করণেক —

সঃ [illegible] সাক্ষী মৌলবী গোলাম আজম ও রামকান্ত রায় —
প্রভৃতি প্রজাগণকে [illegible] মোঃ কেনি সাহেবের প্রতি —
অত্যাচার করা ও করার উদ্যত থাকা বিষয়ে কি জান —

জওয়াব [illegible] আমার [illegible] —
[illegible] —
[illegible] গোলাম আজম [illegible] —
[illegible] সাহেবের নিকট [illegible] —
[illegible] এবং গোলাম আজম [illegible] —
[illegible] এবং [illegible] —
[illegible] করার কথা [illegible] আর [illegible] —
[illegible] —
[illegible] রামকান্ত রায় এহারা সাহেবের অনিষ্ট করার চেষ্টা —
আছে এবং উক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে গোলাম আজম [illegible] —
[illegible] মজুমদার ও [illegible] মজুমদার [illegible] —
[illegible] তাহাদিগের [illegible] মধ্যে [illegible] —
চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমি এ[illegible] —
আছি আমি এই জানি [illegible] —

নীলবিদ্রোহের নেতা সা গোলাম আজমের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালে নীলকর কেনীর দায়েরকৃত মামলার সাক্ষী মশাররফ-পিতা মোয়াজ্জম হোসেনের সওয়াল-জবাব

Dhaka University Institutional Repository

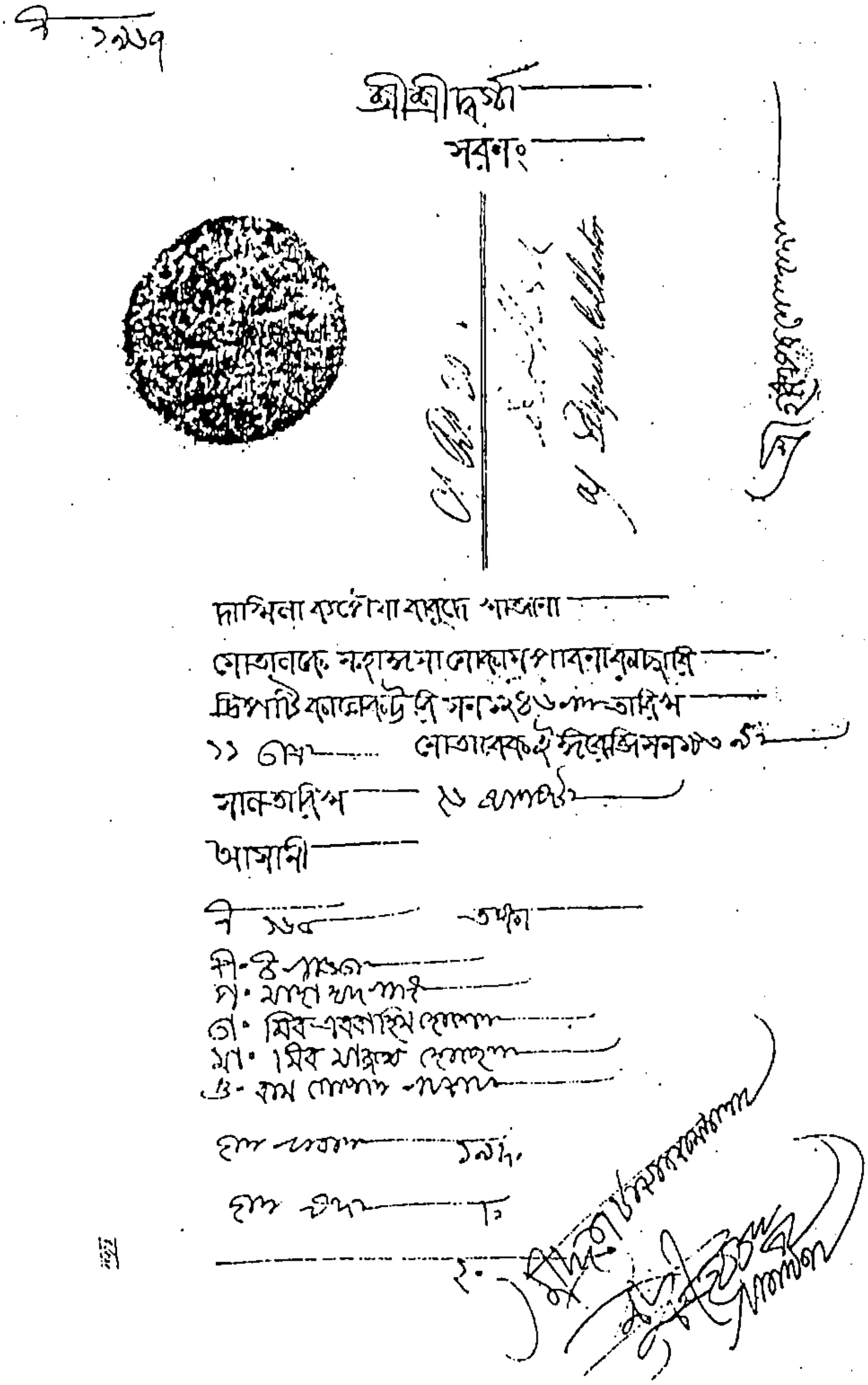

মশাররফের পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেন কর্তৃক ১৮৩৯ সালে প্রদত্ত খাজনার দাখিলা